বসুমতী পুস্তকবিভাগ—১১৫।৪ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একটী বিশেষ কথা—

আমরা বাঙ্গালী।—বাঙ্গালী বীরত্বের সম্মান জানে না, আমাদের এইরূপ অপযশ দীর্ঘকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ কথা সত্য নহে। বাঙ্গালীর বীরত্ব প্রকাশের অবকাশ নাই, বাঙ্গালীকে সৈন্যদলে গ্রহণ করা হয় না, বাঙ্গালীকে ইংরেজ কোথাও কোন প্রকার বীরত্ব প্রকাশক কর্ম্মের ভার দেন নাই। বাঙ্গালীর শৌর্য্যানুরাগ সমধিক বর্দ্ধিত হইলেও তাঁহাদের সমরবিষয়ক গ্রন্থপাঠের স্পৃহা চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে নাই, রণসঙ্গীতের ভাষা বঙ্গসাহিত্যে নাই, বাঙ্গালীকণ্ঠ সে স্বর আয়ত্ত করিতে পারে না। কামানশ্রেণীর জলদ গম্ভীর হুঙ্কারে যখন দিগন্ত প্রকম্পিত হইতে থাকে, সেনাপতির আদেশে সশস্ত্র সৈনিকদল যখন সমতালে পদক্ষেপ করিয়া অধীরচিত্তে যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হয়, ঘন ঘন তূর্য্যনিনাদে ও সাঙ্কেতিক আলোক-অক্ষরে প্রতিপক্ষের গতিবিধি যখন তাহাদিগের মানসক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইতে থাকে, এবং রণদামামা মৃত্যুর নিশ্চিত তরঙ্গভঙ্গে ঝম্পপ্রদানের জন্য যখন আকুলস্বরে স্বদেশের বীরেন্দ্রগণকে অগ্রসর হইতে বলে, তখনকার কি উৎসাহ, কি উদ্দীপনা, তাহা অনুভব করিবার শক্তি বা উপায় আমাদের নাই। তাই বাঙ্গালী! যদি মনুষ্যত্বের আদর করিতে চাও, বীরত্বের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের বাসনা থাকে, যদি কর্ম্মানুরাগের দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া জাতীয় ইতিহাসে আত্মপ্রতিষ্ঠারচিহ্ন অঙ্কিত করিতে চাও, তাহা হইলে উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রণদেবতার জীবনচরিত আলোচনা কর।

নেপোলিয়ানের বীরত্ব সসাগরা ধরণীব্যাপী। যিনি এক একটী যুদ্ধে এক একটী জাতির দর্পচূর্ণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা এক একটী যুদ্ধ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সহিত তুলনার যোগ্য, যাঁহার অঙ্গুলিসঙ্কেতে ইউরোপের সম্রাটগণের সিংহাসন কম্পিত হইত, রাজদণ্ড খসিয়া পড়িত, যিনি মহাপরাক্রান্ত নৃপতিবৃন্দের রাজ্য লইয়া

জগতের অদ্বিতীয় মহাবীর

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট।

বীরত্বেই যে নেপোলিয়ান অসাধারণ ছিলেন, এমন নহে, সর্ব্ববিষয়ে তিনি অসাধারণ ছিলেন; বৃথা রক্তপাত তিনি দেখিতে পারিতেন না; প্রতারণা, প্রবঞ্চনা তিনি প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতেন, তাঁহার ন্যায় সদয়হৃদয় বন্ধু, কর্ত্তব্যপরায়ণ সেনাপতি ভৃত্যবৎসল প্রভু, স্বদেশপ্রেমিক দেশনায়ক, আর্ত্তের সুহৃৎ, বিপন্নের সহায়—পৃথিবীতে অতি অল্পই দেখা যায়। কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কেহ কখনও নেপোলিয়ানকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। এ সকল বীরেরই স্বধর্ম্ম; বিধাতা তাঁহাকে বীর করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। কোন কোন দস্যু ও পরস্বাপহারক প্রবঞ্চক ইংলণ্ডের ইতিহাসে বীরনামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন, প্রতারণা, প্রবঞ্চণা তাঁহাদের বীরত্বের প্রধান উপাদান। সেই সকল বীরের সহিত তুলনা করিলে নেপোলিয়ানের অপমান করা হয়।

পুরুষসিংহ নেপোলিয়ানের জীবনের কথা সংক্ষেপে শেষ করা যায় না। রয়েল ৬০০ পৃষ্ঠায় দুই খণ্ডে প্রকাণ্ড পুস্তক। নেপোলিয়ানের জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল বিষয় এই বিপুল গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ভীষণ লোমহর্ষণ সমরকাহিনী; ইতালী, ভিয়েনা, সিরীয়, ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়া, হোহেনলিন্ডেন, উলম্ অস্তারলিজের ভী[illegible] সমর; আল্পস্ উল্লঙ্ঘন, ওয়াটারলুর যুদ্ধ প[illegible] পড়িতে মনে হইবে, আপনি যুদ্ধস্থলে [illegible] থাকিয়া সমস্ত স্বচক্ষে দেখিতেছেন। [illegible] ইহার কাছে তুচ্ছ! উৎকৃষ্ট কাব্য[illegible] সুখ পাওয়া যায় না, বঙ্গভাষায় [illegible]দিগের চরিত পাঠের সুযোগ একান্ত [illegible]

যদি আত্মশক্তির উদ্বো[illegible] মনুষ্যত্ব লাভে প্রয়াস [illegible] নেপোলিয়ানের হৃদয়-[illegible] [illegible]সর্গিক ফল। কাহিনী পাঠ করুন। [illegible] ভারতবর্ষীয়-

দুই প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

ভীষণ মিউটীনি।

ইংরেজ ও সিপাহীর মহাসমরের ভয়ানক কাহিনী

সিপাহী বিদ্রোহ

সিপাহী বিদ্রোহের নাম আপামর সকলেই শ্রুত আছেন সন্দেহ নাই। যে অভাবনীয় ঘটনায় প্রবাহে ভারতভূমি আলোড়িত হইয়াছিল, যে ঘটনার ভীষণ ষড়যন্ত্রচক্রে চালিত হইয়া অসন্তুষ্ট সিপাহীগণ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল, যে অচিন্তনীয় লোমহর্ষণ ঘটনায় প্রবল প্রতাপশালী ব্রিটিশ কেশরীকেও কম্পান্বিত ও রোমাঞ্চিত কলেবর হইতে হইয়াছিল, এই সিপাহীবিদ্রোহ গ্রন্থ কেবল ঐ জটিল রহস্যময় ঘটনার আমূল বিবরণে পরিপূর্ণ।

কিরূপে লর্ড ডালহাউসীর কুটিল রাজনীতি ভারতের সর্ব্বত্র ভীষণ দাবাগ্নিসম ঘোরতর রোষাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল, কি কারণে টোটার অস্পৃশ্য দোষ আশঙ্কায় অসন্তুষ্ট হইয়া সিপাহীগণ উন্মত্ত, প্রমত্ত ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া আত্মহারাবৎ হইয়া উঠিয়াছিল, কিরূপে, কি কারণে, কি ভাবে দিল্লী ঝান্সী, কানপুর, বারাকপুর প্রভৃতি সর্ব্বত্র যুদ্ধের কাহিনী ও কামানের গভীর গর্জ্জন সমুত্থিত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষ আলোড়িত ও প্রকম্পিত করিয়াছিল, এই গ্রন্থ পাঠে তাহার আমূল সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া বিস্মিত, বিমোহিত ও স্তম্ভিত হইতে হইবে সন্দেহ নাই।

অনেকানেক ঐতিহাসিক মহোদয়গণ এই ঘটনা সম্বন্ধীয় দুই একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা অনেক যত্নে, প্রয়াস ও চেষ্টা করিয়া ও অনেক ঘটনার যথাযথ বিবরণ সংগ্রহে সমর্থ হন নাই। আমরা বহু যত্নে, বহু পরিশ্রমে, বহু অর্থব্যয়ে তৎসমস্ত সম্পূর্ণরূপ যথাযথ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি। অধিক কি, মহামনা "কেন" সাহেবের গ্রন্থে যে সকল ঘটনার উল্লেখ নাই, পাঠকগণ আমাদিগের এই গ্রন্থে তাহাও প্রাপ্ত হইয়া ইতিহাস পাঠ পিপাসার শান্তি ও প্রসঙ্গ লাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। যদি রাজনীতির জটিল রহস্য ও কূটনীতি জানিতে চাহেন, যদি নিষ্ঠুর হত্যার অমানুষিক দৃশ্যে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে বাসনা হয়, যদি নিজের শান্তিপূর্ণ রাজনীতি পাঠে তৃপ্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে পাঠ করিয়া বাসনা ফলবতী করুন।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, ডাঃ

আবার নূতন পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

বোমার সমস্ত কৌশল একাধারে।

ভীষণ বোমা ব্যাপারে গুপ্ত সমিতির ষড়যন্ত্রকাহিনী

নিহিলিষ্ট রহস্য

নিহিলিষ্ট-সম্প্রদায়ের ভীষণ ষড়যন্ত্রের বিবরণ।

পাঠকগণ, সাময়িক সংবাদপত্রাদিতে নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের পরিচয় অবগত আছেন। এই রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য, রুশিয়ার সম্রাটের যথেচ্ছাচার খর্ব্ব করা, সম্রাট কর্ম্মচারিগণের উৎপীড়ন বিদূরিত করা। ইহাদের ভয়ে রুসিয়ার মহাপরাক্রান্ত সম্রাট সদা কম্পমান, রুসিয়ার সহস্র সহস্র গোয়েন্দা সহস্রচক্ষু হইয়া ইহাদের গতিবিধি প্রতিনিয়ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, তথাপি ইহাদের শাসন হইতেছে না। ইহারা কিরূপে, কি কৌশলে

বোমা নিক্ষেপ করিয়া

সম্রাটের জীবন বিপন্ন করিবার চেষ্টা করে, ট্রেণ উড়াইয়া দেয়, প্রাসাদ ধ্বংস করে, প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিদিগকে বধ করে, তাহার বিবরণ এই পুস্তকে দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হইবে। একজন ইহুদী যুবক নিহিলিষ্ট সন্দেহে ধৃত হইয়া সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হন, তিনি চারিহাজার মাইল পথ কিরূপ ছদ্মবেশ ধরিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন, এবং দেশে আসিয়া নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের সহিত যোগদান করিয়া কিরূপ অসাধারণ কার্য্য দ্বারা সমস্ত ইউরোপকে বিস্ময়াকুলিত করেন, তাহারই কাহিনী এই পুস্তকে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এমন লোমহর্ষণ কাহিনী ভারতবর্ষের কোনও ভাষায় ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, একথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

ইহাতে কি ভীষণ ব্যাপার দেখিবেন?

প্রেমের অভিনয়ের মধ্যে বিষাক্ত ছুরিকা, হাস্যের অন্তরালে ডিনামাইট ও গনকটনের বিস্ফারণ, আবশ্যকানুসারে অনায়াসে নিজের বক্ষে অস্ত্রচালনা, উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অসাধ্য সাধন; এ সকল বিবরণ পড়িতে পড়িতে পাঠককে আত্মহারা হইতে হইবে। পুলিসের গোয়েন্দা ও নিহিলিষ্ট গোয়েন্দায় গোয়েন্দাগিরির অপূর্ব্বযুদ্ধ দেখিয়া আহারনিদ্রা ভুলিয়া যাইতে হইবে। প্রকাণ্ড পুস্তক অথচ যৎপরোনাস্তি সুলভ।

মূল্য কেবল ।৵৹ দশ আনা, ডাকে ৸৹ বার আনা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

ভূমিকা।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রণীত, গীতার ভাষ্য ও টীকা থাকিতে গীতার অন্য ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। তবে ঐ সকল ভাষ্য ও টীকা সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত। এখনকার দিনে এমন অনেক পাঠক আছেন যে, সংস্কৃত বুঝেন না, অথচ গীতা-পাঠে বিশেষ ইচ্ছুক। কিন্তু গীতা এমনই দুরূহ গ্রন্থ যে, টীকার সাহায্য ব্যতীত অনেকেরই বোধগম্য হয় না। এই জন্য গীতার একখানি বাঙ্গালা টীকা প্রয়োজনীয়।

বাঙ্গালা টীকা দুই প্রকার হইতে পারে। এক, শঙ্করাদি-প্রণীত প্রাচীন ভাষ্যের ও টীকার বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়, নূতন বাঙ্গালা টীকা প্রণয়ন করা যাইতে পারে। কেহ কেহ প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। বাবু হিতলাল মিশ্র নিজকৃত অনুবাদে, কখন শঙ্করভাষ্যের সারাংশ, কখন শ্রীধরস্বামিকৃত টীকার সারাংশ সঙ্কলন করিয়াছেন। পরম বৈষ্ণব ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত নিজ-কৃত অনুবাদে, অনেক সময়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-প্রণীতা টীকার মর্ম্মার্থ দিয়াছেন। ইঁহাদিগের নিকট বাঙ্গালী পাঠক তজ্জন্য বিশেষ ঋণী। প্রিয়বর শ্রীযুক্ত বাবু ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গীতার আর একখানি সংস্করণ প্রকাশে উদ্যত হইয়াছেন; বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, তাহাতে শাঙ্করভাষ্যের অনুবাদ থাকিবে। ইহা বাঙ্গালী পাঠকের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি নিজকৃত অনুবাদের সহিত "গীতাসন্দীপনী" নামে একখানি [illegible]লা টীকা প্রকাশ করিতেছেন। ইহা [illegible]ষের বিষয় যে, "গীতাসন্দীপনীতে" গীতার মর্ম্ম পূর্ব্ব-পণ্ডিতেরা যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, সেইরূপ বুঝান হইতেছে। বাঙ্গালী পাঠকেরা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাবুর নিকট তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হইবেন সন্দেহ নাই।

এই সকল অনুবাদ বা টীকা থাকিতেও, মাদৃশ ব্যক্তির অভিনব অনুবাদ ও টীকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা পরিশ্রম বলিয়া গণিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার যথার্থ প্রয়োজন না থাকিলে, আমি এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না। প্রয়োজন কি, তাহা বুঝাইতেছি।

এখনকার পাঠকদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই "শিক্ষিত"-সম্প্রদায়ভুক্ত। যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহাদিগকেই সচরাচর "শিক্ষিত" বলা হইয়া থাকে; আমি প্রচলিত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়াই তদর্থে "শিক্ষিত" শব্দ ব্যবহার করিতেছি। কাহার[illegible] শিক্ষা বেশী, কাহারও শিক্ষা কম, কিন্তু [illegible] হউক, বেশী হউক, এখনকার পাঠক [illegible] কাংশই "শিক্ষিত"-সম্প্রদায়ভুক্ত, ইহা আ[illegible] জানা আছে। এখন গোলযোগের কথা [illegible] যে, এই শিক্ষিত-সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উক্তি সহজে বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিলেও তাহা বুঝিতে পারেন না। যেমন টোলের পণ্ডিতেরা, পাশ্চাত্যদিগের উক্তির অনুবাদ দেখিয়াও সহজে বুঝিতে পারেন না, যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহারা প্রাচীন প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের বাক্য কেবল অনুবাদ করিয়া দিলে সহজে বুঝিতে পারেন না। ইহা তাঁহাদিগের দোষ নহে, তাঁহাদিগের শিক্ষার নৈসর্গিক ফল। পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালী প্রাচীন ভারতবর্ষীয়-

ভাষার অনুবাদ হইলেই ভাবের অনুবাদ হৃদয়ঙ্গম হয় না। এখন আমাদিগের "শিক্ষিত"-সম্প্রদায়, শৈশব হইতে পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালীর অনুবর্ত্তী, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় চিন্তা-প্রণালী তাঁহাদিগের নিকট অপরিচিত; কেবল ভাষান্তরিত হইলে প্রাচীন ভাব সকল তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, পাশ্চাত্য ভাবের সাহায্যে গীতার মর্ম্ম তাঁহাদিগকে বুঝান, আমার এই টীকার উদ্দেশ্য।

ইহার আরও বিশেষ প্রয়োজন এই যে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, পূর্ব্ব-পণ্ডিতদিগের কৃত ভাষ্যাদিতে তাহার মীমাংসা নাই, থাকিবারও সম্ভাবনা নাই। কেন না, তাঁহারা যে সকল পাঠকের সাহায্য জন্য ভাষ্যাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মনে সে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনাই ছিল না। এই টীকায় যতদূর সাধ্য সেই সকল সংশয়ের মীমাংসা করা গিয়াছে।

অতএব, সে সকল পণ্ডিতগণ গীতার ব্যাখ্যা [illegible]লার প্রচার করিয়াছেন বা করিতেছেন, [illegible]মি তাঁহাদিগের প্রতিযোগী নহি, যথাসাধ্য তাঁহাদিগের সাহায্য করি, ইহাই আমার ক্ষুদ্রাভিলাষ। আমিও যতদূর পারিয়াছি, পূর্ব্ব-গিরি-টীকা-সংবলিত শাঙ্করভাষ্য, শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা, রামানুজভাষ্য, মধুসূদনসরস্বতীকৃত টীকা, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই টীকা প্রণয়ন করিয়াছি। তবে ইহাও আমাকে বলিতে হইতেছে যে, যে ব্যক্তি পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞান এবং দর্শন অবগত হইয়াছে, সকল সময়েই যে সে প্রাচীনদিগের অনুগামী হইতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। আমিও সর্ব্বত্র তাঁহাদের অনুগামী হইতে পারি নাই। যাঁহারা বিবেচনা করেন, এ দেশীয় পূর্ব্ব-পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলই ঠিক, এবং পাশ্চাত্যগণ জাগতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা সকলই ভুল, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই।

টীকাই আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু মূল ভিন্ন টীকা চলে না, এই জন্য মূল দেওয়া গেল। অনেক পাঠক অনুবাদ ভিন্ন মূল বুঝিতে সক্ষম নহেন, এজন্য একটা অনুবাদও দেওয়া গেল। বাঙ্গালা ভাষায় গীতার অনেক উৎকৃষ্ট অনুবাদ আছে। পাঠক যেটা ভাল বিবেচনা করেন, সেইটা অবলম্বন করিতে পারেন। সচরাচর যাহাতে অনুবাদ অবিকল হয়, সেই চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দুই এক স্থানে অর্থব্যক্তির অনুরোধে এ নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

কলিকাতা,
১২৯৩ সাল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥১॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে সঞ্জয়! পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী সমবেত আমার পক্ষ ও পাণ্ডবেরা কি করিল? ১।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত। ভীষ্মপর্ব্বের ৩য় অধ্যায় হইতে ৪৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত—এই অংশের নাম ভগবদ্গীতা-পর্ব্বাধ্যায়, কিন্তু ভগবদ্গীতার আরম্ভ, পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়ে। তৎপূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সকল পাঠক জানিতে না পারেন, এজন্য তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। কেন না, তাহা না বলিলে, ধৃতরাষ্ট্র কেন এই প্রশ্ন করিলেন, এবং সঞ্জয়ই বা কে, তাহা অনেক পাঠক বুঝিবেন না।

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যসমৃদ্ধি দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধন তাহা অপহরণ করিবার অভিপ্রায়ে যুধিষ্ঠিরকে কপট-দ্যূতে আহ্বান করেন। যুধিষ্ঠির কপট-দ্যূতে পরাজিত হইয়া এই পণে আবদ্ধ হয়েন যে, দ্বাদশ বৎসর তিনি ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ বনবাস করিবেন, তার পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন। এই ত্রয়োদশ বৎসর দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের রাজ্য ভোগ করিবেন। তার পর পাণ্ডবেরা এই পণ রক্ষা করিতে পারিলে, আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসে এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে যাপন করিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন তার পর রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। কাজেই পাণ্ডবেরা যুদ্ধ করিয়া স্বরাজ্যের উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইলেন। উভয়পক্ষ সেনা সংগ্রহ করিলেন। উভয়পক্ষীয় সেনা যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইল। যখন উভয় সেনা পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই, তখন এই গীতার আরম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন—তিনি হস্তিনা-নগরে আপনার রাজভবনে আছেন। তাহার কারণ, তিনি জন্মান্ধ, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধদর্শন-সুখেও বঞ্চিত। কিন্তু যুদ্ধে কি হয়, জানিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহার সম্ভাষণে আসিয়াছিলেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন যে, আমি জ্ঞাতিবধ সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করি না, আপনার তেজঃপ্রভাবে আদ্যোপান্ত এই যুদ্ধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিব। তখন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী সঞ্জয়কে বরদান করিলেন বরপ্রভাবে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে থাকিয়াও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবৃত্তান্ত সকল দিব্যচক্ষে দেখিতে

পাইলেন, দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিতেছেন, সঞ্জয় উত্তর দিতেছেন। মহাভারতের যুদ্ধপর্ব্বগুলি এই প্রণালীতে লিখিত। সকলই সঞ্জয়োক্তি। এক্ষণে, উভয়-পক্ষীয় সেনা যুদ্ধার্থ পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে শুনিয়া ধৃতারাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন, উভয় পক্ষ কি করিলেন? গীতার এইরূপ আরম্ভ।

এই দিব্যচক্ষুর কথাটা অনৈসর্গিক, পাঠককে বিশ্বাস করিতে বলি না। গীতোক্ত ধর্ম্মের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

যে ধর্ম্মব্যাখ্যা গীতার উদ্দেশ্য, প্রথমাধ্যায়ে তাহার কিছুই নাই। কি প্রসঙ্গোপলক্ষে এই তত্ত্ব উত্থাপিত হইয়াছিল, প্রথমাধ্যায়ে এবং দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম একাদশ শ্লোকে কেবল তাহারই পরিচয় আছে। গীতার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য এতদংশের কোন প্রয়োজন নাই। পাঠক ইচ্ছা করিলে এতদংশ পরিত্যাগ করিতে পারেন। আমার যে উদ্দেশ্য, তাহাতে এতদংশের কোন টীকা লিখিবারও প্রয়োজন নাই; ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও এতদংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তবে শ্রেণীবিশেষের পাঠক কোন কোন বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। এজন্য দুই একটা কথা লেখা গেল।

কুরুক্ষেত্র একটি চক্র বা জনপদ। ঐ চক্র এখনকার স্থানেশ্বর বা থানেশ্বর নগরের দক্ষিণবর্ত্তী। আম্বালা নগর হইতে উহা ২০ ক্রোশ উত্তর। কুরুক্ষেত্র ও পানিপাট ভারতবর্ষের যুদ্ধক্ষেত্র, ভারতের ভাগ্য অনেকবার ঐ ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি পাইয়াছে। "ক্ষেত্র" নাম শুনিয়া ভরসা করি, কেহ একখানি মাঠ বুঝিবেন না। কুরুক্ষেত্র প্রাচীনকালেই পঞ্চ যোজন দীর্ঘে এবং পঞ্চ যোজন প্রস্থে। এই জন্য উহাকে সমন্তপঞ্চক বলা যাইত। চক্রের সীমা এখন আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

কুরু নামে একজন চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন। তাঁহা হইতেই এই চক্রের নাম কুরুক্ষেত্র হইয়াছে। তিনি দুর্য্যোধনাদির ও পাণ্ডবদিগের পূর্ব্বপুরুষ; এজন্য দুর্য্যোধনাদিকে কৌরব বলা হয়। তিনি এই স্থানে তপস্যা করিয়া বরলাভ করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম কুরুক্ষেত্র। মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে, তাঁহার তপস্যার কারণেই উহা পুণ্যতীর্থ। ফলে চিরকালই কুরুক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র বা ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। শতপথব্রাহ্মণে আছে, "দেবাঃ হ বৈ সত্রং নিষেদুরগ্নিরিন্দ্রঃ সোমো বিষ্ণুর্বিশ্বেদেবা অন্যত্রৈবাশ্বিভ্যাম্। তেষাং কুরুক্ষেত্রং দেবযজনমাস। তস্মাদাহুঃ কুরুক্ষেত্রং দেবযজনম্।" অর্থাৎ দেবতারা এই স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন,এজন্য ইহাকে 'দেবতাদিগের যজ্ঞস্থান' বলে।

মহাভারতের বনপর্ব্বের তীর্থযাত্রা-পর্ব্বাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্র ত্রিলোকীর মধ্যে প্রধান তীর্থ। বনপর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের সীমা এইরূপ লেখা আছে—"উত্তরে সরস্বতী, দক্ষিণে দৃষদ্বতী, কুরুক্ষেত্র এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী।" (৮৩ অধ্যায়) মনুসংহিতায় বিখ্যাত ব্রহ্মাবর্ত্তেরও ঠিক সেই সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং

প্রচক্ষতে। ২। ১৭।

অতএব কুরুক্ষেত্র এবং ব্রহ্মাবর্ত্ত একই। কালিদাসের নিম্নলিখিত কবিতাতে তাহাই বুঝা যাইতেছে।

ব্রহ্মাবর্ত্তং জনপদমথচ্ছায়য়া গাহমানঃ
ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং কৌরবং তদ্ভজেথাঃ

রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারাপাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্মুখানি ॥
মেঘদূত ৪৯।

কিন্তু মনুতে আবার অন্যপ্রকার আছে। যথা—

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ ॥

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্‌সাঙও ইহাকে স্বীয় গ্রন্থে "ধর্ম্মক্ষেত্র" বলিয়াছেন। *

কুরুক্ষেত্র আজিও পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া ভারতবর্ষে পরিচিত; অনেক যোগী সন্ন্যাসী তথা পরিভ্রমণ করেন। কুরুক্ষেত্রে অনেক ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি মহাভারতের যুদ্ধের স্মারক-স্বরূপ। যে স্থানে অভিমন্যু সপ্তরথিকর্ত্তৃক অন্যায় যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, সে স্থানকে এক্ষণে 'অভিমন্যু-ক্ষেত্র' বা 'অমিন' বলিয়া থাকে। সেখানে আজিও পুত্রহীনারা পুত্রকামনায় অদিতির মন্দিরে অদিতির উপাসনা করেন। যেখানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাদিগের সৎকার-সমাপন হইয়াছিল, ক্ষেত্রের যে ভাগ সেই বীরগণের অস্থিতে সমাকীর্ণ হইয়াছিল, এখনও তাহাকে 'অস্থিপুর' বলে। যেখানে সাত্যকিতে ও ভূরিশ্রবাতে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, অর্জ্জুন সাত্যকির রক্ষার্থ অন্যায় করিয়া ভূরিশ্রবার বাহুচ্ছেদন করেন, সে স্থানকে এক্ষণে "ভোর" বলে। জনপ্রবাদ আছে যে, ভূরিশ্রবার সালঙ্কার ছিন্ন হস্ত পক্ষীতে লইয়া যায়। সেই ছিন্ন হস্তের অলঙ্কারে একখণ্ড বহুমূল্য হীরক ছিল। তাহাই কহিনুর, এক্ষণে ভারতেশ্বরীর অঙ্গে শোভা পাইতেছে। কথাটা যে সত্য, তাহার অবশ্য কোন প্রমাণ নাই।

কুরুক্ষেত্রের নাম বাঙ্গালীমাত্রেরই মুখে আছে। একটা কিছু গোল দেখিলে বাঙ্গালীর মেয়েরাও বলে, 'কুলুক্ষেত্র হইতেছে।' অথচ কুরুক্ষেত্রের সবিশেষ তত্ত্ব কেহই জানেন না। বিশেষ টম্‌সন্‌, হুইলর প্রভৃতি ইংরেজ লেখকেরা সবিশেষ না জানিয়া অনেক গোলযোগ বাধাইয়াছেন। তাই কুরুক্ষেত্রের কথা এখানে এত সবিস্তারে লেখা গেল। *

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

সঞ্জয় বলিলেন—

ব্যূহিত পাণ্ডবসৈন্য দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্যের নিকটে গিয়া বলিলেন। ২।

* M. Stanislaus julien অনুবাদে লিখিয়াছেন, "*Le champ du bonheur.*" অর্থাৎ ধর্ম্মক্ষেত্র।

* সাহেবদিগের ভ্রমের উদাহরণস্বরূপ গীতার অনুবাদক টম্‌সনের টীকা হইতে দুই ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি। কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—

A part of Dhhrmmakshetra, the flat plain around Delhi, which city is often identified with Hastinapur, the capital of Kurukshetra.

এইটুকুর ভিতর ৫টী ভুল। (১) ধর্ম্মক্ষেত্র নামে কোন স্বতন্ত্র ক্ষেত্র নাই। (২) কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্রের অংশ মাত্র নহে। (৩) The flat plain around delhi কুরুক্ষেত্র নহে। (৪) দিল্লী হস্তিনাপুর নহে। (৫) হস্তিনাপুর কুরুক্ষেত্রের রাজধানী নহে। এতটুকুর ভিতর এতগুলি ভুল একত্র করা যায়, আমরা জানিতাম না।

দুর্য্যোধনাদির অস্ত্রবিদ্যার আচার্য্য ভরদ্বাজ-পুত্র দ্রোণ। ইনি পাণ্ডবদিগেরও গুরু। ইনি ব্রাহ্মণ। কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় অদ্বিতীয়। শস্ত্রবিদ্যা ক্ষত্রিয়দিগেরই ছিল,এমন নহে। দ্রোণাচার্য্য, পরশুরাম, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, ইহাঁরা সকলেই ব্রাহ্মণ, অথচ সচরাচর ক্ষত্রিয়দিগের অপেক্ষা যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যখন পশ্চাৎ স্বধর্ম্মপালনের কথা উঠিবে,তখন এই কথা স্মরণ করিতে হইবে।

যুদ্ধার্থ সৈন্য-সন্নিবেশকে ব্যূহ বলে।

সমগ্রস্য তু সৈন্যস্য বিন্যাসঃ স্থানভেদেতঃ।
স ব্যূহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেষু পৃথিবীভুজাম্॥

আধুনিক ইউরোপীয় সমরে সেনাপতির ব্যূহরচনাই প্রধান কার্য্য।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩॥

হে আচার্য্য! আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদপুত্রের দ্বারা ব্যূহিতা পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা দর্শন করুন। ৩।

দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, পাণ্ডবদিগের একজন সেনাপতি। তিনিই ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ইহাঁর পিতা দ্রোণবধকামনায় যজ্ঞ করিলে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনিও দ্রোণের শিষ্য বলিয়া বর্ণিত হইতেছেন। এ কথাটা স্বধর্ম্মপালন বুঝিবার সময়ে স্মরণ করিতে হইবে. নিজ যথার্থ উৎপন্ন শত্রুকে দ্রোণ শিক্ষা দিয়াছিলেন। আচার্য্যের ধর্ম্ম বিদ্যা-দান।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥ ৫॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজা চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ॥৬॥

ইহার মধ্যে শূর, বাণক্ষেপে মহান্, যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন তুল্য, যুযুধান (১) বিরাট, (২) মহারথ দ্রুপদ,ধৃষ্টকেতু, (৩) চেকিতান, বার্য্যবান্ কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, (৪) নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র, (৫) দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ইহাঁরা সকলেই মহারথ। ৪, ৫, ৬।

(১) যুযুধান—যদুবংশীয় মহাবীর সাত্যকি।

(২) দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টকেতু প্রভৃতি সকলে অক্ষৌহিণীপতি।

(৩) ধৃষ্টকেতু মহাভারতে চেদি-দেশের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অন্যবিধ বর্ণনাও আছে। (মহা,উদ্যোগ,১৭১ অধ্যায়)।

(৪) কুন্তিভোজ বংশের নাম। বৃদ্ধ কুন্তিভোজ বসুদেবের পিতা শূরের পিতৃষস্-পুত্র। পাণ্ডবমাতা কুন্তী তাঁহার ভবনে প্রতিপালিতা হয়েন। পুরুজিৎ এ সম্বন্ধে পাণ্ডব-মাতুল।

(৫) বিখ্যাত অভিমন্যু।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥৭॥

হে দ্বিজোত্তম! আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, আমার সৈন্যের নায়ক, তাঁহাদিগকে অবগত হউন। আপনার অবগতির জন্য সে সকল আপনাকে বলিতেছি। ৭।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ॥৮॥ *

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপ, (৬) অশ্বত্থামা, (৭) বিকর্ণ, সোমদত্ত-পুত্র, (৮) ও জয়দ্রথ (৯)। ৮।

(৬) ইনিও ব্রাহ্মণ এবং অস্ত্রবিদ্যায় কৌরবদিগের আচার্য্য।

---

* সৌমদত্তিস্তথৈব চ ইতি পাঠান্তর আছে।

(৭) দ্রোণপুত্র।

(৮) ইনিই বিখ্যাত ভূরিশ্রবা।

(৯) দুর্য্যোধনের ভগিনীপতি।

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ॥ ৯ ॥

আরও অনেক অনেক বীর আমার জন্য ত্যক্তজীবন হইয়াছেন (অর্থাৎ জীবনত্যাগে প্রস্তুত হইয়াছেন)। তাঁহারা সকলে নানাস্ত্রধা'ী এবং যুদ্ধবিশারদ। ৯।

গীতার প্রথমাধ্যায়ে ধর্ম্মতত্ত্ব কিছু নাই। কিন্তু প্রথম অধ্যায় কাব্যাংশে বড় উৎকৃষ্ট। উপরে উভয়পক্ষের বহু গুণবান্ সেনানায়কদিগের নাম যে পাঠককে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল, ইহা কবির একটা কৌশল। পশ্চাতে অর্জ্জুনের যে করুণাময়ী মনোমোহিনী উক্তি লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য এখন হইতে উদ্‌যোগ হইতেছে।

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥১০॥

ভীষ্মাভিরক্ষিত আমাদের সেই সৈন্য অসমর্থ। আর ইহাদিগের ভীমাভিরক্ষিত সৈন্য সমর্থ। ১০।

পর্য্যাপ্ত এবং অপর্য্যাপ্ত শব্দের অর্থ শ্রীধরস্বামীর টীকানুসারে করা গেল। অন্যে অর্থ করিয়াছেন—পরিমিত এবং অপরিমিত।

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি॥ ১১॥

আপনারা সকলে স্ব স্ব বিভাগানুসারে সকল ব্যূহদ্বারে অবস্থিতি করিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করুন। ১১।

ভীষ্ম দুর্য্যোধনের সেনাপতি।

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনাদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ
প্রতাপবান্॥ ১২॥

(তখন) প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ (ভীষ্ম) দুর্য্যোধনের হর্ষ জন্মাইয়া উচ্চ সিংহনাদ করত শঙ্খ-ধ্বনি করিলেন। ১২।

পূর্ব্বকালে রথিগণ যুদ্ধের পূর্ব্বে শঙ্খ-ধ্বনি করিতেন। ভীষ্ম দুর্য্যোধনের পিতামহের ভাই।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥ ১৩॥

তখন, শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ সকল (বাদ্যযন্ত্র) সহসা আহত হইলে সে শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল। ১৩।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥১৪॥

তখন শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে স্থিত কৃষ্ণার্জ্জুন দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন। ১৪।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা
বৃকোদরঃ॥ ১৫॥

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥ ১৬॥

কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ, অর্জ্জুন দেবদত্ত এবং ভীমকর্ম্মা ভীম পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ বাজাইলেন। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ, এবং সহদেব মণিপুষ্পক (নামে) শঙ্খ বাজাইলেন। ১৫। ১৬।

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥১৭॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্
পৃথক্॥ ১৮।

পরম ধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, মহাবাহু সুভদ্রাপুত্র, — হে পৃথিবীপতে!—ইঁহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজাইলেন।

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়াণি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥১৯॥*

সেই শব্দ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিল ও আকাশ এবং পৃথিবীকে তুমুল ধ্বনিত করিল। ১৯।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥২০॥

পরে হে মহীপতে! † ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে ব্যবস্থিত দেখিয়া অস্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত্ত কপিধ্বজ অর্জ্জুন ধনু উত্তোলন করিয়া হৃষীকেশকে এই কথা বলিলেন। ২০।

"ব্যবস্থিত" শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন, "যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিত।"

অর্জ্জুন উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥২১॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন—

যাহারা যুদ্ধ-কামনায় অবস্থিত, আমি যাবৎ তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, এই রণ-সমুদ্যমে কাহাদিগের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে (যাবৎ তাহা দেখি), যাহারা দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের প্রিয়চিকীর্ষায় এইখানে যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে, সেই সকল যুদ্ধার্থি-গণকে (যাবৎ) আমি দেখি, (তাবৎ) তুমি উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর। ২১। ২২।২৩।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥২৪॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥২৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—

হে ভারত! * অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক হৃষীকেশ এইরূপ অভিহিত হইয়া উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ সকল রাজগণের সম্মুখে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া কহিলেন, হে পার্থ! সমবেত কুরুগণকে এই নিরীক্ষণ কর।২৪।২৫।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা॥
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬॥

তখন অর্জ্জুন সেইখানে স্থিত উভয়সেনায় পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, আচার্য্যগণ, মাতুলগণ ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, শ্বশুরগণ, সখিগণ † এবং সুহৃদ্‌গণকে দেখিলেন। ২৬।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

সেই কুন্তীপুত্র সেই সকল বন্ধুগণকে অবস্থিত দেখিয়া, পরম কৃপাবিষ্ট হইয়া বিষাদ-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন। ২৭।

---

* তুমুলোব্যনুনাদয়ন্ ইতি পাঠান্তর আছে।

† বোধ করি পাঠকের স্মরণ আছে যে, সঞ্জয়োক্তি চলিতেছে। সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রের বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতেছেন।

* ধৃতরাষ্ট্র এবং অর্জ্জুন উভয়কেই "ভারত" বলিয়া এই গ্রন্থে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহার কারণ, ইঁহারা দুষ্মন্তপুত্র ভরতের বংশ।

† সখা ও সুহৃদে অবশ্য প্রভেদ আছে। যাঁহার নিকট উপকার পাওয়া গিয়াছে, সেই সখা।

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।*
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন—

হে কৃষ্ণ! এই যুদ্ধেচ্ছু সম্মুখে অবস্থিত স্বজনগণকে দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে। ২৮।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥২৯॥

আমার দেহ কাঁপিতেছে, রোমহর্ষ জন্মিতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে এবং চর্ম্ম জ্বালা করিতেছে। ২৯।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০॥

হে কেশব! আমি আর থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন যেন ভ্রান্ত হইতেছে, আমি দুর্লক্ষণ সকল দর্শন করিতেছি। ৩০।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং
সুখানি চ ॥ ৩১ ॥

যুদ্ধে আত্মীয়বর্গকে বিনাশ করায় আমি কোন মঙ্গল দেখি না—হে কৃষ্ণ! আমি জয় চাহি না, রাজ্যসুখ চাহি না। ৩১।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈ-
র্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ
সুখানি চ ॥ ৩২ ॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ
পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥৩৪ ॥

যাহাদিগের জন্য রাজ্য, ভোগ, সুখ কামনা করা যায়, সেই আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক এবং কুটুম্বগণ যখন ধন-প্রাণ ত্যাগ করিয়া এই যুদ্ধে অবস্থিত, তখন হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যেই কাজ কি, ভোগেই কাজ কি, জীবনেই কাজ কি? হে মধুসূদন! আমি হত হই হইব, তথাপিও তাহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না। ৩২।৩৩।৩৪।

"আমি হত হই হইব (ঘ্নতোঽপি)" কথার তাৎপর্য্য এই যে, "আমি না মারিলে তাহারা আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারে বটে। যদি তাই হয়, সেও ভাল, তথাপি আমি তাহাদিগকে মারিব না। বস্তুতঃ ভীষ্ম-দ্রোণের সহিত অর্জ্জুন এই ভাবেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের "মৃদুযুদ্ধের" কথা আমরা অনেকবার শুনিতে পাই।

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ
স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫ ॥

পৃথিবীর কথা দূরে থাক, ত্রৈলোক্যের রাজ্যের জন্যই বা ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে বধ করিলে কি সুখ হইবে, জনার্দ্দন? । ৩৫।

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।*
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥৩৬॥

এই আততায়িদিগকে বিনাশ করিলে আমাদিগকে পাপ আশ্রয় করিবে, অতএব আমরা সবান্ধব ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে বিনাশ করিতে পারিব না। হে মাধব! স্বজন হত্যা করিয়া আমরা কি প্রকারে সুখী হইব? ৩৬।

---

* দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্। ইতি পাঠান্তর আছে।

* স্ববান্ধবান্ ইতি পাঠান্তর আছে।

ছয় জনকে আততায়ী বলে—

আগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ॥

যে ঘরে আগুন দেয়, যে বিষ দেয়, শস্ত্রপাণি, ধনাপহারী, ভূমি যে অপহরণ করে, ও বনিতা অপহরণ করে, এই ছয় জন আততায়ী। অর্থশাস্ত্রানুসারে আততায়ী বধ্য। টীকাকারেরা অর্জ্জুনের বাক্যের এইরূপ অর্থ করেন যে, যদিও অর্থশাস্ত্রানুসারে আততায়ী বধ্য, তথাপি ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে গুরু প্রভৃতি অবধ্য। ধর্ম্মশাস্ত্রের কাছে অর্থশাস্ত্র দুর্ব্বল, সুতরাং দ্রোণ-ভীষ্মাদি আততায়ী হইলেও তাঁহাদিগের বধে পাপাশ্রয় হইবে। একালে আমরা "Law" এবং "Morality"র মধ্যে যে প্রভেদ করি, এ বিচার ঠিক সেইরূপ। "Law"র উপর "Morals"। ইংরেজের পিনাল কোডেও লিখে যে, অবস্থাবিশেষে আততায়ীর বধজন্য দণ্ড নাই। কিন্তু সেই সকল অবস্থায় আততায়ীর বধ সর্ব্বত্র আধুনিক নীতিশাস্ত্রসঙ্গত নহে।

আনন্দগিরি এই শ্লোকের আর একটা অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এমন বুঝাইতে পারে যে, গুরু প্রভৃতি বধ করিলে আমরাই আততায়ী হইব; সুতরাং আমাদের পাপাশ্রয় করিবে। "গুরুভ্রাতৃসুহৃৎপ্রভৃতীনেতান্ হত্বা বয়মাততায়িনঃ স্যামঃ।"

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ
পাতকম্॥৩৭॥

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন॥৩৮॥

যদ্যপি ইহারা লোভে হতজ্ঞান হইয়া কুলক্ষয়দোষ দেখিতেছে না, কিন্তু হে জনার্দ্দন! আমরা কুলক্ষয় করায় দোষ দেখিতেছি, আমরা সে পাপ হইতে নিবৃত্তিবুদ্ধিবিশিষ্ট কেন না হইব? ৩৭।৩৮।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥৩৯॥

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়। ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট কুল অধর্ম্মে অভিভূত হয়। ৩৯।

সনাতন কুলধর্ম্ম—অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষপরম্পরাপ্রাপ্ত কুলধর্ম্ম।

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥৪০॥

হে কৃষ্ণ! অধর্ম্মাভিভবে কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হয়, স্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে, হে বার্ষ্ণেয়! * বর্ণসঙ্কর জন্মায়। ৪০।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥৪১

এই সঙ্কর কুলনাশকারিদিগের ও তাহাদের কুলের নরকের নিমিত্ত হয়। পিণ্ডোদকক্রিয়ার লোপ হেতু তাহাদিগের পিতৃগণ পতিত হয়। ৪১।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ
শাশ্বতাঃ॥৪২॥

এইরূপ কুলঘ্নদিগের বর্ণসঙ্করকারক এই দোষে জাতিধর্ম্ম ও সনাতন কুলধর্ম্ম উৎসন্ন যায়। ৪২।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥৪৩॥

হে জনার্দ্দন! আমরা শুনিয়াছি যে, যে মানুষদিগের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন যায়, তাহাদিগের নিয়ত নরকে বাস হয়। ৪৩।

৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, এই পাঁচটি শ্লোক আধুনিক কৃতবিদ্য পাঠকদিগের কাণে ভাল

* কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশসম্ভূত, এজন্য বার্ষ্ণেয়।

লাগিবে না। ইহা বর্ণসঙ্কর-বিরোধী প্রাচীন কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে, তার উপর "লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ" প্রভৃতি অলঙ্কারও আছে। বর্ণসঙ্করের উপর গীতাকারের বিশেষ বিদ্বেষ দেখা যায়। ইনি স্বয়ং ভগবানের মুখেও বর্ণসঙ্করের নিন্দা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আমরা যখন তদ্বিষয়িণী ভগবদুক্তির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব, তখন তদুক্তির তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করিব। এক্ষণে অর্জ্জুনোক্তির স্থূল মর্ম্ম বুঝিলেই যথেষ্ট হইল। কুলের পুরুষগণ মরিলে কুলস্ত্রী যে ব্যভিচারিণী হয়, ইহা সচরাচর দেখা যায়। কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে তাহাদিগের গর্ভে নীচলোকের ঔরসে সন্তান জন্মিতে থাকে। বংশ নীচসন্ততিতে পরিপূর্ণ হয়, কাজেই কুলধর্ম্ম লোপ পায়। বর্ণসঙ্করে যাঁহারা দোষ না দেখেন, এবং পিণ্ডাদির স্বর্গকারিতায় যাঁহারা বিশ্বাসবান্ নহেন, স্বর্গ-নরকাদিও যাঁহারা মানেন না, তাঁহারাও করি, এতটুক স্বীকার করিবেন। * বাকীটুকু কাব্যোচিত ভাষা এবং অলঙ্কার। * কথাটা অতি মোটা কথা বটে। কথাটা অর্জ্জুনের মুখে বসাইবার একটু কারণ আছে—অর্জ্জুনের এই "কুলধর্ম্মের" বড়াইয়ের উত্তরে ভগবান্

---

* The women, for instance, whose husbands, frierds or relations have been all slain in battle, no longer restrained by law, seek husbands among other and lower castes or tribes, causing a mixture of blood. which many nations at all ages have regarded as a most serious evil ; but particularly those who— like the Aryans, the Iews and the Scotch—were at first surrounded by foreigners very different to themselves, and thus preserved the distinction and genealogies of their races more effectively than any other.

(Thomsosn's Translation of the Bhagavadgita p. 7.

By the destruction of the males the rites of both tribe and family would cease, because women were not allowed to perform them ; and confusion of castes would arise, for the women would marry men of another caste. Such marriages were considered impure (Manu x. 1-40). Such marriages produced elsewhere a confusion of classes. Livy tells us that the Roman patricians at the instance of Canuleius complained of the intermarriages of the plebian class with their own, affirming that "omnia divina humanaque turbari, ut qui natus sit, ignoret, cujus sanguinis, quorum sacrorum sit."

(Davie's Translation of the Bhagavadgita p, 26)

* In bringing forward these and other melancholy superstitions of Brahmanism in the mouth of Arjuna, we are not to suppose that our poet though as much Brahman of philosophor in many unimportant points of belief—himself received and approved of them.

(THOMSON P, 7,)

"স্বধর্ম্মের" কথাটা তুলিবেন। এটুকু গ্রন্থকারের কৌশল। "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ" এই অমৃতময় বাক্যের পর বলিবার যোগ্য কথা এ নহে।

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪॥

হায়! আমরা রাজ্যসুখলোভে স্বজনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি—মহৎ পাপ করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি। ৪৪।

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥৪৫॥

যদি আমি প্রতীকারপরাঙ্মুখ এবং অশস্ত্র হইলে শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যুদ্ধে আমাকে বিনাশ করে, তাহাও আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত মঙ্গলকর হইবে। ৪৫।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ॥৪৬॥

সঞ্জয় বলিলেন—

অর্জ্জুন এইরূপ বলিয়া শোকাকুল-মানসে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রামস্থলে রথোপস্থে উপবেশন করিলেন। ৪৬।

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে অর্জ্জুন-বিষাদো * নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বলিয়াছি, গীতার প্রথম অধ্যায়ে ধর্ম্মতত্ত্ব কিছু নাই; কিন্তু এই অধ্যায় একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। কাব্যের উপাদান সকল এখানে বড় সুন্দর সাজান হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রে উভয় সেনা সুসজ্জিত হইয়া পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে। পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা ব্যূহবদ্ধা হইয়াছে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন, পরম রণপণ্ডিত আপনার আচার্য্যকে দেখাইলেন। একটু ভীত হইয়া আচার্য্যকে বলিলেন, "আপনারা আমার সেনাপতি ভীষ্মকে রক্ষা করিবেন।"

কিন্তু সেই বৃদ্ধ ভীষ্ম যুবার অপেক্ষাও উদ্যমশীল—তিনি সেই সময়ে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন—(শঙ্খ তখনকার bugle)। তাঁহার শঙ্খধ্বনি শুনিয়া উৎসাহে বা প্রত্যুত্তরে উভয় সৈন্যস্থ যোদ্ধৃগণ সকলেই শঙ্খধ্বনি করিলেন। তখন উভয়দলে নানাবিধ রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল—শঙ্খে,ভেরীতে,অন্যান্য বাদ্যের কোলাহলে,গগন বিদীর্ণ হইল—আকাশপৃথিবী তুমুল হইয়া উঠিল। সেই মহোৎসাহের সময়ে স্থিরচিত্ত অর্জ্জুন—যাঁহার উপরে কৌরব-জয়ের ভার—আপনার সারথি কৃষ্ণকে বলিলেন—"একবার উভয় সেনার মধ্যে রথ রাখ দেখি—দেখি, কাহার সঙ্গে আমায় যুদ্ধ করিতে হইবে।" কৃষ্ণ, শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথ উভয় সেনার মধ্যে স্থাপিত করিলেন,—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা বলিলেন, "এই দেখ।" অর্জ্জুন দেখিলেন, দুই দিকেই ত আপনার জন,—পিতৃব্য, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালক, সুহৃৎ, সখা—তাঁহার গা কাঁপিয়া উঠিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল, মুখ শুকাইল, দেহ অবসন্ন হইল, মাথা ঘুরিল, হাত হইতে সেই মহাধনু গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল। বলিলেন, "কৃষ্ণ! রাজ্য যাদের জন্য, তাদের মারিয়া রাজ্যে কি ফল?—আমি যুদ্ধ করিব না।" এই সংগ্রামক্ষেত্রে দুই দিকে দুই মহতী সেনা, এই তুমুল কোলাহল, রণবাদ্য এবং ঘোরতর উৎসাহ—সেই সময়ে এই মহাবীরের প্রথমে স্থৈর্য্য, তার পর তাঁহার হৃদয়ে সেই করুণ এবং মহান্ প্রশান্ত ভাব—এরূপ মহচ্চিত্র সাহিত্যজগতে দুর্লভ। "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ"—ঈদৃশী অমৃতময়ী বাণী আর কে কোথায় শুনিয়াছে?

* কোন কোন পুস্তকে "সৈন্যদর্শনং" ইতি পাঠ আছে।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

তন্তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥১॥

সঞ্জয় বলিলেন—

তখন সেই কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণাকুললোচন বিষাদযুক্ত (অর্জ্জুন)-কে মধুসূদন এই কথা বলিলেন।১।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥২॥

ভগবান্ বলিলেন—

হে অর্জ্জুন! এই সঙ্কটে অনার্য্যসেবিত স্বর্গহানিকর এবং অকীর্ত্তিকর তোমার এই মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল?।২।

মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়*নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥৩॥

হে কৌন্তেয়! ক্লীবতা প্রাপ্ত হইও না, ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরন্তপ! ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উত্থান কর।৩।

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন॥৪॥

অর্জ্জুন বলিলেন—

হে শত্রুনিসূদন মধুসূদন! পূজার্হ যে ভীষ্ম এবং দ্রোণ, যুদ্ধে তাঁহাদের সহিত বাণের দ্বারা কি প্রকারে আমি প্রতিযুদ্ধ করিব?৪।

* "ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ" ইতি আনন্দগিরি ধৃত পাঠ।

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্॥৫॥

মহানুভব গুরুদিগকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষা অবলম্বন করিতে হয়, সেও শ্রেয়ঃ। আর গুরুদিগকে বধ করিয়া যে অর্থ-কাম ভোগ করা যায়, তাহা রুধিরলিপ্ত।৫।

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো,
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েযুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ॥৬॥

আমরা জয়ী হই বা আমাদিগকে জয় করুক, ইহার মধ্যে কোনটি শ্রেয়ঃ, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না—যাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা বাঁচিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ সম্মুখে অবস্থিত।৬।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ,
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে,
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥৭॥

কার্পণ্য-দোষে আমি অভিভূত হইয়াছি এবং ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আমার চিত্ত বিমূঢ় হইয়াছে, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। যাহা ভাল হয়, আমাকে নিশ্চিত করিয়া বল। আমি তোমার শিষ্য এবং তোমার শরণাপন্ন হইতেছি—আমাকে শিক্ষা দাও।৭।

কার্পণ্য অর্থে দীনতা। তারানাথ "বাচস্পত্যে"এই অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া উদাহরণস্বরূপ গীতার এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভরসা করি, কোন পাঠকই এখানে দীনতা অর্থে দারিদ্র্য বুঝিবেন না। 'দীন' অর্থে মহাব্যসন-

প্রাপ্ত। উদাহরণস্বরূপ—তারানাথ রামায়ণ হইতে আর একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা :—"মহত্বা ব্যসনং প্রাপ্তো দীনঃ কৃপণ উচ্যতে।" আনন্দগিরি বলেন—"যোঽল্পাং স্বল্পামপি স্বক্ষতিং ন ক্ষমতে স কৃপণঃ।" যে সামান্য ক্ষতি স্বীকার করিতে পারে না, সেই কৃপণ। * শ্রীধরস্বামী বুঝাইয়াছেন যে, "এই সকল বন্ধুবর্গকে নষ্ট করিয়া কি প্রাণধারণ করিব?" অর্জ্জুনের ইতি বুদ্ধিই কার্পণ্য। তিনি "কার্পণ্যদোষ" ইতি সমাসকে দ্বন্দ্ব-সমাস বুঝিয়াছেন—কার্পণ্য এবং দোষ। দোষ শব্দে এখানে পূর্ব্বকথিত কুলক্ষয়কৃত পাপ বুঝিতে হইবে। অন্যান্য টীকাকারেরা সেরূপ অর্থ করেন নাই।

নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্-
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

পৃথিবীতে অসপত্ন সমৃদ্ধ রাজ্য এবং সুরলোকের আধিপত্য পাইলেও যে শোক আমার ইন্দ্রিয়গণকে বিশোষণ করিবে, তাহা কিসে যাইবে, আমি দেখিতেছি না। ৮।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ॥৯॥

সঞ্জয় বলিতেছেন—

শত্রুজয়ী অর্জ্জুন † হৃষীকেশকে এইরূপ বলিয়া, 'যুদ্ধ করিব না,' ইহা গোবিন্দকে বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। ৯।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥১০॥

হে ভারত! হৃষীকেশ হাস্য করিয়া উভয় সেনার মধ্যে বিষাদপর অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন। ১০।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥১১॥

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

তুমি বিজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছ বটে; কিন্তু যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহাদের জন্য শোক করিতেছ। কি জীবিত, কি মৃত, কাহারও জন্য পণ্ডিতেরা শোক করেন না। ১১

এইখানে প্রকৃত গ্রন্থারম্ভ। এখন, কি কথাটা উঠিতেছে, তাহা বুঝিয়া দেখা যাউক।

দুর্য্যোধনাদি অন্যায় পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের রাজ্যাপহরণ করিয়াছে। যুদ্ধ বিনা তাহার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। এখানে যুদ্ধ কি কর্ত্তব্য?

মহাভারতের উদ্‌যোগপর্ব্বে এই কথাটার অনেক বিচার হইয়াছে। বিচারে স্থির হইয়াছিল যে, যুদ্ধই কর্ত্তব্য। তাই এই উভয় সেনা সংগৃহীত হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে।

এ অবস্থায় যুদ্ধ কর্ত্তব্য কি না, আধুনিক নীতির অনুগামী হইয়া বিচার করিলেও, আমরা পাণ্ডবদিগের সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য স্বীকার করিব। এই জগতে যত প্রকার কর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে সচারচর যুদ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু ধর্ম্মযুদ্ধও আছে। আমেরিকায় ওয়াশিংটন, ইউরোপে উলিয়ম সাইলেণ্ট, এবং ভারতবর্ষে প্রতাপসিংহ প্রভৃতি যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা পরম ধর্ম্ম—দানাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। পাণ্ডবদিগেরও এই যুদ্ধপ্রবৃত্তি সেই শ্রেণীর ধর্ম্ম। এ বিচার আমি কৃষ্ণচরিত্রে

---

* কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং "কার্পণ্য" শব্দের প্রতিবাক্য দিয়াছেন "helplessness."

† মূলে "গুড়াকেশ" শব্দ আছে। গুড়াকেশ অর্জ্জুনের একটি নাম। টীকাকারেরা ইহার অর্থ করেন, 'নিদ্রাজয়ী।" অন্যবিধ অর্থও দেখা গিয়াছে।

সবিস্তারে করিয়াছি—এক্ষণে সে সকল পুনরুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই।* এ বিচারের স্থূল মর্ম্ম এই যে, যেটি যাহার ধর্ম্মানুমত অধিকার, তাহার সাধ্যানুসারে রক্ষা করা তাহার ধর্ম্ম। রক্ষার অর্থ এই যে, কেহ অন্যায় পূর্ব্বক তাহার অপহরণ বা অবরোধ করিতে না পারে; করিলে তাহার পুনরুদ্ধার এবং অপহর্ত্তার দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য। যদি লোকে স্বেচ্ছামত পরকে অধিকারচ্যুত করিয়া স্বচ্ছন্দে পরস্বাপহরণ পূর্ব্বক উপভোগ করিতে পারে, তবে সমাজ এক দিন টিকে না। সকল মনুষ্যই তাহা হইলে অনন্ত দুখ ভোগ করিবে। অতএব আপনার সম্পত্তির পুনরুদ্ধার কর্ত্তব্য। যদি বল ভিন্ন অন্য সদুপায় থাকে, তবে তাহাই অগ্রে অবলম্বনীয়। যদি বল ভিন্ন সদুপায় না থাকে, তবে বলই প্রযোজ্য। এখানে বলই ধর্ম্ম।

মহাভারতে দেখি যে, অর্জ্জুন ইতিপূর্ব্বে সকল সময়েই যুদ্ধপক্ষ ছিলেন। যখন যুদ্ধে স্বজন-বধের সময় উপস্থিত হইল, বধ্য স্বজনবর্গের মুখ দেখিয়া তিনি যে কাতরচিত্ত ও যুদ্ধবুদ্ধি হইতে বিচলিত হইলেন, ইহাও সজ্জন-স্বভাবসুলভ ভ্রান্তি।

মহাভারতে ইহাও দেখিতে পাই যে, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। পরে যখন যুদ্ধ অলঙ্ঘ্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি যুদ্ধে কোন পক্ষে ব্রতী হইতে অস্বীকৃত হইয়া কেবল অর্জ্জুনের সারথ্য মাত্র স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত হইলেও তিনি পরম ধর্ম্মজ্ঞ, সুতরাং এ স্থলে ধর্ম্মের পথ কোন্‌টা, তাহা অর্জ্জুনকে বুঝাইতে বাধ্য। অতএব অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন যে, যুদ্ধ করাই এখানে ধর্ম্ম, যুদ্ধ না করাই অধর্ম্ম।

বাস্তবিক যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধারম্ভসময়ে কৃষ্ণার্জ্জুনে এই কথোপকথন হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু গীতাকার এইরূপ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্ম্মের সার মর্ম্ম সঙ্কলিত করিয়া মহাভারতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

যুদ্ধে প্রবৃত্তিসূচক যে সকল উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দিতেছেন, তাহা এই দ্বিতীয় অধ্যায়েই আছে। অন্যান্য অধ্যায়েও "যুদ্ধ কর" এইরূপ উপদেশ দিয়া ভগবান্ মধ্যে মধ্যে আপনার বাক্যের উপসংহার করেন বটে, কিন্তু সে সকল বাক্যের সঙ্গে যুদ্ধের কর্ত্তব্যতার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাই বোধ হয় যে, যে কৌশলে গ্রন্থকার এই ধর্ম্মব্যাখ্যার প্রসঙ্গ মহাভারতের সঙ্গে সংবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অপ্রকৃততা পাঠক অনুভূত করিতে না পারেন, এই জন্য যুদ্ধের কথাটা মধ্যে মধ্যে পাঠককে স্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নতুবা যুদ্ধপক্ষ-সমর্থন এই গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। যুদ্ধপক্ষ-সমর্থনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত মনুষ্যধর্ম্মের প্রকৃত পরিচয় প্রচারিত করাই ইহার উদ্দেশ্য।

এই কথাটা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে, বোধ হয় পাঠক মনে মনে বুঝিবেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সেনার সম্মুখে রথ স্থাপিত করিয়া, কৃষ্ণার্জ্জুনের যথার্থ এইরূপ কথোপকথন যে হইয়াছিল, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ। দুই পক্ষের সেনা ব্যূহিত হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত, সেই সময়ে যে এক পক্ষের সেনাপতি উভয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় যোগধর্ম্ম শ্রবণ করিবেন, এ কথাটা বড় সম্ভবপর বলিয়াও বোধ হয় না। এ কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করা যাউক না যাউক; পাঠকের আর কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

---

* এবং নবজীবন প্রথম খণ্ড দেখ।

(১) গীতায় ভগবৎপ্রচারিত ধর্ম্ম সঙ্কলিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু, গীতাগ্রন্থখানি ভগবৎপ্রণীত নহে, অন্য ব্যক্তি ইহার প্রণেতা।

(২) যে ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রণেতা, তিনি যে কৃষ্ণার্জ্জুনের কথোপকথনকালে সেখানে উপস্থিত থাকিয়া সকলই স্বকর্ণে শুনিয়াছেন, এবং শুনিয়া সেইখানে বসিয়া সব লিখিয়াছিলেন, বা স্মৃতিধরের মত স্মরণ রাখিয়াছিলেন, এমন কথাও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। সুতরাং যে সকল কথা গীতাকার ভগবানের মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, সে সকল যে প্রকৃত পক্ষে ভগবানের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, এমন বিশ্বাস করা যায় না। অনেক কথা যে গ্রন্থকারের নিজের মত, তিনি ভগবানের মুখ হইতে বাহির করিতেছেন, ইহা সম্ভব।

যাঁহারা বলিবেন যে, এই গ্রন্থ মহাভারতান্তর্গত, মহাভারত মহর্ষি ব্যাস-প্রণীত, তিনি যোগবলে সর্ব্বজ্ঞ এবং অভ্রান্ত, অতএব এরূপ সংশয় এখানে অকর্ত্তব্য, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমাদের কোন বিচার হইতে পারে না। সে শ্রেণীর পাঠকের জন্য এই ব্যখ্যা প্রণীত হয় নাই, ইহা আমার বলা রহিল।

(৩) সংস্কৃত সকল গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য প্রণীত হইবার পর কোন শ্লোক গীতায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই, তাঁহার ভাষ্যের সঙ্গে এখন প্রচলিত মূলের ঐক্য আছে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের অন্যূন সহস্র বা ততোধিক বৎসর পূর্ব্বেও গীতা প্রচলিত ছিল। এই কালমধ্যে যে কোন শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহা কি প্রকারে বলিব? আমরা মধ্যে মধ্যে এমন শ্লোক পাইব, যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ হয়।

এই সকল কথা স্মরণ না রাখিলে আমরা গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিব না। এ জন্য আগেই এই কয়টি কথা বলিয়া রাখিলাম। এক্ষণে দেখা যাউক, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই যুদ্ধের ধর্ম্ম্যতা বুঝাইতেছেন, সে সকল কথার সার মর্ম্ম কি?

আমরা উনবিংশ শতাব্দীর নীতিশাস্ত্রের বশবর্ত্তী হইয়া উপরে যে প্রণালীতে সংক্ষেপে এই যুদ্ধের ধর্ম্ম্যতা বুঝাইলাম, শ্রীকৃষ্ণ যে সে প্রথা অবলম্বন করেন নাই, ইহা বলা বাহুল্য। তাঁহর কথার স্থূল মর্ম্ম এই যে, সকলেরই স্বধর্ম্মপালন করা কর্ত্তব্য।

আগে আমাদিগের বুঝিয়া দেখা চাই যে, স্বধর্ম্ম সামগ্রীটা কি?

শঙ্করাদি পূর্ব্বপণ্ডিতগণের পক্ষে এ তত্ত্ব বুঝান বড় সহজ হইয়াছিল। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, সুতরাং অর্জ্জুনের স্বধর্ম্ম ক্ষাত্রধর্ম্ম বা যুদ্ধ। তিনি যে যুদ্ধ না করিয়া বরং বলিতেছিলেন যে, "ভিক্ষাবলম্বন করিব, সেও ভাল," সেটা তাঁহার পরধর্ম্মাবলম্বনের ইচ্ছা—কেন না, ভিক্ষা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। *

কিন্তু আমরা এই ব্যাখ্যায় সকল বুঝিলাম কি? বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণের স্বধর্ম্ম বর্ণবিভাগানুসারে নির্ণীত হইতে পারে, ইহা যেন বুঝিলাম। কিন্তু অহিন্দুর পক্ষে স্বধর্ম্ম কি? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যে সমষ্টি, তাহা পৃথিবীর লোক-সংখ্যার অতি ক্ষুদ্রাংশ—অধিকাংশ মনুষ্য চতুর্ব্বর্ণের বাহির; তাহাদের স্বধর্ম্ম নাই? জগদীশ্বর কি তাহাদের কোন ধর্ম্ম বিহিত করেন নাই? কোটি কোটি মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া কেবল ভারতবাসীর জন্য

* শোকমোহাভ্যাং হ্যভিভূতবিবেকবিজ্ঞানঃ স্বত এব ক্ষত্রধর্ম্মে যুদ্ধে প্রবৃত্তোঽপি তস্মাদ্‌যুদ্ধাদুপররাম পরধর্ম্মঞ্চ ভিক্ষাজীবনাদিকং কর্ত্তুং প্রববৃতে।—শাঙ্করভাষ্য।

ধর্ম্ম বিহিত করিয়া আর সকলকেই ধর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন? ভগবদুক্ত ধর্ম্ম কি হিন্দুর জন্যই? ম্লেচ্ছেরা কি তাঁহার সন্তান নহেন? ভাগবত ধর্ম্ম এমন অনুদার নহে।

যিনি স্বয়ং জগদীশ্বরের এইরূপ ধর্ম্মচ্যুতিতে বিশ্বাসবান্, তিনি খ্রীষ্টানের * তুল্য। আর যিনি তাহাতে বিশ্বাসবান্ নহেন, তিনি "স্বধর্ম্মের" অন্য তাৎপর্য্যের অনুসন্ধান করিবেন সন্দেহ নাই।

যাহার যে ধর্ম্ম, তাহার তাই স্বধর্ম্ম। এখন মনুষ্যের ধর্ম্ম কি? যাহা লইয়া মনুষ্যত্ব, তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম। কি লইয়া মনুষ্যত্ব? মানুষের শরীর আছে, এবং মন † আছে। এই শরীরই বা কি এবং মনই বা কি? শরীর কতকগুলি জড়পদার্থের সমবায়, তাহাতে কতকগুলি শক্তি আছে। এই শক্তিগুলি শরীর হইতে তিরোহিত হইলে, মনুষ্যত্ব থাকে না; কেন না, মানুষের মৃতদেহে মনুষ্যত্ব আছে, এমন কথা বলা যায় না। তবেই জড়পদার্থকে ছাড়িয়া দিতে হইবে—সেই দৈহিকী শক্তিগুলিই মনুষ্যশরীরের প্রকৃত উপাদান। আমি স্থানান্তরে এইগুলির নাম দিয়াছি—"শারীরিকী বৃত্তি"। মনুষ্যের মনও এইরূপ শক্তি বা বৃত্তির সমষ্টি। সেইগুলির নাম দেওয়া যাউক, মানসিক বৃত্তি। এখন দেখা যাইতেছে যে, এই শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি লইয়াই মানুষ, বা মানুষের মানুষ্যত্ব।

যদি তাই হইল, তবে সেই সকল বৃত্তিগুলির বিহিত অনুশীলনই মানুষের ধর্ম্ম।

বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা আমরা কি করি? হয় কিছু কর্ম্ম করি, না হয় কিছু জানি। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের জীবনে ফল আর কিছু নাই।

অতএব জ্ঞান ও কর্ম্ম মানুষের স্বধর্ম্ম। সকল বৃত্তিগুলি সকলেই যদি বিহিতরূপে অনুষ্ঠিত করিত, তবে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েই সকল মনুষ্যেরই স্বধর্ম্ম হইত। কিন্তু মনুষ্য-সমাজের অপরিণতাবস্থায় তাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না। † কেহ কেবল জ্ঞানকেই প্রাধান্যতঃ স্বধর্ম্মস্থানীয় করেন, কেহ কর্ম্মকে ঐরূপ প্রধানতঃ স্বধর্ম্মরূপ গ্রহণ করেন।

জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য ব্রহ্ম; সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে আছে। এই জন্য জ্ঞানার্জ্জন যাঁহাদিগের ধর্ম্ম, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রহ্মন্ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

---

* খ্রীষ্টানদিগের বিশ্বাস যে, যে যীশুখ্রীষ্ট না ভজে, জগদীশ্বর তাহাকে অনন্তকাল জন্য নরকে নিক্ষেপ করেন।

† "মন" চলিত কথা, এইজন্য "মন" শব্দ ব্যবহার করিলাম। এই চলিত কথাটি ইংরেজী "mind" শব্দের অনুবাদ মাত্র। হিন্দুদর্শনশাস্ত্রের ভাষা ব্যবহার করিতে গেলে, ইহার পরিবর্ত্তে বুদ্ধি ও মন উভয় শব্দ, এবং তৎসঙ্গে অহঙ্কার এই তিনটি শব্দই ব্যবহার করিতে হইবে। তাহার পরিবর্ত্তে "matter and mind।" এই বিভাগের অনুবর্ত্তী হওয়াই ভাল।

* কোমৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তিন ভাগে চিত্তপরিণতিকে বিভক্ত করেন, "Feeling, Thought, Action," ইহা ন্যায্য। কিন্তু Feeling অবশেষে Thought কিংবা Action প্রাপ্ত হয়। এইজন্যই পরিণামের ফল জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দ্বিবিধ বলাও ন্যায্য।

† আমি উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপকেও সমাজের অপরিণতাবস্থা বলিতেছি।

কর্ম্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বুঝিতে গেলে কর্ম্মের বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। জগতে অন্তর্ব্বিষয় আছে ও বহির্ব্বিষয় আছে। অন্তর্ব্বিষয় কর্ম্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, বাহির্ব্বিষয়ই কর্ম্মের বিষয়। সেই বহির্ব্বিষয়ের মধ্যে কতকগুলিই হৌক অথবা সবই হৌক, মনুষ্যের ভোগ্য। মনুষ্যের কর্ম্ম মনুষ্যের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ত্রিবিধ, যথা (১) উৎপাদন (২) সংযোজন বা সংগ্রহ, (৩) রক্ষা। যাহারা উৎপাদন করে, তাহারা কৃষিধর্ম্মী, (২) যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ করে, তাহারা শিল্প বা বাণিজ্য-ধর্ম্মী এবং যাহারা রক্ষা করে, তাহারা যুদ্ধ-ধর্ম্মী। ইহাদিগের নামান্তর ব্যুৎক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এ কথা পাঠক স্বীকার করিতে পারেন কি?

স্বীকার করিবার প্রতি একটা আপত্তি আছে। হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এবং এই গীতার ব্যবস্থানুসারে কৃষি শূদ্রের ধর্ম্ম নহে, বাণিজ্য এবং কৃষি উভয়ই বৈশ্যের ধর্ম্ম। অন্য তিন বর্ণের পরিচার্য্যাই শূদ্রের ধর্ম্ম। এখনকার দিনে দেখিতে পাই, কৃষি প্রধানতঃ শূদ্রের ধর্ম্ম। কিন্তু অন্য তিন বর্ণের পরিচার্য্যাও এখনকার দিনে প্রধানতঃ শূদ্রেরই ধর্ম্ম। যখন জ্ঞানধর্ম্মী, যুদ্ধধর্ম্মী, বাণিজ্যধর্ম্মী বা কৃষিধর্ম্মীর কর্ম্মের এত বাহুল্য হয় যে, তদ্ধর্ম্মিগণ আপনাদিগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না, তখন কতকগুলি লোক তাহাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানার্জ্জন বা লোকশিক্ষা, (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাণিজ্য, (৪) উৎপাদন বা কৃষি, (৫) পরিচর্য্যা এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম।

ইহার অনুরূপ পাঁচটি জাতি, রূপান্তরে, সকল সমাজেই আছে। তবে অন্য সমাজের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রভেদ এই যে, এখানে ধর্ম্ম পুরুষপরম্পরাগত। কেবল হিন্দুসমাজেই যে এরূপ, তাহা নহে, হিন্দুসমাজসংলগ্ন মুসলমান-দিগের মধ্যেও এইরূপ ঘটিয়াছে। দরজিরা পুরুষানুক্রমে সিলাই করে, জোলারা পুরুষানুক্রমে বস্ত্র বুনে, কলুরা পুরুষানুক্রমে তৈল বিক্রয় করে। ব্যবসা এইরূপ পুরুষপরম্পরা-নিবদ্ধ হইলে একটা দোষ ঘটে এই যে, যখন কোন জাতির সংখ্যা-বৃদ্ধি হইল, তখন নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ে কুলান হয় না, কর্ম্মান্তর অবলম্বন না করিলে জীবিকানির্ব্বাহ হয় না। প্রাচীন-কালের অপেক্ষা এ কালে শূদ্রজাতির সংখ্যা বিশেষ প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। * এজন্য শূদ্র এখন কেবল পরিচর্য্যা ছাড়িয়া কৃষিধর্ম্মী। পক্ষান্তরে, পূর্ব্বকালে আর্য্যসমাজস্থ অধিকাংশ লোক এইরূপ সামাজিক কারণে শিল্প, বাণিজ্য বা কৃষিধর্ম্মী ছিল, এবং তাহাদিগেরই নাম বৈশ্য।

সে যাই হউক, মনুষ্যমাত্রে জ্ঞান বা কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বণিক্, শিল্পী, কৃষক বা পরিচারকধর্ম্মী। সামাজিক অব-

* কেবল কাল সহকারে প্রজাবৃদ্ধির কথা বলিতেছি না; "বাঙ্গালীর উৎপত্তি-বিষয়ে বঙ্গদর্শনে যে কয়টি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি যে, অনার্য্য জাতিবিশেষ সকল হিন্দু-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শূদ্রজাতি-বিশেষে পরিণত হইয়াছে। যথা, পুণ্ড নামক প্রাচীন অনার্য্য জাতিবিশেষ এখন কোন স্থানে পুঁড়া, কোন স্থানে পোদে পরিণত হইয়াছে; এইরূপে কালক্রমে শূদ্রের সংখ্যা বাড়িয়াছে! বর্ণসঙ্কার শূদ্রবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

স্থীর গতি দেখিয়া যদি বল যে, মনুষ্যমাত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র, তাহাতেও কোন আপত্তি হইতে পারে না। স্থূল কথা এই যে, এই ষড়্‌বিধ বা পঞ্চবিধ বা চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম ভিন্ন মনুষ্যের কর্ম্মান্তর নাই। যদি থাকে, তাহা কুকর্ম্ম। * এই ষড়্‌বিধ কর্ম্মের মধ্যে যিনি যাহা গ্রহণ করেন, উপজীবিকার জন্যই হউক আর যে কারণেই হউক, যাহার ভার আপনার উপর গ্রহণ করেন, তাহাই তাঁহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, তাঁহার Duty. তাহাই তাঁহার স্বধর্ম্ম। ইহাই আমার বুদ্ধিতে গীতোক্ত স্বধর্ম্মের উদার ব্যাখ্যা। যাঁহারা ইহার কেবল প্রাচীন হিন্দুসমাজের উপযোগী অর্থ নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা ভগবদুক্তিকে অতি সঙ্কীর্ণার্থ বিবেচনা করেন। ভগবান্ কখনই সঙ্কীর্ণক বুদ্ধি নহেন।

যাহা ভগবদুক্তি—গীতাই হোক Bibleই হোক, স্বয়ং অবতীর্ণ ভগবানের স্বমুখ-নির্গতই হউক বা তাঁহার অনুগৃহীত মনুষ্যের মুখনির্গতই হউক, যখন উহা প্রচারিত হয়, উহা তখনকার ভাষায় ব্যক্ত হইয়া থাকে,এবং তখনকার সমাজের এবং লোকের শিক্ষা ও সংস্কারের অবস্থার অনুমত যে অর্থ, তাহাই তৎকালে গৃহীত হয়। কিন্তু সমাজের অবস্থা এবং লোকের শিক্ষা ও সংস্কার সকল কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়। তখন ভগবদুক্তির ব্যাখ্যারও সম্প্রসারণ আবশ্যক হয়। কেন না, ধর্ম্ম নিত্য এবং সমাজের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধও নিত্য। ঈশ্বরোক্ত ধর্ম্ম যে কেবল একটি বিশেষ সমাজ বা বিশেষ সামাজিক অবস্থার পক্ষেই ধর্ম্ম,সমাজের অবস্থান্তরে তাহা আর খাটিবে না,এজন্য সমাজকে পূর্ব্বাবস্থাতে রাখিতে হইবে, ইহা কখন ঈশ্বরাভিপ্রায়-সঙ্গত হইতে পারে না। কালক্রমে সামাজিক পরিবর্ত্তনানুসারে ঈশ্বরোক্তির সামাজিক জ্ঞানোপযোগিনী ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণোক্ত স্বধর্ম্মের অর্থের ভিতর বর্ণাশ্রমধর্ম্মও আছে; আমি যাহা বুঝাইলাম,তাহাও আছে, কেন না, উহা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সম্প্রসারণ মাত্র তবে প্রাচীনকালে বর্ণাশ্রম বুঝিলেই ঈশ্বরোক্তির কালোচিত ব্যাখ্যা করা হয়; আমি যেরূপ বুঝাইলাম, এখন সেইরূপ বুঝিলেই কালোচিত ব্যাখ্যা করা হয়।

স্বধর্ম্ম কি, তাহা যদি, যাহা হোক এক রকম, আমরা বুঝিয়া থাকি, তবে এক্ষণে স্বধর্ম্ম-পালন কেন করিব,তাহা বুঝিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ দুই প্রকার বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক এ তত্ত্ব অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন। একটি জ্ঞানমার্গ, আর একটি কর্ম্মমার্গ। এই অধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোক হইতে আটত্রিশ শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞানমার্গ-কীর্ত্তন, তৎপরে কর্ম্মমার্গ।

জ্ঞানমার্গের স্থূল তত্ত্ব আত্মা অবিনশ্বর। পর-শ্লোকে সেই কথা উঠিতেছে।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥১২॥

আমি কদাচিৎ ছিলাম না, এমন নহে, তুমি বা এই রাজগণ ছিলেন না, এমন নহে ইহার পরে আমরা সকলে যে থাকিব না, এমন নহে।১২।

যুদ্ধে স্বজন-নিধন-সম্ভাবনা দেখিয়া অর্জ্জুন অনুতাপ করিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ ইহার পূর্ব্ব-শ্লোকে বলিয়াছেন, যাহার জন্য শোক করিতে নাই, তাহার জন্য তুমি শোক করিতেছ,' যে মরিবে তাহার জন্য শোক করা উচিত নহে। কেন, তাহা এই শ্লোকে বুঝাইতেছেন। ভাবার্থ এই যে, "দেখ, কেহ মরে না। দেখ, আমি, তুমি আর এই রাজগণ অর্থাৎ সকলেই চিরস্থায়ী; পূর্ব্বেও সকলেই ছিলাম, এ

* যথা চৌর্য্যাদি।

জীবন-ধ্বংসের পর সবাই থাকিবে। যদি থাকিবে, মরিবে না, তবে তাহাদের জন্ম শোক করিবে কেন?"

ইহাই হিন্দুধর্ম্মের স্থূল কথা—হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত প্রধান তত্ত্ব। কেবল হিন্দুধর্ম্মের নহে, খ্রীষ্টধর্ম্মের, বৌদ্ধধর্ম্মের, ইস্লামধর্ম্মের, সকল ধর্ম্মের মধ্যে ইহাই প্রধান তত্ত্ব। সে তত্ত্ব এই যে, দেহাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মা আছে, এবং সেই আত্মা অবিনাশী। শরীরের ধ্বংস হইলেও আত্মা পরকালে বিদ্যমান থাকে। পরকালে আত্মার কি অবস্থা হয়, তদ্বিষয়ে নানা মতভেদ আছে ও হইতে পারে, কিন্তু দেহাতিরিক্ত অথচ দেহস্থিত আত্মা আছেন, এবং তিনি বিনাশশূন্য, অমর, ইহা হিন্দু, খ্রীষ্টিয়ান বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, মুসলমান প্রভৃতি সকলের সম্মত। এই সকল ধর্ম্মের ইহাই মূলভিত্তি।

এই তত্ত্বের প্রধান প্রতিবাদী বৈজ্ঞানিকেরা। তাঁহারা বলেন, শরীরাতিরিক্ত আর কিছু নাই। শরীরাতিরিক্ত আর একটা যে আত্মা আছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই।

আজকাল বৈজ্ঞানিকেরাই বড় বলবান্। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম একদিকে, তাঁহারা আর একদিকে। তাঁহাদের প্রচণ্ড প্রতাপে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম হঠিয়া যাইতেছে। অথচ বিজ্ঞানের * অপেক্ষা ধর্ম্ম বড়। পক্ষান্তরে, ধর্ম্ম বড় বলিয়া আমরা বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। ধর্ম্মও সত্য, বিজ্ঞানও সত্য। অতএব এ স্থলে আমাদের বিচার করিয়া দেখা যাউক, কতটুকু সত্য কোন্ দিকে আছে। বিশেষতঃ শিক্ষিত বাঙ্গালী, বিজ্ঞান জানুন বা না জানুন, বিজ্ঞানের প্রতি অচলভক্তিবিশিষ্ট। বিজ্ঞানে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ হয়, জাহাজ চলে, কল চলে, কাপড় হয়, নানারকমে টাকা আসে, অতএব বিজ্ঞানই তাঁহাদের কাছে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ। যখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্ম এই টীকা লেখা যাইতেছে, তখন আত্মবাদের বিজ্ঞান যে প্রতিবাদ করেন, তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত।

এ বিচারে আগে বুঝা কর্ত্তব্য যে, আত্মা কাহাকে বলা যাইতেছে, এবং হিন্দুরা আত্মাকে কিরূপ বুঝে।

হিন্দু দার্শনিকেরা আত্মাকে বলেন, "অহম্প্রত্যয়-বিষয়াহম্পদ-প্রত্যয়-লক্ষিতার্থঃ"—অর্থাৎ "আমি" বলিলে যাহা বুঝিব, সেই আত্মা। এ সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা এই বাক্যের সম্প্রসারণ মাত্র।

"আমি দুঃখ ভোগ করি"—কিন্তু আমি কে? বাহ্য প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছু তোমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। তুমি বলিতেছ, আমি বড় দুঃখ পাইতেছি—আমি বড় সুখী। কিন্তু একটি মনুষ্যদেহ ভিন্ন "তুমি" বলিব, এমন কোন সামগ্রী দেখিতে পাই না। তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগোচর। তবে কি তোমার দেহেরই এই সুখ-দুঃখ ভোগ বলিব?

তোমার মৃত্যু হইলে তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু তৎকালে তাহার সুখ-দুঃখ-ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে অপমান করিয়াছে, তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, তথাপি তুমি দুঃখী। তবে তোমার দেহ দুঃখ ভোগ করে না। যে দুঃখভোগ করে, সে স্বতন্ত্র। সেই তুমি। তোমার দেহ তুমি নহে।

এইরূপ সকল জীবের। অতএব দেখা

---

* পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রচলিত প্রথানুসারে science কেই বিজ্ঞান বলিতেছি ও বলিব।

যাইতেছে যে, এই জগতের কিয়দংশ ইন্দ্রিয়-গোচর, কিয়দংশ অনুমেয় মাত্র,ইন্দ্রিয়-গোচর নহে, এবং সুখ-দুঃখাদির ভোগকর্ত্তা। যে সুখদুঃখাদির ভোগকর্ত্তা, সেই আত্মা।" *

আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক,এই স্থূল কথাটা খ্রীষ্টীয়াদি সকল ধর্ম্মেই আছে। কিন্তু তাহার উপর আর একটা অতি সূক্ষ্ম, অতি চমৎকার কথা, কেবল হিন্দুধর্ম্মেই আছে। সেই তত্ত্ব অতি উন্নত, উদার, বিশুদ্ধ, বিশ্বাসমাত্রে মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়। হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতিই সেই অতি মহত্তত্ত্ব অনুভূত করিতে পারে নাই। যে সকল কারণে, হিন্দু-ধর্ম্ম অন্য সকল ধর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা তাহার মধ্যে একটি অতি গুরুতর কারণ। সেই তত্ত্ব এখন বুঝাইতেছি।

আত্মা সকলেরই আছে। তুমি যখন আমা হইতে ভিন্ন.তখন তোমার আত্মা আমা হইতে কাজেই ভিন্ন। কিন্তু ভিন্ন হইয়াও প্রকৃতরূপে ভিন্ন নহে। মনে কর, বহুসংখ্যক শূন্য পাত্র আছে; তাহার সকলগুলির ভিতর আকাশ আছে। এক পাত্রাভ্যন্তরস্থ আকাশ পাত্রান্তরস্থ আকাশ হইতে ভিন্ন। কিন্তু পৃথক্ হইলেও সকল পাত্রস্থ আকাশ জাগতিক আকাশের অংশ। পাত্রগুলি ভগ্ন করিলেই আর কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না। সকলপাত্রস্থ আকাশ সেই জাগতিক আকাশ হইতে অভিন্ন হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জীবগত আত্মা পরস্পর পৃথক্ হইলেও জাগতিক আত্মার অংশ; দেহবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলে সেই জাগতিক আত্মায় বিলীন হয়। এই জগদাত্মাকে হিন্দু-দার্শনিকেরা পরমাত্মা বলেন। জীবদেহস্থ আত্মা যত দিন সেই পরমাত্মায় বিলীন না হয়, তত দিন তাহাকে জীবাত্মা বলে।

এখন এই জীবাত্মা কি নশ্বর? দেহের ধ্বংস হইলেই কি তাহার ধ্বংস হইল? ইহার সহজ উত্তর এই যে, যাহা অবিনশ্বরের অংশ, তাহা কখন নশ্বর হইতে পারে না। যদি জাগতিক আকাশ অবিনশ্বর হয়, তবে ভাণ্ডস্থ আকাশও অবিনশ্বর। যদি পরমাত্মা অবিনশ্বর হয়েন, তবে তদংশ জীবাত্মাও অবিনশ্বর।

এই হইল হিন্দুধর্ম্মের কথা। অন্য কোন ধর্ম্ম এই অত্যুন্নত তত্ত্বের নিকটেও আসিতে পারেন নাই। আমরা পরে দেখাইব যে,ইহার অপেক্ষা উন্নততত্ত্ব মনুষ্যজ্ঞাত তত্ত্বের ভিতর আর নাই বলিলেও হয়। প্রাচীন ঋষিরা বলিতে পারেন, "আমরা যদি আর কিছু না করিতাম, কেবল এই কথাটা পৃথিবীতে প্রচার করিয়া যাইতাম, তাহা হইলেও আমরা সকল মনুষ্যের উপরে আসন পাইবার যোগ্য হইতাম।" * বাস্তবিক এই সকল তত্ত্বের আলোচনা করিলে তাঁহাদিগকে মনুষ্যমধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না; দেবতা বলিতেই ইচ্ছা করে।

এখন দেখা যাউক, বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে কি বলেন। তাঁহারা বলেন, আদৌ আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। প্রমাণাভাবে কোন কথাই স্বীকার কর্ত্তব্য নহে। যখন আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করা যাইতে পারে না, তখন তাহার অবিনাশিতা, জীবাত্মা, পরমাত্মা, এ সকল উপন্যাসমধ্যে গণনা করিতে হয়। এই শ্রেণীর একজন জগদ্বিখ্যাত লেখক, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার পক্ষে যে আপত্তি, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন।

* প্রবন্ধ পুস্তক।

*যে তত্ত্বটা বুঝাইলাম,তাহা সে বিলাতী Pantheism নয়, এ কথা বোধ হয়,বলিবার প্রয়োজন নাই।

"Thought and consciousness, thought mentally distinguishable from the body, may not be a substance separable from it, but a rseult of it, standing in relation to it, like that of a tune to the mnsical instrument on whic it is played; and that the arguments used to prove that the soul does not die with the body would equally prove that the tun does not die with the instrument but survives its destruction and continues to exist apart. In fact, those moderns who dispute the evidences of the immortality of the soul, do not in general believe the soul to be a substance per-se, but regard it as a bundle of attributes, the attributes of feeling, thinking, reasoning, believing, willing and these attributes they regard as a cousequence of the bodily organization which therefore, they urge it is as unreasonable to suppose surviving when that organization is dispersed, as to suppose the colour or odour of a rose surviving when the rose itself has perished. Those therefore who would deduce the immortality of the soul from its own nature have first to prove that the attributes in question are not attributes of the body, but of a separates ubstance."*

এইখানে পাঠক একটু সূক্ষ্ম বুঝিয়া দেখুন, এই বিচারের তাৎপর্য্য এই যে, আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব অসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন ইহার দ্বারা আত্মার অনস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে না। আত্মা নাই, এমন কথা মিল কি কেহই বলিতে পারেন না। উক্ত বিচারে যে আত্মার অনস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে, তাহা মিল নিজেই বুঝাইতেছেন।

'In the first place, it does not prove, experimentally, that any mode of organization has the power of producing feeling or thought. To make that proof good, it would be necessary, that we should be able to produce an organism, and try whether it would feel, which we connot do."

পুনশ্চ—

"There are thinkers who regard it as a truth of reason that miracles are impossible; and in like maener there are others who because the phenomena of life and consciousness are associated in their minds bp undeviating experience with the action of material organs, think it an absurdity per-se to imagine it possible those phenomena can exist under any other conditions. But they should remember that the uniform co-existence of one fact with another

---

* Three Essays on Religion, P. 197. শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য এই টীকা লেখা যাইতেছে, সুতরাং ইংরাজীর তরজমা দেওয়া যাইবে না।

does not make the onc fact a part of the other or the same with it. The relation of thought to a material brain is no metaphysical necessity; but simply a constant co-existenee within the limits of observation. And when analysed to the bottom on the principles of the associative psychology, just as much as the mental functions, is, like matter itself, merely a set of human sensation either actual or inferrible as possible......Experience furnishes us with no example of any series of states of consciousness without this group of contingent sensations attached to it; but it is as easy to imagine such a series of states without, as with this accompaniment, and, we knew of no reason in the nature of things against the possibility of its being thus disjoined. We may suppose that the same thoughts, emotions, volition and even sensations which we have here, may persist or recoommence somewhereelse under other conditions, just as we may suppose that other thoughts and sensations may exist under other conditons in other parts of the universe. And in entertaining this supposition we need not be embarrassed by any metappysical difficulty about a thinking substance. Substance is but a general name for the perdurability of attributes; wherever there is a series of thonghts connected together by memories, that constitutes a thinking substance.

জড়বাদীর এই আপত্তি বিচারে ভাসিয়া গেল, তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না। তথাপি ইহাতেই আত্মবাদী জয়ী হইতেছেন না। পৃথক্ আত্মা নাই, অথবা তাহা নশ্বর, এ কথা বলিবার কাহারও অধিকার নাই, ইহাতে প্রমাণীকৃত হইল। কিন্তু আত্মা যে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ, এবং তাহা অবিনাশী, ইহা প্রমাণীকৃত হইল না। তুমি বলিতেছ, স্বতন্ত্র আত্মা আছে এবং তাহা অবিনাশী, এ কথার প্রমাণ কি?

অনেক সহস্র বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির মধ্যে এই প্রমাণ সংগৃহীত হইয়া আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা তাহা অপ্রচুর বলিয়া উড়াইয়া দেন। বৈজ্ঞানিকেরা সত্যবাদী এবং প্রমাণ-সম্বন্ধে তাঁহারা সুবিচারক। অতএব তাঁহারা এ কথা কেন বলেন, সেটাও বুঝিয়া রাখা চাই।

বুঝিতে গেলে, আগে বুঝিতে হইবে, প্রমাণ কি? যাহার দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, তাহাই তাহার প্রমাণ। আমি এই পুষ্পটি দেখিতে পাইতেছি বলিয়াই জানিতে পারিতেছি যে, পুষ্পটি আছে। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিই এখানে পুষ্পের অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া মেঘগর্জ্জন শুনিলাম. ইহাতে জানিলাম যে, আকাশে মেঘ আছে, এখানে মেঘ আমার প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। কিন্তু মেঘের ধ্বনি আমার প্রত্যক্ষের *

* যাহা ইন্দ্রিয়গোচর, তাহাই প্রত্যক্ষের বিষয়। পুষ্পের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইল, মেঘের ধ্বনির শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল।

বিষয়। প্রত্যক্ষাভাবেও মেঘবিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার কারণ পূর্ব্বকৃত প্রত্যক্ষ হইতে অনুমান। যখনই যখনই এইরূপ গর্জ্জনধ্বনি শুনিয়া আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করা গিয়াছে, তখনই তখনই আকাশে মেঘ দেখা গিয়াছে।

অতএব আমরা দ্বিবিধ প্রমাণের দেখা পাইতেছি;—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান। ভারতবর্ষীয়েরা অন্যবিধ প্রমাণও স্বীকার করেন, তাহার কথা পরে বলিতেছি। বৈজ্ঞানিক বা জড়বাদিগণ অন্য কোন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা অনুমান সম্বন্ধে ইহাও বলেন যে, যে অনুমান প্রত্যক্ষমূলক নহে, সে অনুমান অসিদ্ধ; অথবা এরূপ অনুমান হইতেই পারে না। এই তত্ত্বের মীমাংসা জন্য ইউরোপীয়েরা এক অতি বিচিত্র এবং মনোহর দর্শনশাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ পরিচয় দিবার স্থান নাই।

এখন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মা কখন কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয় হয় নাই। শরীর প্রত্যক্ষ, কিন্তু শরীরস্থ আত্মার প্রত্যক্ষতা নাই। শরীর-বিমুক্ত আত্মারও কেহ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই। যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষমূলক কোন অনুমানও হইতে পারে না। কেবল ইহাই নহে। আত্মা ভিন্ন এমন অন্য কোন পদার্থ সম্বন্ধে মনুষ্যের কোন প্রকার প্রত্যক্ষজাত কোন প্রকার জ্ঞান নাই যে, তাহা হইতে আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। এরূপ যে সকল প্রমাণ এদেশে বা ইউরোপে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বিচারে টিকে না। অতএব আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। *

তাই বিজ্ঞান, আত্মাকে খুঁজিয়া পায় না।

বিজ্ঞান সত্যবাদী। বিজ্ঞানের যতদূর সাধ্য, বিজ্ঞান ততদূর সন্ধান করিল, কিন্তু যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া ও সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও বিজ্ঞান আত্মাকে পাইল না। পাইল না কেন, না বিজ্ঞানের ততদূর গতিশক্তি নাই। যাহার যত দৌড়, তাহার বেশী সে যাইতে পারে না। ডুবুরি কোমরে দড়ি বাঁধিয়া সাগরে নামে, যতটুকু দড়ি, ততটুকু যাইতে পারে, তার বেশী যাইতে পারে না, সাগরে সমস্ত রত্ন কুড়াইবার তার সাধ্য নাই। প্রমাণের দড়ি বিজ্ঞানের কোমরে

---

* তবে সর্ব্বদেশে সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, মৃত ব্যক্তির দেহবিমুক্ত আত্মা কখন কখন মনুষ্যের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হয়। দেহ-বিমুক্তাত্মা এইরূপে মনুষ্যের ইন্দ্রিয়-গোচর হইলে অবস্থাবিশেষে ভূত প্রেত নাম প্রাপ্ত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এ সকল চিত্তের ভ্রমমাত্র, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানবৎ ভ্রমজ্ঞান মাত্র, আর ঈদৃশ ভ্রমজ্ঞানই আত্মার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসের কারণ। কিন্তু এক্ষণে ইউরোপ ও আমেরিকায় Spiritualism তত্ত্বের প্রাদুর্ভাবে, এই প্রেততত্ত্বই বিজ্ঞানের একটি শাখা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এবং Crookes, Wallace প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা এতদ্বিষয়ক প্রমাণ সকল এমন উত্তমরূপে পরীক্ষিত ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন যে প্রতিপক্ষেরা কিছু গোলযোগে পড়িয়াছেন। ইহার নানা প্রকার বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছে। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, প্রেতপ্রত্যক্ষের যাথার্থ্য এখনও বৈজ্ঞানিকেরা সাধারণতঃ স্বীকার করেন না। সুতরাং উহা আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণের মধ্যে আমি গণনা করিতে পারিলাম না। আর ঈদৃশ প্রমাণের উপর ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করি না। ধর্ম্ম বিজ্ঞান নহে; তাহার ভিত্তি আরও দৃঢ়সংস্থাপিত।

বাধা, বিজ্ঞান প্রমাণের অপ্রাপ্য আত্মতত্ত্ব পাইবে কোথা? যেখানে বিজ্ঞান পৌঁছে না, সেখানে বিজ্ঞানের অধিকার নাই, যে উচ্চ ধামের নিম্ন-সোপানে বসিয়া বিজ্ঞান জন্ম সার্থক করে, সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অনুসন্ধান করাই ভ্রম। "Our victorious Science fails to sound one fathom's depth on any side, since it does not explain the parentage of mind.* For mind was in truth before all science, and remains for ever, the seer, judge interpreter, even father of all its systems, facts, and laws. Our faculties are none the less truly above our heads because we no longer wonder like children at processes we do not understand. Spite of category and formula of Kant and Hegel, we are abashed before our own untraceable thought, The star of heaven, the grass of the field, the very dust that shall be man, foil our curiousity as much as ever, and none the less for yielding to the lens, the prison and the polarsscope of science ever now triumphs. for our pride and delight. †" যখন বিজ্ঞান একটী ধূলিকণার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারে না,* তখন আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবে কি প্রকারে? যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে না পায়, সে বিজ্ঞানে পায় না। যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে পাইয়াছে, তাহার কাছে আত্ম-বাদ-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের কোন প্রয়োজন নাই।

এখন, বৈজ্ঞানিক উত্তর করিবেন যে, বিচার বড় অন্যায় হইতেছে। যখন বলিতেছ, জ্ঞানমাত্রের উপায় প্রমাণ, তখন অবশ্য স্বীকার করিতেছ যে, প্রমাণাতিরিক্ত জ্ঞেয় কিছুই নাই। আত্মতত্ত্ব যখন প্রমাণের অতীত, আত্মার অস্তিত্বের যখন প্রমাণ নাই, তখন আত্মসম্বন্ধে মনুষ্যের কোন জ্ঞান নাই, ও হইতে পারে না। অতএব আত্মা আছে কি না, জানি না, ইহা ভিন্ন আর কিছু আমাদের বলিবার উপায় নাই।

এ কথার দুইটি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। একটি প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকদিগের উত্তর, একটি আধুনিক জর্ম্মাণদিগের উত্তর। দর্শনশাস্ত্রে এই দুইটি জাতিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ। এই দুই জাতিই দেখিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষমূলক যে অনুমান, তাহার গতিশক্তি অতি সঙ্কীর্ণ, তাহা কখনই মনুষ্যজ্ঞানের সীমা নহে। এই জন্য হিন্দু দার্শনিকেরা অন্যবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকেরা বলেন, আর দ্বিবিধ প্রমাণ আছে, উপমান এবং শাব্দ। সাংখ্যেরা উপমান স্বীকার করেন না, কিন্তু শাব্দকে তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন।

উপমান (Analogy) যে একটি পৃথক্ প্রমাণ, ইহা আমরা পাঠকদিগকে স্বীকার

* আত্মা।

† Oriental Religions, India, P. 447.

* কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মতে বহির্জ্জগতের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই।

করিতে বলিতে পারি না। অনেক স্থলে উহার দ্বারা প্রমাণজ্ঞান জন্মে না, ভ্রমজ্ঞান জন্মে। যেখানে উপমান প্রমাণের কার্য্য করে, সেখানে উহা পৃথগ্বিধ প্রমাণ নহে, অনুমানবিশেষ মাত্র। এক্ষণে "শাব্দ" কি, তাহা বুঝাইতেছি।

আপ্তোপদেশই শাব্দ, অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য যে বাক্য, তাহাই তৃতীয় প্রমাণ। যদি বেদাদিকে ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি, তবে তাহা প্রমাণ। যদি বেদাদিকে আমরা ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য বাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি, তবে আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা বেদে উক্ত হইয়াছে বলিয়া উহা অনায়াসে স্বীকার করা যাইতে পারে। পরন্তু বেদাদি যদি মনুষ্যোক্তি হয়, তবে উহা ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না, কেন না, মনুষ্যমাত্রেই ভ্রমপ্রমাদাদির অধীন। স্থূল কথা, এক ঈশ্বরই ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য পুরুষ। যদি কোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি, তবে তাহাই প্রকৃত শাব্দরূপ প্রমাণ। খ্রিষ্টিয়ানেরাও ইহাকে উৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন—ইংরাজি নাম Revelation। বস্তুতঃ যদি কোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কেন না, প্রত্যক্ষ ও অনুমানও ভ্রান্ত হইতে পারে, ঈশ্বর কখনই ভ্রান্ত হইতে পারে না। যদি এই গীতাকে কাহারও ঈশ্বরোক্তি বলিয়া বিশ্বাস হয়, তবে আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা সম্বন্ধে তাঁহার অন্য প্রমাণ খুঁজিবার প্রয়োজন নাই; এই গীতাই অখণ্ডনীয় প্রমাণ। তবে নিরীশ্বর বৈজ্ঞানিক গীতাদিকেই ঈশ্বরোক্তি বলিয়া স্বীকার করিবেন না। আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে তিনি কি বাধ্য নহেন?

তাঁহাদিগের জন্য জর্ম্মাণ-দার্শনিকদিগের উত্তর আছে। কাণ্টের বিচিত্র দর্শনশাস্ত্র পাঠককে বুঝাইবার স্থান এখানে নাই। কিন্তু কাণ্ট এবং তাঁহার পরবর্ত্তী কতকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনিকদিগের মত এই যে, প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষমূলক অনুমান ভিন্ন জ্ঞানের অন্য কারণ আছে। তাঁহারা বলেন, কতকগুলি তত্ত্ব মনুষ্যচিত্তে স্বতঃসিদ্ধ। তাঁহারা কেবল "বলেন" ইহাই নয়, কাণ্ট এই তত্ত্বের যে প্রকার প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা মনুষ্যবুদ্ধির আশ্চর্য্য পরিচয়স্থল। কাণ্ট ইহাও বলেন যে, যাহাকে আমরা বুদ্ধি বলি, অর্থাৎ যে শক্তির দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষাদি হইতে প্রাপ্তজ্ঞান লইয়া বিচার করি, তাহার অপেক্ষা উচ্চতর আমাদের আর এক শক্তি আছে। যাহা বিচারে অপ্রাপ্য, সেই শক্তির প্রভাবে আমরা তাহা জানিতে পারি। ঈশ্বর, আত্মা, এবং জগতের একত্ব-সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমরা সেই মহতী শক্তি হইতে পাই। এই "Transcendental philosophy" সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। অতএব এমন লোক অনেক আছেন যে, আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতায় বিশ্বাস তাঁহাদের পক্ষে দুর্লভ। তবে যাহা, আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য, তাহা আমি এখানে বলিতে বাধ্য। আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, চিত্তবৃত্তি সকল সমুচিত মার্জ্জিত হইলে, আত্মসম্বন্ধীয় এই জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হয়।*

ভক্তের এ সকল কচকচিতে কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরভক্ত, কেবল ক্ষুদ্র দর্শনশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া আত্মার স্বাতন্ত্র্য বা অবিনাশিতা স্বীকার করেন না। ভক্তের পক্ষে

---

* অনেকে বলিবেন, তবে কি Huxley Tyndall প্রভৃতির মত লোকের চিত্তবৃত্তি সকল সমুচিত মার্জ্জিত হয় নাই? উত্তর—না, সকলগুলি হয় নাই।

ইহাই যথেষ্ট যে, ঈশ্বর আছেন, এবং তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তিনিই পরমাত্মা এবং স্বয়ংই সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছেন। তবে যে এই দীর্ঘ-বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহার কারণ এই যে, অনেকে অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মতত্ত্বকে উপহসিত করেন। তাঁহাদের জানা উচিত যে, আত্মতত্ত্ব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অতীত হউক, বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ নহে।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

দেহীর যেমন এই দেহে কৌমার ও যৌবন ও বার্দ্ধক্য, তেমনি দেহান্তর-প্রাপ্তি। পণ্ডিত তাহাতে মুগ্ধ হন না। ১৩।

গীতোক্ত প্রধান তত্ত্ব, আত্মার অবিনাশিতা। এই শ্লোকে দ্বিতীয় প্রধান তত্ত্ব কথিত হইতেছে—জন্মান্তরবাদ। যেমন এই দেহেতেই আমাদিগকে ক্রমশঃ কৌমার, যৌবন, জরা ইত্যাদি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে হয়, তেমনি দেহান্তে দেহান্তরপ্রাপ্তি অবস্থান্তরপ্রাপ্তিমাত্র, অর্থাৎ মৃত্যু কেবল অবস্থান্তর মাত্র, যেমন কৌমার গেলে যৌবন উপস্থিত হয়, যৌবন গেলে জরা উপস্থিত হয়, তেমনি এ দেহ যায় আর এক দেহ আসে ;—যেমন কৌমার গিয়া যৌবন আসিলে কেহ শোক করে না, যৌবন গিয়া জরা আসিলে কেহ শোক করে না, তেমনি এ দেহ গেলে দেহান্তরপ্রাপ্তির বেলাই বা কেন শোক করিব ?

এই কথায়, মানিয়া লওয়া হইল যে, মরিলেই আবার জন্ম আছে। আত্মার অবিনাশিতা যেমন হিন্দুধর্ম্মের প্রথমতত্ত্ব,জন্মান্তরবাদ তেমনি দ্বিতীয় তত্ত্ব। কিন্তু আত্মার অবিনাশিতা যেমন খ্রীষ্টিয়াদি অন্যান্য প্রধান ধর্ম্মে স্বীকৃত, জন্মান্তরবাদ সেরূপ নহে। পক্ষান্তরে জন্মান্তরবাদ যে কেবল হিন্দুধর্ম্মেই আছে, এমনও নহে। বৌদ্ধধর্ম্মেরও ইহা প্রধান তত্ত্ব, এবং অন্যান্য ধর্ম্মেও ছিল বা আছে। তবে ইউরোপে এ মত অগ্রাহ্য এবং ইহার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই। এজন্য শিক্ষিত বাঙ্গালী এ মত গ্রাহ্য করেন না।

বাস্তবিক আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, তেমনি জন্মান্তর সম্বন্ধেও তদ্রূপ কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে, যেমন আত্মার অস্তিত্ব অপ্রমাণ করা যায় না, জন্মান্তরও অপ্রমাণ করা যায় না। তা না যাক্, যাহার প্রমাণাভাব, তাহা মানিতে কেহ বাধ্য নহে। এই তত্ত্বে বিশ্বাস যে চিত্তবৃত্তিসকলের সমুচিত অনুশীলনে স্বতঃসিদ্ধ হয়, এমন কথাও আমি বলিতে পারি না। তবে যিনি স্বর্গ-নরকাদি মানেন, জন্মান্তরবাদীর অপেক্ষা তাঁহার বেশী জোর কিছুই নাই। যেমন জন্মান্তরবাদের আপ্তোপদেশ ভিন্ন অন্য প্রমাণ নাই, স্বর্গ-নরকাদিরও তেমনি অন্য প্রমাণ নাই। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এ দেশে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ইউরোপীয়দিগের দেখাদেখি প্রমাণাভাবেও স্বর্গ-নরকে বিশ্বাসবান্—অর্থাৎ সুখ-দুঃখ-যুক্ত পারলৌকিক অবস্থাবিশেষে বিশ্বাসবান্, কিন্তু জন্মান্তরে কোন মতেই বিশ্বাসবান্ নহেন।

কথাটা একটু সবিস্তারে সমালোচনা করিবার আমাদের একটু প্রয়োজন আছে। যিনি আত্মার অস্তিত্ব মানেন না, তাঁহার সঙ্গে ত আমাদের কথাই নাই, কেন না, তিনি কাজেই জন্মান্তর মানিবেন না। কিন্তু যিনি আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা মানেন, তাঁহার সম্মুখে একটা বড় গুরুতর প্রশ্ন আপনা হইতেই উপস্থাপিত হয়।

জীবাত্মা যদি অবিনশ্বর হইল, তবে দেহান্তে তাহার গতি কি হয়?

এ বিষয়ে জগতে অনেকগুলি মত প্রচলিত আছে।

১। ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়। ইহা সচরাচর অসভ্য জাতিদিগের বিশ্বাস।

২। স্বর্গাদি লোকান্তর প্রাপ্ত হয়। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানদিগের এই মত।

৩। জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধদিগের এই মত।

৪। পরব্রহ্মে লীন হয় বা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

হিন্দুধর্ম্মে শেষোক্ত এই তিনটি মতই প্রচলিত আছে। এই তিনটি মতের সামঞ্জস্য কি প্রকার হইয়াছে, তাহা বুঝাইতেছি। হিন্দুরা বলেন যে, দেহান্তে জীবাত্মা মুক্ত হয় না; আপনার কৃত কর্ম্মানুসারে পুনর্ব্বার দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহার আবার জন্মান্তর হয়। যখন জীবাত্মা এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, ঈশ্বরে লীন হইবার যোগ্য হইয়াছে, তখন আর জন্ম হয় না, ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় বা নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হয়। ইহাকে সচরাচর মুক্তি বা মোক্ষ বলে। কিসে জীবাত্মা এই অবস্থাপন্ন হইতে পারে, ইহাই সাংখ্যাদি দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। হিন্দুরা ইহাইও বলেন যে, যখন জীবাত্মা মুক্ত হইবার অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, অথচ এমন কোন সুকৃত করিয়াছে যে, স্বর্গাদি উপভোগের যোগ্য, তখন জীবাত্মা কৃত পুণ্যের পরিমাণানুযায়ী কাল স্বর্গাদি উপভোগ করে, পরে জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়।

আপাততঃ শুনিলে এ সকল কথা পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকের নিকট অশ্রদ্ধেয় বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু একটু বিচার করিলে আর এক রকম বোধ হইবে।

এই জন্মান্তরবাদ, হিন্দুধর্ম্মে অতিশয় প্রবল। উপনিষদুক্ত হিন্দুধর্ম্ম, গীতোক্ত হিন্দুধর্ম্ম, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম বা দার্শনিক হিন্দুধর্ম্ম, সকল প্রকার হিন্দুধর্ম্ম ইহার উপর স্থাপিত। যেমন সূত্রে মণি গ্রথিত থাকে, হিন্দুধর্ম্মের সকল তত্ত্বগুলিই তেমনি এই সূত্রে গ্রথিত আছে। অতএব এই তত্ত্বটি আমাদিগকে বড় যত্নপূর্ব্বক বুঝিতে হইবে। কথাটাও বড় গুরুতর—অতি দুরূহ। আমরা বাল্যকাল হইতে কথাটা শুনিয়া আসিতেছি, ইহা আমাদের বাল্য-সংস্কারের মধ্যে, সুতরাং আমরা সচরাচর ইহার গৌরব অনুভব করি না। কিন্তু বিদেশীয় এবং অন্যধর্ম্মাবলম্বী চিন্তাশীল পণ্ডিতেরা কুসংস্কারবর্জ্জিত হইয়া ইহার আলোচনাকালে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েন। গীতার অনুবাদকার টম্সন সাহেব এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "Undoubtedly it is the most novel and startling idea ever started in any age or country." টেলর সাহেব ইহাকে "One of the most remarkable developments of ethical speculation" বলিয়া প্রশংসিত করিয়াছেন। *

কথাটা যদি এমনই গুরুতর, তবে ইহা আর একটু ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

বলা হইয়াছে, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, ইহা হিন্দুশাস্ত্রের উক্তি। পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের অংশ তাঁহা হইতে পার্থক্য লাভ করিল কি প্রকারে? তাঁহার দেহবদ্ধাবস্থা বা কেন? হিন্দুশাস্ত্রে ইহার যে উত্তর আছে, তাহা বুঝাইতেছি। ঈশ্বরের অশেষ প্রকার শক্তি আছে। একটি শক্তির নাম মায়া। এই মায়া কি, তাহা স্থানান্তরে বুঝাইব। এই মায়ার দ্বারা

* "Primitive Culture, Vol. I. P.12.

তিনি আপনার সত্তাকে জগতে পরিণত করিয়াছেন। তিনি চৈতন্যময়; তাঁহা ভিন্ন আর চৈতন্য নাই; অতএব জগতে যে চৈতন্য দেখি, ইহা তাঁহারই অংশ; তাঁহার সিসৃক্ষা-ক্রমে এই অংশ মায়ার বশীভূত হইয়া পৃথক্ ও দেহবদ্ধ হইয়াছে। যদি সেই পৃথগ্ভূত চৈতন্য বা জীবাত্মা কোন প্রকারে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, তবে আর তাহার পার্থক্য থাকিবে কেন? পার্থক্য ঘুচিয়া যাইবে; জীবাত্মা আবার পরমাত্মার বিলীন হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, জীবাত্মা এই মায়াকে অতিক্রম করিবে কি প্রকারে? যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা বা নিয়োগক্রমেই বদ্ধ হইয়া থাকে, তবে আবার বিমুক্ত হইবার সাধ্য কি? ইহার উত্তর এই যে, ঈশ্বরের নিয়োগ এরূপ নহে যে, জীবাত্মা চিরকালই মায়াবদ্ধ থাকিবে। তিনি যে সকল নিয়ম করিয়া-ছেন, মায়ার অতিক্রমের উপায়ও তাহার ভিতরে রাখিয়াছেন। সে উপায় কি, তদ্বি-ষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, জ্ঞানেই সেই মায়াকে অতিক্রম করা যায়; কেহ বলেন কর্ম্মে, কেহ বলেন ভক্তিতে। এই সকল মতের মধ্যে কোন্‌টি সত্য বা কোন্‌টি অসত্য, তাহার বিচার পশ্চাৎ করা যাইবে। এখন সকলগুলিই সত্য, ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক। এখন, এইগুলিই যদি ঈশ্বরে বিলীন হইবার উপায় হয়, তবে যে ব্যক্তি ইহজীবনে জ্ঞান, কর্ম্ম বা ভক্তির সমুচিত অনুষ্ঠান করে নাই, সে ঈশ্বরে লয় বা মুক্তি লাভ করিবে না। তবে সে ব্যক্তির আত্মা মৃত্যুর পর কোথায় যাইবে? আত্মা অবি-নশ্বর, সুতরাং দেহভ্রষ্ট আত্মাকে কোথাও না কোথাও যাইতে হইবে।

ইহার এক উত্তর এই হইতে পারে যে, দেহভ্রষ্ট আত্মা কর্ম্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে যাইবে। স্বর্গ বা নরক প্রভৃতি লোকান্তরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব। কিন্তু প্রমাণের কথা এখন থাক। স্বীকার করা যাউক, কর্ম্মফলানু-সারে আত্মা স্বর্গে বা নরকে যায়। এখন জিজ্ঞাস্য যে, জীবাত্মা স্বর্গে বা নরকে কিয়ৎ-কালের জন্য যায়, না অনন্তকালের জন্য যায়?

যদি বল, কিয়ৎকালের জন্য যায়, তবে সেখান হইতে ফিরিয়া আবার কোথায় যাইবে? জন্মান্তর স্বীকার না করিলে, এ প্রশ্নের উত্তর নাই। হয়, বল যে, জীব কর্ম্ম-ফলের উপযোগী কাল স্বর্গ বা নরক ভোগ করিয়া, পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিবে, নয়, বল যে, অনন্তকাল সে স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে।

খৃষ্টিয়ানেরা তাই বলেন। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর বিচার করিয়া পাপীকে অনন্ত নরকে এবং পুণ্যবান্‌কে অনন্ত স্বর্গে প্রেরণ করেন।

এ কথায় বড় গোলমালে পড়িতে হয়। মনুষ্যলোকে এমন কেহই নাই যে, কোন সৎকর্ম্ম কখন করে নাই বা কোন অসৎকর্ম্ম কখন করে নাই। সকলেই কিছু পাপ, কিছু পুণ্য করে। এখন জিজ্ঞাস্য যে, যে কিছু পাপ করিয়াছে, কিছু পুণ্য করিয়াছে, সে অনন্ত স্বর্গে যাইবে, না অনন্ত নরকে যাইবে? যদি সে অনন্ত স্বর্গে যায়, তবে জিজ্ঞাসা করি, তাহার পাপের দণ্ড হইল না কেন? যদি বল, অনন্ত নরকে যাইবে, তবে জিজ্ঞাসা করি, তাহার পুণ্যের পুরস্কার হইল না কেন?

যদি বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী, সে অনন্ত নরকে, যাহার পুণ্যের ভাগ বেশী, সে অনন্ত স্বর্গে যাইবে, তাহা হইলেও ঈশ্বরে অবিচার আরোপ করা হইল। কেন না, তাহা হইলে এক পক্ষে পুণ্যের কিছুই পুর-স্কার হইল না, আর এক পক্ষে পাপের কিছুই দণ্ড হইল না।

কেবল ঈশ্বরের প্রতি অবিচার আরোপ করা হয়, এমত নহে। ঘোরতর নিষ্ঠুরতা আরোপ করাও হয়। যাঁহাকে দয়াময় বলি, তিনি যে এই অল্পকাল-পরিমিত মনুষ্যজীবনে কৃতপাপের জন্য অনন্তকালস্থায়ী দণ্ড-বিধান করিবেন,ইহার অপেক্ষা অবিচার ও নিষ্ঠুরতা আর কি আছে ? ঈদৃশ নিষ্ঠুরতা ইহলোকের পামরগণের মধ্যেও পাওয়া যায় না।

যদি বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী,পুণ্যের ভাগ কম, সে পুণ্যানুরূপ কাল স্বর্গভোগ করিয়া অনন্তকাল জন্য নরকে যাইবে, এবং তদ্বিপরীতে বিপরীত ফল হইবে ; তাহাতেও ঐ সকল আপত্তির নিরাস হইল না। কেন না, পরিমিত কাল, কোটি কোটি যুগ হই-লেও, অনন্তকালের তুলনায় কিছুই নহে। অবিচার ও নিষ্ঠুরতার লাঘব হইল, এমন হইতে পারে, অভাব হইল না। অতএব তুমি যদি স্বর্গ নরক স্বীকার কর, তবে তোমাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে,অনন্তকালের জন্য স্বর্গ-নরক-ভোগ বিহিত হইতে পারে না। তুমি উর্দ্ধ ইহাই বলিতে পার যে, পাপ-পুণ্যের পরিমাণানুযায়ী পরিমিত কাল জীব স্বর্গ বা নরক, বা পৌর্ব্বাপর্য্যের সহিত উভয় লোক ভোগ করিবে। তাহা হইলে সেই সাবেক প্রশ্নটির উত্তর বাকি থাকে। সেই পরিমিত কালের অবসানে জীবাত্মা কোথায় যাইবে ? পরব্রহ্মে লীন হইতে পারে না। কেন না, জ্ঞান-কর্ম্মাদিই যদি মুক্তির উপায়, তবে স্বর্গ-নরকে সে উপায়ের সাধনাভাবে মুক্তি অপ্রাপ্য : কেন না, স্বর্গ-নরক ভোগ মাত্র—কর্ম্মক্ষেত্র নহে, এবং দেহশূন্য আত্মার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অভাবে, স্বর্গ-নরকে জ্ঞান-কর্ম্মের অভাব। অতএব এখনও জিজ্ঞাস্য, এই পরিমিত কালের অবসানে জীবাত্মা কোথায় যায় ?

হিন্দুশাস্ত্র এ প্রশ্নের উত্তরে বলে,—জীবাত্মা তখন জীবলোকে প্রত্যাগমন করিয়া দেহান্তর ধারণ করে। হিন্দুধর্ম্মের,বিশেষতঃ এই গীতোক্ত ধর্ম্মের এই অভিপ্রায় যে, জীবাত্মা সচরাচর দেহধ্বংসের পর দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া পুন-র্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। সেই দেহান্তর-প্রাপ্তিতে কর্ম্মফলানুসারে এবং পাপপুণ্যের তারতম্যানুসারে সদসদ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়। সচ-রাচর কর্ম্মফলভোগ জন্মান্তরেই হইয়া থাকে, কিন্তু কতকগুলি কর্ম্ম এমন আছে যে, তাহার ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি হইতে পারে,আর কতকগুলি কর্ম্ম এমন আছে যে,তাহার ফলে নরক-ভোগ করিতে হয়। যে সেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকে স্বর্গে বা নরকে যাইতে হইবে। কর্ম্মের ফলের পরিমাণানুযায়ী কালই স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে, তাহার পর আবার জীবলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি জন্মান্তর মানে না, তাহার সকল আপত্তির এখনও নিরাস হয় নাই। সে বলিবে, "যাহা বলিলে, এটা সাফ আন্দাজি কথা। অনন্ত স্বর্গ-নরক-ভোগ অসঙ্গত কথা স্বীকার করি। স্বর্গ ও নরক আমি আদৌ মানিতেছি না। কেন না, তাহার প্রমাণাভাব। কিন্তু স্বর্গ-নরক না মানিলেই জন্মান্তর মানিব কেন ? মানিলাম যে, আত্মা অবিনাশী। তুমি বলিতেছ যে, অবিনাশী আত্মা,যদি দেহান্তরে না যায়, তবে কোথায় যাইবে ? আমি উত্তরে বলিব, কোথায় যায়, তাহা জানি না। পরকালের কথা কিছুই জানি না। যাহা জানি না, যাহার প্রমাণাভাব, তাহা মানিব না। জন্মা-ন্তরের প্রমাণ দাও, তবে মানিব। গত্যন্ত-রের প্রমাণাভাব, জন্মান্তরের প্রমাণ নয়। তুমি যে রামও নও, শ্যামও নও, তাহাতে প্রমাণ হইতেছে না যে, তুমি যাদব কি

মাধব। জন্মান্তর যে হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ কি?"

কথা বড় শক্ত। জন্মান্তরবাদীরা এ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ দিয়া থাকেন, বা ইচ্ছা করিলে দিতে পারেন, তাহা আমি যথাসাধ্য নিম্নে সংগ্রহ করিলাম।

১। এ দেশে সচরাচর, লোকের অদৃষ্ট-তারতম্য দেখাইয়া এই মতসমর্থন করা হয়। কেহ বিনা দোষে দুঃখী; কেহ সহস্র দোষ করিয়াও সুখী, এদেশীয়গণ জন্মান্তরের সুকৃত দুষ্কৃত ভিন্ন এইরূপ বৈষম্যের কিছু কারণ দেখেন না। লোকান্তরে অর্থাৎ স্বর্গনরকে সুকৃতের পুরস্কার ও দুষ্কৃতের দণ্ড হইবে, এ কথা বলিলে ইহলোকের অদৃষ্টবৈষম্য সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় না। কেহ আজন্ম দুঃখী, অন্নহীনের ঘরে জন্মিয়াছে; কেহ আজন্ম সুখী, রাজার একমাত্র পুত্র;—জন্মকালেই এ অদৃষ্ট-তারতম্য কেন? যদি ইহা জীবের কর্ম্মফল হয়, তবে ইহজন্মের কর্ম্মফল নহে, কেন না, সদ্যঃপ্রসূত শিশুর ত কিছুই ইহজন্মকৃত কর্ম্ম নাই। কাজেই তাঁহারা এখানে পূর্ব্ব-জন্মকৃত কর্ম্মফল বিবেচনা করিয়া থাকেন।

আপত্তিকারক এ বিচারে সন্তুষ্ট হইবেন না। মনে কর, তিনি বলিবেন,—"সকলই কি কর্ম্মফল? যদি তাই হয়, তবে মৃত্যুকেও কর্ম্মফল বলিতে হইবে। কিন্তু কখনও কোন জীব, মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। অতএব ইহাই সিদ্ধ যে, এমন কোন কর্ম্ম বা অকর্ম্ম নাই, যদ্দারা মৃত্যু হইতে রক্ষা হইতে পারে। অতএব মৃত্যু কর্ম্মফল হইতে পারে না। মৃত্যু যদি কর্ম্মফল না হইল, তবে জন্মই বা কর্ম্মফল বলিব কেন? যাহা কর্ম্মফল আর যাহা কর্ম্মফল নহে, সকলই ঈশ্বরের নিয়মে ঘটে। ইহাও তাই। দম্পতি-সংসর্গে অবস্থাবিশেষে পুত্র জন্মে, রাজার ঘরেও জন্মে; মুটের ঘরেও জন্মে। ইহাও তাই ঘটিয়াছে। এমন স্থলে জাত ব্যক্তির কর্ম্মফল খুঁজিব কেন?"

এখানেও বিচার শেষ হয় না। পূর্ব্বজন্মবাদী প্রত্যুত্তরে বলিতে পারেন, "ঈশ্বরের নিয়মের ফলে সকলই ঘটে, ইহা আমিও স্বীকার করি। তবে বলিতেছি যে, এ বিষয়ে ঈশ্বরের নিয়ম এই যে, পূর্ব্বজন্মকৃত ফলানুসারে এই সকল বৈষম্য ঘটে। তুমি যে নিয়ম বলিতেছ, আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি—জন্মের কারণ উপস্থিত হইলেই জন্ম ঘটিবে—তা রাজ্ঞীর গর্ভেই কি, আর দরিদ্রের গর্ভেই কি? কিন্তু এ নিয়মে কি জন্মতত্ত্ব সকলই বুঝাইতে পার? কেহ রূপ, কান্তি, বুদ্ধি, সদ্‌গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে—কেহ কুরূপ, নির্ব্বোধ ও গুণহীন হইয়া জন্মগ্রহণে করিতেছে। তুমি যদি বল যে, এইরূপ প্রভেদ অনেক স্থলে জন্মের পরবর্ত্তী শিক্ষার ফল, তাহাতে আমার উত্তর এই যে, শিক্ষার প্রভেদে কতক তারতম্য ঘটে বটে, কিন্তু সমস্ত তারতম্যটুকু শিক্ষাধীন বলিয়া বুঝা যায় না। কেন না, অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, এক প্রকার শিক্ষায় পাত্রভেদে ফলের বিশেষ তারতম্য ঘটে। এমন কি, শিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দেহ ও বুদ্ধির তারতম্য দেখা যায়। ছয় মাসের শিশুদিগের মধ্যেও এ প্রভেদ লক্ষিত হয়। জানি, তুমি বলিবে যে, যেটুকু শিক্ষার অধীন বলিয়া বুঝা যায় না, সে তারতম্যটুকু বৈজিক, অর্থাৎ পিতা-মাতা বা পূর্ব্বপুরুষগণের প্রকৃতির ফল। আমি ইহাও মানি যে, মাতা পিতা বা তৎপূর্ব্বগামী পূর্ব্বপুরুষগণের প্রকৃতি, এমন কি, সংস্কার পর্য্যন্ত আমাদিগকে পাইতে হয়, এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা তাহা

সপ্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্যমধ্যে যে তারতম্যের কথা বলিতেছি, তাহা তোমার বৈজ্ঞিক তত্ত্বে নিঃশেষে বুঝা যায় না। দেখ, এক মাতার গর্ভে এক পিতার ঔরসে অনেকগুলি ভ্রাতা জন্মে, তাহাদের মাতা, পিতা বা পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে কোনই প্রভেদ নাই; অথচ ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। ইহার উত্তরে তুমি বলিতে পার বটে যে, গর্ভাধানকালে মাতা-পিতার দৈহিক অবস্থা এবং যত দিন শিশু গর্ভে থাকে,তত দিন মাতার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা ও তৎকালীন ঘটনা সকল এই তারতম্যের কারণ। না হয় ইহাও মানিলাম—কিন্তু যমজেও এরূপ তারতম্য দেখা যায়—সে তারতম্যের কিছু কারণ নির্দ্দেশ করিতে পার কি?"

ইহারও বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে পারেন। তিনি বলিতে পারেন যে, এই সকল তারতম্য এতদূর মনুষ্য-পরিজ্ঞাত নৈসর্গিক নিয়মাধীন বলিয়া বুঝা গেল, তবে বাকিটুকু মনুষ্যের জ্ঞেয় নিয়মের অধীন বলিয়া বিবেচনা করা উচিত—পূর্ব্বজন্ম কল্পনা করা অনাবশ্যক। এখনও বিজ্ঞান এতদূর যায় নাই যে,এই তারতম্যের কারণ সর্ব্বত্র নির্দ্দেশ করা যায়; কিন্তু একদিন যাইবে ভরসা করা যায়।

এ দিকে জন্মান্তরবাদীও বলিতে পারেন যে, এ তোমার আন্দাজি কথা। যাহা বিজ্ঞান এখন বুঝাইতে পারিতেছে না, তাহা যে বিজ্ঞান বুঝাইতে পারে এবং ভবিষ্যতে বুঝাইতে পারিবে, এটা আন্দাজি কথা। ইহা আমি মানি না।

এরূপ বিচারের অন্ত নাই, কোন পক্ষের জয়-পরাজয় নাই। এখানে বৈজ্ঞানিক, জন্মান্তরবাদীকে নিরস্ত করিতে পারেন না বা জন্মান্তরবাদী বৈজ্ঞানিককে নিরস্ত করিতে পারেন না। উভয়ের দশা তুল্য হইয়া পড়ে। যাহা অজ্ঞাত, উভয়কেই তাহার আশ্রয় লইতে হয়। তবে জন্মান্তরবাদকেই বিশেষ প্রকারে অজ্ঞাত ও অপ্রামাণিকের আশ্রয় লইতে হয়। এ বিচারে জন্মান্তর প্রমাণীকৃত হইতেছে, এমন আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

২। যাহাতে মনুষ্যসাধারণের বিশ্বাস, তাহা সত্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়, এমন কথা অনেকে বলেন। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানেরা যাই বলুন, অন্যান্য-ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্যেরা সাধারণতঃ জন্মান্তরে বিশ্বাস করে। পৃথিবী অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, নানা দেশে নানা জাতিই জন্মান্তরে বিশ্বাসবান্। *

*"It has been accepted, in some form, by disciples ot every Great religion in the world. It is common to Greek philosophers, Egyptain priests, Jewish Rabbins, and several early Christian sects. It appears in the speculations of the Neo Platonists, of latter European mystics, even of socialists like Fourier, who elaborates a fanciful system of successive lines mutually connected by numerical relation. It reaches from the Eleusinian mysteries down to the religions of many rude tribes of North Amereca and the Pacific isles. Not a few noble dreams of the cultivated imagination are subtly associate with it, as in Plato, Giorda Primo, Herder, Sir Thomas 1 wne, and specially notable is L sing's conception of gradual in provement of the human tyk

বলা বাহুল্য যে, এ প্রমাণও অনেক লোকের অপ্রতীতিকর হইবে না। যাহা জনসাধারণের বিশ্বাস, তাহাও সকল সময়ে সত্য হয় না। ইহা প্রসিদ্ধ। যথা, পৃথিবী সূর্য্যাদির সংবর্ত্তনকেন্দ্র।

৩। যত দিন না আত্মা বহুজন্মার্জ্জিত জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা বিধূতপাপ হয়, তত দিন ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয় না। এক জন্মে সকলে তদুপযোগী চিত্তশুদ্ধি লাভ করে না। এ কথাটা আমাদের দেশী, কিন্তু গ্রীক দার্শনিকেরাও এই যুক্তির দ্বারা জন্মান্তরবাদের সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহারা তাহা সবিস্তারে পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা phoedon নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সক্রেতিসের উক্তি অধ্যয়ন করিবেন। বৈজ্ঞানিক বলিবেন, এ কথারও প্রমাণাভাব।

৪। অনেকের বিশ্বাস যে, যোগসিদ্ধ পুরুষেরা আপনাদিগের পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারেন। কিন্তু কোন সিদ্ধ পুরুষের যে এরূপ পূর্ব্বজন্মস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসজনক কিছু প্রমাণ নাই। পুরাণেতিহাসের সকল কথা যে বিশ্বাসযোগ্য নহে, ইহা বলা বাহুল্য।* আর যদি কোন সিদ্ধ পুরুষ যথার্থই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার পূর্ব্বজন্মস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইলেও প্রমাণ সম্পূর্ণ হইল না। কেন না, দুইটি সন্দেহের কারণ বিদ্যমান থাকে, (১) তিনি সত্য কথা বলিতেছেন কি না, (২) যদিও ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা না বলুন, তাঁহার সেই বিস্মৃতি কোন পীড়াজনিত মস্তিষ্কের বিক্রিয়া মাত্র কি না?

৫। যোগীদিগের পূর্ব্বজন্ম-স্মৃতিতে বিশ্বাসবান্ না হইলেও আর এক প্রকার পূর্ব্বজন্মস্মৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অনেকেরই এমন ঘটে যে, কোন নূতন স্থানে আসিলে মনে হয় যে, পূর্ব্বে যেন কখনও এ স্থানে আসিয়াছি—কোন একটা নূতন ঘটনা হইলে মনে হয়, যেন এ ঘটনা পূর্ব্বে কখন ঘটিয়াছিল। অথচ ইহাও নিশ্চিত

---

through metamorphosis in a series of futrure lives." Oriental Religions Inidia. P. 517.

যিনি এ সকল কথার বিস্তারিত প্রথম সংগ্রহ দেখিতে চান তিনি টেলর প্রণীত "Primitive culture" নামক গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায় অধ্যয়ন করিবেন।

* কিন্তু ইহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ভিন্ন দেশীয় লেখকেও এরূপ পূর্ব্বজন্মস্মৃতির কথা বলেন।

"Pythagoras is made to illustrate in his own person his doctrine of metempsychosis, by recognizing where it hung in Here's temple the shield he had carried in a former birth, when he was that Euphorbas whom Mentelaus slew the seige of Troy. Afterwards he was Hermotunos, the Klazomenian prophet, whose funeral rites were so prematurely celebrated while his soul was out, and after that, as Lucian tells the story, his prophetic soul entered the body of a cock. Milkyllos asks the cock to tell him of the siege of Tory—were things there really as Homar has said? But the cock replies ;—"How should Homer have known, O Milkyllos, when the Trojan war was going on, he was a camel in Bactria."—Tylor's Primitive Culture, Vol II. P. 13.

বলা বাহুল্য, ইহা সব খোস গল্প মাত্র।

স্মরণ হয় যে, এ জন্মে কখন সে স্থানে আসি নাই বা সে ঘটনা ঘটে নাই। অনেকে এমন স্থলে বিবেচনা করেন যে, পূর্ব্বজন্মে সেই স্থলে গিয়াছিলাম, অথবা সেই ঘটনা ঘটিয়াছিল—নহিলে এরূপ স্মৃতি কোথা হইতে উদয় হয়।

এরূপ স্মৃতির উদয় যে হইয়া থাকে, তাহা সত্য। অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি সত্য। অনেক পাঠকই বলিতে পারিবেন যে,তাঁহাদের মনে কখন না কখন এমন স্মৃতির উদয় হইয়াছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রও ইহার সত্যতা স্বীকার করে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে,এ সকল "Fallacies of Memory" অথবা মস্তিষ্কের Double action. কিরূপে এরূপ স্মৃতির উদয় হয়,তাহা কার্পেণ্টর সাহেবের Mental physiology নামক গ্রন্থ হইতে দুইটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইব।

"Several years ago the Rev, S, Hansard, now Rector of Bethna Green, was doing clerical duty for a time at Hurstmonceaux in Susee and while there, he one day went over with a party of friends to Pevensey Castle, which he did not remember to have previously visited. As he approached the gateway he became conscious of very vivice impression of having seen it before and he "seemed to himself to see" not only the gateway itself but donkeys beneath the arch and people on the top of it. His convictio that he must have visited the castle on some former occasion although he had neither the slightest remembrance of such a visit, nor any knowledge of having ever been in the neighbourhood previously to his residence at Hnrstmonceaux—made him enquire from his mother if she could throw any light on the matter. She at once informed him that being in that part of the country when he was about eighteen months old, she had gone over with a large party and had taken him in the pannier cf a donkey, that the elders of the party having brought lunch with them, had eaten it on the roof of the gateway, where they would have been seenfrom below, whilst he had been left with the attendant and donkeys.—This case is remarkable for the vividness of the sensorial impression (it may be worth mentioning that Mr, Hansard has a decidedly artistic temperament) and for the reproduction of details which were not likely to have been brought up in convesation, even if he had happened to hear the visit itself metioned as an event of his childhood, and of such mention he has no remembrance whatever."

যদি এই ব্যক্তির মা না বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে এ স্মৃতি কোথা হইতে আসিল, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা হইত না। পূর্ব্বজন্মবাদিগণ ইহা পূর্ব্বজন্মস্মৃতি বলিয়া ধরিতেন,

সন্দেহ নাই। এইরূপ অনেক স্মৃতি আছে, যাহার আমরা কোন কারণ দেখি না, অনুসন্ধান করিলে ইহজন্মেই তাহার কারণ পাওয়া যায়। এইরূপ সকল অনুসন্ধানের আর একটি উদাহরণ কার্পেন্টর সাহেবের ঐ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"In a Roman Catholic town in Germany a young woman who could neither read nor write, was seized with a fever and was said by the priests, to be possessed of a devil, because she was heard talking Latin, Greek and Hebrew. Whole sheets of her ravings were written out and found to consist of sentences intelligible in themselves, but having slight connection with each other. Of her Hebrew saying only a few could be traced to the Bible and most seemed to be in Rabbinical dialect. All trick was out of the question, the woman was a simple creature; there was no doubt as to the fever. It was long before any explnanation, save that of demoniacal possession, could be odtaine.p At last the mystery it was unveiled by a physician who determined to trace back the girl's history and who after much trouble discoverd that at the age of nine she had been charitably taken by an old Protestant pastor great Hebrew scholar, in whose house she lived till his death. On further inquiry it appeard to have been the old man's custom for years to walk up and down a passage in his house into which the kitchen opened, and to read to himself with a loud voice out of his books. The books were ransacked and among them were found several of the Greek and Latin Fathers together wrth a collection of Rabbinical writings. In these works so many of the passages taken down at the young woman's bedside were indentified that there could be no reasonable doubt as to their source."

এ দেশে হইলে ইহার আর কোন অনুসন্ধান হইত না, গ্রীক, লাটিন ও হিব্রু এই স্ত্রীলোকের "পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যার" মধ্যে গণিত ও স্থিরীকৃত হইত।

পক্ষান্তরে, ইহাও বলিতে পারা যায় না যে, এরূপ সকল স্মৃতিই অনুসন্ধান করিলে এই বর্ত্তমান জীবনমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। বেশী অনুসন্ধান না হইলে এ কথা স্থির করিয়া বলা যায় না। তেমন বেশী অনুসন্ধান আজিও হয় নাই। যত দিন না হয়, তত দিন এ প্রমাণ কতদূর গ্রাহ্য, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

অনুসন্ধানের ফল যাহা হউক, আর একটা তর্ক উঠিতে পারে। স্মৃতি মস্তিষ্কের ক্রিয়া, না আত্মার ক্রিয়া? যদি বল আত্মার ক্রিয়া, তবে পূর্ব্বজন্মের সবিশেষ স্মৃতি আমাদের মনে উদয় হয় না কেন? কেবল এক আধটুকু অস্পষ্ট স্মৃতি কখন কদাচিৎ মনে আসার কথা বল কেন? আত্মা ত সেই আছে,

তবে তাহার স্মৃতি কোথায় গেল? আর যদি বল, স্মৃতি মস্তিষ্কের ক্রিয়া, তবে এই এক আধটুকু অস্পষ্ট স্মৃতিই বা উদিত হইতে পারে কি প্রকারে? কেন না, যে মস্তিষ্কে পূর্ব্ব-জন্মের স্মৃতি ছিল, সে মস্তিষ্ক ত দেহের সঙ্গে ধ্বংস পাইয়াছে—আর নাই।

এ আপত্তির সুমীমাংসা করা যায়। কিন্তু প্রয়োজন নাই। কেন না, এই সকল স্মৃতি যে পূর্ব্বজন্মস্মৃতি, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে না।

শেষ কথা এই যে, যাঁহারা জীবাত্মার নিত্যতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের জন্মান্তর-স্বীকার ভিন্ন গতি নাই। আত্মা যদি নিত্য হয়, তবে অবশ্য পূর্ব্বে ছিল। কোথায় ছিল? পরমাত্মায় লীন ছিল, এ কথা বলা যায় না। কেন না, পরমাত্মায় যাহা লীন, তাহা জীবাত্মা নহে, তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। আর যদি বল, লোকান্তরে ছিল, তাহা হইলে ইহলোকে তাহার জন্ম, জন্মান্তর বলিতেই হইবে। লোকান্তরে ছিল, যদি এমন না বল, তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে, ইহলোকেই দেহান্তরে ছিল।

এমন কেহ থাকিতে পারেন যে, আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করিবেন, কিন্তু নিত্যতা স্বীকার করিবেন না। অর্থাৎ, বলিবেন যে, দেহের সহিত আত্মার জন্ম হয়, জন্ম হইলে আর ধ্বংস নাই, কিন্তু জন্মের পূর্ব্বে যে আত্মা ছিল, এমন না হইতে পারে। যাঁহারা এমন বলেন, তাঁহারা প্রত্যেক জীবজন্মে একটি নূতন সৃষ্টির কল্পনা করেন। এরূপ কল্পনা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। কেন না, বিজ্ঞান-শাস্ত্রের মূল সূত্র এই যে, জাগতিক নিয়ম সকল নিত্য, তাহার কখন বিপর্য্যয় ঘটে না। এখন জাগতিক নিয়মের মধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রমাণীকৃত একটি নিয়ম এই যে, জগতে কিছু নূতন সৃষ্টি নাই। জগতে কিছু নূতন সৃষ্টি হয় না,—নিত্য নিয়মাবলীর প্রভাবে বস্তুর রূপান্তর হয় মাত্র। * এই যে জীব-শরীর, ইহা জন্মিলে বা গর্ভে সঞ্চারিত হইলে কোন নূতন সৃষ্টি হইল, এমত কথা বলা যায় না; পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান জড়পদার্থ-সমূহের নূতন সমবায় হইল মাত্র। অন্য বস্তুর রূপান্তর হইল মাত্র। আত্মা যাহার শরীরের সহিত জন্মগ্রহণ করিল, তাহা কিছুরই রূপান্তর বলা যায় না। কেন না, আত্মা জড়পদার্থ নহে, সুতরাং জড়ের বিকার নহে। পূর্ব্বজাত আত্মা সকলও অবিনাশী, সুতরাং তাহারও রূপান্তর নহে। কাজেই নূতন সৃষ্টি বলিতে হইবে। কিন্তু নূতন সৃষ্টি জাগতিক নিয়ম-বিরুদ্ধ। অতএব আত্মাকে অবিনাশী বলিলে নিত্য ও অনাদি কাজেই বলিতে হয়। নিত্য ও অনাদি বলিলে জন্মান্তর কাজেই স্বীকার করিতে হয়।

আর যাঁহারা আত্মার স্বাতন্ত্র্য বা অবিনাশিতা স্বীকার করেন না, তাঁহারা অবশ্য জন্মান্তরও স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদিগের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, জন্মান্তরবাদ অপ্রামাণ্য হইলেও ইহা তাঁহাদিগের কাছে অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। তাঁহাদিগেরই সম্প্রদায়ভুক্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কি বলেন, শুনা যাউক। †

বৌদ্ধতত্ত্ববেত্তা Rhys Davids লেখেন, —"The doctrine of Transmigra.

---

* নাবস্তুনাবস্তু-সিদ্ধিঃ Exnihilo nihil fit.

† অনেকগুলি আধুনিক ইউরোপীয় লেখক জন্মান্তরবাদ সমর্থন করিয়াছেন। Herder ও Lessing তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তদ্ভিন্ন Fourier, Soame, Jenyns, Figuier, Dupont de Nemours, Pezzani প্রভৃতি অনেক ইতর লেখকের নাম করা যাইতে পারে।

tion in either the Brahmanical or the Bnddhist form, is not capable of disproof; wnile it affords an explanation, quite complete to those who can believe in it, of the apparent anomalis and wrongs in the distribution of happiness cr woe. * The explanation can always be exact, for it is scarcely more than a repetition of the facts to be explained; it mayal ways fit the facts, for it is derived from them; and it cannot be disproved, † for it lies in a sphere beyond the reach of human enquiry."

টেলর সাহেব লিখিতেছেন—

"The Bnddhist Theory of "Karma," or "Action," whih controls the destiny of all scntient beings, not by judicial rewards and punishment, but by the inexhorable result of couse into effect, where the present is ever determined by the past in an unbroken line of causatison is indeed one of the world's most remarkable developments of ethical speculation." Primitve Culture—Vol II.P. 12.

কথাটার ভিতর একটু নিগূঢ়ার্থ আছে। খৃষ্টানেরা জন্মান্তর বিশ্বাস করেন না; তাঁহারা বলেন, স্বর্গে বসিয়া ঈশ্বর পাপ-পুণ্যের বিচার করিয়া দোষীর দণ্ড ও পুণ্যাত্মার পুরস্কার বিহিত করেন। টেলর সাহেবের এ কথাটার তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর যে হাকিমের মত বেঞ্চে বসিয়া ডিক্রী-ডিসমিস করেন, তাহার অপেক্ষা এই কার্য্যকারণ-সম্বন্ধে নিবদ্ধ জীবাদৃষ্ট অধিকতর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বটে। কথাটা একটু ভাল করিয়া বুঝা উচিত। জগতের শাসনপ্রণালী এই যে, কতকগুলি জাগতিক নিয়ম আছে। তাহা নিত্য, কখন বিপর্য্যস্ত হয় না। সেইগুলির প্রভাবে সমস্ত জাগতিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়, জগদীশ্বরকে কখনও হস্তক্ষেপ করিয়া নিজে কোন কাজ করিতে হয় না, ইহাও সত্য, সকল কাজ তিনি নিজেই করেন; কিন্তু সে নিয়মের আড়ালে থাকিয়া। কিন্তু যদি বলি যে, তিনি বিচারকার্য্যে ব্রতী হইয়া জীবের মৃত্যুর পর, তাহার অদৃষ্ট-সম্বন্ধে ডিক্রী-ডিসমিস করিয়া কাহাকে স্বর্গে বা কাহাকে নরকে পাঠাইতেছেন, তবে যাহা জগতের বিরুদ্ধ, তাহা কল্পনা করা হইল। এখানে নিয়মের দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে না, স্বয়ং জগদীশ্বরকে কার্য্য করিতে হইতেছে। প্রত্যেক জীবের দণ্ড-পুরস্কার-বিধান, এক একটি ঈশ্বরের অনিয়মসিদ্ধ কার্য্য—অর্থাৎ Miracle, কিন্তু জন্মান্তরবাদে এ আপত্তি ঘটে না। ঈশ্বরের নিয়ম এই যে, এইরূপ পাপাচারী এইরূপ যোনি প্রাপ্ত হইবে। কর্ম্ম

---

*Buddhisim—P. 100.

† যদি বল, প্রেততত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিতেছেন যে, দেহভ্রষ্ট মনুষ্যাত্মা কখন কখন মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে, তাহাতেও জন্মান্তরবাদের নিরাস হয় না। জন্মান্তরবাদীরা এমন বলেন না যে, সকল সময়েই মৃত্যু হইবামাত্র আত্মা দেহান্তরে প্রবেশ করে। যদি এমন হয় যে, কখন কখন দেহান্তরপ্রাপণ পক্ষে কালবিলম্ব ঘটে. তাহা হইলে জন্মান্তর অপ্রমাণিত হইল না।

কারণ, যোনিবিশেষ তাহার কার্য্য। এইরূপ কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-নিবদ্ধ কর্ম্মফলের দ্বারাই জন্মান্তর সম্পাদিত হয়—"Miracle" প্রয়োজন হয় না।

শ্লেগেল বড় গোঁড়া খৃষ্টিয়ান, কিন্তু তিনি ইউরোপের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও পণ্ডিত। তিনি এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার ইংরেজি অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি।

"In this doctrine, there was a noble element of truth—the feeling that man since he has gone astray, and wandered so far from his God, must needs exort many efforts, and undergo a long and painful pilgrimage before he can regain the source of all perfection ;—the firm conviction and positive certainty that nothing defective, impure, or defiled with earthy stains can enter the pure region of perfect spirits, or be eternally united to God.; and that thus before it can attain to this blissful end, the immortal soul must pass throngh long trials and many purifications. It may now well be conceived, (and indeed the experience of this life would prove it) that suffering, which deeply pierces the soul, anguish that convulses all the members of existence, may contribute, or may even be necessary, to the deliverance of the soul from all alloy, and pollution, or to borrow a comparison from natural objects, the generous metal is melted down in fire and purged from its dross. It is certainly true that the greater the degeneracy and the degradation of man, the nearer is his approximation to the brute ; and when the transmigration of the immortal soul through the bobies of various animals is merely considered as the punishment of its former transgressions, we can very well understand the opinion which supposes that man who by his crimes and the abuse of his reason, had descended to the level of the brute should at last be transformed into the brute itself."

পরিশেষে আমেরিকা-নিবাসী সামুয়েল জন্‌সন সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাঁর মত বিজ্ঞ লেখক দুর্ল্লভ।

"The Transmigration faith was so widely spread In the elder world, because it had its roots in natural and profound aspirations. It combined the two-fold intuition of immortality and moral sequence with that mystic sense of the unity of being which is a germ of the highest religious truth." †

* Philasophy of History—translated by Robertson—Bohn's Edition—p. 157-8

† Oriental Religions, India p. 539.

একণে যাহা বলা হইল, তাহার স্থূল মর্ম্ম বলিতেছি।

১। জন্মান্তরবাদ অপ্রমাণ করা যায় না।

২। ইহার পক্ষে কোন রকম কিছু প্রমাণও আছে।

৩। যাঁহারা আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের নিকট ইহার প্রামাণ্যতা অখণ্ডনীয়।

৪। যাঁহারা আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করেন না, এই তত্ত্ব তাঁহাদিগের নিকটও অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না,কেন না, জাগতিক নিত্য নিয়মাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত পরলোকবাদ আর কিছুই প্রচলিত নাই।

যিনি ভক্ত, তাঁহার পক্ষে এ সকল বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। যদি এই শ্লোকটিতে ঈশ্বরোক্তির মর্ম্ম থাকে, তবে তাহাই যথেষ্ট কারণ। তাহার বিচার্য্য বিষয় এই যে, জন্মান্তরবাদ যাহা গীতায় আছে, তাহা যথার্থ ঈশ্বরোক্তি,না গ্রন্থকারের বিশ্বাসমাত্র—তিনি আপনার বিশ্বাস ঈশ্বরবাক্যমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন?

যদি কাহারও এমন সংশয় উপস্থিত হয় যে, ইহা ভগবদুক্তি কি না এবং উপরে যে সকল প্রমাণের উপরে সমালোচনা করা গেল, তাহাতে যদি জন্মান্তরে বিশ্বাসবান্ না হয়েন, তবে তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, জন্মান্তরে বিশ্বাস না করিলেও এই গীতোক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করা যায় কি না?

ইহার উত্তর বড় সোজা। এই গীতোক্ত ধর্ম্ম সমস্ত মনুষ্যের জন্য। জন্মান্তরে যে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ;যে না করে, তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করে,তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; যে ঈশ্বরে বিশ্বাস নাও করে, তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; কেন না, চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সংযম অনীশ্বরবাদীর পক্ষেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ;সেই চিত্তশুদ্ধি এই গীতার উদ্দেশ্য। এরূপ বিশ্বলৌকিক ও সর্ব্বব্যাপক ধর্ম্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই। যাঁহার যতটুকুতে অধিকার, তিনি ততটুকু গ্রহণ করিবেন। যেখানে যাহার বিশ্বাস নাই, সেখানে সে অনধিকারী। যাঁহার যাহাতে অধিকার, তিনি তাহা ইহাতে পাইবেন।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ-সুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাংস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥

হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়গণ এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে তৎসংযোগ,* ইহাই শীতোষ্ণাদি সুখ-দুঃখ-জনক। সে সকলের উৎপত্তি ও অপায় আছে, অতএব হে ভারত! সে সকল সহ্য কর। ১৪।

একাদশ শ্লোকে বলা হইল যে,যাহার জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহার জন্য তুমি শোক করিতেছ। দ্বাদশ শ্লোকে এরূপ অনুযোগ করিবার কারণ নির্দ্দেশ করা হইল। সে কারণ এই যে,কেহই ত মরিবে না, কেন না, আত্মা অবিনাশী। তুমি কাটিয়া পাড়িলেও সে থাকিবে। কেন না, তাহার আত্মা থাকিবে। একাদশ শ্লোক পাঠে জানা যায় যে, যখন গীতা প্রণীত হয়, তখন জন্মান্তর জনসমাজে গৃহীত। একাদশ শ্লোকে অর্জ্জুনের আপত্তি আশঙ্কা করিয়া ভগবান্ তাহারই খণ্ডন করিতেছেন। অর্জ্জুন বলিতে পারেন, আত্মা না হয় রহিল, কিন্তু যখন দেহ গেল, তখন আমার আত্মীয় ব্যক্তি যাহার জন্য শোক করিতেছি, সে আর রহিল কৈ? দেহান্তর প্রাপ্ত হইলে সে ত ভিন্ন ব্যক্তি হইল। এই

---

*মাত্রাশ্চ স্পর্শাশ্চ ইতি শঙ্করঃ।

আপত্তির আশঙ্কা করিয়া ভগবান্ ত্রয়োদশ শ্লোকে বলিতেছেন যে, এরূপ ভেদ-কল্পনা অনুচিত, কেন না, যেমন কৌমার, যৌবন, জরা এক ব্যক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র, তেমনি দেহান্তরপ্রাপ্তিও অবস্থান্তর মাত্র। ইহাতেও অর্জ্জুন আপত্তি করিতে পারেন যে. না হয় স্বীকার করা গেল যে, দেহান্তরেও দেহীর একতা থাকে—কিন্তু মৃত্যুর একটা দুঃখ-কষ্ট ত আছেই? এই স্বজনগণ সেই কষ্ট পাইবে —তাহা শ্রবণ করিয়া শোক করিব না কেন? তাহাদের বিরহে কাতর হইব না কেন?

তাহার উত্তরে ভগবান্ এই চতুর্দ্দশ শ্লোকে বলিতেছেন যে, যে সকলকে তুমি এই দুঃখ বলিতেছ, তাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-জনিত। যতক্ষণ সেই সংযোগ থাকে, ততক্ষণ সে দুঃখ থাকে,সংযোগের অভাবে আর সে দুঃখ থাকে না। যেমন যতক্ষণ ত্বকের সঙ্গে রৌদ্রাদি উত্তাপের বা হিমের শৈত্যের সংযোগ হয়, ততক্ষণ উষ্ণ বা শীতস্বরূপ যে দুঃখ, তাহা অনুভূত করি, রৌদ্রাদির অভাব হইলে তাহা থাকে না। যাহা থাকিবে না,অনিত্য, তাহা সহ্য করাই উচিত। যে দুঃখ সহ্য করিলেই ফুরাইবে, তাহার জন্য কষ্ট বিবেচনা করিব কেন?

এই সহিষ্ণুতা বা ধৈর্য্যগুণ থাকিলেই জীবন মধুর হয়। অভ্যাস করিলে অভ্যাসগুণে আর কোন দুঃখকেই দুঃখ বোধ হয় না। তার পর এই গীতোক্ত সর্ব্বানন্দময়ী ভক্তিতে মনুষ্যের জীবন অপরিসীম সুখে আপ্লুত হয়, দুঃখমাত্র থাকে না। জীবনকে সুখময় করিবার জন্য গোড়াতে এই দুঃখসহিষ্ণুতা আছে —তাহা ব্যতীত কিছু হইবে না। ইন্দ্রিয়গণের সহিত বহির্ব্বিষয়ের সংযোগজনিত যে সুখ—ভোগবিলাসাদি, তাহাও দুঃখের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে, কেন না, তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিলে তাহার অভাবও দুঃখ বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য "শীতোষ্ণ সুখদুঃখ" একত্র গণনা করা হইয়াছে। *

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫॥

হে পুরুষর্ষভ! সুখদুঃখে সমভাব যে ধীর পুরুষ এ সকলে ব্যথিত হন না, তিনিই মোক্ষলাভে সমর্থ হন। ১৫।

সুখ-দুঃখ সহ্য করিতে পারিলে মোক্ষ-

---

* এখানে মূলে যে মাত্রা শব্দ আছে, ও মাত্রাস্পর্শ পদ আছে; তাহার দুই প্রকার অর্থ করা যায়। উহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বুঝাইতে পারে এবং ইন্দ্রিয়গণের বিষয়কেও বুঝাইতে পারে। শঙ্করাচার্য্য বলেন, "মাত্রা আভির্মীয়ন্তে শব্দাদয় ইতি শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি মাত্রাণাং স্পর্শাঃ শব্দাদিভিঃ সংযোগাঃ।" শ্রীধরস্বামীও ঐরূপ বলেন, যথা—"মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়স্তাসাং স্পর্শা বিষয়ৈঃ সহ সম্বন্ধাঃ (মাত্রাস্পর্শাঃ)।" মধুসূদন সরস্বতীও ঠিক তাই বলেন। পক্ষান্তরে, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন,"মাত্রা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়াঃ।" তাতেও বড় আসিয়া যাইত না, কিন্তু একজন ইংরেজ অনুবাদক Davis স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, এই মাত্রা শব্দ লাটিন ভাষায় Mateiia ও ইংরাজিতে Matter; সুতরাং তিনি "মাত্রাস্পর্শাঃ' পদের অনুবাদে matter contrcls লিখিয়াছেন। পরিমাণজ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়বিষয়েরও যে আবশ্যকতা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাংখ্য দর্শনের তন্মাত্রা শব্দের তাৎপর্য্য বিচার করা কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য যে, আমি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও ডেভিস সাহেবকে পরিত্যাগ করিয়া শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধরস্বামীর অনুসরণ করিয়াছি।

লাভের উপযোগী হয় কেন? দুঃখ হইতে মুক্তিই, মুক্তি বা মোক্ষ। সংসার দুঃখময়। যাঁহারা বলেন, সংসারে দুঃখের অপেক্ষা সুখ বেশী, তাঁহাদেরও স্বীকার করিতে হইবে, সংসারে দুঃখ আছে। এজন্য জন্মান্তরও দুঃখ, কেন না, পুনর্ব্বার সংসারে আসিয়া আবার দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। অতএব পুনর্জ্জন্ম হইতে মুক্তিলাভও মুক্তি বা মোক্ষ। স্থূলতঃ দুঃখভোগ হইতে মুক্তিলাভই মোক্ষ। এই জন্য সাংখ্যকার প্রথম সূত্রে বলিয়াছেন, "ত্রিবিধ-দুঃখস্যাত্যন্ত-নিবৃত্তিরত্যন্ত-পুরুষার্থঃ।" এখন, দুঃখ সহ্য করিতে শিখিলেই দুঃখ হইতে মুক্তি হইল। কেন না, যে দুঃখ সহ্য করিতে শিখিয়াছে, সে দুঃখকে আর দুঃখ মনে করে না। তাহার আর দুঃখ নাই বলিয়া তাহার মোক্ষলাভ হইয়াছে। অতএব মোক্ষের জন্য মরিবার প্রয়োজন নাই। দুঃখ সহ্য করিতে পারিলে অর্থাৎ দুঃখে দুঃখিত না হইলে, ইহ-জীবনেই মোক্ষলাভ হইল।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥১৬॥

অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নাই, সদ্বস্তুর অভাব হয় না। তত্ত্বদর্শিগণ এইরূপ উভয়ের অন্তদর্শন করিয়াছেন।১৬।

অস্ ধাতু হইতে সৎ শব্দ হইয়াছে। যাহা থাকিবে, তাহাই সৎ, যাহা নাই বা থাকিবে না, তাহাই অসৎ। আত্মাই সৎ। শীতোষ্ণাদি সুখ-দুঃখ অসৎ; নিত্য আত্মায় এই অনিত্য শীতোষ্ণাদি সুখ-দুঃখাদি স্থায়ী হইতে পারে না। কেন না, সৎ যে আত্মা, অসৎ শীতোষ্ণাদি তাহার ধর্ম্মবিরোধী; শ্রীধরস্বামী এইরূপ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, "অসতোঽনাত্মধর্ম্মত্বাৎ অবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ন ভাবঃ।" আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি।

শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া সদসদ্বুদ্ধি যে প্রকারে বুঝাইয়াছেন, তাহাও পাঠকদিগের বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইতে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা এই সকল বিষয় কোন্ দিক্ হইতে দেখিতেন, এবং আমরা এখন কোন্ দিক্ হইতে দেখি, তাহার প্রভেদ বুঝিতে পারিবেন। এই শ্লোকের শঙ্করপ্রণীত ভাষ্য অতিশয় দুরূহ। নিম্নে তাহার একটি অনুবাদ দেওয়া গেল।

"কারণ হইতে উৎপন্ন, অতএব অসৎ-স্বরূপ শীত উষ্ণ প্রভৃতি কার্য্যের অস্তিত্ব নাই। শীত উষ্ণাদি যে কারণ হইতে উৎপন্ন, তাহা প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হয়, সুতরাং উহারা সৎপদার্থ হইতে পারে না। কারণ, উহারা বিকার মাত্র, এবং বিকারেরও সর্ব্বদা ব্যভিচার দৃষ্ট হয় (অর্থাৎ কখন বিকার থাকে, কখন থাকে না।) যেমন চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইলেও ঘটাদি পদার্থ মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছু * বলিয়া উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ কারণ ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া উপলব্ধি না হওয়ায় সর্ব্বপ্রকার বিকার-পদার্থই অসৎ। উৎপত্তির পূর্ব্বে এবং ধ্বংসের পরে, মৃত্তিকাদি কারণ হইতে উৎপন্ন-ঘটাদি কার্য্যের উপলব্ধি হয় না। এই সকল কারণও আবার তাহাদের কারণ হইতে ভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি হয় না, সুতরাং তাহারও অসৎ। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, কারণসমূহ এইরূপে অসৎ হইলে সকল পদার্থই অসৎ হইয়া পড়ে, (সৎ আর কিছুই

---

* অর্থাৎ ঘটের জ্ঞান জন্মিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্তিকার জ্ঞান জন্মায়। মৃত্তিকার জ্ঞান না জন্মাইলে ঘটের জ্ঞান জন্মায় না, সুতরাং ঘট অসৎ, উহার কারণ মৃত্তিকা সৎ।

থাকে না।) এরূপ আপত্তির খণ্ডন এই যে, সকল স্থলেই দুই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সৎ বলিয়া জ্ঞান ও অসৎ বলিয়া জ্ঞান। যে বস্তুর জ্ঞানের ব্যভিচার নাই অর্থাৎ যে বস্তু একবার আছে বলিয়া বোধ হইলে আর "নাই" বলিয়া বোধ হয় না, তাহার নাম সৎ। আর যে বস্তু একবার আছে বলিয়া বোধ হইলে পরে আবার নাই বলিয়া বোধ হয়, তাহার নাম অসৎ। এইরূপে বুদ্ধিতন্ত্র সৎ ও অসৎ দুই ভাগে বিভক্ত, এবং সকলেই সর্ব্বত্র এই দুই প্রকার জ্ঞান হইতেছে বলিয়া উপলব্ধি করেন। বিশেষণ ও বিশেষ্য পদ এক বিভক্তিতে বর্ত্তমান থাকিলে তাহাদের অভেদ হয়, যেমন "নীলং উৎপলং" ইহার অর্থ উৎপল নীল হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ ঐ উৎপলের জ্ঞান হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অভিন্নভাবে নীলত্বেরও জ্ঞান হইবে। এইরূপ যখন "ঘটঃ সন্ পটঃ সন্ হস্তী সন্" ইত্যাদি জ্ঞান হয়, তখন ঘটজ্ঞানের সহিত "সৎ" এই জ্ঞান অভিন্নভাবে উৎপন্ন হয়। সুতরাং সৎ ও অসৎ ভেদ-বুদ্ধির যে কল্পনা করা হইতেছিল, তাহা নিরর্থক হয়। কিন্তু লোকে এরূপ অভিন্নভাবে উপলব্ধি করে না। এই বুদ্ধিদ্বয়ের (সৎ ও অসৎ) মধ্যে ঘটাদি বুদ্ধির ব্যভিচার হয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে; সৎ বুদ্ধির ব্যভিচার হয় না। অতএব ব্যভিচার হয় বলিয়া যে পদার্থ ঘটাদি বুদ্ধির বিষয়, তাহা অসৎ, এবং ব্যভিচার হয় না বলিয়া উহা সৎ-বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না।

যদি বল, ঘট বিনষ্ট হইলে যখন ঘটবুদ্ধির ব্যভিচার হয়, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে সৎবুদ্ধিরও ব্যভিচার হউক (অর্থাৎ আপত্তিকারীর মতে ঘটবুদ্ধি ও সৎবুদ্ধি অভিন্ন, সুতরাং ঘটবুদ্ধির ব্যভিচার হইলে সৎবুদ্ধিরও ব্যভিচার হউক)। এই আপত্তি ঘটিতে পারে না, কারণ, তৎকালে সেই সৎবুদ্ধি ঘটাদিতে বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং উহার উপর ব্যভিচার হয় না। সে সৎ বুদ্ধি বিশেষণভাবে অবস্থিত সুতরাং (বিশেষ্য নাশে) বিনষ্ট হয় না।

যদি বল, সৎবুদ্ধি স্থলে যেরূপ যুক্তি অনুসারে একটি ঘট বিনষ্ট হইলেও অন্য ঘটে ত ঘটবুদ্ধি থাকে, "সুতরাং ঘটবুদ্ধি সৎ হউক," এ আপত্তি ইহাতে খাটিতে পারে না; যেহেতু, সে ঘটবুদ্ধি পটাদিতে থাকে না।

যদি বল, সৎবুদ্ধিও ঘট নষ্ট হইলে দৃষ্ট হয় না। এ কথা গুরুতর নহে। সৎবুদ্ধি বিশেষণভাবে অবস্থিত, বিশেষ্যের অভাব হইলে বিশেষণ থাকিতে পারে না। থাকিলে তাহার কি হইবে? বিষয়ের অভাব হইলে সৎবুদ্ধি থাকে না। যদি বল, ঘটাদি বিশেষ্যের অভাব হইলেও বিশেষণ বিশেষ্যভাবে এক বিভক্তিতে উল্লেখ করা যায় বলিয়া ঘট সৎ হইবে, তাহার উত্তর এই যে, মরীচিকা প্রভৃতি স্থলেও সৎবুদ্ধি এবং উদক উভয়ের অভাব হইলেও এক বিভক্তিতে 'সৎ ইদং উদকং' এরূপ ব্যবহার হয়, (ইহা দ্বারা এক বিভক্তিতে উল্লেখ হওয়া সৎ অথবা অসৎ এ উভয়ের কোন্ পক্ষেই প্রমাণ নহে)।

অতএব দেহাদি দ্বন্দ্ব কারণ হইতে উৎপন্ন ও অসৎ, উহার অস্তিত্ব নাই; এবং সৎ যে আত্মা, তাঁহারও কোথাও অভাব নাই, যেহেতু, তাঁহার কোথাও ব্যভিচার হয় না। ইহাই সৎ এবং অসৎরূপ আত্মা এবং অনাত্মার স্বরূপনির্ণয়। যে সৎ, সে সৎই, যে অসৎ, সে অসৎই। *

শঙ্করাচার্য্য যেমন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, এই দার্শনিক বিচারও তাহার উপযুক্ত। তবে উন-

---

* শাঙ্কর ভাষ্যের এই অনুবাদ আমরা কোন বন্ধুর নিকট উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে ইহা বড় মিশিবে না। সুখ-দুঃখকে সৎই বল,আর অসৎই বল, সুখ-দুঃখ আছে। থাকিবে না সত্য, কিন্তু নাই, এ কথা বলিবার বিষয় নাই। কিন্তু থাকিবে না, এইটাই বড় কাজের কথা। তবে, সহ্য করিতে পারিলেই দুঃখ নষ্ট হইবে।

"———The darkest day,
Wait till to-morrow,
will have passed away.

এখন, ১৪।১৫।১৬, এই তিন শ্লোকে যাহা উক্ত হইল, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে, কয়েকটি আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি, দুঃখ সহ্য করিতে হইবে—নিবারণ করিতে হইবে না? অর্জ্জুনের দুঃখ, জ্ঞাতি-বন্ধু-বধ; যুদ্ধ না করিলেই সে দুঃখ-নিবারণ হইল; দুঃখনিবারণের সহজ উপায় আছে। এ স্থলে তাঁহাকে দুঃখ নিবারণ করিতে উপদেশ না দিয়া ভগবান্ দুঃখ সহ্য করিতে উপদেশ দিতেছেন, ইহা কিরূপ উপদেশ? রোগীর রোগের উপশমের জন্য ঔষধ ব্যবহার করিতে পরামর্শ না দিয়া তাহাকে রোগের দুঃখ সহ্য করিতে উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে কি এ উপদেশ তুল্য নহে?

না, তাহা নহে। দুঃখনিবারণের কোন নিষেধ নাই। তবে যেখানে দুঃখনিবারণ করিতে গেলে অধর্ম্ম হয়,সেখানে দুঃখনিবারণ না করিয়া সহ্য করিবে। যে যুদ্ধে অর্জ্জুন প্রবৃত্ত, তাহা ধর্ম্মযুদ্ধ। ধর্ম্মযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্মপরিত্যাগে অধর্ম্ম। অতএব এ স্থলে দুঃখ সহ্য না করিয়া নিবারণ করিলে অধর্ম্ম আছে। এজন্য এখানে সহ্য করিতে হইবে, নিবারণ করা হইবে না।

দ্বিতীয় আপত্তি এই, দুঃখ সহ্য করিবে—সুখ সহ্য করা কিরূপ? সুখ-দুঃখ সমান জ্ঞান করিব? তবে ভগবানের কি এই আজ্ঞা যে, পৃথিবীর কোন সুখে সুখ হইবে না? তবে আর aceticism কাহাকে বলে? সুখশূন্য ধর্ম্ম লইয়া কি হইবে?

ইহার উত্তর পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ইন্দ্রিয়ের অধীন যে সুখ, তাহা দুঃখের কারণ—তাহা দুঃখমধ্যে গণ্য। ইন্দ্রিয়াদির অনধীন যে সুখ, যথা—জ্ঞান, ভক্তি, প্রীতি, দয়াদিজনিত যে সুখ, তাহা গীতোক্ত ধর্ম্মানুসারে পরিত্যাজ্য নহে,বরং গীতোক্ত ধর্ম্মের সেই সুখই উদ্দেশ্য। আর ইন্দ্রিয়ের অধীন যে সুখ, তাহাও প্রকৃত পক্ষে পরিত্যাজ্য নহে। তৎপরিত্যাগও গীতোক্ত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে। তাহাতে অনাসক্তিই গীতোক্ত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, পরিত্যাগ উদ্দেশ্য নহে।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥২।৬৪॥

উক্ত চতুঃষষ্টিতম শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে আমরা এ বিষয়ে আরও কিছু বলিব।

আমরা দেখিয়াছি যে, দ্বাদশ শ্লোকে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রথম তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে, আত্মার অবিনাশিতা। ত্রয়োদশ শ্লোকে দ্বিতীয় তত্ত্ব জন্মান্তরবাদ। এই চতুর্দ্দশ,পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শ্লোকে তৃতীয় তত্ত্ব সূচিত হইতেছে—সুখ-দুঃখের অনাত্মধর্ম্মিতা ও অনিত্যত্ব। সাংখ্য-দর্শনের ব্যাখ্যার উপলক্ষে, আত্মার সঙ্গে সুখ-দুঃখের সম্বন্ধ পূর্ব্বে যেরূপ বুঝাইয়াছিলাম, তাহা বুঝাইতেছি।

"শরীরাদি-ব্যতিরিক্ত পুরুষ। কিন্তু দুঃখ ত শারীরাদিক; শরীরাদিতে যে দুঃখের কারণ নাই,—এমন দুঃখ নাই। যাহাকে মানসিক দুঃখ বলি—বাহ্য পদার্থই তাহার মূল। আমার বাক্যে তুমি অপমানিত হইলে, আমার বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ,তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার দুঃখ। অতএব প্রকৃতি ভিন্ন দুঃখ নাই. কিন্তু প্রকৃতি-ঘটিত

দুঃখ পুরুষে বর্ত্তে কেন? "অসোঙ্গহ্যয়ম্ পুরুষঃ।" পুরুষ একা, কাহারও সংসর্গবিশিষ্ট নহে। (১ম অধ্যায় ১৫শ সূত্র।) অবস্থাদি, সকল শরীরের আত্মার নহে। (ঐ ১৪ সূত্র) "ন বাহ্যান্তরয়োরুপরজ্যোপরঞ্জকভাবোঽপি দেশ-ব্যবধানাৎ শ্রুঘ্নস্থ-পাটলিপুত্রস্থয়োরিব।" বাহ্য এবং আন্তরিকের মধ্যে উপরজ্য এবং উপ-রঞ্জকভাব নাই, কেন না, তাহা পরস্পর সংলগ্ন নহে, দেশব্যবধানবিশিষ্ট, যেমন এক জন পাটলিপুত্র নগরে থাকে, আর এক জন শ্রুঘ্ন নগরে থাকে, ইহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান তদ্রূপ।

তবে পুরুষের দুঃখ কেন? প্রকৃতির সংযোগই দুঃখের কারণ। বাহ্যে আন্তরিকে দেশব্যবধান আছে বটে, কিন্তু কোন প্রকার সংযোগ নাই, এমত নহে। যেমন স্ফাটিক পাত্রের নিকট জবাকুসুম রাখিলে পাত্র পুষ্পের বর্ণ-বিশিষ্ট হয় বলিয়া, পুষ্প এবং পাত্রে এক প্রকার সংযোগ আছে বলা যায়, এ সেইরূপ সংযোগ। পুষ্প এবং পাত্রমধ্যে দেশব্যবধান থাকিলেও পাত্রের বর্ণ বিকৃত হইতে পারে; ইহাও সেইরূপ। এ সংযোগ নিত্য নহে দেখা যাইতেছে, সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে। সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই দুঃখের কারণ অপনীত হইল। অত-এব এই সংযোগের উচ্ছিত্তিই দুঃখনিবারণের উপায়; সুতরাং তাহাই পুরুষার্থ। "যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ" (৬ ৭।) *

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥১৭॥

যাহার দ্বারা এই সকলই ব্যাপ্ত, তাহাকে অবিনাশী জানিবে। এই অব্যয়ের বিনাশ করিতে পারে না।১৭।

"যাহার দ্বারা" অর্থাৎ পরমাত্মার। এই "সকলই" অর্থাৎ জগৎ। এই জগৎ পরমাত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত—শঙ্কর বলেন যেমন ঘটাদি আকাশের দ্বারা ব্যাপ্ত, সেইরূপ ব্যাপ্ত।

যাহা সর্ব্বব্যাপী, তাহার বিনাশ হইতে পারে না; কেন না, যত কাল কিছু থাকিবে, তত কাল সেই সর্ব্বব্যাপী সত্তাও থাকিবে, যত কাল কিছু থাকিবে, ততকাল সেই সর্ব্ব-ব্যাপী সত্তা সর্ব্বব্যাপীই থাকিবে। অতএব তাহা অব্যয়। আকাশ সর্ব্বব্যাপী, আকাশের বিনাশ বা ক্ষয় আমরা কল্পনা করিতে পারি না। আকাশ অবিনাশী এবং অব্যয়। যিনি সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং আকাশও যাঁহার দ্বারা ব্যপ্ত, তিনিও অবিনাশী ও অব্যয়। কাজেই কেহই ইহার বিনাশসাধন করিতে পারে না।

এক্ষণে, এই কথার দ্বারা আর একটি কথা সূচিত হইতেছে। সেই সকল কথা হিন্দুধর্ম্মের স্থূল কথা, এজন্য এখানে তাহার উত্থাপন করা উচিত।

প্রথমতঃ এই শ্লোকের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, ঈশ্বর নিরাকার, সাকার হইতে পারেন না। যাহা সাকার, তাহা সর্ব্বব্যাপী হইতে পারে না। সাকার ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য। আমরা জানি যে, ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য সাকার সর্ব্বব্যাপী কোন পদার্থ নাই। অতএব ঈশ্বর যদি সর্ব্বব্যাপী হয়েন, তবে তিনি সাকার নহেন।

ঈশ্বর সাকার নহেন, ইহাই গীতার মত। কেবল গীতার নহে, হিন্দুশাস্ত্রের এবং হিন্দু-ধর্ম্মের ইহাই সাধারণ মত। উপনিষৎ এবং দর্শনশাস্ত্রের এই মত। সে সকলে ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

* প্রবন্ধ পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

সত্য বটে, পুরাণেতিহাসে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি সাকার চৈতন্য কল্পিত হইয়া অনেক স্থলে ঈশ্বরস্বরূপ উপাসিত হইয়াছেন। যে কারণে এইরূপ ঈশ্বরের রূপকল্পনার প্রয়োজন বা উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধানের এ স্থলে প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই বক্তব্য যে, পুরাণেতিহাসে শিবাদি সাকার বলিয়া কথিত হইলেও, পুরাণ ও ইতিহাসকারেরা ঈশ্বরের সাকারতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন না, ঈশ্বর যে নিরাকার, তাহা কখনই ভুলেন না। পুরাণেতিহাসেও ঈশ্বর নিরাকার।

একটা উদাহরণ দিলেই আমার কথার তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। বিষ্ণুপুরাণের প্রহ্লাদ-চরিত্র ইহার উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। তথায় বিষ্ণুই ঈশ্বর। প্রহ্লাদ তাঁহাকে "নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ" বলিয়া স্তব করিতেছেন। অন্যস্থলে স্পষ্টতঃ সাকারতা স্বীকার করিতেছেন। যথা—

ব্রহ্মত্বে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ।
রুদ্ররূপায় কল্পান্তে নমস্তভ্যং ত্রিমূর্ত্তয়ে॥

এবং পরিশেষে পীতাম্বর হরি সশরীরে প্রহ্লাদকে দর্শন দিলেন। কিন্তু তথাপি এই প্রহ্লাদচরিত্রে বিষ্ণু নিরাকার; তাঁহার নাম "অনন্ত", তিনি "সর্ব্বব্যাপী।" যিনি অনন্ত এবং সর্ব্বব্যাপী, তিনি নিরাকার ভিন্ন সাকার হইতে পারেন না; এবং তিনি যে নির্গুণ ও নিরাকার, তাহা পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে। যথা—

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ পরাত্মনে।
নামরূপং ন যস্যৈকো যোঽস্তিত্বেনোপলভ্যতে॥
ইত্যাদি ১।১৯।৭৯

পুনশ্চ, বিষ্ণু "অনাধিমধ্যান্তঃ" সুতরাং নিরাকার।

এরূপ সকল পুরাণে ইতিহাসে। অতএব ঈশ্বর নিরাকার, ইহাই যে হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম, ইহা নিশ্চিত।

তবে কি হিন্দুধর্ম্মে সাকারের উপাসনা নাই? গ্রামে গ্রামে ত প্রত্যহ প্রতিমা-পূজা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ প্রতিমার্চ্চনায় পরিপূর্ণ। তবে হিন্দুধর্ম্মে সাকারবাদ নাই কি প্রকারে বলিব?

ইহার উত্তর এই যে, অন্যদেশে যাহা হউক, হিন্দুর প্রতিমার্চ্চনা সাকারের উপাসনা নয়; এবং যে হিন্দু প্রতিমার্চ্চনা করে, সে নিতান্ত অজ্ঞ ও অশিক্ষিত না হইলে মনে করে না যে, এই প্রতিমা ঈশ্বর, অথবা ঈশ্বরের এইরূপ আকার বা ইহা ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিমা। যে একখানা মাটীর কালী গড়িয়া পূজা করে, সে যদি স্বকৃত উপাসনার কিছুমাত্র বুঝে, তবে সে জানে, এই চিত্রিত মৃৎপিণ্ড ঈশ্বর নহে বা ঈশ্বরের প্রতিমা নহে; এবং সে জানে, তাহা ঈশ্বরের প্রকৃতি হইতে পারে না।

তবে সে এ মাটীর তালের পূজা করে কেন? সে যাঁহার পূজা করিবে, তাঁহাকে খুঁজিয়া পায় না। তিনি অদৃশ্য, অচিন্তনীয়, ধ্যানের অপ্রাপ্য, অতএব উপাসনার অতীত। কাজেই সে তাঁহাকে ডাকিয়া বলে, "হে বিশ্বব্যাপিনি সর্ব্বময়ি আদ্যাশক্তি! তুমি সর্ব্বত্রই আছ, কিন্তু আমি তোমাকে দেখিতে পাই না; তুমি সর্ব্বত্রই আবির্ভূত হইতে পার, অতএব আমি দেখিতে পাই, এমন কিছুতে আবির্ভূত হও। আমি তোমার যেরূপে কল্পনা করিয়া গড়িয়াছি, তাহাতে আবির্ভূত হও, আমি তোমার উপাসনা করি। নহিলে কোথায় পুষ্পচন্দন দিব, তদ্বিষয়ে মনঃস্থির করিতে পারি না।"

এই প্রতিমাপূজার উপরে আমাদের শিক্ষাগুরু ইংরেজদিগের বড় রাগ এবং তাঁহাদিগের শিষ্য নব্য ভারতবর্ষীয়েরও বড় রাগ। ইংরেজের রাগ, তাহার কারণ,

বাইবেলে তাহার নিষেধ আছে। শিক্ষিত ভারতবর্ষীয়ের রাগ, কেন না, ইংরেজের ইহার উপর রাগ। যাহা ইংরেজে নিন্দা করে, তাহা "আমাদের" অবশ্য নিন্দনীয়। প্রতিমাপূজা ইংরেজের নিকট নিন্দনীয়, অতএব প্রতিমা-পূজা অবশ্য "আমাদের" নিন্দনীয়, তাহার আর বিচার আচারের প্রয়োজন নাই। ইংরেজ বলেন যে, এই প্রতিমাপূজার জন্য ভারতবর্ষ উৎসন্ন গিয়াছে, এবং ইহার ধ্বংস না হইলে একেবারে উৎসন্ন যাইবে; সুতরাং আমরাও তাহাই বিশ্বাস করিতে বাধ্য; তাহার আর বিচার আচারের প্রয়োজন নাই। সত্য বটে, রোম, গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য প্রতিমা-পূজা করিয়াও উন্নত হইয়াছিল, কিন্তু ইংরেজ বলেন যে, ভারতবর্ষ প্রতিমা-পূজায় উৎসন্ন যাইবে, অতএব ভারতবর্ষ নিশ্চয় প্রতিমাপূজায় উৎসন্ন যাইবে; তদ্বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই। এইরূপ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে ভাবিয়া থাকেন। অন্যমত বিবেচনা করা কুশিক্ষা, কুবুদ্ধি, এবং নীচাশয়তার কারণ মনে করেন।

আমরা এরূপ উক্তির অনুমোদন করিতে পারি না। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সকলের অন্তর্যামী। সকলের অন্তরের ভিতর তিনি প্রবেশ করিতে পারেন, সকল প্রকারের উপাসনা গ্রহণ করিতে পারেন। কি নিরাকারের উপাসক, কি সাকারোপাসক, কেহই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ অনুভূত করিতে পারেন না। তিনি অচিন্তনীয়। অতএব তাঁহার চক্ষে সাকার উপাসকের উপাসনা ও নিরাকার উপাসকের উপাসনা তুল্য; কেহই তাঁহাকে জানে না। যদি ইহা সত্য হয়, যদি ভক্তিই উপাসনার সার হয়, এবং ভক্তিশূন্য উপাসনা যদি তাঁহার অগ্রাহ্যই হয়, তবে ভক্তিযুক্ত হইলে সাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকট গ্রাহ্য; ভক্তিশূন্য হইলে নিরাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকট পৌঁছিবে না। অতএব আমাদের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষীয়ের যদি ঈশ্বরে ভক্তি না থাকে, তবে সাকার উপাসনার ভাবে আচ্ছন্ন হইলেও কেহ উৎসন্ন যাইবে না, আর ভক্তিশূন্য হইলে নিরাকারোপাসনায়ও উৎসন্ন হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সাকার ও নিরাকার উপাসনার মধ্যে আমাদের মতে কোনটাই নিষ্ফল নহে; এবং এতদুভয়ের মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ নাই। সুতরাং উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার নিষ্প্রয়োজন।

সাকারোপাসকেরা বলিয়া থাকেন, নিরাকারের উপাসনা হয় না। অনন্তকে আমরা মনে ধরিতে পারি না, সুতরাং তাঁহার ধ্যান বা চিন্তা আমাদের দ্বারা সম্ভব নহে; এ কথারও বিচার নিষ্প্রয়োজন বোধ হয়। কেন না, এমন যদি কেহ থাকেন যে, তিনি আপনার সান্তচিন্তাশক্তির দ্বারা অনন্তের ধ্যান বা চিন্তায় সক্ষম, এবং তাহাতে ভক্তিযুক্ত হইতে পারেন, তবে তিনি নিরাকারেরই উপাসনা করুন। যিনি তাহা না পারেন, তাঁহাকে কাজেই সাকারের উপাসনা করিতে হইবে। অতএব সাকারোপাসক ও নিরাকারোপাসকের মধ্যে বিচার, বিবাদ ও পরস্পরের বিদ্বেষের কোন কারণ দেখা যায় না।

পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, আমি "সাকারের উপাসনা," এবং "সাকারোপাসক" ভিন্ন "সাকারবাদ" বা "সাকারবাদী" শব্দ ব্যবহার করিতেছি না। কেন না, "সাকারবাদ" অবশ্য পরিহার্য্য। ঈশ্বর সাকার নহেন, ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে।

কথাটা উঠিতে পারে যে, ঈশ্বর যদি সাকার নহেন, তবে হিন্দুধর্ম্মের অবতারবাদের কি

হইবে? এই গীতার বক্তা কৃষ্ণকে উদাহরণ-স্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। ঈশ্বর নিরাকার,কিন্তু কৃষ্ণ সাকার। ইহাঁকে তবে কি প্রকারে ঈশ্বরাবতার বলা যাইবে? এই প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর আমি কৃষ্ণচরিত্র নামক মৎপ্রণীত গ্রন্থে দিয়াছি. সুতরাং এখানে সে সকল কথা পুনর্ব্বার বলিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, সুতরাং ইচ্ছানুসারে তিনি যে আকার ধারণ করিতে পারেন না, এ কথা বলিলে তাঁহার সীমা নির্দ্দশ করা হয়।

"যেন সর্ব্বমিদং ততম্" ইত্যাদি বাক্যে অনেকের এইরূপ ভ্রম জন্মিতে পারে যে, বিলাতী Pantheism এবং হিন্দুধর্ম্মের ঈশ্বরবাদ বুঝি একই। স্থানান্তরে এই ভ্রমের নিরাস করা যাইবে।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্যুদ্ধস্ব ভারত ॥১৮॥

নিত্য, অবিনাশী এবং অপ্রমেয় আত্মার এই দেহ নশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব হে ভারত! যুদ্ধ কর। ১৮।

নিত্য,অর্থাৎ সর্ব্বদা একরূপে স্থিত (শ্রীধর)। অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা অপরিচ্ছেদ্য। প্রত্যক্ষাদির অতীত।

শ্রীধর এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—"নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদা একরূপ, অতএব অবিনাশী, ও অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন যে আত্মা,তাঁহার এই দেহ সুখদুঃখাদিধর্ম্মক, ইহা তত্ত্বদর্শীদিগের দ্বারা উক্ত; যখন আত্মার বিনাশ নাই, সুখদুঃখাদি-সম্বন্ধ নাই, তখন তজ্জনিত শোক পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিও না।"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যার পর শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, তাঁহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক। তিনি বলেন—"ইহাতে যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা-বিধান করা হইতেছে না। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও ইনি শোকমোহপ্রতিবদ্ধ হইয়া তূষ্ণীম্ভাবে আছেন, ভগবান্ তাঁহার কর্ত্তব্য-প্রতিবন্ধের অপনয়ন করিতেছেন মাত্র। অতএব 'যুদ্ধ কর' ইহা অনুবাদ মাত্র, বিধি নয়।"

অনেকের বিশ্বাস যে, এই গীতাগ্রন্থের স্থূল উদ্দেশ্য—যুদ্ধের ন্যায় নৃশংস ব্যাপারে মনুষ্যের প্রবৃত্তি দেওয়া। তাঁহারা যে গীতা বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। গীতা,বাজারের উপন্যাস-গ্রন্থ নহে যে, একবার পড়িবামাত্র উহার সমস্ত তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। বিশেষরূপে উহার আলোচনা না করিলে বুঝা যায় না। গীতার এতদংশের উদ্দেশ্য—স্বধর্ম্মপালনের অপরিহার্য্যতা প্রতিপন্ন করা। স্বধর্ম্ম বলিলে শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝিতে কষ্ট পাইতে পারেন, ইহার ইংরেজি প্রতিশব্দ—Duty—শুনিলে বোধ হয়, সে কষ্ট থাকিবে না। গীতার এতদংশের উদ্দেশ্য—সেই Duty ধর্ম্মের অবশ্যসম্পাদ্যতা প্রতিপন্ন করা। সকল মনুষ্যের স্বধর্ম্ম এক প্রকার নহে—কাহারও স্বধর্ম্ম দণ্ড-প্রণয়ন; কাহারও স্বধর্ম্ম ক্ষমা। শিপাহীর স্বধর্ম্ম শত্রুকে আঘাত করা, ডাক্তারের স্বধর্ম্ম সেই আঘাতের চিকিৎসা। মনুষ্যের যত প্রকার কর্ম্ম আছে, তত প্রকার স্বধর্ম্ম আছে। কিন্তু সকল প্রকার স্বধর্ম্মমধ্যে যুদ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা নৃশংস ব্যাপার বুদ্ধ। পরিহার করিতে পারিলে যুদ্ধ কাহারও কর্ত্তব্য নহে। এমন অবস্থা ঘটে যে, এই নৃশংস কার্য্য অপরিহার্য্য ও অবশ্য সম্পাদ্য হইয়া উঠে। তৈমূরলঙ্গ বা নাদের দেশ দগ্ধ ও লুণ্ঠিত করিতে আসিতেছে, এমন অবস্থায় যে যুদ্ধ করিতে জানে, যুদ্ধ তাহারই অপরিহার্য্য ও অবশ্য-সম্পাদ্য ও স্বধর্ম্ম। অতএব গীতাকার স্বধর্ম্ম-পালন-সম্বন্ধে

ইংরেজি দর্শনশাস্ত্রে যাহাকে Crucial instance বলে, তাহাই অবলম্বন করিয়া স্বধর্ম্মের অবশ্যসম্পাদ্যতা এবং তদুপলক্ষে সমস্ত ধর্ম্মেরও নিগূঢ় রহস্য ব্যাখ্যাত করিতেছেন। উদাহরণস্বরূপ, যে স্বধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা নৃশংস ও ভয়াবহ ও যাহাতে সাধুজনমাত্রেই স্বতঃ অপ্রবৃত্ত, তাহাই গ্রহণ করা হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে—যুদ্ধের মধ্যে যে যুদ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা নৃশংস ও ভয়াবহ, যাহাতে স্বভাবতঃ নৃশংস ব্যক্তিও সহজে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না,তাহাই উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। Crucial instance বটে। গীতার উদ্দেশ্য ইহাই প্রতিপাদন করা যে, স্বধর্ম্ম এরূপ নৃশংস, ভয়াবহ এবং সাধুজনপ্রবৃত্তির আপাতবিরোধী হইলেও তাহা অবশ্য পালনীয়।

কিন্তু শ্লোকটার ভাবার্থ বোধ করি, এখনও পরিষ্কার হয় নাই। আত্মা অবিনাশী—কেহ তাহার বিনাশ করিতে পারে না—অতএব 'যুদ্ধ কর,' এই কথার অর্থ কি? আত্মা অবিনাশী বলিয়া কাহাকে হত্যা করায় কি দোষ নাই? ভগবদ্বাক্যের সে তাৎপর্য্য নহে। ইহার তাৎপর্য্য উপরিধৃত শঙ্করভাষ্যে যাহা কথিত হইয়াছে, তাই। অর্জ্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তবে মোহে অভিভূত হইয়া, মানুষ মারিতে হইবে, এই দুঃখে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন। ভগবান্ বুঝাইতেছেন যে, দুঃখ করিবার কারণ কিছুই নাই—কেন না,কেহই মরিবে না। শরীর নষ্ট হইবে বটে,কিন্তু শরীর ত অনিত্য, অর্জ্জুন যুদ্ধ না করিলেও একদিন অবশ্য নষ্ট হইবে। কিন্তু শরীর নষ্ট হইলে মানুষ মরে না—যাহার শরীর, সে অমর—কেহই তাহাকে মারিতে পারে না। অতএব যুদ্ধের প্রতি অর্জ্জুন যে আপত্তি উপস্থিত করিতেছেন,সেটা ভ্রমজনিত মাত্র। অতএব তিনি যুদ্ধ করিতে পারেন।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন
হন্যতে॥ ১৯॥

যে ইহাঁকে হন্তা বলিয়া জানে এবং যে ইহাঁকে হত বলিয়া জানে, ইহারা উভয়েই অনভিজ্ঞ। ইনি হত্যা করেন না—হতও হয়েন না। ১৯।

প্রাচীন টীকাকারেরা, এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, যথা—ভীষ্মাদির মৃত্যুনিমিত্ত অর্জ্জুনের শোক,উক্ত বাক্যে নিবারিত হইল। এক্ষণে "আমি ইহাদের বধের কর্ত্তা" এই নিমিত্ত যে দুঃখ প্রথম অধ্যায়ের ৩৪।৩৫ ইত্যাদি শ্লোকে অর্জ্জুনের দ্বারা উক্ত হইয়াছে, তাহার উত্তরে ভগবান্ বুঝাইতেছেন যে, আত্মা যেমন কাহারও কর্ত্তৃক হত হয়েন না, তেমনি তিনি কাহাকেও হত্যা করেন না। কেন না, আত্মা অবিক্রিয়।

শঙ্কর ও শ্রীধর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়েরা যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, আমি এক্ষণে সেইরূপ বলিতেছি। ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকেও সেইরূপ অর্থ করিব। অন্য অর্থ হয় কি না, তাহাও বলা যাইবে; টীকাকারেরা বলেন, আত্মা যে অবিক্রিয়, তাহার প্রমাণ পরবর্ত্তী শ্লোকে দেওয়া হইতেছে।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০॥

ইনি জন্মেন না বা মরেন না, কখন হয়েন নাই,বর্ত্তমান নাই বা হইবেন না। ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ; শরীর হত হইলে ইনি হত হয়েন না। ২০।

টীকাকারেরা বলেন,আত্মা যে অবিক্রিয়, ইহার ষড়্ভাব-বিকারশূন্যত্বের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত করা হইতেছে। ইনি জন্মশূন্য—এই কথার

যায়া জন্ম প্রতিবিদ্ধ হইল; মরেন না—ইহাতে বিনাশ প্রতিবিদ্ধ হইল। ইনি কথন উৎপন্ন হয়েন নাই, এজন্য বর্ত্তমান নাই। যাহা জন্মে, তাহাকেই বর্ত্তমান বলা যায়; কিন্তু ইনি পূর্ব্ব হইতে স্বতঃ সদ্রূপে আছেন, অতএব উৎপন্ন হইয়া যে বিদ্যমানতা, তাহা ইঁহার নাই; এবং সেই জন্য ইনি আবার জন্মিবেন না। সেই জন্য ইনি অজ,অর্থাৎ জন্মশূন্য,ইনি নিত্য, অর্থাৎ সর্ব্বদা একরূপ, শাশ্বত,অর্থাৎ অপক্ষয়-শূন্য, পুরাণ, অর্থাৎ বিপরিণামশূন্য।

এক্ষণে পাঠক, এই দুইটি শ্লোকের প্রতি মনোনিবেশ করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, আত্মার এই অবিক্রিয়ত্ববাদ-সম্বন্ধে কোন কথা স্পষ্টতঃ মূলে নাই। অস্পষ্টতঃ "নায়ং হন্তি" এই কথাটা আছে, কিন্তু ইহার অন্য অর্থ না হইতে পারে, এমনও নহে। যদি কেহ মরে না, তবে আত্মাও কাহাকে মারে না।

আত্মা যে অবিক্রিয়, ইহা প্রাচীন দর্শন-শাস্ত্রের একটি মত। তত্ত্বটা কি,তাহা পাঠককে বুঝান যাইতে পারে,কিন্তু সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে না। আবশ্যক বোধ হইতেছে না, তাহার কারণ, আমরা গীতার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত কিন্তু এই দুইটি শ্লোক গীতার নহে। শ্লোক দুইটি কঠোপনিষদের গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের যেটি ১৯শ শ্লোক, তাহা কঠোপনিষদেরও দ্বিতীয় বল্লীর ১৯শ শ্লোক; আর গীতার ঐ অধ্যায়ের যেটি ২০শ শ্লোক, তাহা কঠোপনিষদের ঐ বল্লীর ১৮শ শ্লোক। গীতার শ্লোক ও কঠোপনিষদের শ্লোক পাশাপাশি লেখা যাইতেছে।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে
হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন
হন্যতে ॥২।১৯॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ম্পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ।২।২০।
গীতা।—

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন
হন্যতে ॥ ২।১৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি-
ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ম্পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২।১৮
কঠোপনিষৎ।

শ্লোক দুইটি কঠোপনিষদ হইতে গীতায় আনীত হইয়াছে, গীতা হইতে কঠোপনিষদে নীত হয় নাই। এ কথা লইয়া বোধ কার বেশী বিচারের প্রয়োজন নাই। আমরা দেখিব, উপনিষদ হইতে অনেক শ্লোক গীতায় আনীত হইয়াছে। অন্ততঃ প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের এই মত। শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—"শোক-মোহাদি-সংসারকারণনিবৃত্ত্যর্থং গীতাশাস্ত্রং ন প্রবর্ত্তকমিত্যেতৎ পার্থস্য সাক্ষীভূতে ঋচাবানিনায়,"এবং আনন্দগিরি লিখিয়াছেন—"হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং ইত্যাদ্যামৃচমর্থতো দর্শয়ন্ত্বা ব্যাচষ্টে য এনমিতি।"

এক্ষণে এই শ্লোক-সম্বন্ধে দুইটি কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি।

প্রথম, আত্মা যদি কর্ত্তা নহে, তবে কর্ম্ম-যোগ জলে ভাসাইয়া দিতে হয়। শঙ্করাচার্য্যের যে তাহাই উদ্দেশ্য, ইহা বলা বাহুল্য। কর্ম্ম-যোগের কথা যখন পড়িবে, পাঠক তখন এ বিষয়ে বিচার করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়, আত্মার অবিক্রিয়ত্ব একটা দার্শনিক মত। প্রাচীনকালে সকল দেশে দর্শন-ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে এবং ধর্ম্ম দর্শনের

অনুগামী হয়। ইহা উভয়েরই অনিষ্টকারী। ধর্ম্ম ও দর্শন পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইলেই উভয়ের উন্নতি হয়, নচেৎ হয় না। এই তত্ত্বটি সপ্রমাণ করিয়া কোমৎ ও তৎশিষ্যগণ দর্শন ও ধর্ম্ম উভয়েরই উপকার করিয়াছেন। আমাদিগেরও সেই মার্গাবলম্বী হওয়া উচিত।

দার্শনিক মত যাহাই হউক, হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ মত—আত্মাই কর্ত্তা। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য শত পৃষ্ঠা ধরিয়া বচন উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। আমরা কেবল দুইটি কথা তুলিব। একটি উপনিষদ্ হইতে, আর একটি পুরাণ হইতে।

আত্মা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।
নান্যং কিঞ্চন মিষৎ।
স ঈক্ষত লোকনান্ নু সৃজা ইতি। ১
স ইমাল্লোঁকানসৃজত অম্ভো মরীচীর্ম্মর-
মিত্যাদি ঋগ্বেদীয়ৈতরেয়োপনিষৎ।

আত্মাই সব সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং আত্মাই কর্ত্তা।

দ্বিতীয় উদাহরণ পুরাণ হইতে গ্রহণ করিতেছি। উহা কঠোপনিষদের শ্লোকের সঙ্গে তুলনা করিয়া পাঠক দেখিবেন, হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করা কি যন্ত্রণা—

কঃ কেন হন্যতে জন্তুর্জন্তুঃ কঃ কেন রক্ষ্যতে।
হন্তি রক্ষন্তি চৈবাত্মা হ্যসৎ সাধু সমাচরন্॥
বিষ্ণুপুরাণ ১। ১৮। ২৯

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥২১॥

যে ইহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ এবং অব্যয় বলিয়া জানে, হে পার্থ! সে পুরুষ কাহাকে মারে? কাহাকেই বা হনন করায়? ।২১।

ভাবার্থ—যে জানে যে, দেহনাশ হইলেই শরীরের বিনাশ হইল না, সে যদি কাহারও দেহধ্বংসের কারণ হয়, তবে তাহার উচিত নহে যে, "আমি ইহার বিনাশের কারণ হইলাম" বলিয়া দুঃখিত হয়। কেন না, আত্মা অবিনাশী। শরীরের বিনাশে তাহার বিনাশ হইল না।

তবে যদি বল যে, "ভাল, আত্মার বিনাশ না হউক, কিন্তু শরীরের'ত বিনাশ আছেই। শরীরনাশেরই বা আমি কেন কারণ হই?" তাহার উত্তর পরশ্লোকে কথিত হইতেছে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়,
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

যেমন মনুষ্য জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র * গ্রহণ করে, তেমনি আত্মা, পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীরে সঙ্গত হয়। ২২।

অর্থাৎ যেমন তোমার জীর্ণ বস্ত্র কেহ ছিঁড়িয়া দিক্, বা না দিক্ তোমাকে জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করিতেই হইবে, তেমনি তুমি যুদ্ধ কর বা না কর, যোদ্ধৃগণ অবশ্য দেহত্যাগ করিবে, তোমার যুদ্ধবিরতিতে তাহাদের দেহনাশ নিবারণ হইবে না। তবে কেন যুদ্ধ করিবে না?

স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যে ব্যক্তি বধকার্য্য করিতে হইবে বলিয়া শোকমোহপ্রযুক্ত ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে বিমুখ হয়, তাহার প্রতি এই সকল বাক্য

---

* "It was if my soul were thinking separately from the body, she looked upon the *body us a foreign substance, as we look upon a garment*, Wilhelm Meister, Garlyle's Translation. Book VI.

যে কয়টা কথা ইটালিক অক্ষরে লিখিলাম, পাঠক তৎপ্রতি অনুধাবন করিবেন, গীতার কথাটা বেশ বুঝা যাইবে।

প্রযুজ্য। নচেৎ আত্মা অবিনশ্বর এবং দেহ-মাত্র নশ্বর, ইহার এমন অর্থ নহে যে, কেহ কাহাকে খুন করিলে তাহাতে দোষ নাই। খুন করিলে দোষ আছে কি না আছে—সে বিচারের সঙ্গে এ বিচারের কোন সম্বন্ধই নাই—থাকিতেও পারে না। এখানে বিবেচ্য, ধর্ম্ম-যুদ্ধে শোকমোহের কোন কারণ আছে কি না? উত্তর—কারণ নাই, কেন না, আত্মা অবিনশ্বর, আর দেহ নশ্বর। দেহী কেবল নূতন কাপড় পরিবে মাত্র—তাহাতে কাঁদা-কাটার কথাটা কি?

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥২৩॥

এই (আত্মা) অস্ত্রে কাটে না, আগুনে পুড়ে না, জলে ভিজে না, এবং বাতাসে শুকায় না। ২৩।

আত্মা নিরবয়ব, এই জন্য অস্ত্রাদির অতীত।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে॥২৪

ইনি ছেদনীয় নহেন, দহনীয় নহেন, ক্লেদ-নীয় নহেন, এবং শোষণীয় নহেন। (ইনি) নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকার্য্য বলিয়া কথিত হন। ২৪।

[স্থাণু, অর্থাৎ স্থিরস্বভাব। অচল—পূর্ব্বরূপ-অপরিত্যাগী। সনাতন—চিরন্তন, অনাদি। অব্যক্ত—চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়। অচিন্ত্য—মনের অবিষয়। অবিকার্য্য—কর্ম্মে-ন্দ্রিয়ের অবিষয়।

শঙ্কর এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ করেন। আত্মা অচ্ছেদ্য ইত্যাদি, এজন্য আত্মা নিত্য; নিত্য এজন্য সর্ব্বগত; সর্ব্বগত এজন্য স্থির-স্বভাব; স্থিরস্বভাব এজন্য অচল; অচল এজন্য সনাতন, ইত্যাদি।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥২৫॥

অতএব ইহাকে এইরূপ জানিয়া, শোক করিও না। ২৫।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং* শোচিতুমর্হসি॥২৬॥

আর যদি ইহা তুমি মনে কর, আত্মা সর্ব্ব-দাই জন্মে, সর্ব্বদা মরে, তথাপি হে মহাবাহো! ইহার জন্য শোক করিও না। ২৬।

কেন তথাপি শোক করিবে না? শঙ্কর বলেন, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বলিয়া। পরশ্লোকেও সেই কথা আছে। কিন্তু পরশ্লোকে, "ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" এই বাক্যে আত্মার অবিনাশিতাও সূচিত হইতেছে। তাহা হইলে আর আত্মার বিনাশ স্বীকার করা হইল কৈ? এবং নূতন কথাই বা কি হইল? এই জন্য শ্রীধর আর এক প্রকার বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, আত্মাও যদি মরিল, তাহা হইলে তোমাকেও আর পাপপুণ্যের ফলভাগী হইতে হইবে না, তবে আর দুঃখের বিষয় কি?

কেন তথাপি শোক করিবে না, তাহা পর-শ্লোকে বলা হইতেছে।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥২৭

যে জন্মে, সে অবশ্য মরে; যে মরে, সে অবশ্য জন্মে; অতএব যাহা অপরিহার্য্য, তাহাতে শোক করিও না। ২৭।

আত্মার অবিনাশিতা গীতাকারের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। "নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্" বলিয়া মানিয়া লইয়াও, উত্তরে আবার বলিতেছেন, "ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" যদি মরিলে আবার অবশ্য জন্মিবে, তবে আত্মা অবশ্য অবিনাশী, "নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্" বলা আর খাটে না। তবে, শ্রীধরের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে এ আপত্তি উপস্থিত হয় না।

* "নৈবং" পাঠান্তর।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥২৮॥

জীবসকল আদিতে অব্যক্ত, (কেবল) মধ্যে ব্যক্ত, (আবার) নিধনে অব্যক্ত; সেখানে শোকবিলাপ কি ?। ২৮।

অব্যক্ত শব্দের অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শঙ্কর অর্থ করেন, "অব্যক্তমদর্শনমনুপলব্ধি-র্যেষাং ভূতানাং" অর্থাৎ যে (যে অবস্থায়) ভূতসকলের দর্শন বা উপলব্ধি নাই। শ্রীধর অর্থ করেন, "অব্যক্তং প্রধানং তদেবাদি উৎপত্তেঃ পূর্ব্বরূপম্।" অর্থাৎ ভূত-সকল উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণরূপে অব্যক্ত থাকে। অপর সকলে কেহ শ্রীধরের, কেহ শঙ্করের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। শঙ্করের অর্থ গ্রহণ করিলেই অর্থ সহজে বুঝা যায়।

শ্লোকের অর্থ এই যে,যেখানে জীব-সকল আদিতে অর্থাৎ জন্মের পূর্ব্বে চক্ষুরাদির অতীত ছিল; কেবল মধ্যে দিনকত জন্মগ্রহণ করিয়া ব্যক্তরূপ হইয়াছিল,শেষে মৃত্যুর পর আবার চক্ষুরাদির অতীত হইবে, তখন আর তজ্জন্য শোক করিব কেন? "প্রতিবুদ্ধস্য স্বপ্নদৃষ্ট-বস্তুষিব শোকো ন যুজ্যতে" (আনন্দগিরি) —ঘুম ভাঙ্গিলে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় জীবের জন্য শোক অনুচিত।

এখানেও আত্মার অবিনাশিত্ববাদ-জাজ্বল্যমান।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥২৯॥

এই (আত্মা)-কে কেহ আশ্চর্য্যবৎ দেখেন, কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ বলেন;কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ শুনিয়া থাকেন; শুনিয়াও কেহ ইহাকে জানিতে পারিলেন না।২৯।

এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই। আত্মা অবিনাশী হইলেও পণ্ডিতেরাও মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করিয়া থাকেন বটে। কিন্তু তাহার কারণ এই যে, তাঁহারাও প্রকৃত আত্মতত্ত্ব অবগত নহেন। আত্মা তাঁহাদের নিকট বিস্ময়ের বিষয় মাত্র—তাঁহারা আশ্চর্য্য বিবেচনা করেন। আত্মার দুর্জ্ঞেয়তা বশতঃ সকলের এই ভ্রান্তি।

এ কথাতে এই আপত্তি হইতে পারে যে, "আত্মা অবিনাশী" এবং "ইন্দ্রিয়াদির অবিষয়।" এই সকল কথাতে এমন কিছু নাই যে, পণ্ডিতেও বুঝিতে পারে না। কিন্তু ভগবদুক্তির উদ্দেশ্য কেবল দুর্ব্বোধ্যতা প্রতিপাদন করা নহে। আমরা আত্মার অবিনাশিতা বুঝিতে পারিলেও কথাটা আমাদের হৃদয়ে বড় প্রবেশ করে না। তদ্বিষয়ক যে বিশ্বাস, তাহা আমাদের সমস্ত জীবন শাসিত করে না। এই বিশ্বাসকে আমরা একটা সর্ব্বদাজাজ্বল্যমান, জীবন্ত,সর্ব্বথা হৃদয়ে প্রস্ফুটিত ব্যাপারে পরিণত করি না। ইহাই ভগবদুক্তির উদ্দেশ্য।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত!।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং
শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

হে ভারত! সকলের দেহে, আত্মা নিত্য ও অবধ্য। অতএব জীব-সকলের জন্য তোমার শোক করা উচিত নহে। ৩০।

আত্মার অবিনাশিতা-সম্বন্ধে যাহা কথিত হইল, এই শ্লোক তাহার উপসংহার।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন
বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

স্বধর্ম্ম প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভীত হইও না। ধর্ম্মযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়ঃ আর নাই। ৩১।

এক্ষণে ১১ ও ২২ শ্লোকের টীকায় যাহা বলা গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে হইবে।

স্বধর্ম্ম কি, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ক্ষত্রিয় অর্থাৎ যুদ্ধব্যবসায়ীর স্বধর্ম্ম—যুদ্ধ। কিন্তু যোদ্ধার স্বধর্ম্ম যুদ্ধ বলিয়া যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই যে যোদ্ধাকে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, এমন নহে। অনেক সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যোদ্ধার পক্ষে অধর্ম্ম। অনেক রাজা সর্ব্বস্বাপহরণ জন্যই যুদ্ধ করেন। তাদৃশ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ধর্ম্মানুমত নহে। কিন্তু যে যুদ্ধব্যবসায়ী, মনুষ্যসমাজের দোষে তাহাকে তাহাতেও প্রবৃত্ত হইতে হয়। যোদ্ধৃগণ রাজা বা সেনাপতির আজ্ঞানুবর্ত্তী। তাঁহাদের আজ্ঞামত যুদ্ধ করিতে অধীন যোদ্ধামাত্রেই বাধ্য; কিন্তু সে অবস্থায় যুদ্ধ করিলেও তাঁহারা পরস্বাপহরণ ইত্যাদি পাপের অংশী হয়েন। এই অধর্ম্ম-যুদ্ধই অনেক। যোদ্ধা তাহা হইতে কোনরূপে নিষ্কৃতি পান না। ভীষ্মের ন্যায় পরমধার্ম্মিক ব্যক্তিরও অন্নদাসত্ব বশতঃ দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক অধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার কথা এই মহাভারতেই আছে। ইউরোপীয় সৈন্যমধ্যে খুঁজিলে ভীষ্মের অবস্থাপন্ন লোক সহস্র সহস্র পাওয়া যাইবে। অতএব যোদ্ধার এই মহৎ দুর্ভাগ্য যে, স্বধর্ম্মপালন করিতে গিয়া, অনেক সময়েই অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। ধার্ম্মিক যোদ্ধা ইহাকে মহদ্দুঃখ বিবেচনা করেন। কিন্তু ধর্ম্মযুদ্ধও আছে। আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, সমাজরক্ষা, দেশরক্ষা, সমস্ত প্রজার রক্ষা, ধর্ম্মরক্ষার জন্যও যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এইরূপ যুদ্ধে যোদ্ধার অধর্ম্ম-সঞ্চয় না হইয়া পরম ধর্ম্মসঞ্চয় হয়। এখানে কেবল স্বধর্ম্মপালন নহে, তাহার সঙ্গে অনন্ত পুণ্যসঞ্চয়। এরূপ ধর্ম্মযুদ্ধ যে যোদ্ধার অদৃষ্টে ঘটে, সে পরম ভাগ্যবান্। অর্জ্জুনের সেই সময় উপস্থিত, এরূপ যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি পরম অধর্ম্ম—অনর্থক স্বধর্ম্মপরিত্যাগ। অর্জ্জুন সেই স্বধর্ম্মপরিত্যাগরূপ ঘোরতর অধর্ম্মে প্রবৃত্ত। ইহার কারণ আর কিছুই নহে। কেবল স্বজনাদি-নিধনের ভয়। সেই ভয়ে ভীত, শোকাকুল বা মুগ্ধ হইবার কোন কারণ নাই, তাহা ভগবান্ বুঝাইলেন; বুঝাইলেন যে, কেহ মরিবে না—কেন না, দেহী অমর। যাইবে কেবল স্থূলদেহ, কিন্তু সেটা ত জীর্ণ বস্ত্র মাত্র। অতএব স্বজনবধাশঙ্কায় ভীত হইয়া স্বধর্ম্মে উপেক্ষা অকর্ত্তব্য। এই ধর্ম্ম্যযুদ্ধের মত এমন মঙ্গলময় ব্যাপার ক্ষত্রিয়ের আর ঘটে না। ইহাই শ্লোকার্থ।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥৩২॥

মুক্ত স্বর্গদ্বারস্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ, আপনা হইতে যাহা উপস্থিত হইয়াছে, সুখী ক্ষত্রিয়েরাই ইহা লাভ করিয়া থাকে।৩২।

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥৩৩॥

আর যদি তুমি এই ধর্ম্ম্যযুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্ম্ম এবং কীর্ত্তি-পরিত্যাগে পাপযুক্ত হইবে।৩৩।

৩১ শ্লোকের টীকায় যাহা লেখা গিয়াছে, তাহাতেই এই দুই শ্লোকের তাৎপর্য্য স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে॥৩৪॥

লোকে তোমার চিরস্থায়ী অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। সমর্থ ব্যক্তির অকীর্ত্তির অপেক্ষা মৃত্যু ভাল।৪।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥৩৫॥

মহারথগণ মনে করিবেন, তুমি ভয়ে রণ হইতে বিরত হইলে। যাঁহারা তোমাকে বহুমান করেন, তাঁহাদিগের নিকট তুমি লাঘব প্রাপ্ত হইবে।৩৫।

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥৩৬॥

তোমার শত্রুগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে ও অনেক আবাচ্য কথা বলিবে। তার পর অধিক দুঃখ আর কি আছে? ৩৬।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥৩৭॥

হত হইলে স্বর্গ পাইবে। জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব হে কৌন্তেয়! যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর। ৩৭।

৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭, এই চারিটি শ্লোক কি প্রকারে এখানে আসিল, তাহা বুঝা যায় না। এই চারিটি শ্লোক গীতার অযোগ্য। গীতায় ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আছে, এবং দার্শনিক তত্ত্বও আছে। এই শ্লোকের বিষয় না ধর্ম্ম, না দার্শনিক তত্ত্ব। ইহাতে বিষয়ী লোকে যে অসার অশ্রদ্ধেয় কথা সচরাচর উপদেশস্বরূপ ব্যবহার করে, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহা ঘোরতর স্বার্থবাদে পূর্ণ, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

৩৩শ শ্লোক পর্য্যন্ত ভগবান্ অর্জ্জুনকে *আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় পরম পবিত্র উপদেশ দিলেন।* ৩৮ শ্লোক হইতে আবার জ্ঞান ও কর্ম্মসম্বন্ধীয় পরম পবিত্র উপদেশ আরম্ভ হইবে। এই চারিটি শ্লোকের সঙ্গে, দুইয়ের একেরও কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। তৎপরিবর্ত্তে লোক-নিন্দা-ভয় প্রদর্শিত হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, লোক-নিন্দা-ভয় কোন প্রকার ধর্ম্ম নহে। সত্য বটে, আধুনিক সমাজ-সকলে ধর্ম্ম এতই দুর্ব্বল যে, অনেক সময়ে লোকনিন্দা-ভয়ই ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে। অনেক চোর চৌর্য্যে ইচ্ছুক হইয়াও কেবল লোকনিন্দাভয়ে চুরি করে না, অনেক পারদারিক লোক নিন্দা-ভয়েই শাসিত থাকে। তাহা হইলেও ইহা ধর্ম্ম হইল না; পিতলকে গিল্টি করিলে দুই চারিদিন সোণা বলিয়া চালান যায় বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া পিতল সোণা হয় না। পক্ষান্তরে, এই লোকনিন্দা বহুতর পাপের কারণ। আজিকার দিনে হিন্দুসমাজের ভ্রূণহত্যা ও স্ত্রীহত্যা অনেকই এই লোক-নিন্দা-ভয় হইতেই উৎপন্ন। এক সময়ে ফরাসীর দেশে উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে পারদারিকতার অভাবই নিন্দার কারণ ছিল। সিয়াপোষ কাফরদিগের মধ্যে যে একজনও মুসলমানের মাথা কাটে নাই, অর্থাৎ যে নরঘাতী নহে, সে সমাজে নিন্দিত -তাহার বিবাহ হয় না। সকল সমাজেরই সহস্র সহস্র পাপ লোকনিন্দা-ভয় হইতেই উৎপন্ন; কেন না, সাধারণ লোক নির্ব্বোধ, যাহা ভাল, তাহারও নিন্দা করিয়া থাকে। লোকে যাহা ভাল বলে, মনুষ্য এখন তাহারই অন্বেষণ করে বলিয়াই, মনুষ্যের ধর্ম্মাচরণে অবসর বা তৎপ্রতি মনোযোগ নাই। লোকনিন্দা-ভয়ে অনেকে যে ধর্ম্মাচরণ করিতে পারে না, এবং ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে অসার লোকে লোকনিন্দাভয় প্রদর্শন করে, ইহা সচরাচর দেখা গিয়া থাকে। যে লোক নিন্দা-ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত, সে সাক্ষাৎ নরপিশাচ। ভগবান্ স্বয়ং যে অর্জ্জুনকে সেই মহাপাপে উপদিষ্ট করিবেন, ইহা সম্ভব নহে। কোন জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই ইহা ঈশ্বরোক্তি বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। ইহা গীতাকারের নিজের কথা বলিয়াও গ্রহণ করিতে পারা যায় না; কেন না, গীতাকার যেই হউন, তিনি পরম জ্ঞানী এবং ভগবদ্ধর্ম্মে সুদীক্ষিত; এরূপ পাপোক্তি তাঁহা হইতেও সম্ভবে না। যদি কেহ বলেন যে, এই শ্লোক চারিটি প্রক্ষিপ্ত, তবে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা শঙ্করের পর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। শঙ্কর এই কয় শ্লোককে "লৌকিক ন্যায়" বলিয়াছেন।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যদি "লৌকিক স্থায়" পরিত্যাগ না করিবেন, তবে আর দাঁড়াই কোথায়! যাহাই হউক, লোকনিন্দার কথার পর, ও পৃথিবীভোগের কথার পরেই "এষা-তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে" ইত্যাদি কথা অসংলগ্ন বোধ হয় বটে। অতএব যাঁহারা এই চারিটি শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলিবেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা বিবাদ করিতে ইচ্ছুক নহি।

বলিতে কেবল বাকি আছে যে, যদিও ৩৭শ শ্লোকে লোকনিন্দা-ভয় দেখান নাই, তথাপি ইহা স্বার্থবাদ-পরিপূর্ণ। স্বর্গ বা রাজ্যের প্রলোভন দেখাইয়া ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করা, আর ছেলেকে মিঠাই দিব বলিয়া সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করা, তুল্য কথা। উভয়ই নিকৃষ্ট স্বার্থপরতার উত্তেজনা মাত্র।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥৩৮॥

অতএব, সুখদুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয় তুল্যজ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ উদ্‌যুক্ত হও। নচেৎ পাপযুক্ত হইবে। ৩৮।

যুদ্ধই যদি অধর্ম্ম, অতএব অপরিহার্য্য, তবে তাহাতে সুখ-দুঃখ, লাভালাভ, জয়-পরাজয় সমান জ্ঞান করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কেন না, ফল যাহাই হউক, যাহা অনুষ্ঠেয়, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য—করিলে সুখ হইবে কি দুঃখ হইবে, লাভ হইবে কি অলাভ হইবে, ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে। ইহাই পশ্চাৎ কর্ম্মযোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা—

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥৩৮॥

পাঠক দেখিবেন, ৩৭শ শ্লোকের পর আবার সুর ফিরিয়াছে। এখন যথার্থ ভগবদ্‌গীতার মহিমাময় শব্দ পাওয়া যাইতেছে। এই যথার্থ কৃষ্ণের বংশীরব। ৩৪—৩৭শ শ্লোক ও ৩৮শ শ্লোকে কত প্রভেদ!

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥৩৯॥

তোমাকে সাংখ্যে এই জ্ঞান কথিত হইল। (কর্ম্ম) যোগে ইহা (যাহা বলিব) শ্রবণ কর। তদ্দ্বারা যুক্ত হইলে, হে পার্থ! কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইবে। ৩৯।

প্রথম—সাংখ্য কি? "সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা। সম্যগ্‌জ্ঞানং তস্যাং প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যম্।" (শ্রীধর)। যাহার দ্বারা বস্তুতত্ত্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয়, তাহা সংখ্যা। তাহার সম্যগ্‌জ্ঞান প্রকাশমান আত্মতত্ত্ব সাংখ্য। সচরাচর সাংখ্য নামটি এক্ষণে দর্শনবিশেষ-সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তজ্জন্য ইংরেজ পণ্ডিতেরা গুরুতর ভ্রমে পড়িয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই গীতাগ্রন্থে সাংখ্য শব্দ "তত্ত্বজ্ঞান" অর্থেই ব্যবহৃত দেখা যায়, এবং ইহাই ইহার প্রাচীন অর্থ বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিতীয়—যোগ কি? যেমন সাংখ্য এক্ষণে কপিল-দর্শনের নাম, যোগও এক্ষণে পাতঞ্জল-দর্শনের নাম। (পতঞ্জলি) যে অর্থে যোগ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, * এক্ষণে সচরাচর যোগ বলিলে তাহাই আমরা বুঝিয়া থাকি; কিন্তু গীতায় যোগ শব্দ সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। তাহা হইলে, "কর্ম্মযোগ" "ভক্তিযোগ" ইত্যাদি শব্দের কোন অর্থ হয় না। বস্তুতঃ গীতায় "যোগ" শব্দটি সর্ব্বত্র এক অর্থেই যে ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন কথাও বলা যায় না। সচরাচর ইহা গীতায় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, ঈশ্বরারাধনা বা মোক্ষের বিবিধ উপায় বা সাধনবিশেষই যোগ। জ্ঞান, ঈদৃশ একটি উপায় বা সাধন, কর্ম্ম তাদৃশ

---

* যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।

উপায়ান্তর, ভক্তি তৃতীয়, ইত্যাদি—এজন্য জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে। সচরাচর এই অর্থ, কিন্তু এ শ্লোকে সে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে না। এ স্থলে "যোগ" অর্থে কর্ম্মযোগ। এই অর্থে "যোগ" "যোগী" "যুক্ত" ইত্যাদি শব্দ গীতায় ব্যবহৃত হইতে দেখিব। স্থানান্তরে "যোগ" শব্দে জ্ঞান-যোগাদিও বুঝাইতে দেখা যাইবে।

অতএব এই শ্লোকের দুইটি শব্দ বুঝিলাম—সাংখ্য, জ্ঞান; এবং যোগ, কর্ম্ম। এক্ষণে মনুষ্যপ্রকৃতির কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

মনুষ্যজীবনে যাহা কিছু আছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন,—Thought, Action and Feeling. আমরা না হয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতাবলম্বী নাই হইলাম, তথাপি আমরা নিজেই মনুষ্যজীবন আলোচনা করিয়া দেখিলে জানিব যে, তাহাতে এই তিন ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই তিনকেই ঈশ্বরমুখ করা যাইতে পারে; তিনই ঈশ্বরার্পিত হইলে ঈশ্বরসমীপে লইয়া যাইতে পারে, Thought ঈশ্বরমুখ হইলে জ্ঞানযোগ; Action ঈশ্বরমুখ হইলে কর্ম্মযোগ; Feeling ঈশ্বরমুখ হইলে ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগের কথা এখন থাক। ৩৮ শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞানের কথা ভগবান্ অর্জ্জুনকে বুঝাইলেন; এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামই "সাংখ্যযোগ"। * জ্ঞানে অর্জ্জুনকে উপদিষ্ট করিয়া ভগবান্ এক্ষণে ৩৯ শ্লোক † হইতে কর্ম্মে উপদিষ্ট করিতেছেন। কি বলিতেছেন, এক্ষণে তাহাই শুন।

* চতুর্থাধ্যায়ের নাম জ্ঞানযোগ। প্রভেদ কি, পশ্চাৎ জানা যাইবে।

† মধ্যের চারিটি শ্লোক তবে কি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয় না।?

ভাষ্যকারেরা বলেন, এই কর্ম্ম, জ্ঞানের সাধন (শ্রীধর) বা প্রাপ্তির উপায় (শঙ্কর)। অর্থাৎ প্রথমে তত্ত্বজ্ঞান কি, তাহা অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া যদি অর্জ্জুনের তত্ত্বজ্ঞান অপরোক্ষ না হইয়া থাকে, তবে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবার নিমিত্ত এই "কর্ম্মযোগ" কহিতেছেন (হিতলাল মিশ্র)। বলা বাহুল্য, এরূপ কথা মূলে এখানে নাই। তবে স্থানান্তরে এরূপ কথা আছে বটে, যথা—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে। ৬।৩

কিন্তু আবার স্থানবিশেষে অন্য প্রকার কথাও পাওয়া যাইবে, যথা—যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে ইত্যাদি। ৫।৬।৫

এ সকল কথার মর্ম্ম পশ্চাৎ বুঝা যাইবে।

এই শ্লোকে কর্ম্মযোগের ফলও কথিত হইতেছে। এই ফল "কর্ম্মবন্ধ" হইতে মোচন। কর্ম্মবন্ধ কি? কর্ম্ম করিলেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। জন্মান্তরবাদীরা বলেন, এ জন্মে যাহা করা যায়, জন্মান্তরে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। যদি আর পুনর্জ্জন্ম না হয়, তবেই আর কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইল না। তাহা হইলেই কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি হইল। অতএব মোক্ষপ্রাপ্তই কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত।

কিন্তু যে জন্মান্তর না মানে, সেও কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি এ জীবনের চরমোদ্দেশ্য বলিয়া মানিতে পারে। পরকালে বা জন্মান্তরে কি হইবে, তাহা জানি না, কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে, ইহজন্মেই আমরা সকল কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকি। আমরা সকলেই জানি যে, হিম লাগাইলে ইহজন্মেই সর্দ্দি হয়। আমরা সকলেই জানি যে, রোগের চিকিৎসা করিলে রোগ আরাম হয়। সকলেই জানি যে, আমরা যদি কাহারও শত্রুতা করি, তবে সেও ইহজীবনেই আমাদের শত্রুতা করে, এবং আমরা যদি কাহারও উপকার করি, তবে তাহার ইহজীবনেই

আমাদের প্রত্যুপকার করার সম্ভাবনা। সকলেই জানে, ধনসঞ্চয় করিলেই ইহজন্মেই "বড়মানুষী" করা যায়, এবং পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিলেই ইহজন্মেই বিদ্যালাভ করা যায়। সকল প্রকার কর্ম্মের ফল, ইহজন্মেই এইরূপ পাওয়া গিয়া থাকে।

তবে কতকগুলি কর্ম্ম আছে, তাহার বিশেষ প্রকার ফলের প্রত্যাশা করিতে আমরা শিক্ষিত হইয়াছি। এই কর্ম্মগুলিকে সচরাচর পাপ-পুণ্য বলিয়া থাকে। তাহার যে সকল ফল প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা করিতে আমরা শিখিয়াছি, তাহা ইহজন্মে পাই না বটে। আমরা শিখিয়াছি যে, দান করিলে স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু ইহজীবনে কাহারও স্বর্গলাভ হয় না। কেহ বা মনে করেন, একগুণ দিলে দশগুণ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহজীবনে একগুণ দিলে অর্দ্ধগুণও পাওয়া যায় না। শুনা আছে, চুরি করিলে একটা ঘোরতর পাপ হয়। কিন্তু ইহজীবনে চুরি করিয়া সকলে রাজদণ্ডে পড়ে না—সকলে সে পাপের কোন প্রকার দণ্ড দেখিতে পায় না। সকলে দেখিতে পায় না বলিয়া ইহজীবনে চুরির কোন প্রকার দণ্ড নাই—কর্ম্মফলভোগ নাই, এমত নহে; এবং দানের যে কোন পুরস্কার নাই, তাহাও নহে। চিত্তপ্রসাদ আছে—পুনঃ পুনঃ দানে আপনার চিত্তের উন্নতি এবং মাহাত্ম্যবৃদ্ধি আছে। পাপপুণ্যে ইহজীবনে কিরূপ সমুচিত কর্ম্মফল পাওয়া যায়, তাহা আমি গ্রন্থান্তরে বুঝাইয়াছি, *পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। যাঁহাদের ইচ্ছা হইবে, সেই গ্রন্থে দৃষ্টি করিবেন।

সেই গ্রন্থে ইহাও বুঝাইয়াছি যে, সম্পূর্ণ ধর্ম্মাচরণের দ্বারা ইহজীবনেই মুক্তিলাভ করা যায়। সেই মুক্তি কি প্রকার এবং কিরূপেই বা লাভ হয়, তাহাও সেই গ্রন্থে বুঝাইয়াছি। সে সকল কথা আর এখানে পুনরুক্ত করিব না। ফলে জীবন্মুক্তি হিন্দুধর্ম্মের বহির্ভূত তত্ত্ব নহে। এই গীতাতেই উক্ত হইয়াছে যে, জীবন্মুক্তি লাভ করা যায়। আমরা ক্রমশঃ তাহা বুঝিব। যেরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহা লাভ করা যাইতে পারে, তাহাই কর্ম্মযোগ, ইহাও দেখিব। সুতরাং যাঁহারা জন্মান্তর মানেন না, তাঁহারাও কর্ম্মযোগের দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারেন। গীতোক্ত ধর্ম্ম বিশ্বলৌকিক, ইহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে।

উপসংহারে বলা কর্ত্তব্য যে, আর এক কর্ম্মফলের কথা আছে। হিন্দুরা যাগযজ্ঞ-ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন—কর্ম্মফল পাইবার জন্য। এই সকলেতে ইহলোকে যে কোন প্রকার ফল পাওয়া যায় না, এমন কথা আমরা বলি না। একাদশীব্রত করিলে শারীরিক স্বাস্থ্যলাভ করা যায়, এবং অন্যান্য যাগযজ্ঞের ও ব্রতাদির কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক ফল পাওয়া যাইতে পারে। তবে হিন্দুরা সচরাচর যে সকল ফল কামনা করিয়া এই সকল অনুষ্ঠান করেন, তাহা এ জন্মে পাওয়া যায় না বটে। ভরসা করি, এ টীকার এমন কোন পাঠক উপস্থিত হইবেন না, যিনি এ প্রশ্নের কোন উত্তর প্রত্যাশা করিবেন।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥৪০॥

এই (কর্ম্মযোগে) প্রারম্ভের নাশ নাই; প্রত্যবায় নাই; এ ধর্ম্মের অল্পতেই মহদ্ভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ৪০।

জ্ঞান-সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা যায় না। কেন না, অল্পজ্ঞানের কোন ফলোপধায়িতা নাই; বরং প্রত্যবায় আছে, উদাহরণ—সামান্য জ্ঞানায় ঈশ্বরানুসন্ধানে নাস্তিকতা উপ-

* ধর্ম্মতত্ত্ব।

স্থিত হইয়া থাকে, এমন সচরাচর দেখা গিয়াছে।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥৪১॥

হে কুরুনন্দন! ইহাতে (কর্ম্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি একই হইয়া থাকে। কিন্তু অব্যবসায়িগণের বুদ্ধি বহুশাখাযুক্ত ও অনন্ত হইয়া থাকে। ৪১।

শ্রীধর বলেন, "পরমেশ্বরে ভক্তির দ্বারা আমি নিশ্চিত ত্রাণ পাইব," এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। ইহা একই হয়, অর্থাৎ একনিষ্ঠই হয়, নানা বিষয়ে ধাবিত হয় না। কিন্তু যাহারা অব্যবসায়ী, অর্থাৎ যাহাদের সেরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নাই, অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বরারাধনাবহির্মুখ, এবং সকাম, তাহাদের কামনা-সকল অনন্ত, এবং কর্ম্মফল-গুণফলত্বাদির প্রকারভেদ আছে, এজন্য তাহাদের বুদ্ধিও বহুশাখা ও অনন্ত হয়, অর্থাৎ কত দিকে যায়, তাহার অন্ত নাই। যাহারা কামনাপরবশ, এবং কামনাপরবশ হইয়াই কাম্যকর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাদিগের ঈশ্বরারাধনার বুদ্ধি একনিষ্ঠ নহে, নানাবিধ বিষয়েই প্রধাবিত হয়।

কথাটার স্থূল তাৎপর্য্য এই। ভগবান্ কর্ম্মযোগের অবতারণা করিতেছেন, কিন্তু অর্জ্জুন সহসা মনে করিতে পারেন যে, কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানই কর্ম্মযোগ, কেন না, তৎকালে বৈদিক কাম্যকর্ম্মই কর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। কর্ম্ম বলিলে সেই সকল কর্ম্মই বুঝায়। অতএব প্রথমেই ভগবান্ বলিয়া রাখিতেছেন যে, কাম্যকর্ম্ম যোগ নহে, তাহার বিরোধী। কর্ম্ম কি, তাহা পশ্চাৎ বলিবেন, কিন্তু তাহা বলিবার আগে এ বিষয়ে যে সাধারণ ভ্রম প্রচলিত, পরে তাহারই নিরাস করিতেছেন।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥৪২॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥৪৩॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥৪৪॥

হে পার্থ! অবিবেকিগণ এই শ্রবণরমণীয়, জন্মকর্ম্মফলপ্রদ ভোগৈশ্বর্য্যের সাধনভূত, ক্রিয়াবিশেষবহুল বাক্য বলে, যাহারা বেদবাদরত "(তদ্ভিন্ন) আর কিছুই নাই" যাহারা ইহা বলে, তাহারা কামাত্মা, স্বর্গপর, ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত এবং সেই কথায় যাহাদের চিত্ত অপহৃত, তাহাদের বুদ্ধি সমাধিতে সংশয়বিহীন হয় না। ৪২।৪৩।৪৪।

এই তিনটি শ্লোক ও ইহার পরবর্ত্তী দুই শ্লোকের ও ৫৩শ্লোকের বিশেষ প্রাধান্য আছে; কেন না, এই ছয়টি শ্লোকে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে; এবং গীতার এবং কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বুঝিবার জন্য ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। অতএব ইহার প্রতি পাঠকের বিশেষ মনোযোগের অনুরোধ করি। *

---

* এই শ্লোকত্রয়ের বিশেষ প্রাধান্য আছে বলিয়া পাঠকের সন্দেহভঞ্জনার্থ মৎকৃত অনুবাদ ভিন্ন আর একটি অনুবাদ দেওয়া ভাল। এজন্য কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদককৃত অনুবাদও এ স্থলে দেওয়া গেল। উহা অবিকল অনুবাদ, এমন বলা যায় না, কিন্তু বিশদ বটে।

"যাহারা আপাতমনোহর শ্রবণরমণীয় বাক্যে অনুরক্ত; বহুবিধ ফলপ্রকাশক বেদবাক্যই যাহাদের প্রীতিকর; যাহারা স্বর্গাদি ফলসাধন কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুই স্বীকার করে না; যাহারা কামনাপরায়ণ, স্বর্গই যাহাদের পরমপুরুষার্থ; জন্ম কর্ম্ম ও ফলপ্রদ ভোগ

প্রথমতঃ শ্লোকত্রয়ে যে কয়টা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাউক।

কাম্যকর্ম্মের কথা হইতেছিল। এখনও সেই কথাই হইতেছে। কাম্যকর্ম্মবিষয়িণী কথাকে আপাতশ্রুতিসুখকর বলা হইতেছে; কেন না, বলা হইয়া থাকে যে, এই করিলে স্বর্গলাভ হইবে, এই করিলে রাজ্যলাভ হইবে, ইত্যাদি।

সেই সকল কথা "জন্মকর্ম্মফলপ্রদ।" শঙ্কর ইহার এইরূপ অর্থ করেন, "জন্মৈব কর্ম্মণঃ ফলং জন্মকর্ম্মফলং, তৎ প্রদদাতীতি জন্মকর্ম্মফলপ্রদা।" জন্মই কর্ম্মের ফল, যাহা তাহা প্রদান করে, তাহা "জন্মকর্ম্মফলপ্রদ।" শ্রীধর ভিন্ন প্রকার অর্থ করেন; "জন্ম চ তত্র কর্ম্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি।" জন্ম, তথা কর্ম্ম এবং তাহার ফল, ইহা যে প্রদান করে। অনুবাদকেরা কেহ শঙ্করের, কেহ শ্রীধরের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। দুই অর্থই গ্রহণ করা যাইতে পারে।

তার পর ঐ কাম্যকর্ম্মবিষয়িণী কথাকে "ভোগৈশ্বর্য্যের সাধনভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল" বলা হইয়াছে। ইহা বুঝিবার কোন কষ্ট নাই। ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তির জন্য ক্রিয়াবিশেষের বাহুল্য ঐ সকল বিধিতে আছে, এইমাত্র অর্থ।

কথা এইরূপ। যাহারা এই সকল কথা বলে, তাহারা "বেদ-বাদরত।" বেদেই এই সকল কাম্যকর্ম্মবিষয়িণী কথা আছে—অন্ততঃ তৎকালে বেদেই ছিল; এবং এখনও ঐ সকল কর্ম্ম বেদমূলক বলিয়াই প্রসিদ্ধ ও অনুষ্ঠেয়। যাহারা কাম্যকর্ম্মানুরাগী, তাহারা বেদেরই দোহাই দেয়—বেদ ছাড়া "আর কিছু নাই," ইহাই বলে। অর্থাৎ বেদোক্ত কাম্যকর্ম্মাত্মক যে ধর্ম্ম, তাহা ভিন্ন আর কিছু ধর্ম্ম নাই, ইহাই তাহাদের মত। তাহারা "কামাত্মা" বা কামনাপরবশ—"স্বর্গপর" অর্থাৎ স্বর্গই তাহাদের পরমপুরুষার্থ, ঈশ্বরে তাহাদের মতি নাই, মোক্ষলাভে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা নাই। তাহারা ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যে আসক্ত—সেই জন্যই স্বর্গকামনা করে, কেন না, স্বর্গ একটা ভোগৈশ্বর্য্যের স্থান বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস আছে। কাম্যকর্ম্মবিষয়ক পুষ্পিত বাক্য তাহাদের মনকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঈদৃশ ব্যক্তিরা অবিবেকী বা মূঢ়। সমাধিতে—ঈশ্বরে চিত্তের যে অভিমুখতা বা একাগ্রতা—তাহাতে, এবংবিধ বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হয় না।

শ্লোকত্রয়ের অর্থ এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি। বেদে নানাবিধ কাম্যকর্ম্মের বিধি আছে; বেদে বলে যে, সেই সকল বহুপ্রকার কাম্যকর্ম্মের ফলে স্বর্গাদি বহুবিধ ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তি হয়, সুতরাং আপাততঃ শুনিতে সে সকল কথা বড় মনোহারিণী। যাহারা কামনাপরায়ণ, আপনার ভোগৈশ্বর্য্য খুঁজে, সেই জন্য স্বর্গাদি কামনা করে, তাহাদের মন সেই সকল কথায় মুগ্ধ হয়। তাহারা কেবল বেদেরই দোহাই দিয়া বেড়ায়, বলে, ইহা ছাড়া আর ধর্ম্ম নাই। তাহারা মূঢ়। তাহাদের বুদ্ধি কখন ঈশ্বরে একাগ্র হইতে পারে না। কেন না, তাহাদের বুদ্ধি "বহুশাখা" ও "অনন্তা," ইহা পূর্ব্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে।

কথাটা বড় ভয়ানক ও বিস্ময়কর। ভারতবর্ষ এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেও বেদশাসিত। আজিও বেদের যে প্রতাপ, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের তাহার সহস্রাংশের এক অংশ নাই। সেই

ও ঐশ্বর্য্যের সাধনভূত নানাবিধ ক্রিয়াপ্রকাশক বাক্যে যাদের চিত্ত অপহৃত হইয়াছে; এবং যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে একান্ত সংসক্ত; সেই বিবেকবিহীন মূঢ়দিগের বুদ্ধি সমাধিবিষয়ে সংশয়শূন্য হয় না।"

প্রাচীনকালে বেদের আবার ইহার সহস্র গুণ প্রতাপ ছিল। সাংখ্যপ্রবচনকার ঈশ্বর মানেন না—ঈশ্বর নাই, এ কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতে সাহস করিয়াছেন, তিনিও বেদ অমান্য করিতে সাহস করেন না—পুনঃ পুনঃ বেদের দোহাই দিতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন, এই বেদবাদীরা মূঢ়, বিলাসী; ইহারা ঈশ্বরারাধনার অযোগ্য।

ইহার ভিতর একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব *নিহিত আছে। তাহা বুঝাইবার আগে, আর দুইটা কথা বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ, কৃষ্ণের ঈদৃশ উক্তি বেদের নিন্দা নহে,* বৈদিককর্ম্মবাদীদিগের নিন্দা। যাহারা বলে, বেদোক্ত কর্ম্মই (যথা, অশ্বমেধাদি) ধর্ম্ম, কেবল তাহাই আচরণীয়, তাহাদেরই নিন্দা। কিন্তু বেদে যে কেবল অশ্বমেধাদি যজ্ঞেরই বিধি আছে, আর কিছু নাই, এমন নহে। উপনিষদে যে অত্যুন্নত ব্রহ্মবাদ আছে, গীতা সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুবাদিনী, তদুক্ত জ্ঞানবাদ অনেক সময়েই গীতায় উদ্ধৃত, সঙ্কলিত ও সম্প্রসারিত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মবাদ ও ভক্তিবাদের সহিত সমঞ্জসীভূত হইয়াছে। অতএব কৃষ্ণের এতদুক্তিতে সমস্ত বেদের নিন্দা বিবেচনা করা অনুচিত। তবে, দ্বিতীয় কথা এই বক্তব্য যে, যাঁহারা বলেন যে, বেদে যাহা আছে, তাহাই ধর্ম্ম, তাহা ছাড়া আর কিছু ধর্ম্ম নহে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মধ্যে নহেন। তিনি বলেন, (১) বেদে ধর্ম্ম আছে, ইহা মানি। (২) কিন্তু বেদে এমন অনেক কথা আছে, যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে—যথা, এই সকল জন্মকর্ম্মফলপ্রদা ক্রিয়াবিশেষবহুলা পুষ্পিতা কথা। (৩) তিনি আরও বলেন যে, যেমন একদিকে বেদে এমন অনেক কথা আছে, যাহা ধর্ম্ম নহে, আবার অপরদিকে অনেক তত্ত্ব যাহা প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব, অথচ বেদে নাই। ইহার উদাহরণ আমরা গীতাতেই পাইব। কিন্তু গীতা ভিন্ন মহাভারতের অন্যস্থানেও পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ কর্ণপর্ব্ব হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রুতের্ধর্ম্ম ইতি হ্যেকে বদন্তি বহবো জনাঃ।
তত্তে ন প্রত্যসূয়ামি ন চ সর্ব্বং বিধীয়তে॥৫৬॥
প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্॥৫৭॥ *

যদি কেহ ইহাকে বেদনিন্দা বলিতে চাহেন, তবে শ্রীকৃষ্ণ বেদনিন্দক এবং গীতার এবং মহাভারতের অন্যত্র বেদনিন্দা আছে। *বস্তুতঃ ইহা এই পর্য্যন্ত বেদনিন্দা যে, এতদ্দ্বারা বেদের অসম্পূর্ণতা সূচিত হয়।*

ততদূর ইহাকে না হয়, বেদনিন্দাই বলা যাউক। এই বেদনিন্দার ভিতর একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে বলিয়াছি, তাহা মৎপ্রণীত "ধর্ম্মতত্ত্ব" গ্রন্থে বুঝাইয়াছি। কিন্তু ঐ গ্রন্থ সম্প্রতি মাত্র প্রচারিত হইয়াছে। এজন্য পাঠকদিগের সুলভ না হইতে পারে। অতএব প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাস্যদেবের যে সম্বন্ধ দেখা যায়, বৈদিক ধর্ম্মে উপাস্য-উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। 'হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই সোমরস পান কর, হবি ভোজন কর, আর আমাকে ধন দাও, সম্পদ্ দাও, পুত্র দাও, গোরু দাও, শস্য

---

* "অনেকে শ্রুতিকে ধর্ম্মপ্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট নাই। এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়।" কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ—কর্ণপর্ব্ব, ৭০ অধ্যায়। সিংহ মহোদয় যে কাপি দেখিয়া অনুবাদ করিয়াছেন তাহাতে এই শ্লোক দুটি ৭০ অধ্যায়ে আছে। কিন্তু অন্যত্র ৬৯ অধ্যায়ে ইহা পাওয়া যায়।

'দাও, আমার শত্রুকে পরাস্ত কর।' বড় জোর বলিলেন, 'আমার পাপ ধ্বংস কর।' দেবগণকে এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রসন্ন করিবার জন্য বৈদিকেরা যজ্ঞাদি করিতেন। এইরূপ কাম্য বস্তুর উদ্দেশে যজ্ঞাদি করাকে কাম্যকর্ম্ম বলে।

কাম্যাদি-কর্ম্মাত্মক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কর্ম্ম। এই কাজ করিলে, তাহার এই ফল; অতএব কাজ করিতে হইবে এইরূপ ধর্ম্মার্জ্জনের যে পদ্ধতি, তাহারই কর্ম্ম। বৈদিক কালের শেষভাগে এইরূপ আত্মক ধর্ম্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যাগযজ্ঞের দৌরাত্ম্যে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন অবস্থায়, উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই কর্ম্মাত্মক ধর্ম্ম বৃথা ধর্ম্ম। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বুঝিয়াছিলেন যে, বৈদিক দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝা যায় না; ভিতরে ইহার একটা অজ্ঞেয় কারণ আছে। তাঁহারা সেই কারণের অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন।

এই সকল কারণে কর্ম্মের উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাঁহারা ত্রিবিধ বিপ্লব উপস্থিত করিলেন। সেই বিপ্লবের ফলে আসিয়া প্রদেশ অদ্যাপি শাসিত। একদল চার্ব্বাক—তাঁহারা বলেন, কর্ম্মকাণ্ড সকলই মিথ্যা—খাও দাও, নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নেতা শাক্যসিংহ—তিনি বলিলেন, কর্ম্মফল মানি বটে, কিন্তু কর্ম্ম হইতেই দুঃখ। কর্ম্ম হইতে পুনর্জ্জন্ম। অতএব কর্ম্মের ধ্বংস কর, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া চিত্তসংযম পূর্ব্বক অষ্টাঙ্গ ধর্ম্মপথে গিয়া নির্ব্বাণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিকদিগের দ্বারা উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা প্রায় ব্রহ্মবাদী। তাঁহারা দেখিলেন যে, জগতের যে অনন্ত কারণভূত চৈতন্যের অনুসন্ধানে তাঁহারা প্রবৃত্ত, তাহা অভিন্ন ব্রহ্মের। সেই ব্রহ্ম জানিতে পারিলে সেই জগতের অন্তরাত্মা বা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ এবং জগতের সঙ্গেই বা তাঁহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে পারিলে, বুঝা যাইতে পারে যে, এ জীবন লইয়া কি করিতে হইবে। সেটা কঠিন—তাহা জানাই ধর্ম্ম। অতএব জ্ঞানই ধর্ম্ম—জ্ঞানই নিঃশ্রেয়স। বেদের যে অংশকে উপনিষদ্ বলা যায়, তাহা এই প্রথম জ্ঞানবাদীদিগের কীর্ত্তি। ব্রহ্ম-নিরূপণ ও আত্মজ্ঞানই উপনিষদ্-সকলের উদ্দেশ্য। তার পর ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিবর্দ্ধিত ও প্রচারিত হইয়াছে। কপিলের সাংখ্যে ব্রহ্ম পরিত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানবাদাত্মক।

শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞানবাদীদিগের মধ্যে। কিন্তু অন্য জ্ঞানবাদী যাহা দেখিতে পায় না, অনন্ত জ্ঞানী তাহা দেখিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, জ্ঞান সকলের আয়ত্ত নহে; অন্ততঃ অনেকের পক্ষে অতি দুঃসাধ্য। তিনি আরও দেখিয়াছিলেন, ধর্ম্মের অন্য পথও আছে; অধিকারীভেদে তাহা জ্ঞানাপেক্ষা সুসাধ্য। পরিশেষে ইহাও দেখিয়াছিলেন, অথবা দেখাইয়াছেন, জ্ঞানমার্গ, এবং অন্যমার্গ পরিণামে সকলই এক। এই কয়টি কথা লইয়া গীতা।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫॥

হে অর্জ্জুন! বেদ-সকল ত্রৈগুণ্যবিষয়; তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও। নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, যোগ-ক্ষেমরহিত এবং আত্মবান্ হও। ৪৫।

এই শ্লোকে ব্যবহৃত শব্দগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুবাদে তাহার কিছুই পরিষ্কার করা গেল না। প্রথম, "ত্রৈগুণ্যবিষয়" কি? সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই

ত্রিগুণ; ইহার সমষ্টি ত্রৈগুণ্য। এই তিন গুণের সমষ্টি কোথায় দেখি? সংসারে। সেই সংসার যাহার বিষয়, অর্থাৎ প্রকাশয়িতব্য (Subject), তাহাই "ত্রৈগুণ্যবিষয়।" সংসারই বেদের বিষয়, এইজন্য বেদ-সকল "ত্রৈগুণ্য-বিষয়।"

শঙ্করাচার্য্য এইরূপ অর্থ করিয়াছেন তিনি বলেন, "ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ ত্রৈগুণ্যং সংসারো বিষয়ঃ প্রকাশয়িতব্যো যেষাং তে বেদাস্ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ।" ইহাও একটু বেদ-নিন্দার মত শুনায়। অতএব, শঙ্করের টীকাকার আনন্দগিরি প্রমাদ গণিয়া সকল দিক্ বজায় রাখিবার জন্য লিখিলেন, "বেদশব্দেনাত্র কর্ম্মকাণ্ডমেব গৃহ্যতে। তদভ্যাসবতাং তদনুষ্ঠানদ্বারা সংসারধ্রৌব্যান্ন বিবেকাবসরো-হস্তীত্যর্থঃ।" অর্থাৎ "এখানে বেদ শব্দেরও অর্থ কর্ম্মকাণ্ড বুঝিতে হইবে। যাহারা তাহা অভ্যাস করে, তাহাদের তদনুষ্ঠান দ্বারা সংসারধ্রৌব্য হেতু বিবেকের অবসর থাকে না।" বেদের কতটুকু কর্ম্মকাণ্ড, আর কতটুকু জ্ঞানকাণ্ড, সে বিষয়ে কোন ভ্রম না ঘটিলে, আনন্দগিরির এ কথায় আমাদের কোন আপত্তি নাই।

শ্রীধরস্বামী বলেন, "ত্রিগুণাত্মকাঃ সকামা যে অধিকারিণস্তদ্বিষয়াঃ কর্ম্মফলসম্বন্ধ-প্রতিপাদকা বেদাঃ।" এই ব্যাখ্যা অবলম্বনে প্রাচীন বাঙ্গালা অনুবাদক হিতলাল মিশ্র বুঝাইয়াছেন যে, "ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সকাম অধিকারীদিগের নিমিত্তই (!) বেদ-সকল কর্ম্মফল-সম্বন্ধে প্রতিপাদক হয়েন।" এবং শ্রীধরের বাক্যেরই অনুসরণ করিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতকার এই শ্লোকার্দ্ধের অনুবাদ করিয়াছেন যে—"বেদসকল সকাম ব্যক্তিদিগের কর্ম্মফল-প্রতিপাদক।" অন্যান্যও সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন।

উভয় ব্যাখ্যা মর্ম্মতঃ এক। সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। তাহা হইলেই ইহার অর্থ এই হইতেছে যে, "হে অর্জ্জুন! বেদ-সকল সংসারপ্রতিপাদক বা কর্ম্মফলপ্রতিপাদক। তুমি বেদকে অতিক্রম করিয়া সাংসারিক বিষয়ে বা কর্ম্মফলবিষয়ে নিষ্কাম হও।" কথাটা কি হইতেছিল, স্মরণ করিয়া দেখা যাউক্। প্রথমে ভগবান্ অর্জ্জুনকে সাংখ্যযোগ বুঝাইয়া তৎপরে কর্ম্মযোগ বুঝাইবেন, অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু কর্ম্মযোগ কি, তাহা এখনও বলেন নাই। কেন না, কর্ম্ম-সম্বন্ধে যে একটা গুরুতর সাধারণ ভ্রম প্রচলিত ছিল, (এবং এখনও আছে), প্রথমে তাহার নিরাস করা কর্ত্তব্য। নহিলে প্রকৃত কর্ম্ম কি, অর্জ্জুন তাহা বুঝিবেন না। সে সাধারণ ভ্রম এই যে, বেদে যে সকল যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান-প্রথা কথিত ও বিহিত হইয়াছে, তাহাই কর্ম্ম। ভগবান্ বুঝাইতে চাহেন যে, ইহা প্রকৃত কর্ম্ম নহে। বরং যাহারা ইহাতে চিত্তনিবেশ করে, ঈশ্বরারাধনায় তাহাদিগের একাগ্রতা হয় না। এজন্য প্রকৃত কর্ম্মযোগীর উহা কর্ম্ম নহে। এই ৪৫শ শ্লোকে সেই কথাই পুনরুক্ত হইতেছে। ভগবান্ বলিতেছেন যে, বেদ-সকল, যাহারা সংসারী অর্থাৎ সংসারের সুখ খোঁজে, তাহাদিগেরই অনুসরণীয়। তুমি সেরূপ সাংসারিক সুখ খুঁজিও না। ত্রৈগুণ্যের অতীত হও।

কি প্রকারে ত্রৈগুণ্যের অতীত হইতে পারা যায়, শ্লোকের দ্বিতীয় অর্দ্ধে তাহা কথিত হইতেছে। ভগবান্ বলিতেছেন—তুমি নির্দ্বন্দ্ব হও, নিত্যসত্ত্বস্থ হও, যোগ-ক্ষেম-রহিত হও এবং আত্মবান্ হও। এখন এই কটা কথা বুঝিলেই শ্লোক বুঝা হয়।

১। নির্দ্বন্দ্ব—শীতোষ্ণ-সুখদুঃখাদিকে দ্বন্দ্ব

বলে,তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। যে সে সকল তুল্য জ্ঞান করে, সেই নির্দ্বন্দ্ব।

২। নিত্যসত্ত্বস্থ—নিত্য সত্ত্বগুণাশ্রিত।

৩। যোগ-ক্ষেম-রহিত - যাহা অপ্রাপ্ত, তাহার উপার্জ্জনকে যোগ বলে, আর যাহা প্রাপ্ত, তাহার রক্ষণকে ক্ষেম বলে। অর্থাৎ উপার্জ্জন-রক্ষা-সম্বন্ধে যে চিন্তা, তদ্রহিত হও।

৪। আত্মবান্—অথবা অপ্রমত্ত। *

---

* আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ মূলসঙ্গত বোধ হইয়াছে, আমি সেইরূপ অর্থ করিলাম। কিন্তু যাঁহারা বেদের গৌরব বজায় রাখিয়া এই শ্লোকের অর্থ করিতে চান, তাঁহারা কিরূপ বুঝেন, তাহার উদাহরণস্বরূপ বাবু কেদারনাথ দত্ত কৃত এই শ্লোকের ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকের যে অর্থ সঙ্গত বোধ হয়, সেই অর্থই গ্রহণ করিবেন।

"শাস্ত্রসমূহের দুই প্রকার বিষয়—অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বিষয় ও নির্দ্দিষ্ট বিষয়। যে বিষয়টি যে শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য,তাহাই তাহার উদ্দিষ্ট বিষয়। যে বিষয়কে নির্দ্দেশ করিয়া উদ্দিষ্ট বিষয়কে লক্ষ্য করে,সেই বিষয়ের নাম নির্দ্দিষ্ট বিষয়। অরুন্ধতী যে স্থলে উদ্দিষ্ট বিষয়, সে স্থলে তাহার নিকটে প্রথমে লক্ষিত যে স্থূল তারা, তাহাই নির্দ্দিষ্ট বিষয় হয়। বেদসমূহ নিগুর্ণ তত্ত্বকে উদ্দিষ্ট বলিয়া লক্ষ্য করে,কিন্তু নিগুর্ণ তত্ত্ব সহসা লক্ষিত হয় না বলিয়া প্রথমে কোন সগুণ তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সেই জন্যই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ ত্রিগুণময়ী মায়াকেই প্রথম দৃষ্টিক্রমে বেদ-সকলের বিষয় বলিয়া বোধ হয়। হে অর্জ্জুন, তুমি সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নিগুর্ণ তত্ত্বরূপ উদ্দিষ্ট তত্ত্ব লাভ করত নিস্ত্রৈগুণ্য স্বীকার কর। বেদশাস্ত্রে কোন স্থলে রজস্তমোগুণাত্মক কর্ম্ম, কোন স্থলে সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে নিগুর্ণ ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। গুণময় মানাপমানাদি দ্বন্দ্বভাব হইতে রহিত হইয়া নিত্য সত্ত্ব অর্থাৎ আমার ভক্তগণের সঙ্গ করত কর্ম্মজ্ঞানমার্গের অনুসন্ধেয় যোগ ও ক্ষেমানুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিযোগ সহকারে নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ কর।"

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥৪৬

এখানে এই শ্লোকের অনুবাদ দিলাম না। টীকার ভিতরে অনুবাদ পাওয়া যাইবে। কেন না, এই শ্লোকের প্রচলিত যে অর্থ, তাহাতে দুই একটা আপত্তি ঘটে,সে সকলের মীমাংসা না করিয়া অনুবাদ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে।

আমি এই শ্লোকের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা বুঝাইব।

প্রথম। যে ব্যাখ্যাটি পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত, এবং শঙ্কর ও শ্রীধরাদির অনুমোদিত, তাহাই অগ্রে বুঝাইব।

দ্বিতীয়। আর একটি নূতন ব্যাখ্যা পাঠকের সমীপে তাঁহার বিচার জন্য উপস্থিত করিব। সঙ্গত বোধ না হয়, পাঠক তাহা পরিত্যাগ করিবেন।

তৃতীয়। আধুনিক ইংরেজি অনুবাদকেরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও বুঝাইব।

সংক্ষেপতঃ সেই তিন প্রকার ব্যাখ্যা এই:—

১ম। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে উদপানে যাবানর্থঃ, বিজানতো ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু তাবানর্থঃ। ইংরেজি অনুবাদকেরা এই অর্থ করিয়াছেন। ইহার কোন মানে হয় না।

২য়। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। এই ব্যাখ্যা নূতন।

৩য়। উদপানে যাবানর্থঃ সংপ্লুতোদকে তাবানর্থঃ। এবং সর্ব্বেষু বেদেষু যাবানর্থঃ বিজানতো ব্রাহ্মণস্য তাবানর্থঃ। এই অর্থ প্রাচীন এবং প্রচলিত।

অগ্রে প্রচলিত ব্যাখ্যাই বুঝাইব। কিন্তু বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া যায় নাই; তদভাবে যাঁহারা সংস্কৃত না জানেন, তাঁহাদের অসুবিধা হইতে পারে, এজন্য প্রচলিত ব্যাখ্যার উদাহরণস্বরূপ প্রথমে প্রাচীন অনুবাদক হিতলাল মিশ্রকৃত অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"যাহা হইতে জল পান করা যায়, তাহা উদপান শব্দে বাচ্য, অর্থাৎ পুষ্করিণী এবং কূপাদি। তাহাতে স্থিত অল্প জলে একেবারে সমস্ত প্রয়োজন-সাধনের অসম্ভব হেতু সেই সমস্ত কূপাদি পরিভ্রমণ করিলে, পৃথক্ পৃথক্ যে প্রকার স্নান-পানাদি প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, সে সমুদয় প্রয়োজন সংপ্লুতোদক শব্দবাচ্য এক মহাহ্রদে একত্র যেমন নির্ব্বাহ হইতে পারে, তদ্রূপ সমস্ত বেদে কথিত যে কর্ম্মফলরূপ অর্থ তাহা সমুদায়ই ভগবদ্ভক্তিযুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির তদ্দারাই সম্পন্ন হয়।"

শঙ্কর ও শ্রীধর উভয়েই এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, কাজেই আর সকলে সেই পথের পথিক হইয়াছেন। শ্রীধর-কৃত ব্যাখ্যা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

"উদকং পীয়তে যস্মিংস্তদুদপানং বাপীকূপতড়াগাদি। তস্মিন্ স্বল্পোদকে একত্র কৃৎস্নার্থস্যাসম্ভবাত্তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্ স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি তাবান্ সর্ব্বোঽপ্যর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহাহ্রদে একত্রৈব যথা ভবতি এবং যাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু তত্তৎকর্ম্মফলরূপোঽর্থস্তাবান্ সর্ব্বোঽপি বিজানতো ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব।"

ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, যেমন ক্ষুদ্র জলাশয় অনেকগুলি পরিভ্রমণ করিলে যাবৎ-পরিমিত প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, এক মহাহ্রদেই তাবৎ প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, সেইরূপ, সমস্ত বেদে যাবৎ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি-যুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠায়, তাবৎ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।" *

আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি, এই ব্যাখ্যা বুঝিতে গিয়া যে গোলযোগে পড়িয়াছি, প্রাচীন মহামহোপাধ্যায়দিগের পাদপদ্মবন্দনাপূর্ব্বক আমি তাহা নিবেদন করিতেছি। যে আপনার সন্দেহ ব্যক্ত করিতে সাহস না করে, তাহার কোন জ্ঞানই জন্মে নাই; এবং জন্মিবারও সম্ভাবনা নাই।

'যাবৎ' 'তাবৎ' শব্দ পরিমাণবাচক। কিন্তু কেবল যাবৎ বলিলে কোন পরিমাণ বুঝা যায় না। একটা যাবৎ থাকিলেই, তার একটা তাবৎ আছেই। একটা তাবৎ থাকিলেই তার একটা যাবৎ আছেই। এমন

---

* শঙ্করাচার্য্য-ব্যবহৃত ভাষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার। শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, "সর্ব্বেষু বেদেষু বেদোক্তেষু কর্ম্মসু যোঽর্থো যৎ কর্ম্মফলং সোঽর্থো ব্রাহ্মণস্য সন্ন্যাসিনঃ পরমার্থতত্ত্বং বিজানতো যোঽর্থঃ যৎ বিজ্ঞানফলং সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ং তস্মিংস্তাবানেব সংপদ্যতে ইত্যাদি।" ইহার ভিতর অন্য যে কল-কৌশল থাকে, তাহা পশ্চাৎ বুঝাইব। সম্প্রতি "সর্ব্বেষু বেদেষু" ইহার যেরূপ অর্থ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন, তৎপ্রতি পাঠককে মনোযোগ করিতে বলি। "সর্ব্বেষু বেদেষু" অর্থ "বেদোক্তেষু কর্ম্মসু।" যে কারণে আনন্দগিরি বলিয়াছেন, "বেদশব্দেনাত্র কর্ম্মকাণ্ডমের গৃহ্যতে" সেই কারণে ইনও বলিয়াছেন, "সর্ব্বেষু বেদেষু" অর্থে "বেদোক্তেষু কর্ম্মসু।"

অনেক সময়ে ঘটে যে, কেবল 'যাবৎ' শব্দটা স্পষ্ট, তাহার পরবর্ত্তী 'তাবৎ'-কে বুঝিয়া লইতে হয়; যথা—'আমি যাবৎ না আসি, তুমি এখানে থাকিও।' ইহার প্রকৃত অর্থ, 'আমি যাবৎ না আসি, (তাবৎ) তুমি এখানে থাকিও।' অতএব স্পষ্টই হউক, আর উহ্যই হউক, যাবৎ থাকিলেই তাবৎ থাকিবে। তদ্রূপ তাবৎ থাকিলেই যাবৎ থাকিবে।

এই যাবৎ তাবৎ শব্দের পরস্পরের সম্বন্ধ এই, যে বস্তুর সঙ্গে যাবৎ থাকে, আর যাহার সঙ্গে তাবৎ থাকে, উভয়ের পরিমাণ এক বা সমান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। অতএব যাবৎ তাবৎ থাকিলে দুইটি তুল্য বা তুলনার বস্তু আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। 'আমি যাবৎ না আসি, (তাবৎ) তুমি এখানে থাকিও,' এই বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, 'আমার পুনরাগমন পর্য্যন্ত যে কাল, আর তোমার এখানে অবস্থিতিকাল, উভয়ে সমান হইবে।' এখানে এই দুইটি সময় তুল্য বা তুলনীয়।

এইরূপ যেখানে একটি যাবান্ আর একটি তাবান্ আছে, সেখানেও বুঝিতে হইবে যে, দুইটি বিষয় পরস্পর তুলিত হইতেছে। যদি তার পর আবার যাবান্ তাবান্ দেখি, তবে অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, আবার আরও দুইটি বিষয় পরস্পর তুলিত হইতেছে। ইহার অন্যথা কদাচ হইতে পারে না।

এখন, এই শ্লোকের মূলে মোটে একটি যাবান্ আর একটি তাবান্ আছে; অতএব বুঝিতে হইবে, দুইটি বিষয় মাত্র পরস্পর তুলিত হইতেছে, অর্থাৎ (১) উদপানে বা সঙ্কীর্ণ জলাশয়ে অবস্থাবিশেষে যাবৎ-পরিমিত প্রয়োজন, (২) সমস্ত বেদে অবস্থাবিশেষে তাবৎ প্রয়োজন। কিন্তু প্রাচীন টীকাকারদিগের কৃত যে ব্যাখ্যা, যাহার উদাহরণ উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দেখি যে, দুইটা যাবান্ এবং দুইটা তাবান্।* অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রথমে দুইটা বস্তু পরস্পর তুলিত হইলে পর, আবার দুইটা বস্তু পরস্পর তুলিত হইয়াছে। প্রথম, সঙ্কীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সমস্ত বেদ তুলিত না হইয়া, মহাহ্রদের সঙ্গে তুলিত হইতেছে। তার পর আবার সমস্ত বেদ, সঙ্কীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়া ব্রহ্মনিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা প্রাপ্ত হইল। ইহাতে কোন অর্থবিপর্য্যয় ঘটিতেছে কি না?

সচরাচর এ প্রশ্নের এই উত্তর যে, কোন অর্থবিপর্য্যয় ঘটিতেছে না। কেন না, যাবান্ তাবান্ যেখানে না ও থাকে, সেখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যাকারকে বসাইয়া লইতে হয়; তাহার উদাহরণ পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। এ কথার এখানে দুইটি আপত্তি উপস্থিত হইতেছে।

প্রথম আপত্তি এই। মানিলাম যে, ব্যাখ্যার প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যাকার যাবান্ তাবান্ বসাইয়া লইতে পারেন। কিন্তু যাবান্ কাটিয়া তাবান্ করিতে, তাবান্ কাটিয়া যাবান্ করিতে পারেন কি? আমি যদি বলি, আমি যাবৎ না আসি, তুমি এখানে থাকিও, তাহা হইলে ব্যাখ্যাকার তাবৎ শব্দ বসাইয়া লইয়া 'তাবৎ এখানে থাকিও' বলিতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি যাবৎ কাটিয়া তাবৎ করেন, তাবৎ কাটিয়া যাবৎ করেন, যদি বলেন যে, এই বাক্যের অর্থ 'আমি তাবৎ না আসি, যাবৎ তুমি এখানে থাকিও', তাহা হইলে তাঁহার ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য ও মূলের বিপরীত বলিতে হইবে।

আরও একটা উদাহরণের দ্বারা কথাটা আরও স্পষ্ট করা যাউক।

---

*বড় বড় অক্ষরে এই চারিটা শব্দ ছাপিয়াছি, পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন।

'যাবৎ তোমার জীবন, তাবৎ আমার সুখ।' (ক)

এই বাক্যটি উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ কর, এবং তাহাতে (ক) চিহ্ন দাও। তার পর উহার যাবৎ কাটিয়া তাবৎ কর, তাবৎ কাটিয়া যাবৎ কর। তাহা হইলে বাক্য এইরূপ দাঁড়াইতেছে।

'তাবৎ তোমার জীবন, যাবৎ আমার সুখ। (খ)

এখন দেখ, বাক্যার্থের কিরূপ বিপর্য্যয় ঘটিল। (ক)-চিহ্নিত বাক্যের প্রকৃত অর্থ যে, "তুমি যত দিন বাঁচিবে, ততদিনই আমি সুখী, তার পর আর সুখী হইব না।" (খ)-চিহ্নিত বাক্যের প্রকৃত অর্থ—"যত দিন আমি সুখী থকিব, তত দিন তুমি বাঁচিবে,তার পর আর তুমি বাঁচিবে না।" অর্থের সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিল।

অতএব টীকাকার কখনও যাবান্ কাটিয়া তাবান্, তাবান্ কাটিয়া যাবান্ করিবার অধিকারী নহেন। কিন্তু এখানে টীকাকার ঠিক তাহাই করিয়াছেন। বুঝিবার জন্য শ্লোকের চারিটি চরণে ক্রমান্বয়ে ক, খ, গ, ঘ, চিহ্ন দেওয়া যাক্। তাহা হইলে শ্লোকস্থ 'যাবানের' গায়ে (ক) এবং 'তাবানের' গায়ে (গ) চিহ্ন পড়িতেছে।

(ক) যাবানর্থ উদপানে
(খ) সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে
(গ) তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু
(ঘ) ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ

তদ্ব্যাখ্যায় টীকাকার করিয়াছেন—

(ক) যাবানর্থ উদপানে
(খ) তাবান্ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে
(গ) যাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু
(ঘ) তাবান্ ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।

এক্ষণে পাঠক (গ) তে (গ) তে মিলাইয়া দেখিবেন, তাবান্ কাটিয়া যাবান্ হইয়াছে কি না।*

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ব্যাখ্যার প্রয়োজনমতে ব্যাখ্যাকার যাবান্ তাবান্ বসাইয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে পারেন কি? যেখানে নূতন যাবান্ তাবান্ না বসাইয়া লইয়া সোজা অর্থ করিলেই অর্থ হয়, সেখানে কি যাবান্ তাবান্ বসাইয়া লইতে হইবে? এখানে কি নূতন যাবান্ তাবান্ না বসাইলে অর্থ হয় না? হয় বৈ কি। বড় সোজা অর্থই আছে।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

ইহার সোজা অর্থ আমি এইরূপ বুঝি;—

সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থঃ বিজানতো ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু তাবানর্থঃ।

অর্থাৎ সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে উদপানে অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয়ে যাবৎ প্রয়োজন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠের সমস্তবেদে তাবৎ প্রয়োজন।

মহামহোপাধ্যায় প্রাচীন ঋষিতুল্য ভাষ্যকার-টীকাকারেরা যে এই সহজ অর্থের প্রতি দৃষ্টি করেন নাই, আমার এরূপ বোধ হয় না। আমার বোধ হয় যে, তাঁহারা এই অর্থের প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি করিয়াছেন এবং অতিশয় দূরবর্ত্তী দেশকালপাত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই এই সহজ অর্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন। দুইটা ব্যাখ্যার প্রকৃত তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা

* সত্য বটে, শঙ্করাচার্য্য তাবান্ শব্দের স্থানে যাবান্ শব্দ ব্যবহার করার বিষয়ে সতর্ক হইয়াছেন, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে 'যদ্' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কাজেই এক কথা।

করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। শেষে কথিত এই সহজ ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য কি? সর্ব্বত্র জলপ্লাবিত হইলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে লোকের আর কি প্রয়োজন থাকে? কোন প্রয়োজনই থাকে না। কেন না, সর্ব্বত্র জলপ্লাবিত—সকল ঠাঁইই জল পাওয়া যায়। ঘরে বসিয়া জল পাইলে কেহ আর বাপী-কূপাদিতে যায় না। তেমনি যে ঈশ্বরকে জানিয়াছে, তাহার পক্ষে বেদে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এখন বেদে কিছু প্রয়োজন নাই, এমন কথা, আমরা উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজদের শিষ্য আমরা না হয় সাহস করিয়া বলিতে পারি, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য কি শ্রীধর স্বামী এমন কথা কি বলিতে পারিতেন? বেদ স্বয়ম্ভূ, অপৌরুষেয়, নিত্য, সর্ব্বফলপ্রদ। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা বেদকেই একটা ঈশ্বরস্বরূপ খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন। কপিল ঈশ্বর পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু বেদ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বৃহস্পতি বা শাক্যসিংহ প্রভৃতি যাঁহারা বেদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দু সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। অতএব শঙ্করাচার্য্য কি শ্রীধরস্বামী হইতে এমন উক্তি কখন সম্ভবে না যে, ব্রহ্মজ্ঞানীই হউক বা যেই হউক, কাহারও পক্ষে বেদ নিষ্প্রয়োজনীয়। কাজেই তাঁহাদিগকে এমন একটা অর্থ করিতে হইয়াছে যে, তাহাতে বুঝায় যে, ব্রহ্মজ্ঞানেও যা, বেদেও তা, একই ফল। তাহা হইলে বেদের মর্য্যাদা বাহাল রহিল। শেষে যে ব্যাখ্যা লিখিত হইল, তাহার অর্থ যে, ব্রহ্মজ্ঞানের তুলনায় বেদজ্ঞান অতি তুচ্ছ। এক্ষণে সেই "সর্ব্বেষু বেদেষু" অর্থে "বেদোক্তেষু কর্ম্মসু" "বেদশব্দেনাত্র কর্ম্মকাণ্ডমেব গৃহ্যতে।" ইত্যাদি বাক্য পাঠক স্মরণ করুন। প্রাচীন টীকাকারদিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন।

এক্ষণে পাঠকের বিচার্য্য এই যে, দুইটা ব্যাখ্যা, তাহার মধ্যে একটার জন্য মূল কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করিতে হয় না, যেমন আছে, তেমনি ব্যাখ্যা করিলেই সেই অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু সে ব্যাখ্যার পক্ষে কেহই সহায় নাই। আর একটা ব্যাখ্যার জন্য কিছু নূতন কথা বসাইয়া কিছু কাটকুট করিয়া লইতে হয়। কিন্তু সমস্ত টীকাকার, ভাষ্যকার ও অনুবাদক এবং মহামহোপাধ্যায় মণ্ডিতমণ্ডলী সেই ব্যাখ্যার পক্ষে। কোন্ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা উচিত? আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেমন বুঝিয়াছি, সেইরূপ বুঝাইলাম। দুই দিকই বুঝাইলাম, পাঠকের যে ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হয়, তাহাই অবলম্বন করিবেন। অভিনব ব্যাখ্যার সমর্থন জন্য আরও কিছু বলা যাইতে পারে, কিন্তু ততটা প্রয়াস পাইবার বিষয় কিছু দেখা যায় না। বৈদিক ধর্ম্মের সঙ্গে গীতোক্ত ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ, পাঠক তাহা বুঝিলেই হইল। সে সম্বন্ধ কি, পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি।

তৃতীয়; ইংরেজি অনুবাদকেরা এই শ্লোকের আর এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থ, এরূপ না বুঝিয়া তাঁহারা বুঝেন, সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে উদপানে যাবনার্থঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ "সংপ্লুতোদকে" পদ "উদপানের" বিশেষণ মাত্র। অন্য ইংরেজি অনুবাদকগণের প্রতি পাঠকগণের শ্রদ্ধা হউক বা না হউক, কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা হইতে পারে। তিনি এই শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

"To the instructed Brahmana there is in all the Vedas as much utility as in a reservoir of water in to which waters flow from all sides."

দুঃখের বিষয় কেবল এই যে, ইহার অর্থ হয় না। কিছু তাৎপর্য্য নাই। অনুবাদকও তাহা অগত্যা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এই শ্লোকের একটি টীকা লিখিয়া তাহাতে বলিয়াছেন—

"The meaning here is not easily apprehended, I suggest the follwing explanation—Having said that the Vedas are concerned with actions for special benefits. Krishna compares them to a reservoir which provides water for various special purposes drinking, bathing &c. The Vedas similary prescribe particular rites and ceremonies for going to heaven, or destroying an enemy &c. But, says Krishna, man's duty is merely to perform the actions prescribed for him among these, and not entertain desires, for the special benefits named."

তেলাঙ্গের পর আর কোন ইংরেজি অনুবাদকের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজনীয় হইতে পারে না। ইহাই বলা যথেষ্ট যে, Davis ও Thomson প্রভৃতি সাহেবেরা তেলাঙ্গের ন্যায় অর্থ করিয়াছেন। তবে তাঁহারা সেই অনুবাদের সঙ্গে যে একটু একটু টীকা সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আরও রস আছে। Thomson কৃত টীকাটুকু পাঠককে উপহার দিলেই যথেষ্ট হইল। তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"as a tank full of fresh water may be used for drinking, bathing, washing one's clothes, and numerous other purposes, so the text of the Vedas may be turned to any object of self-interest by a Brahman who is will acquainted with them and knows now to wield them. We may examplify this general fact by the uses made of texts from our seriptures in the mouths of the puritans on the one hand, and of the Cavaliers on the other. Our author must not, however be understood to reject the use of the Vedas by what he here says. He merely advises a careful use of them. Kapila himself admits them as a last source proof of the truth when others fail."

আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি গীতার মর্ম্মার্থ বুঝিতে বা বুঝাইতে যে অক্ষম, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। তবে "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য"ইত্যাদি বাক্য স্মরণ করিয়াই স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু আমি বুঝাইতে পারি বা না পারি, প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের যে সকল মহদ্বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি, অন্ততঃ তাহা হইতে পাঠক ইহার মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারিবেন, এমত ভরসা আছে। কিন্তু তাহাতেও বুঝুন বা না বুঝুন, পাঠকের কাছে যুক্ত করে এই নিবেদন করি যে, ইংরেজের কাছে যেন গীতার্থ বুঝিবার জন্য না যান। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীকে ইংরেজের কৃত গীতানুবাদ পড়িতে দেখিয়াছি বলিয়াই এ কথা বলিতেছি; এবং সেই প্রবৃত্তির বিনাশের জন্যই এতটা ইংরেজি উদ্ধৃত করিলাম।

প্রবাদ আছে যে পুরাণাদি প্রণয়নের পর ব্যাসদেব একদিন সমুদ্রতীরে উপবেশন করিয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন। সমুদ্রের বৃহৎ

বৃহৎ উর্ম্মি-মালার মত তাঁহারও মানস-সমুদ্রে গুরুতর চিন্তা উঠিয়া মনকে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সময়ে দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। নারদের নিকট ব্যাসদেব মনের অবস্থা বিবৃত করেন,—'প্রভু, জগতের হিতার্থ আমি সাধারণের দুর্ব্বোধ্য বেদোক্ত ধর্ম্মকে সহজ করিয়া প্রচার করিয়াছি, গল্পচ্ছলে বেদোক্ত উপদেশ লইয়া পুরাণাদি প্রণয়ন করিয়াছি, ইহাতে আমার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছে; তথাপি এখন আমার মনে হইতেছে, বুঝি আমার কর্ত্তব্য কিছুই করা হয় নাই, অথচ আর আমি কি করিব নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। এই জন্য মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে—আশান্ত-মনে সমুদ্রতীরে আসিয়াছি—দেব! কোথায় আমার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইয়াছে, আরও আমার কি কর্ত্তব্য বাকি আছে, নির্দ্দেশ করিয়া আমার এই অশান্ত মনে শান্তি প্রদান করুন।' 'ধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন ভক্তি জগতে প্রচার কর' এই উপদেশ দিয়া দেবর্ষি অন্তর্হিত হইলেন। কথিত আছে যে, ব্যাসদেব তখন ভাগবত ও ভগবদ্গীতা প্রণয়ন করেন, আরও দুই একখানি পুরাণে ভক্তের আদর্শ অঙ্কন করেন। এই কারণে কেহ কেহ মহাভারত গীতার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, অনুমান করেন।

গীতা ও ভাগবত ভক্তি-প্রধান গ্রন্থ। ব্যাসদেব বুঝিয়াছিলেন, ভক্তি জীবনের চরম উদ্দেশ্য, পারত্রাণের একমাত্র উপায়।

কি কথাটা হইতেছিল, এক্ষণে একবার স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ভগবান্ অর্জ্জুনকে জ্ঞানযোগ বুঝাইয়া "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে" ইত্যাদি বাক্যে বলিলেন যে,এখন তোমাকে কর্ম্মযোগ শুনাইব। তখন কর্ম্মযোগের কিছু প্রশংসা করিয়া প্রথমতঃ একটা, সাধারণ প্রচলিত ভ্রান্তির নিরাসে প্রবৃত্ত হইলেন। সে ভ্রান্তি এই যে,বেদোক্ত কাম্য কর্ম্মসকলেই লোকের চিত্ত নিবিষ্ট, তাদৃশ লোক ঈশ্বরে একাগ্রচিত্ত হইতে পারে না। তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন যে, বেদসকল "ত্রৈগুণ্য,-বিষয়" তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও বা বেদবিষয়কে অতিক্রম কর। কেন না, যেমন সর্ব্বত্র জলপ্লাবিত হইলে বাপী কূপ-তড়াগাদিতে কাহারও প্রয়োজন হয় না,তেমনি যে ব্রহ্মনিষ্ঠ, বেদে আর তাহার প্রয়োজন হয় না। কর্ম্মযোগের সহিত বৈদিক কর্ম্মের সম্বন্ধরাহিত্য এইরূপে প্রতিপাদন করিয়া ভগবান্ এক্ষণে কর্ম্মযোগ কহিতেছেন;—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥৪৭॥

কর্ম্মে তোমার অধিকার,কিন্তু ফলে কদাচ (অধিকার) না হউক। তুমি কর্ম্মফলহেতু হইও না; অকর্ম্মে তোমার আসক্তি না হউক। ৪৭।

এই শ্লোক বুঝিতে গেলে, "কর্ম্ম" কি, "কর্ম্মফলহেতু" কি, "অকর্ম্ম" কি, বুঝা চাই।

"কর্ম্ম কি" বুঝিলে, আর দুইটা বুঝা গেল। কর্ম্মফল যাহার প্রবৃত্তি-হেতু, সেই "কর্ম্মফলহেতু" কর্ম্মশূন্যতাই অকর্ম্ম। কর্ম্ম কি, তাহা পরে বলিতেছি।

অতএব শ্লোকের অর্থ এই যে,কর্ম্ম করিও, কিন্তু কর্ম্মফল কামনা করিও না। কর্ম্মফলপ্রাপ্তিই যেন তোমার কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতু না হয়। কিন্তু কর্ম্মের ফলের প্রত্যাশা না থাকিলে কেহ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, এই জন্য শ্লোকশেষে তাহাও নিষিদ্ধ হইতেছে বলা হইতেছে, ফল চাহি না বলিয়া কর্ম্মে বিরত হইও না অর্থাৎ কর্ম্ম অবশ্য করিবে, কিন্তু কামনা করিয়া কর্ম্ম করিবে না।

বোধ হয়, এক্ষণে শ্লোকের অর্থ বুঝা গিয়াছে। ইহাই সুবিখ্যাত নিষ্কাম কর্ম্ম-তত্ত্ব। এরূপ উন্নত, পবিত্র এবং মনুষ্যের মঙ্গলকর মহামহিমময় ধর্ম্মোক্তি জগতে আর কখন প্রচারিত হয় নাই। কেবল ভগবৎ-প্রসাদাৎই হিন্দু এরূপ পবিত্র ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিতে পারিয়াছে।

কিন্তু লাভ করিয়াও হিন্দুর পক্ষে ইহার বিশেষ ফলোপধায়িতা ঘটে নাই। তাহার কারণ, এমন কথাতেও আমাদের বুদ্ধিবিভ্রংশ বশতঃ অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছে। আমরা আজিও ভাল করিয়া ইহা বুঝিতে পারি নাই।

আমি এমন বলিতেছি না যে, আমি ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছি বা পাঠককে সম্পূর্ণরূপে বুঝাইতে পারিব। ভগবান্ যাঁহাকে তাদৃশ অনুগ্রহ করিবেন, তিনিই ইহা বুঝিতে পারিবেন। যতটুকু পারি, বুঝাইতে চেষ্টা করায় বোধ হয় ক্ষতি নাই।

ইহার প্রথম গোলযোগ, কর্ম্ম শব্দের অর্থ-সম্বন্ধে। যাহা করা যায় বা করিতে হয়, তাহাই কর্ম্ম, কর্ম্ম শব্দের এই প্রচলিত অর্থ-কিন্তু কতকগুলি হিন্দু-শাস্ত্রকার বা হিন্দু-শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার ইহাতে একটা গোলযোগ উপস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের কৃপায় এ সকল স্থলে বুঝিতে হয়, কর্ম্ম অর্থে বেদোক্ত যজ্ঞাদি। কর্ম্মমাত্রেই কর্ম্ম নহে—বেদোক্ত অথবা শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞই কর্ম্ম।

যদি তাই হয়, তাহা হইলে এই শ্লোকের অর্থ এই বুঝিতে হয় যে, বেদোক্তাদি যজ্ঞাদি করিবে; কিন্তু সেই সকল যজ্ঞের ফল স্বর্গাদি, সেই স্বর্গাদির কামনা করিবে না।

এইরূপ অর্থ চিরপ্রচলিত বলিয়া সুশিক্ষিত ইংরেজি নবিশেরাও এইরূপ অর্থ বুঝিয়াছেন। সুপণ্ডিত কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্ ইহার পূর্ব্ব-শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, "The Vedas...prescribe particular rites and cermonies for going to heaven or destroying an enemy &c. But says Krishna, man's duty is merely to perform the actions prescribed for him among these, and nnt entertain desires for the special benefits named."

যদি কর্ম্মশব্দের এই অর্থ হয়, তবে পাঠককে একটু গোলযোগে পড়িতে হইবে। পাঠক বলিবেন যে, যে কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি, অন্য কোন প্রয়োজন নাই, যদি সে ফলই কামনা না করিলাম, তবে সে কর্ম্মই করিব কেন? নিষ্কাম কাম্যকর্ম্ম কিরূপ? কাম্যকর্ম্ম নিষ্কাম হইয়াই বা করি কেন?

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্ম অর্থে বেদোক্তাদি কাম্যকর্ম্ম বুঝিলে আমরা কোন বোধগম্য তত্ত্বে উপস্থিত হইতে পারি না। আর বেদোক্ত কর্ম্ম গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মের উদ্দিষ্ট নহে, তাহা গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় অতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ঐ তৃতীয় অধ্যায়ের নামই "কর্ম্মযোগ।" ইহাতে কর্ম্ম-সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥৫

"কেহ কখন ক্ষণমাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, কেন না, প্রকৃতিজ বা স্বাভাবিক গুণে সকলকেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য করে।

এখন দেখা যাইতেছে, বেদোক্ত যজ্ঞাদি-সম্বন্ধে এ কথা কখনই বলা যায় না। কেবল সচরাচর যাহাকে কর্ম্ম বলি—যাহাকে ভাষায় কাজ এবং ইংরেজিতে action বলে, তাহা সম্বন্ধেই কেবল এ কথা বলা যাইতে পারে। কেহ কখন কাজ না করিয়া থাকিতে পারে

না, অন্য কোন কাজ না করুক, স্বভাব বা প্রকৃতির Nature বশীভূত হইয়া কতকগুলি কাজ অবশ্য করিতে হইবে। যথা,অশন,বসন, শয়ন, শ্বাস, প্রশ্বাস ইত্যাদি। অতএব স্পষ্টই কর্ম্মশব্দে বাচ্য, যাহাকে সচরাচর কর্ম্ম বলা যায়, তাহাই ; যজ্ঞাদি নহে।

পুনশ্চ ঐ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে কথিত হইতেছে।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥

"তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর ; কর্ম্ম অকর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ ; অকর্ম্মে তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইতে পারিবে না।"

এখানেও,নিশ্চিত কর্ম্ম শব্দ, সর্ব্ববিধ কর্ম্ম বা 'কাজ'—যজ্ঞাদি নহে। যজ্ঞাদি ব্যতীত সকলেরই শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে ও হইয়া থাকে, কেবল কাজ বা action যাহাকে সচরাচর কর্ম্ম বলা যায়, তাহা ভিন্ন শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না।

এবংবিধ প্রমাণ গীতা হইতে আরও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। * প্রমাণ নির্দ্দোষ হইলে, এক প্রমাণই যথেষ্ট। অতএব আর নিষ্প্রয়োজনীয়।

অতএব ইহা সিদ্ধ যে, কর্ম্মযোগ-ব্যাখ্যায় কর্ম্ম অর্থে যাহা সচরাচর কর্ম্ম বলা যায়,অর্থাৎ কাজ বা action, তাহাই ভগবানের অভিপ্রেত ;—বৈদিক যজ্ঞাদি নহে।

তাহা হইলে, এই ৪৭ শ্লোকের অর্থ এই হইতেছে যে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল করিতে হইবে। কিন্তু তাহার ফল কামনা করিবে না, নিষ্কাম হইয়া করিবে। এক্ষণে এই মহাবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

ইহার ভিতর দুইটি আজ্ঞা আছে—প্রথম, কর্ম্ম করিতে হইবে। দ্বিতীয়, সকল কর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া করিতে হইবে। এক একটি করিয়া বুঝা যাউক। প্রথম, কর্ম্ম করিতে হইবে।

কর্ম্ম করিতে হইবে কেন? তৃতীয়াধ্যায়ের যে দুই শ্লোক উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই উহা বুঝান হইয়াছে। কর্ম্ম আমাদের জীবনের নিয়ম—Law of life—কর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে না—সকলেই প্রকৃতিজগুণে কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। কর্ম্ম না করিলে শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হয় না। কাজেই সকলকে কর্ম্ম করিতে হইবে।

কিন্তু সকল কর্ম্মই কি করিতে হইবে? কতকগুলি কর্ম্মকে আমরা সৎকর্ম্ম বলি, কতকগুলিকে অসৎকর্ম্ম বলি। অসৎকর্ম্মও করিতে হইবে ?

অসৎকর্ম্ম আমাদের জীবন-নির্ব্বাহের নিয়ম নহে—ইহা আমাদের Law of life নহে। অসৎকর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল থাকিতে পারে না,এমন নহে ,—অসৎকর্ম্ম না করিলে

* পক্ষান্তরে অষ্টমাধ্যায়ে, "ভূতভবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ" ইতি বাক্যও আছে। তাহার প্রচলিত অর্থও যজ্ঞ পক্ষে বটে। কিন্তু সেই প্রচলিত অর্থও যে ভ্রমাত্মক, বোধ করি, পাঠক তাহা পশ্চাৎ বুঝিতে পারিবেন। আমি বুঝাইব, এমন বলি না—পাঠক সহজেই বুঝিবেন, এবং ইহাও স্বীকার করিতে আমি বাধ্য যে,কখন কখন গীতাতেও কর্ম্ম শব্দে বৈদিক কাম্যকর্ম্ম বুঝায়, যথা, এই যে অধ্যায়ের ৪৯ শ্লোক "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম।" কিন্তু এখানেও স্পষ্টই বুঝা যায়, এ "কর্ম্মের" সঙ্গে কর্ম্মযোগের বিরুদ্ধভাব। গীতায় অনেকগুলি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

কাহারও শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহের বিঘ্ন হয় না। চুরি বা পরদার না করিয়া কেহ বাঁচিতে পারে না, এমন নহে। সুতরাং অসৎকর্ম্ম করিতে হইবে না। তৃতীয় অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত ঐ দুই শ্লোক হইতে উহা বুঝা যাইতেছে, পশ্চাৎ আরও বুঝা যাইবে।

পক্ষান্তরে, ইহাও জিজ্ঞাসিত হইতে পারে যে,যাহাকে সৎকর্ম্ম বলি,তাহাই কি আমাদের জীবনযাত্রার নিয়ম? আমরা কতকগুলিকে সৎকর্ম্ম বলি, যথা পরোপকারাদি;—আর কতগুলিকে অসৎকর্ম্ম বলি, যথা পরদারগমনাদি;—আর কতকগুলিকে সদসৎ কিছুই বলি না, যথা শয়ন-ভোজনাদি। ভাল, বুঝা গিয়াছে যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মগুলি করিবার প্রয়োজন নাই; এবং তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মগুলি না করিলে নয়, সুতরাং করিতে হইবে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মগুলি করিব কেন? সৎকর্ম্ম মনুষ্যজীবনের নিয়ম কিসে?

এ কথার উত্তর আমার প্রণীত ধর্ম্মতত্ত্ব নামক গ্রন্থে সবিস্তারে দিয়াছি, সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। আমি সেই গ্রন্থে বুঝাইয়াছি যে, যাহাকে আমরা সৎকর্ম্ম বলি, তাহাই মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান। অতএব ইহা মনুষ্যজীবন-নির্ব্বাহের নিয়ম।

বস্তুতঃ কর্ম্মের এই ত্রিবিধ প্রভেদ করা যায় না। যাহাকে সৎকর্ম্ম বলি,আর যাহাকে সদসৎ কিছুই বলি না, অথচ করিতে বাধ্য হই, এতদুভয়ই মনুষ্যত্বপক্ষে প্রয়োজনীয়। এই জন্য এই দুইকে আমি ধর্ম্মতত্ত্বে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়াছি। এই টীকাতেও বলিতে থাকিব।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় এবং কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় নহে,তাহার মীমাংসা কে করিবে? মীমাংসার স্থূল নিয়ম এই গীতাতেই কথিত হইয়াছে,পশ্চাৎ দেখিব, এবং সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া আমি উক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রন্থে এ তত্ত্ব কিছু দূর মীমাংসা করিয়াছি।

এই শ্লোকোক্ত প্রথম বিধি, "কর্ম্ম করিবে," তৎসম্বন্ধে এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিয়া দ্বিতীয় বিধি সামান্যতঃ বুঝাইব। দ্বিতীয় বিধি এই যে, যে কর্ম্ম করিবে, তাহা নিষ্কাম হইয়া করিবে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক

পরোপকার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। অনেকে পরোপকার এইরূপ অভিপ্রায়ে করিয়া থাকে যে, আমি যাহার উপকার করিলাম, সে আমার প্রত্যুপকার করিবে। ইহা সকাম কর্ম্ম। ইহা এই বিধির বহির্ভূত।

অনেকে এই অভিপ্রায়ে দানাদির দ্বারা পরোপকার করে যে,ইহাতে আমার পুণ্যসঞ্চয় হইয়া তৎফলে স্বর্গাদিলাভ হইবে। ইহাও সকাম কর্ম্ম এবং তাহাও এই বিধির বহির্ভূত।

অনেকে এইরূপ অভিপ্রায়ে পরোপকার করিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর ইহাতে আমার মঙ্গল করিবেন। তাহা হইতে পারে, ঈশ্বর প্রসন্ন হইবেন সন্দেহ নাই,এবং পরোপকারীর মঙ্গলও করিতে পারেন; কিন্তু ইহা নিষ্কাম কর্ম্ম নহে। ইহা সকাম এবং এই বিধির বহির্ভূত।

নিষ্কামকর্ম্মী তাহাও চাহে না,কিছুই চাহে না, কেবল আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিতে চাহে। পরোপকার আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম—এই জন্য আমি করিব,কোন ফলই চাই না। ইহা নিষ্কাম চিত্তভাব।

ধর্ম্মতত্ত্বে আমি আর আর উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়াছি যে, সকল প্রকার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মই নিষ্কাম হইতে পারে। অতএব পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

নিষ্কাম কর্ম্ম-সম্বন্ধে এইটি প্রথম কথা।

এ তত্ত্ব ক্রমশঃ আরও পরিস্ফুট ও বিশদ হইবে।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ৪৮॥

হে ধনঞ্জয়! যোগস্থ হইয়া "সঙ্গ" ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান করিয়া (কর্ম্ম কর)। (এইরূপ) সমত্বকে যোগ বলে। ৪৮।

পূর্ব্বশ্লোকে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য যে কর্ম্ম,তাহাই বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে সেইরূপ কর্ম্ম করার পক্ষে তিনটি বিধি নির্দ্দিষ্ট হইতেছে—

প্রথম, যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে।

দ্বিতীয়, সঙ্গত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে।

তৃতীয়, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে তুল্যজ্ঞান করিবে।

ক্রমশঃ এই তিনটি বিধি বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

প্রথম, যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে। যোগ কি? যোগ শব্দ গীতায় স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পাঠককে বুঝাইতে হইবে না যে, যাহাকে পতঞ্জলি ঠাকুর "চিত্তবৃত্তি নিরোধ" বলিয়াছেন, সেরূপ যোগের কথা হইতেছে না।

এখানে "যোগ" শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামীর মতে "পরমেশ্বরৈকপরতা।" শঙ্করাচার্য্যও তাহাই বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন, "যোগস্থঃ সন্ কুরু কর্ম্মাণি কেবলমীশ্বরার্থম্।" কিন্তু শ্লোকের শেষাংশের ব্যাখ্যাকালে তিনি বলিয়াছেন."কোঽসৌ যোগো যত্রস্থঃ কুর্ব্বিত্যুক্ত-মিদমেব :তৎ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে।"

স্থূল কথা, যোগ কি, তাহা যখন এই শ্লোকেই ভগবান্ স্বয়ং বুঝাইয়াছেন, তখন আর ভিন্ন অর্থ খুঁজিবার প্রয়োজন কি? সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যে সমত্বজ্ঞান, তাহাই যোগ। তৃতীয় বিধি বুঝিলেই তাহা বুঝিব। তৃতীয় বিধি, প্রথম বিধির সম্প্রসারণ মাত্র. সম্প্রসারণকে পুনরুক্তি বলা যায় না।

তৃতীয় বিধির আগে দ্বিতীয় বিধি বুঝা যাউক। "সঙ্গ" ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে। সঙ্গ কি? শ্রীধর বলেন, "কর্তৃত্বাভিনিবেশঃ." আমি কর্ত্তা,এই অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরাশ্রয়ে, অর্থাৎ ঈশ্বরই কর্ত্তা, ইহা জানিয়া কর্ম্ম করিবে।

শঙ্কর বলেন, "যোগস্থঃ সন্ কর্ম্মাণি, কেবলমীশ্বরার্থং তত্রাপীশ্বরো মে তুষ্যত্বিতি সঙ্গং ত্যক্ত্বা." কেবল ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিবে, কিন্তু ঈশ্বর তজ্জন্য আমার শুভ করুন্, এরূপ কামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে। ফলে, ফলকামনাত্যাগই সঙ্গত্যাগ, এইরূপ অর্থে 'সঙ্গ' শব্দ পুনঃ পুনঃ গীতায় ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখা যায়।

এক্ষণে তৃতীয় বিধি বুঝা যাউক। কর্ম্মসিদ্ধি এবং কর্ম্মের অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে, এই সমত্বজ্ঞানই যোগ। এই কথা জ্ঞানবাদী শঙ্করাচার্য্য যেরূপ বুঝাইয়াছেন, আমাদের মত অজ্ঞানীদিগের সেরূপ বুঝায় বিশেষ লাভ নাই। তাঁহার মত এই যে, জ্ঞানপ্রাপ্তিই কর্ম্মের সিদ্ধি। তাই তিনি বলেন যে, "সত্ত্বশুদ্ধিজা জ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণা সিদ্ধিঃ।" এবং "তদ্বিপর্য্যয়জা অসিদ্ধিঃ।" শ্রীধর ঠাকুরও এখানে শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী। তিনি বলেন, "কর্ম্মফলস্য জ্ঞানস্য সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ' ইত্যাদি

এখন জ্ঞান, কর্ম্মের ফল কি না, সে বিচারের প্রয়োজন নাই। স্থানান্তরে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আপাততঃ, যে কথাটা উপস্থিত, তাহার সোজা অর্থ বুঝিতে পারিলে আমাদিগের পরমলাভ হইবে। টীকাকার

মধুসূদন সরস্বতী সেই সোজা অর্থ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, "সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বেতি ফলসিদ্ধৌ হর্ষং ফলাসিদ্ধৌ চ বিষাদং ত্যক্ত্বা" ইত্যাদি। ফলসিদ্ধিতে হর্ষত্যাগ, এবং ফলের অসিদ্ধিতে বিষাদত্যাগ, ইহাই সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমত্বজ্ঞান। সাধারণ পাঠকের ইহাই সঙ্গত অর্থ বলিয়া বোধ হইবে। যে নিষ্কাম, ফলকামনা করে না, তাহার ফলসিদ্ধিতে হর্ষ হইতে পারে না, এবং অসিদ্ধিতে বিষাদ জন্মিতে পারে না। যত দিন সে ফলসিদ্ধিতে আনন্দ লাভ করে, তত দিন বুঝিতে হইবে যে, সে ফলকামনা করে—কেন না, ফলকামনা না করিলে ফলসিদ্ধিতে হর্ষ লাভ করিবে কেন? কর্ম্মচারী নিষ্কাম হইলে, তাহার ফলসিদ্ধিতে হর্ষ নাই বা অসিদ্ধিতে দুঃখ নাই। তাহার পক্ষে অসিদ্ধি ও সিদ্ধি সমান। এই সমত্বজ্ঞানই যোগ। তাদৃশ যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর, ইহাই প্রথম বিধি।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥৪৯॥

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ হইতে কর্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট। বুদ্ধিতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। যাহারা সকাম, তাহারা নিকৃষ্ট। ৪৯।

বুদ্ধিযোগ কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বে কথিত হয় নাই। শ্রীধর বলেন, ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি-যুক্ত কর্ম্মযোগই বুদ্ধিযোগ। শঙ্কর বলেন, সমত্ববুদ্ধিঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে। তাহা হইতে কর্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট যখন বলা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, এখানে কর্ম্ম শব্দে কাম্যকর্ম্ম। ভাষ্যকারেরা এইরূপ বলেন। অতএব শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের অর্থ এই যে, যে কর্ম্মযোগের কথা বলিলাম, তাহা হইতে কাম্যকর্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট।

শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলা হইতেছে যে, বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ কর বা বুদ্ধির অনুষ্ঠান কর। ইহাতে এখানে "বুদ্ধি" শব্দে ঐ বুদ্ধিযোগই বুঝিতে হয়। ভাষ্যকারেরা বলেন, সাংখ্যবুদ্ধি বা জ্ঞান। যদি তাই হয়, তবে প্রথমার্দ্ধেও বুদ্ধি শব্দে জ্ঞান বুঝাই উচিত। তাহা হইলে তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জ্জনার্দ্দন।" ইত্যাদি বাক্যে আর কোন গোলযোগ হইবে না। কিন্তু পরবর্ত্তী ৫০ শ্লোকে কিছু গোলযোগ বাধিবে।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব, যোগঃ কর্ম্মসু
কৌশলম্ ॥ ৫০ ॥

যিনি বুদ্ধিযুক্ত, ইহজন্মে তিনি সুকৃত-দুষ্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ করেন। তজ্জন্য তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর। কর্ম্মে কৌশলই যোগ। ৫০।

"বুদ্ধিযুক্ত"—অর্থাৎ বুদ্ধিযোগে যুক্ত। যে সকল কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি, তাহাই সুকৃত; আর যে সকল কর্ম্মের ফল নরকাদি, তাহাই দুষ্কৃত। যিনি বুদ্ধিযুক্ত, তিনি যাহাতে স্বর্গাদি বা নরকাদি-প্রাপ্তি হয়, তাদৃশ উভয়বিধ কর্ম্মই পরিত্যাগ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এমন নহে যে, তিনি কোন প্রকার সৎকর্ম্ম করেন না, অথবা ভাল মন্দ কোন কর্ম্মই করেন না। ইহার অর্থ এই যে, তিনি স্বর্গাদি কামনা বা নরকাদির ভয়ে কোন কর্ম্ম করেন না। যাহা করেন, তাহা অনুষ্ঠেয় বলিয়া করেন।

অতএব তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর। কর্ম্মে কৌশলই যোগ। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এ কথার এই অর্থ করিয়াছেন যে, কর্ম্ম বন্ধনজনক, কেন না, কর্ম্ম করিলেই পুনশ্চ জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার ফলভোগ করিতে হয়। কিন্তু তাদৃশ বন্ধনকেও যদি ঈশ্বরারাধনার সাহায্যে মুক্তির উপায়ে পরিণত করিতে পারা যায়, তবে তাহাকেই কর্ম্মের কৌশল বা চাতুর্য্য বলা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা এরূপ বুঝিতে প্রস্তুত নহি। আমরা বুঝি, যিনি কর্ম্মে কুশলী, অর্থাৎ আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মসকল যথাবিহিত নির্ব্বাহ করেন, তিনিই যোগী। কর্ম্মে তাদৃশ কৌশল বা বিহিত অনুষ্ঠানই যোগ। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।" এ কথার এই অর্থই সহজ এবং সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যেখানে সহজ অর্থ আছে, সেখানে ভাষ্যকার মহা-মহোপাধ্যায়দিগকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া আমরা সেই সহজ অর্থেরই অনুবর্ত্তী হইব।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা, মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥৫১॥

বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ কর্ম্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়া জন্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া অনাময়-পদ প্রাপ্ত হয়েন। ৫১।

"বুদ্ধিযুক্ত" —বুদ্ধিযোগাবলম্বী।

অনাময়পদ—সর্ব্বোপদ্রবশূন্য বিষ্ণুপদ। (শ্রীধর)

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥৫২॥

যবে তোমার বুদ্ধি মোহকানন অতিক্রম করিবে, তবে তুমি শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয় সকলে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে। ৫২।

এই ফল-কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক অনাময়-পদ কিসে পাওয়া যায়? যখন, মোহ বা দেহাভিমান হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তখন সমস্ত শ্রু॰ বা শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য বা কামশূন্যতা জন্মে। স্বর্গাদিসুখ বা রাজ্যাদি সম্পদ্, কোন বিষয়েরই কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইতে হয় না।

শ্রু॰িবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥৫৩॥

তোমার "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না" বুদ্ধি যখন সমাধিতে নিশ্চলা (সুতরাং) অচলা হইয়া থাকিবে, তখন যোগপ্রাপ্ত হইবে। ৫৩।

"শ্রুতিবিপ্রতিপন্না"। বিপ্রতিপন্ন অর্থে বিক্ষিপ্ত। * কিন্তু শ্রুতি কি? শ্রুতি, যাহা শুনা গিয়াছে—আর শ্রুতি বেদকে বলে। বেদ বুদ্ধিবিক্ষেপের কারণ হইতে পারে, ইহা প্রাচীন ভাষ্যকারেরা স্বীকার করিতে পারেন না; সুতরাং এখানে শ্রুতি শব্দে "যাহা শুনা গিয়াছে," তাঁহারা এইরূপ অর্থ করেন। রামানুজের মত সোজা—শ্রুতি শ্রবণ মাত্র। মধুসূদন আর একটু বেশী বলেন, "নানাবিধ ফলশ্রবণই" শ্রুতি। শঙ্করাচার্য্য তাই বলেন, তবে তাঁহার মার্জ্জিত লেখনীর শব্দের ছটাটা বেশীর ভাগ। তিনি বলেন, "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না অনেকসাধ্যসাধনসম্বন্ধপ্রকাশনশ্রুতিভিঃ শ্রবণৈর্ব্বিপ্রতিপন্না। শ্রীধরস্বামী সকলের অপেক্ষা একটু সাহস করিয়াছেন—তিনি বলেন, "নানালৌকিকবৈদিকার্থশ্রবণৈর্ব্বিপ্রতিপন্না।"

ইংরেজ গীতার কিছুই বুঝে না—বুঝিবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু অনেক সময় মূর্খের কথাও শুনায় ক্ষতি বোধ করেন না। Davis সাহেব এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

সাহেব প্রথমে একটু আপনার বড়াই করিতেছেন—

"I, too, have consulted Hindu Commentators largely (কদাচিৎ)and have found them deficient in critical insight and more intent on finding or forming Vedantist doctrines in every part than in giving the true sense of the anthor. (শাঙ্কর-ভাষ্য-সম্বন্ধে অনেক দেশী লোকও এ কথা বলিয়া থাকেন)। I have examind

---

* Anglice—distracted.

their explnations with the freedom of inquiry that is common to western habits of thought and thus while I have sometimes followed their guidance, I have been obliged to reject their comments as misrepresenting the doctrine of the author. I append some instsnces of this kind, that my readers may be able to form their own judgement."

এই বলিয়া, সাহেব, দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শ্লোককেই উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি শ্রুতি শব্দে 'বেদ' এই অর্থ করেন এবং উপরিলিখিত উক্তির পোষকতায় বলেন, যে—

"Hers the reference is to Sruti, which means (1) hearing, (2) revelation. Hindu commentators say that the meaning is,what you have heard, about the means of obtaining desirable things ; assuming as a certainproposition that the Vedas could not be attacted. The doctrine of the Bhagavadgita is, however, that the devotee (yogin), when fixed in meditation lays aside the Vedas and Vedic ritual."

ডেবিস একজন ক্ষুদ্রপ্রাণী—তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া কাগজ নষ্ট করিবার প্রয়োজন ছিল না। তবে এই মতটা ইউরোপের একজন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠের—বোদলাসেনের। তিনিও "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না" পদের ঐরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। আর আর ক্ষুদ্র অনুবাদকেরা তাঁহার পথে গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ডেবিসের আত্মশ্লাঘার ভিতর একটি অমূল্য কথা আছে—সেই অমূল্য তত্ত্ব ভারতবর্ষে তদানীং ছিল না ও এখনও নাই। FREEDOM OF ENQUIRY" —এই অমূল্য বাক্যের অনুরোধেই আমরা তাঁহার ন্যায় লেখকের আত্মশ্লাঘা উদ্ধৃত করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না।

বেদ-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ মত আমরা বুঝিয়াছি বা বুঝাইয়াছি, তাহার সঙ্গে দেশী মতের অপেক্ষা বিলাতী মতটা বেশী সঙ্গত। তবে পাঠক ইচ্ছা করিলে শ্রীধরস্বামীকে এখানে বিলাতী দলে টানিয়া লইতে পারেন।

এই শ্লোকে "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না" ভিন্ন আর একটি মাত্র পদ বুঝাইবার প্রয়োজন যাহাতে চিত্ত সমাহিত হয়, তাহাই "সমাধি।"

এক্ষণে অনুবাদ পাঠ করিলে, পাঠক বোধ হয় শ্লোকার্থ বুঝিতে পারিবেন।

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ ৫৪॥

অর্জ্জুন বলিলেন,—

হে কেশব! যিনি সমাধিস্থ হইয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহার কি লক্ষণ? স্থিতধী ব্যক্তি কি বলেন, কিরূপে অবস্থান করেন, কিরূপে চলেন?। ৫৪।

ইতিপূর্ব্বে সাংখ্যযোগ কহিয়া, ভগবান্ অর্জ্জুনকে কর্ম্মযোগ বুঝাইলেন। কর্ম্মযোগের শেষ কথা এই বলিয়াছেন যে, কর্ম্মফল-সম্বন্ধে যাহা (বেদেই হউক,অন্যত্রই হউক)শুনিয়াছ, তাহাতে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। যত দিন সেরূপ থাকিবে,তত দিন তুমি কর্ম্মযোগ প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু যখন তোমার বুদ্ধি সমাধিতে (পরমেশ্বরে) স্থির হইবে, তখন তুমি যোগপ্রাপ্ত হইবে। যাহার এইরূপ বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থিতধী

বলা যায়। অর্জ্জুন এক্ষণে সেই সমাধিস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥৫৫॥

যখন সকল প্রকার মনোগত কামনা বর্জ্জিত হয়, আপনাতে বা (আত্মাতে) আপনি তুষ্ট থাকে, তখন স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায় ॥৫৫॥

কামনার পূরণেই মানুষের সুখ দেখিতে পাই। যে কামনা ত্যাগ করিল, তাহার আর কি সুখ রহিল? শঙ্করাচার্য্য বলেন, পরমার্থ-দর্শনলাভে অন্য আনন্দ নিষ্প্রয়োজন। বেদে তাদৃশ ব্যক্তিকে "আত্মারাম" বলা হইয়াছে।

আমরা আর একটা সোজা উত্তরে সন্তুষ্ট। আমরা স্বীকার করি, পরমেশ্বরই আনন্দ। তিনি পরমানন্দ। কিন্তু বহির্জ্জগৎও ঈশ্বর হইতে বিযুক্ত নহে। কামনাশূন্য হইলে বহির্ব্বিষয়ে আনন্দ উপভোগ করা যাইবে না কেন? যে কামনাশূন্য, সে কি জগতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হয় না? না জনার্দ্দনে আনন্দ লাভ করে না? না সৎকর্ম্মসম্পাদনে প্রফুল্ল হয় না? কর্ম্মের অনুষ্ঠানই আনন্দময়—তাহার উপর সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্যজ্ঞান থাকিলে, সে আনন্দের আর কখন লাঘব হয় না; এবং এইরূপ আনন্দ আত্মাতেই; কাহারও সাপেক্ষ নহে।

যিনি এই কথাটা তলাইয়া না বুঝিবেন, তিনি গীতার এই সকল উক্তি, এই শ্লোক এবং ইহার পরবর্ত্তী কয়টি শ্লোক Ascetic philosophy বলিয়া গণ্য করিবেন। সম্ভবতঃ ইহা Asceticism নহে। সংসারে যে কিছু সুখ আছে, তাহার নির্ব্বিঘ্নে উপভোগের এই তত্ত্বই উপযোগী। সংসারে উপভোগ্য যে কিছু সুখ আছে, তাহার উপভোগের বিঘ্ন কামনা ও ইন্দ্রিয়াদির প্রাবল্য। তাহা বশবর্ত্তী হইলে সাংসারিক সুখ-সকলের উপভোগের আর কোন বিঘ্ন থাকে না, সংসার পবিত্র ও সুখময় কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য মৎপ্রণীত অনুশীলনতত্ত্বে (ধর্ম্মতত্ত্ব প্রথম ভাগ) আমি বিশেষ যত্ন পাইয়াছি, সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। পরবর্ত্তী শ্লোক-সকলে ইহা বিশেষ প্রকারে পরিস্ফুট হইবে।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে ॥৫৬॥

দুঃখে যিনি অনুদ্বিগ্নমনা, সুখে যিনি স্পৃহাশূন্য, যাঁহার অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ আর নাই, তাঁহাকে স্থিতধী মুনি বলা যায়। ৫৬।

এ সকল Asceticism নহে, এই তত্ত্ব দুঃখনাশক, (সুতরাং) সুখবৃদ্ধির উপায়। দুঃখে যে কাতর হয়, সেই দুঃখী। দুঃখে যাহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, সে দুঃখজয়ী হইয়াছে, তাহার আর দুঃখ নাই। সুখে যাহার স্পৃহা, সে বড় দুঃখী, কেন না, সুখের স্পৃহা অনেক সময়েই ফলবতী হয় না, ফলবতী হইলেও আশানুরূপ ফল ফলে না; এই উভয় অবস্থাতেই সেই সুখস্পৃহা দুঃখে পরিণত হয়। অতএব সুখস্পৃহা কেবল দুঃখবৃদ্ধির কারণ। ভয়, ক্রোধ দুঃখের কারণ, ইহা বলা বাহুল্য। অনুরাগ অর্থে এখানে সকল প্রকার অনুরাগ বুঝা উচিত নহে। যথা ঈশ্বরানুরাগ—ইহা কখন নিষিদ্ধ হইতে পারে না। অনুরাগ অর্থে, এখানে কেবল কাম্য বস্তুতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ্যাদি বস্তুতে অনুরাগই বুঝিতে হইবে। তাদৃশ বিষয়-সকলে অনুরাগ যে দুঃখের কারণ, তাহা আবার বলিতে হইবে না।

বলিতে কেবল বাকি আছে যে, সুখস্পৃহা ত্যাগ করিলেই সুখত্যাগ করা হইল না, এবং সুখস্পৃহাত্যাগ ভিন্ন, সুখভোগত্যাগ এখানে বিহিত হইতেছে না। যে সুখে স্পৃহাশূন্য,

স সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে। স্বয়ং জগদীশ্বর সর্ব্বপ্রকার স্পৃহাশূন্য, অথচ অনন্তসুখে সুখী। তবে মনুষ্য-সম্বন্ধে এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে মনুষ্য সুখে স্পৃহাশূন্য হইলে, সুখলাভের চেষ্টা না করিলে, মনুষ্য সুখলাভ করে না। যিনি কর্ম্মযোগ বুঝিয়াছেন, তিনি কখন এই আপত্তি করিবেন না। কর্ম্মযোগের মর্ম্ম এই যে, নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিবে। কর্ম্মের ফলই সুখ—যে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সুনির্ব্বাহ করে, সে তজ্জনিত সুখলাভও করে। যে কামনা বা স্পৃহার অধীন হইয়া কর্ম্ম করে, সে সুখ লাভ করে না—কামনা ও স্পৃহা অননুষ্ঠেয় কর্ম্মের, সুতরাং পাপের ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। অতএব নিষ্কাম ও সুখে স্পৃহাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবে—সুখ আপনি আসিবে। ৭০ শ্লোকে ভগবান্ স্বয়ং তাহাই বলিয়াছেন, পরে দেখিব।

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥৫৭॥

যিনি সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য, তত্তদ্বিষয়ে শুভপ্রাপ্তিতে আনন্দিত বা অশুভপ্রাপ্তিতে বিদ্বেষযুক্ত হন না, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৫৭।

"সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য।"—শ্রীধর বলেন, সর্ব্বত্র কি না 'পুত্রমিত্রাদিষ্বপি।' শঙ্কর বলেন, "দেহজীবিতাদিষ্বপি।" শঙ্করের ব্যাখ্যাই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। দেহজীবনাদির শুভাশুভে যাহার কোন আনন্দ বা বিদ্বেষ নাই, তাহারই বুদ্ধি যে ঈশ্বরে স্থির হইবার সম্ভাবনা, তাহা বুঝাইতে হইবে না। ৫৭।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥৫৮॥

কূর্ম্ম যেমন সকল বস্তু হইতে আপনার অঙ্গ-সকল সংহরণ করিয়া লয়, তেমনি যিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়-সকল সংহরণ করেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৫৮।

এই কথার উপর কোন টীকা চাহি না। ইন্দ্রিয়সংযম ভিন্ন কোন প্রকার ধর্ম্মাচরণ নাই; ইহা সকল ধর্ম্মগ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা, সকল ধর্ম্মমন্দিরের প্রথম সোপান। * সর্ব্বশাস্ত্রেই আগে ইন্দ্রিয়সংযমের কথা। কেবল এই কূর্ম্মের উপমার প্রতি একটু মনোযোগ আবশ্যক। কূর্ম্ম তাহার হস্তপদাদি সংহৃত করিয়া রাখে—ধ্বংস করে না, এবং আবশ্যকমতে তদ্দ্বারা দৈবনিক কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ইন্দ্রিয়াদি-সম্বন্ধেও তাই। ইহার সংযমই ধর্ম্ম, ধ্বংস ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্মতত্ত্বে এ কথা বুঝাইয়াছি।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥৫৯॥

নিরাহার দেহীর ইন্দ্রিয়াদির বিষয় বিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু তৎপ্রতি অনুরাগ যায় না। (কেবল) ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেই তাহা বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। ৫৯।

"নিরহার"—যে ইন্দ্রিয়াদির বিষয়োপভোগে বিরত।

---

* All ethical gymnastic consists therefore singly in the subjngating the insincts and appetites of our physical system in order that we remain their masters in any and all circumstances hazurdous to morality ; a gymnastic exercise rendering the will hardly and robust and which by the consciousness of regained freedom makes the heart glad.—Kant-Metaphysics of Ethics—translated Semple

মনের একটা অতি ভয়ঙ্কর অবস্থা আছে. দুর্ভাগ্যবশতঃ জগতে তাহা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। উপভোগ যায়, কিন্তু বাসনা যায় না। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা আতুরাদির উদাহরণ দিয়াছেন। যে জড় বা আতুর, তাহার উপভোগের সাধ্য নাই, সুতরাং উপভোগ নাই। কিন্তু ভোগের বাসনার অভাব নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার অপেক্ষা শোচনীয় উদাহরণ আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাই। লোকনিন্দাভয়ে বা পবিত্র চরিত্রের ভাণ করিয়া বা সন্ন্যাসাদি ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, অনেকে উপভোগ ত্যাগ করেন, কিন্তু বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন না। তার পর একদিন বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া পাপের স্রোতে সব ভাসিয়া যায়। ঈদৃশ ব্যক্তির সঙ্গে উপভোগরত ব্যক্তির প্রভেদ বড় অল্প। এইরূপ মানসিক অবস্থা বড় দুর্জ্জয়। কিন্তু ঈশ্বরে অনুরাগ জন্মিলে ইহা দূরীকৃত হয়। "পরং দৃষ্ট্বা" এই কথার এমন তাৎপর্য্য নহে যে, ঈশ্বরকে চক্ষে দেখিবে।

ধর্ম্মের এই বিঘ্ন এমন গুরুতর যে, ভগবান্ পরবর্ত্তী কয় শ্লোকে ইহা আরও পরিস্ফুট করিতেছেন।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥৬০॥
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥৬১॥

হে কৌন্তেয়! বিবেকী পুরুষ প্রযত্ন করিলেও প্রমথনকারী ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বক চিত্ত হরণ করে। ৬০।

সেই সকল ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, যোগযুক্ত হইয়া, মৎপর হইয়া, যিনি অবস্থান করেন, তাঁহার ইন্দ্রিয়-সকল বশীভূত হইয়াছে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৬১।

এই গেল ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক বলের কথা। যিনি বিবেকী, তিনিও যত্ন করিয়াও ইহাদিগের সহজে দমন করিতে পারেন না, বলপূর্ব্বক ইহারা চিত্তকে হরণ করে। আর যাহারা যত্ন করে না, যাহারা বাহিরে উপভোগ করে না, কিন্তু মনে কেবল সেই ইন্দ্রিয়-বিষয়েরই ধ্যান করে, তাহাদের সর্ব্বনাশ ঘটে। সেই কথা পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে বলা হইয়াছে।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥৬২॥

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥৬৩॥

(ইন্দ্রিয়ের) বিষয় ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনা জন্মে, কামনা হইতে ক্রোধ জন্মে। ৬২।

ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয়, সম্মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ ঘটে। ৬৩।

যাহাকে মনে পুনঃ পুনঃ স্থান দিবে, তাহাই প্রতি আসক্তি জন্মিবে। আসক্তি জন্মিলে তাহা পাইতে ইচ্ছা করে, অর্থাৎ কামনা জন্মে। না পাইলেই, প্রতিরোধক বিষয়ের প্রতি ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্যতা বা মূঢ়তা জন্মে। এরূপ মোহ হইতে কার্য্য-কারণ-পরম্পর-সম্বন্ধ বিস্মৃত হইতে হয়। কার্য্যকারণসম্বন্ধ ভুলিলেই বুদ্ধিনাশ হইল। বুদ্ধিনাশে বিনাশ। *

ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে হইবে, এবং ইন্দ্রিয়াদির বিষয়কে মনেও স্থান দেওয়া যাইবে না। তবে কি ইন্দ্রিয়াদির উপভোগ একেবারে নিষিদ্ধ? যদি তাহা হয়, তবে এই

* সীতারামের চরিত্রের বর্ত্তমান লেখক এই কথাগুলি উদাহরণের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়াছেন।

গীতোক্ত ধর্ম্ম asceticism * না ত কি? তাহা হইলে জনসমাজকে সন্ন্যাসীর মঠে পরিণত করিতে হয়।

তাহা নহে, ইন্দ্রিয়ের উপভোগ নিষিদ্ধ নহে, তাহার বিশেষ বিধি পরশ্লোকে দেওয়া হইতেছে।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

যিনি বিধেয়াত্মা তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত এবং আপনার বশ্য ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়ের উপভোগে করিয়া প্রসাদ লাভ করেন। ৬৪।

বিধেয়াত্মা—যাঁহার আত্মা বা অন্তঃকরণ বশবর্ত্তী।

ঈদৃশ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-সকল নিজের আজ্ঞাধীন—বলের দ্বারা তাঁহার চিত্ত হরণ করিতে পারে না। তাঁহার ইন্দ্রিয়-সকল ভোগ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত—ই সকল তাঁহার বশ, তিনি ইন্দ্রিয়ের বশ নহেন। ঈদৃশ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদিবিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ বা শান্তি † লাভ করেন। অর্থাৎ তাঁহা কৃত উপভোগ দুঃখের কারণ নহে, সুখের কারণ। তাই বলিতেছিলাম যে, গীতোক্ত এই ধর্ম্ম Ascetic philosophy নহে—প্রকৃত পুণ্যময় ও সুখময় ধর্ম্ম। বিষয়ের উপভোগ ইহাতে নিষিদ্ধ হইতেছে না, তবে ইহার পরিমাণ ও উপযুক্ত বিধি কথিত হইয়াছে।

একটা কথা বুঝাইতে বাকি আছে। বিধেয়াত্মা পুরুষের ইন্দ্রিয়-সকলকে "রাগদ্বেষবিমুক্ত"—অনুরাগ ও বিদ্বেষশূন্য বলা হইয়াছে। বিধেয়াত্মা পুরুষেরা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে অনুরাগশূন্য কেন হইবে, তাহা বুঝান নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বিদ্বেষশূন্য বলিবার কারণ কি? ভোগ্যবিষয়ে অনুরাগ ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, বিদ্বেষ অস্বাভাবিক, কখন দেখান যায় না। যাহার সম্ভাবনা নাই, তাহার নিষেধের কারণ কি? আর যদি উপভোগ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের বিদ্বেষ ঘটে, সে ত ভালই—তাহা হইলে আর ইন্দ্রিয়সুখে প্রবৃত্তি থাকিবে না। তবে এ নিষেধ কেন?

উপভোগ্যে যে বিদ্বেষ ঘটে না, এমন নহে। রোগীর আহারে অরুচি এবং অলসের ব্যায়ামসুখে অরুচি, উদাহরণস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। এ সকল শারীরিক স্বাস্থ্যেরও লক্ষণ নহে, মানসিক স্বাস্থ্যেরও লক্ষণ নহে। অনেককে দেখিতে পাই, কিছুতেই পাড়ওয়ালা ধুতি পরিবেন না, চটিজুতা নহিলে পায়ে দিবেন না। ইহাদিগের চিত্ত আজিও বিকারশূন্য হয় নাই। যে ফিনফিনে কালাপাড়ে ধুতি নহিলে পরিবে না, তাহাদিগের চিত্ত যেমন এখনও বিকৃত, ইহাদিগের তেমনি। যখন সকলই সমান জ্ঞান হইবে, তখন ইহারা আর এরূপ আপত্তি করিবে না।

এই সকল ক্ষুদ্র উদাহরণে কথাটা যত ক্ষুদ্র বোধ হইতেছে, বস্তুতঃ কথাটা ততটা ছোট কথা নহে। একটা বড় উদাহরণ দ্বারা ইহার গৌরব প্রতিপন্ন করিতেছি। রোমান কাথলিক ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের ইন্দ্রিয়বিশেষের তৃপ্তির প্রতি বিদ্বেষ--কার্য্যতঃ না হউক, বিধিতঃ বটে। এই জন্য তাঁহাদের মধ্যে চিরকৌমার বিহিত ছিল। ইহার ফলে কিরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাসপাঠক মাত্রেই জানেন। কিন্তু আর্য্য ঋষিরা যথার্থ স্থিতপ্রজ্ঞ—কোন ইন্দ্রি-

* আমরা যাহাকে বৈরাগ্য বা সংন্যাস বলি, Asceticism তাহা হইতে একটু স্বতন্ত্র জিনিস। এই জন্য ইংরেজি কথাটাই আমি উপরে ব্যবহার করিয়াছি।

† "Makes the
পূর্ব্বোদ্ধৃত কাম্তের উক্তি

ষের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগও নাই, বিদ্বেষও নাই। অতএব তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া যথাকালে দারপরিগ্রহ করিতেন। কিন্তু তাঁহারা যেমন বিদ্বেষশূন্য,ইন্দ্রিয়ের প্রতি তেমনি অনুরাগশূন্য, অতএব কেবল ধর্ম্মতঃ সন্তানোৎপাদন জন্যই বিবাহ করিতেন; এবং সেই জন্য স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট সাময়িক নিয়মের অতিরিক্ত কখন ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেন না।

Asciticism দূরে থাকুক, যাহাকে Puritanism বলে,এই গীতোক্ত ধর্ম্ম তাহারও বিরোধী। কেন না, puritanism "বিদ্বেষ"-বুদ্ধিজাত। গীতোক্ত ধর্ম্মে কোনরূপ ভণ্ডামি চলিবার পথ নাই।

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥৬৫॥

প্রসাদে তাঁহার সকল দুঃখের বিনাশ জন্মে। যিনি প্রসন্নচিত্ত, আশু তাঁহার বুদ্ধি স্থির হয়। ৬৫।

পূর্ব্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, আত্মবশ্য ও রাগদ্বেষবিমুক্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের উপভোগে প্রসাদলাভ হয়। প্রসাদ অর্থে প্রসন্নচিত্ত বা শান্তি। এক্ষণে কথিত হইতেছে, সেই প্রসাদে সর্ব্বদুঃখ নষ্ট হয়, এবং সেই প্রসন্নচেতার স্থিতপ্রজ্ঞতা জন্মে।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥৬৬॥

অযুক্তের বুদ্ধি নাই। অযুক্তের ভাবনা নাই। যাহার ভাবনা নাই,তাহার শান্তি নাই। যাহার শান্তি নাই, তাহার সুখ নাই। ৬৬।

অযুক্ত অসমাহিতান্তঃকরণ (যোগশূন্য)। ভাবনা ধ্যান, চিন্তা। যাহার অন্তঃকরণ অসমাহিত, ইন্দ্রিয়-সকল বশীকৃত হয় নাই,তাহার শাস্ত্রাদির আলোচনাতেও বুদ্ধি জন্মে না। যাহার বুদ্ধি নাই,সে চিন্তা করিতে পারে না। (ভাষ্যকারেরা বলেন, আত্মজ্ঞানাভিনিবেশ নাই) যাহার চিন্তায় শক্তি নাই, তাহার শান্তি নাই; শান্তি না থাকিলে সুখ নাই।

ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তির যে বুদ্ধি নাই, ইহা বুদ্ধি শব্দের সাধারণ অর্থে সত্য নহে। অনেক ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ বলিয়া জগতে পরিচিত হইয়াছেন। তবে সে বুদ্ধিতে তাঁহাদিগকে কখন সুখী করে না। যে বুদ্ধিতে সুখী করে না, সে বুদ্ধি বুদ্ধিই নহে।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥

যাহার মন বিষয়ে প্রবর্ত্তমান ইন্দ্রিয়গণের অনুবর্ত্তন করে, যেমন বায়ু নৌকাকে জলে মগ্ন করে, সেইরূপ (ইন্দ্রিয়) তাহার প্রজ্ঞা হরণ করে। ৬৭।

টীকার প্রয়োজন নাই।

তস্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬৮॥

অতএব হে মহাবাহো! যাহার ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে সর্ব্বপ্রকারে বিমুখীকৃত হইয়াছে, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৬৮।

টীকার প্রয়োজন নাই।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯॥

যাহা সর্ব্বভূতের রাত্রি, সংযমী তখন জাগ্রত। সর্ব্বভূত যখন জাগে, দৃষ্টিযুক্ত মুনির তাহাই রাত্রি। ৬৯।

মহাভারতকারের অনুবাদই এই শ্লোকের প্রচুর টীকা। "অজ্ঞানতিমিরাবৃতমতি ব্যক্তিদিগের নিশাস্বরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠাতে জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ জাগ্রত থাকেন; এবং প্রাণিগণ যে বিষয়-নিষ্ঠাস্বরূপ দিবায় প্রবোধিত থাকে, আত্মতত্ত্বদর্শী যোগীদিগের সেই রাত্রি।"

ব্যামিশ্র (সন্দেহজনক) বাক্যের দ্বারা আমার মন মুগ্ধ করিতেছ। অতএব যাহা দ্বারা আমি শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইব, সেই একই (এক প্রকার নিষ্ঠাই) আমাকে নিশ্চিত করিয়া বলিয়া দাও। ২।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥৩॥

হে অনঘ! ইহলোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা আছে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ সাংখ্যদিগের জ্ঞানযোগ এবং (কর্ম্ম)-যোগীদিগের কর্ম্মযোগ বলিয়াছি। ৩।

এই সকল কথা একবার বুঝান হইয়াছে। পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥৪॥

এই কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই পুরুষ নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রাপ্ত হয় না। আর, কর্ম্মত্যাগেই সিদ্ধি পাওয়া যায় না। ৪।

অর্জ্জুনের প্রশ্ন ছিল, যদি কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তবে কর্ম্মে নিয়োগ করিতেছ কেন? ভগবানের উত্তর, জ্ঞান যদি শ্রেষ্ঠই হয়, তাহা হইলে কি তোমাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে বলিতে হইবে? জ্ঞাননিষ্ঠ হইলেই কি তুমি কর্ম্মত্যাগ করিতে পারিবে? তুমি কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেই কি নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রাপ্ত হইবে? না নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রাপ্ত হইলেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে?

কর্ম্মের অনমুষ্ঠানে কেন নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রাপ্ত হইবে না, তাহা ভগবান্ বলিতেছেন,

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥৫।

কেহই কখনও ক্ষণমাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতির গুণে সকলেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। ৫।

হে অর্জ্জুন! তুমি বলিতেছ, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও আমি তোমাকে কর্ম্ম করিতে বলিতেছি, কিন্তু কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পার কৈ? প্রকৃতি ছাড়েন কৈ? নিশ্বাস, প্রশ্বাস, অশন, শয়ন, স্নান, পান, এ সকল কর্ম্ম নয় কি? জ্ঞানমার্গাবলম্বী হইলে এ সকল ত্যাগ করা যায় কি?

জিজ্ঞাসু এখানে বলিতে পারেন যে, যে সকল কর্ম্ম প্রকৃতির বশ হইয়া করিতে হইবে, তাহা ত্যাগ করা যায় না বটে, কিন্তু যে সকল কার্য্য আপনার ইচ্ছাধীন, তাহা কি জ্ঞানী বা সন্ন্যাসী পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

ইহার সহজ উত্তর এই, অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কেহই পরিত্যাগ করিতে পারে না। ঈশ্বরচিন্তা স্বেচ্ছাধীন কর্ম্ম, ইহা কি জ্ঞানমার্গাবলম্বী পরিত্যাগ করিতে পারে? তবে জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি?

অনেকে বলিবেন, সাধারণতঃ যাহাকে কর্ম্ম বলে, তাহার কথা হইতেছে না। হিন্দুশাস্ত্রে শ্রৌত কর্ম্ম ও স্মার্ত্ত কর্ম্মকেই কর্ম্ম বলে। কিন্তু ইহা সত্য নহে শ্রৌত কর্ম্ম ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে না এবং এই সকল স্বাভাবিক নহে যে, প্রকৃতির তাড়নায় বাধ্য হইয়া তাহা করিতে হয়। অতএব সাধারণতঃ যাহাকে কর্ম্ম বলে —যাহা কিছু করা যায়—তাহারই কথা হইতেছে বটে। ইহা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি। গীতার ব্যাখ্যায় কর্ম্ম বলিলে, কর্ম্মমাত্রই বুঝিতে হইবে; কেবল শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্ম যে ভগবানের অভিপ্রেত নহে, তাহা এই শ্লোকেই দেখা যাইতেছে।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬

যে বিমূঢ়াত্মা, মনেতে ইন্দ্রিয়-বিষয়-সকল স্মরণ রাখিয়া, কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া অবস্থিতি করে, সে মিথ্যাচারী। ৬।

ভগবান্ বলিয়াছেন যে, কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই নৈষ্কর্ম্ম্য পাওয়া যায় না এবং কর্ম্মত্যাগেই সিদ্ধি পাওয়া যায় না। কর্ম্মের অনমুষ্ঠানে যে নৈষ্কর্ম্ম্য ঘটে না, ভগবান্ তাহার এই প্রমাণ দিলেন যে, তুমি কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেও স্বভাবগুণেই তোমাকে কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইতে হইবে। আর কর্ম্মত্যাগেই যে সিদ্ধি ঘটে না, তাহার এই প্রমাণ দিতেছেন যে, কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকল সংযত করিয়া "কর্ম্ম করিব না" বলিয়া বসিয়া থাকিলেও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-সকল মনে আসিয়া উদিত হইতে পারে। তাহা হইলে সে মিথ্যাচার মাত্র। তাহাতে কোন সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

যদি কর্ম্মত্যাগও করা যায় না, এবং কর্ম্মত্যাগ করিলেও সিদ্ধি নাই, তবে কর্ত্তব্য কি, তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥৭॥

হে অর্জ্জুন! যে ইন্দ্রিয়-সকল মনের দ্বারা নিয়ত করিয়া অসক্ত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রেষ্ঠ। ৭।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥৮॥

তুমি নিয়ত কর্ম্ম করিবে। কর্ম্মশূন্যতা হইতে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মশূন্যতায় তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইতে পারে না। ৮।

"তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব!" অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের, ভগবান্ এই উত্তর দিলেন। উত্তর এই যে, কর্ম্মত্যাগ কেহই করিতে পারে না, এবং কর্ম্মত্যাগ করিলেই সিদ্ধি ঘটে না। কর্ম্ম না করিলে তোমার জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের সম্ভাবনা নাই। অতএব কর্ম্ম করিবে। তবে যদি কর্ম্ম করিতেই হইল, তবে যে প্রকারে করিলে কর্ম্ম মঙ্গলকর হয়, তাহাই করিবে। কর্ম্ম যাহাতে শ্রেয়ঃসাধক হয়, তাহার দুইটি নিয়ম কথিত হইল। প্রথম, ইন্দ্রিয়-সকল * মনের দ্বারা সংযত করিয়া, দ্বিতীয়, অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবে। তদতিরিক্ত আর একটি নিয়ম আছে। তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মযোগের কেন্দ্রীভূত। তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে কথিত হইতেছে।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

যজ্ঞার্থ যে কর্ম্ম, তদ্ভিন্ন অন্যত্র কর্ম্ম ইহলোকে বন্ধনের কারণ। হে কৌন্তেয়! তুমি সেই জন্য (যজ্ঞার্থ) অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর। ৯।

যজ্ঞ শব্দের অর্থের উপর এই শ্লোকের ব্যাখ্যা নির্ভর করে। সচরাচর বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপকে পূর্ব্বে যজ্ঞ বলি,—যথা অশ্বমেধাদি। এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপকেই যজ্ঞ বলে।

প্রাচীন ভাষ্যকার শঙ্কর ও শ্রীধর এ অর্থে গ্রহণ করেন না। শঙ্কর বলেন,—'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরঃ।" শ্রীধর সেই অর্থ গ্রহণ করেন। মধুসূদন সরস্বতীও এইরূপ অর্থ করেন। রামানুজ তাহা বলেন না। তিনি দ্রব্যার্জনাদিক কর্ম্মকে যজ্ঞ বলেন।

শঙ্করাদি-কথিত যজ্ঞ শব্দের অর্থ গ্রহণ করিলে, এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ হয় যে, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট ভিন্ন যে সকল কর্ম্ম, তাহা কেবল কর্ম্মফলভোগের জন্য বন্ধন মাত্র। অতএব অনাসক্ত হইয়া কেবল ঈশ্বরোদ্দেশেই কর্ম্ম করিবে।

---

* ভাষ্যকারেরা বলেন,—কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল।

তাহা হইলে, বিচার্য্য শ্লোকের অর্থ এই হয় যে, ঈশ্বরারাধনার্থ যে কর্ম্ম, তাহা ভিন্ন অন্য সকল কর্ম্ম কর্ম্মফলভোগের বন্ধন মাত্র। অতএব কেবল ঈশ্বরারাধনার্থই কর্ম্ম করিবে।

এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তাও কি হয়? ভগবান্ই স্বয়ং বলিতেছেন, নিতান্ত পক্ষে প্রকৃতিতাড়িত হইয়া এবং জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহার্থও কর্ম্ম করিতে হইবে। ঈশ্বরারাধনা কি সে সকল কর্ম্মের উদ্দেশ্য হইতে পারে? আমি জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহার্থ স্নানপান আহার-ব্যায়ামাদি করি, তাহাতে ঈশ্বরারাধনার কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে?

এ কথা বুঝিবার জন্য, আগে স্থির করিতে হয়, ঈশ্বরারাধনা কি? মনুষ্যের আরাধনা করিতে গেলে, আমরা আরাধ্য ব্যক্তির স্তবস্তুতি করি। কিন্তু ঈশ্বরকে সেরূপ তোষামোদপ্রিয় ক্ষুদ্রচেতা মনে করা যায় না। তাঁহার স্তুতি করিলে যদি আমাদের নিজের সুখ কি চিত্তোন্নতি হয়, তবে এরূপ স্তবস্তুতি করার পক্ষে কোন আপত্তিই নাই, এবং এরূপ স্থলে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তাই বলিয়া, ইহাকে প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা বলা যায় না। সেইরূপ, যাহাকে সাধারণতঃ "যাগ-যজ্ঞ" বলে, পুষ্প চন্দন নৈবেদ্য হোম বলি উৎসব এ সকলও ঈশ্বরারাধনা নহে।

ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন ঈশ্বরারাধনা বটে, কিন্তু তোষামোদে তাঁহার তুষ্টিসাধন হইতে পারে না। তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্যের সম্পাদন, তাঁহার নিয়ম-প্রতিপালনই তাঁহার তুষ্টিসাধন—তাহাই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা। এক্ষণে, তাঁহার অভিপ্রেত-কার্য্যের সম্পাদন ও তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন কাহাকে বলি? বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ এক কথায় এই প্রশ্নের অতি সুন্দর উত্তর দিয়াছেন—

"সর্ব্বত্র দৈ[illegible]ঃ সমতা[illegible]পেত্য
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য॥"

সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা। আমরা ক্রমশঃ ভূয়োভূয়ঃ দেখিব, গীতোক্ত ঈশ্বরারাধনাও তাই—সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, সর্ব্বভূতে আত্মবৎ জ্ঞান, এবং সর্ব্বভূতের হিতসাধন।

অতএব কর্ম্মযোগীর কর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য, সর্ব্বভূতের হিতসাধন।

যে কর্ম্মকর্ত্তা, সে নিজেও সর্ব্বভূতের অন্তর্গত। অতএব আত্মরক্ষাও ঈশ্বরাভিপ্রেত। জগদীশ্বর আত্মরক্ষার ভার, সকলেরই নিজের উপর দিয়াছেন। এ সকল কথা আমি সবিস্তারে ধর্ম্মতত্ত্বে বুঝাইয়াছি, পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

এই নবম শ্লোকে বলা হইতেছে যে, "যজ্ঞ" (যে অর্থেই হউক) ভিন্ন অন্যত্র কর্ম্মবন্ধন মাত্র। "বন্ধন" কি, এইটা বুঝাইতে বাকি আছে। অন্যবিধ কর্ম্ম নিষ্ফল হয় বা পাপজনক, এমন কথা বলা হইতেছে না। বলা হইতেছে, তাহা বন্ধনস্বরূপ। এই বন্ধন বুঝিতে জন্মান্তরবাদ স্মরণ করিতে হইবে। কর্ম্ম করিলেই জন্মান্তরে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। কর্ম্মফল—সুফলই হউক্ আর কুফলই হউক্, তাহা ভোগ করিবার জন্য, জীবকে জন্মান্তরগ্রহণ করিতে হইবে। যতদিন জন্মের পর জন্ম হইবে, ততদিন জীবের মুক্তি নাই। মুক্তির প্রতিবন্ধক বলিয়াই কর্ম্মবন্ধন মাত্র।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে,—যদি জন্মান্তর না থাকে? তাহা হইলেও গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মই কি ধর্ম্মানুমোদিত? না নিষ্কাম কর্ম্মও যা, সকাম কর্ম্মও তা?

আমি ধর্ম্মতত্ত্বে এ কথার উত্তর দিয়াছি নিষ্কাম কর্ম্ম ভিন্ন মনুষ্যত্ব নাই। মনুষ্যত্ব ব্যতীত ইহজন্মে বা ইহলোকে স্থায়ী সুখ

নাই। অতএব গীতোক্ত এই ধর্ম্ম বিশ্বজনীন।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥১০॥

পূর্ব্বকালে, প্রজাপতি প্রজাগণের সহিত যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "ইহার দ্বারা তোমরা বর্দ্ধিত হইবে, ইহা তোমাদিগের অভীষ্টপ্রদ হইবে।"। ১০।

এখানে 'যজ্ঞ' শব্দে আর 'ঈশ্বর' নহে বা ঈশ্বরারাধনা নহে। কেবল যজ্ঞই অর্থাৎ শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মই যজ্ঞ; এবং পরবর্ত্তী ১২শ, ১৩শ ১৪শ এবং ১৫শ শ্লোকেতে যজ্ঞ শব্দে কেবল ঐ যজ্ঞই বুঝায়। এক শ্লোকে একার্থে একটি শব্দ কোন অর্থবিশেষে ব্যবহৃত করিয়া,তাহার পর ছত্রেই ভিন্নার্থে কেহ ব্যবহার করে না। এজন্য অনেক আধুনিক পণ্ডিত নবম শ্লোকে যজ্ঞার্থে যজ্ঞই বুঝেন। কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্ স্বকৃত অনুবাদে যজ্ঞার্থে sacrifice লিখিতেছেন। তাহার পর দশম শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—Probably the sacrifices spoken of in that passage (নবম শ্লোকে) must be taken to be the same as those referred to in this passage." ডেবিস্ সাহেবও তৎপথাবলম্বী। শঙ্করের ভাষ্য দেখিয়াও গ্রাহ্য করেন নাই, নোটে এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। এদিকে কামধুকের স্থানে Kamduk লিখিয়া বসিয়াছেন! একবার নহে, বার বার!!

এতক্ষণ ভগবান্ সকাম কর্ম্মের নিন্দা ও নিষ্কাম কর্ম্মের প্রশংসা করিতেছিলেন। কিন্তু যজ্ঞ সকাম। অতএব যজ্ঞার্থে ঈশ্বর না বুঝিলে ইহাই বুঝিতে হয়,ভগবান্ সকাম কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিতেছেন। তাই নবমে যজ্ঞার্থে ঈশ্বর, ইহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদ হইতে বাহির করিয়াছেন। চতুর্ব্বেদ তাঁহার কণ্ঠস্থ।

এক্ষণে এই শ্লোকটা সম্বন্ধে একটা কথা বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। বলা হইতেছে, প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এমন কেহই বুঝিবেন না যে, যজ্ঞ একটা জীব বা জিনিস; প্রজাপতি যখন মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন, তখন তাহাকেও সৃষ্টি করিলেন। ইহার অর্থ এই যে, বেদে যজ্ঞবিধি আছে এবং যখন প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিলেন, তখন সেই বেদও ছিল। গোঁড়া হিন্দু এইটুকুতেই সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু আমার অধিকাংশ পাঠক সে শ্রেণীর লোক নহেন। আমার পাঠকেরা বলিবেন, প্রথমতঃ প্রজাসৃষ্টিই মানি না—মনুষ্য ত বানরের বিবর্ত্তন। তার পর, বেদ নিত্য বা অপৌরুষেয় বা প্রজাসৃষ্টির সমসাময়িক, ইহাও মানি না। পরিশেষে প্রজাপতি যে প্রজাসৃষ্টি করিয়া যজ্ঞ-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়া শুনাইলেন, ইহাও মানি না।

মানিবার আবশ্যকতা নাই। আমিও মানি না, শ্রীকৃষ্ণও মানিতে বলিতেছেন না। ক্রমশঃ বুঝা যাইবে। এই সকল কথার আলোচনা, আর পরবর্ত্তী কয়েকটি শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য আমি ষোড়শ শ্লোকের পর বলিব।

পুনশ্চ লৌকিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন,

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥১১।

তোমরা যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে সংবর্দ্ধিত কর; দেবগণ তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন। পরস্পর এইরূপ সংবর্দ্ধিত করিয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিবে। ১১।

টীকায় শ্রীধর স্বামী বলেন, "তোমরা হবির্ভাগের দ্বারা দেবগণকে সংবর্দ্ধিত করিবে, দেবগণও বৃষ্ট্যাদির দ্বারা অন্নোৎপত্তি করিয়া

তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করিবেন। আমরা ত অন্ন না খাইলে বাঁচি না, ইহা জানা আছে। দেবতারাও না কি যজ্ঞের ঘি খাইয়া থাকেন, খাইলে তাঁহাদের পুষ্টিসাধন হয়। বেদে এরূপ কথা আছে। থাকুক।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে
যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তা ন প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন
এব সঃ॥ ১২॥

যজ্ঞের দ্বারা সংবর্দ্ধিত দেবগণ যে অভীষ্ট ভোগ তোমাদিগকে দিবেন, তাঁহাদিগকে তদ্দত্ত (অন্ন) না দিয়া যে খায়, সে চোর।১২।

শঙ্কর ও শ্রীধর স্বামী বলেন, (বলিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না) "পঞ্চ যজ্ঞাদিভিরদত্বা," পঞ্চযজ্ঞাদির দ্বারা না দিয়া যে খায়, সে চোর। পঞ্চযজ্ঞ যথা—

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি-
ভোজনম্॥

অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞ বা অধ্যাপন, পিতৃযজ্ঞ বা তর্পণ, দৈবযজ্ঞ বা হোম, ভূতযজ্ঞ বা বলি, এবং নরযজ্ঞ বা অতিথি-ভোজন। ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, "শ্রীধর পঞ্চযজ্ঞেরদত্বা" বলেন না, "পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্বা" বলেন।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্ম-
কারণাৎ॥১৩॥

যে সজ্জনগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন। যাহারা কেবল আপনার জন্য পাক করে, সেই পাপিষ্ঠেরা পাপভোজন করে। ১৩।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥ ১৪॥

অন্ন হইতে ভূত-সকল উৎপন্ন; পর্জ্জন্য হইতে অন্ন জন্মে; যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য জন্মে। কর্ম্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি। ১৪।

পর্জ্জন্য একটি বৈদিক দেবতা। তিনি বৃষ্টি করেন। এখানে পর্জ্জন্য অর্থে বৃষ্টি বুঝিলেই হইবে।

অন্ন হইতে জীবের উৎপত্তি। কথাটা ঠিক বৈজ্ঞানিক না হউক, অসত্য নয়, এবং বোধগম্য বটে। টীকাকারেরা বুঝাইয়াছেন, অন্ন রূপান্তরে শুক্র-শোণিত হয়, তাহা হইতে জীব জন্মে। ইহাই যথেষ্ট।

তার পর, বৃষ্টি হইতে অন্ন। তাহাও স্বীকার করা যাইতে পারে; কেন না, বৃষ্টি না হইলে ফসল হয় না। কিন্তু যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি, এ কথাটা বৈজ্ঞানিক স্বীকার করিবে না। টীকাকারেরা বলেন, যজ্ঞের ধূমে মেঘ জন্মে। অন্য ধূমেও মেঘ জন্মিতে পারে। অধিকাংশ মেঘ ধূম ব্যতীত জন্মে। যে দেশে যজ্ঞ হয় না, সে দেশেও মেঘ ও বৃষ্টি হয়। সে যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এ স্থলে আলোচিত হইতেছে না। তবে কি ভগবদুক্তি অসত্য ও অবৈজ্ঞানিক? ক্রমশঃ তাহাই বুঝাইতেছি।

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতি-
ষ্ঠিতম্॥১৫॥

কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত জানিও; ব্রহ্ম অক্ষর হইতে সমুদ্ভূত; অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। ১৫।

টীকাকারেরা বলেন, ব্রহ্ম শব্দে এখানে বেদ বুঝিবে; অক্ষর পরমাত্মা। তবে কেহ কেহ এই গোলযোগ করেন যে, প্রথম চরণে ব্রহ্ম শব্দে বেদ বুঝিয়া, দ্বিতীয় চরণে ব্রহ্ম শব্দে পরব্রহ্ম বুঝেন। নহিলে অর্থ হয় না। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতকার এবং অন্যান্য অনুবাদকেরা এই মতের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন।

কিন্তু শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং দ্বিতীয় চরণেও ব্রহ্ম শব্দে বেদ বুঝিয়াছেন, অতএব এই শ্লোকের দুই প্রকার অর্থ করা যায়।

প্রথম, শ্রীধরাদির মতে—

"কর্ম্ম বেদ হইতে, এবং বেদ পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে; অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।"

দ্বিতীয়, শঙ্করাচার্য্যের মতে—

"কর্ম্ম বেদ হইতে এবং বেদ পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে; অতএব বেদ সর্ব্বার্থ-প্রকাশকত্ব হেতু নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।"

পাঠকের যে ব্যাখ্যা ইচ্ছা, তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন; স্থূল তাৎপর্য্যের বিঘ্ন কোনও ব্যাখ্যাতেই হইবে না।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ ১৬॥

এইরূপ প্রবর্ত্তিত চক্রের যে অনুবর্ত্তী না হয়, সে পাপজীবন ও ইন্দ্রিয়ারাম, হে পার্থ, সে অনর্থক জীবনধারণ করে। ১৬।

(ইন্দ্রিয়সুখে যাহার আরাম, সেই ইন্দ্রিয়ারাম।)

ব্রহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জীব। টীকাকারেরা ইহাকে জগচ্চক্র বলিয়াছেন। কর্ম্ম করিলে এই জগচ্চক্রের অনুবর্ত্তন করা হইল। কেন না, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ হইবে, যজ্ঞ হইতে মেঘ হইবে, মেঘ হইতে অন্ন হইবে, অন্ন হইতে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ হইবে। এই হইল চক্রের একভাগ। এ ভাগ সত্য নহে; কেন না, আমরা জানি, কর্ম্ম করিলেই যজ্ঞ* হয় না, যজ্ঞ করিলেই মেঘ হয় না, মেঘ হইলেই শস্য হয় না (সকল মেঘে বৃষ্টি নাই এবং অতিবৃষ্টিও আছে) ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, যজ্ঞ ভিন্ন কর্ম্ম আছে, বিনা যজ্ঞেও মেঘ হয়, বিনা মেঘেও শস্য হয় (যথা রবিখন্দ), শস্য বিনাও জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ হয়, (উদাহরণ, সকল অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতি মৃগয়া বা পশুপালন করিয়া খায়) ইত্যাদি।

চক্রের দ্বিতীয় ভাগ এই যে, ব্রহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কর্ম্ম। ইহাও বিরোধের ব্রহ্ম হইতে বেদ না বলিয়া, অনেকে বলেন, বেদ অপৌরুষেয়। অনেকে বলিতে পারেন, বেদ অপৌরুষেয়ও নহে, ব্রহ্মসম্ভূতও নহে, ঋষিপ্রণীত মাত্র, তাহার প্রমাণ বেদেই আছে। তার পর, বেদ হইতে কর্ম্ম, এ কথা কেবল শ্রৌত কর্ম্ম ভিন্ন আর কোন প্রকার কর্ম্ম-সম্বন্ধে সত্য নহে। পাঠক দেখিবেন, দশম শ্লোক হইতে আর এই ষোড়শ পর্য্যন্ত আমরা অনৈসর্গিক কথার ঘোরতর আবর্ত্তে পড়িয়াছি। সমস্তই অবৈজ্ঞানিক unscientific কথা। এখানে মহর্ষিতুল্য প্রাচীন ভাষ্যকারেরা কেহই সহায় নহেন; তাঁহারা বিশ্বাসের জাহাজে পাল ভরিয়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। আমরা ম্লেচ্ছের শিষ্য; আমাদের উদ্ধারের সে উপায় নাই। তবে ইহা আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিব যে, গীতা বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ নহে। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বপ্রচার জন্য Huxley বা Tyndale ইহার প্রণয়ন করেন নাই। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান তাহাতে পাওয়ার প্রত্যাশা করা যায় না।

* যদি বল, শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মই কর্ম্ম, কাজেই যজ্ঞ ভিন্ন কর্ম্ম নাই, তাহা হইলে "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ," (৫ম শ্লোক), এবং "শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ" (৮ম শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যের অর্থ নাই।

তবে, পাঠক বলিতে পারেন যে, যাহা তুমি ভগবদুক্তি বলিতেছ, তাহা ভ্রমশূন্য ও অসত্যশূন্য হওয়াই উচিত। অবৈজ্ঞানিক হইলে অসত্য হইল। ঈশ্বরের অসত্য কথা কি প্রকারে সম্ভবে?

কিন্তু এই সাতটি শ্লোক যে ভগবদুক্তি, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গীতায় যাহা কিছু আছে, তাহাই যে ভগবদুক্তি, এমন কথা বিশ্বাস করা উচিত নহে। আমি বলিয়াছি যে, কৃষ্ণকথিত ধর্ম্ম অন্য কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। যিনি সঙ্কলন করিয়াছেন, তাঁহার নিজের মতামত অবশ্য ছিল। তিনি যে নিজ সঙ্কলিত গ্রন্থের কোথাও নিজের মত চালান নাই, ইহা সম্ভব নহে। শ্রীধর স্বামীর ন্যায় টীকাকারও সঙ্কলনকর্ত্তা-সম্বন্ধে "প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাদ্বিনিঃসৃতানেব শ্লোকানলিখৎ?" ইহা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, "কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে ব্যরচৎ।" এখানে দেখিতে পাইতেছি, কৃষ্ণোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্মের সঙ্গে এই সাতটি শ্লোকের বিশেষ বিরোধ। এজন্য ইহা ভগবদুক্তি নহে, সঙ্কলনকর্ত্তার মত—ইহাই আমার বিশ্বাস।

তবে ইহাও আমার বক্তব্য যে, ইহা যদি প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণোক্তিই হয়, তবে যে এ সকল কথা ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানসঙ্গত হওয়া উচিত ছিল, এমন বিশ্বাস আমার নাই। আমি "কৃষ্ণচরিত্রে" দেখাইয়াছি যে, কৃষ্ণ মানুষী শক্তির দ্বারা পার্থিব কর্ম্মসকল নির্ব্বাহ করেন, ঐশী শক্তি দ্বারা নহে। মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ ভিন্ন, ঈশ্বরের মনুষ্যদেহ গ্রহণ করা বুঝা যায় না। কৃষ্ণ যদি মানবশরীরধারী, ঈশ্বর হয়েন, তবে তাঁহার মানুষী শক্তি ভিন্ন ঐশী শক্তির দ্বারা কার্য্য করা অসম্ভব, কেন না, কোন মানুষেরই ঐশী শক্তি নাই— মানুষের আদর্শেও থাকিতে পারে না। কেবল মানুষী শক্তির ফল যে ধর্ম্মতত্ত্ব, তাহাতে তিন সহস্র বৎসর পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক সত্য প্রত্যাশা করা যায় না। ঈশ্বরের তাহা অভিপ্রেত নহে।

আর, এই বৈজ্ঞানিকতা-সম্বন্ধে আর একটা কথা আছে। মনে কর, এখন ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া নূতন ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিলেন। এখনকার লোকের বোধগম্য বিজ্ঞান অতিক্রম করিয়া, নিজের সর্ব্বজ্ঞতাপ্রভাবে আর তিন চারি হাজার বৎসর পরে বিজ্ঞান যে অবস্থায় দাঁড়াইবে, তাহার সহিত সুসঙ্গতি রাখিলেন। বিজ্ঞানের যেরূপ দ্রুতগতি, তাহাতে তিন চারি হাজার বৎসর পরে বিজ্ঞানে যে কি না করিবে, তাহা বলা যায় না। তখন হয়ত মনুষ্য জীবন্ত মনুষ্য হাতে গড়িয়া সৃষ্টি করিবে, ইথরের তরঙ্গে চড়িয়া সপ্তর্ষি-মণ্ডল * বা রোহিণী নক্ষত্র † বেড়াইয়া আসিবে, হিমালয়ের উপর দাঁড়াইয়া মঙ্গলাদি গ্রহ-উপগ্রহবাসী কিম্ভূতকিমাকার জীবগণের সঙ্গে কথোপকথন বা যুদ্ধ করিবে, এ বেলা ও বেলা সূর্য্যলোকে অগ্নিভোজনের নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইবে। মনে কর, ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞতাপ্রযুক্ত এই ভাবী বিজ্ঞানের সঙ্গে সুসঙ্গতি রাখিয়া তদুপযোগী ভাষায় নূতন ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিলেন। করিলে, শুনিবে কে? অনুবর্ত্তী হইবে কে? কেহ না। এই জন্য ঈশ্বরোক্তি সময়োপযোগী ভাষায় প্রচারিত হওয়া উচিত। তার পর, ক্রমশঃ মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে, সেই প্রাচীন-কালোপযোগী ভাষার দেশ-কাল পাত্রের উপযোগী ব্যাখ্যা হইতে পারে। সেই জন্যই শঙ্করাদি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কৃত-গীতা-ভাষ্য থাকিতেও আমার ন্যায় মূর্খ অভিনব ভাষ্য-রচনায় সাহসী।

এই সাতটি শ্লোক যে বৈজ্ঞানিক অসত্যে

---

* Great Bears. † Plerades,

কলম্বিত, এই প্রথম আপত্তির আমি এই তিনটি উত্তর দিলাম। দ্বিতীয় আপত্তি এই উপস্থিত হইতে পারে যে, এই সাতটি শ্লোক গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্মের বিরোধী। এ আপত্তি অতি যথার্থ। তবে এই কয়টি শ্লোক কেন এখানে আসিল, এ প্রশ্নের উত্তর শঙ্কর ও শ্রীধর যেরূপ দিয়াছেন, তাহা নবম শ্লোকের টীকায় বলিয়াছি। মধুসূদন সরস্বতী যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাকৃত সঙ্গত বোধ হইতে পারে। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন তাহার মর্ম্মার্থ অতি বিশদরূপে বুঝিয়াছেন, অতএব তাঁহার কৃত গীতার্থ-সন্দীপনী নাম্নী টীকা হইতে ঐ অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"সহযজ্ঞ" অর্থাৎ কর্ম্মাধিকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে সম্বোধন করিয়া প্রজাপতি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কাম্য কর্ম্মেরই উদ্ঘোষণা হইল ; কিন্তু "মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ" এই বচনে কাম্য কর্ম্মের নিষেধও করা হইয়াছে এবং গীতাতেও কাম্য কর্ম্মের প্রসঙ্গ নাই, এজন্য ব্রহ্মার উক্তি এ স্থলে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে ; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে এ আশঙ্কা বিদূরিত হইবে। "প্রজাগণ, তোমরা কামনা করিয়া ফলপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও", ব্রহ্মা এ কথা বলেন নাই। কর্ত্তব্যানুরোধে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই ব্রহ্মার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই কর্ম্মসাধনমধ্যে যে দিব্য শক্তি নিহিত আছে, তাহারই ঘোষণার্থ ব্রহ্মা বলিলেন, "তোমরা নিয়মিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও। তাহারই অলৌকিক প্রভাবে তোমরা যখন যাহা বাসনা করিবে, তাহা সিদ্ধ হইতে থাকিবে। লোকে আম্রেরই জন্য যেমন আম্রবৃক্ষ রোপণ করে, কিন্তু ছায়া ও মুকুলের সদ্গন্ধ তাহারা বিনা চেষ্টাতেই পাইয়া থাকে, সেইরূপ কর্ত্তব্যের অনুরোধেই কর্ম্ম সাধন করিবে, কিন্তু অনুষ্ঠানের ফল-কামনা না করিলেও উহা স্বতএব প্রাপ্ত হইবে। ফলে ইচ্ছা না থাকিলেও কর্ম্মের স্বভাবগুণেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।"

আমার বোধ হয়, আমার পাঠকের নিকট শঙ্কর ও শ্রীধরের উত্তরের ন্যায়, এ উত্তরও সন্তোষজনক হইবে না। কিন্তু বিচারে বা প্রতিবাদে আমার কোন্ প্রয়োজন নাই। সাতটি শ্লোকের ভিতর একটি রহস্য আছে, তাহা দেখাইয়া দিয়া ক্ষান্ত হইব।

গীতাকার বলিতেছেন যে—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।*

এ কথা গীতাকার নিজে হইতে বলেন নাই। এইরূপ বিশ্বাস প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। মনুসংহিতায় আছে,

"কর্ম্মাত্মনাঞ্চ দেবানাং সোঽসৃজৎ প্রাণিনাং প্রভুঃ।
সাধ্যানাঞ্চ গণং সূক্ষ্মং যজ্ঞঞ্চৈব সনাতনম্॥"
১-২২। ইত্যাদি।

যজ্ঞের দ্বারা যে দেবগণ পরিতুষ্ট ও প্রসন্ন হয়েন, এবং যজ্ঞকারীকে অভিমত ফলদান করেন, ইহা বৈদিক ধর্ম্মের স্থূলাংশ। ইহাই লৌকিক ধর্ম্ম।

এখন পূর্ব্বপ্রচলিত প্রাচীন লৌকিক ধর্ম্মের প্রতি ধর্ম্মসংস্কারকের কিরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য ? এমন লৌকিক ধর্ম্ম নাই এবং হইতেও পারে না যে, তাহাতে উপধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই। যিনি ধর্ম্মসংস্করণে প্রবৃত্ত, তিনি সেই লৌকিক বিশ্বাসযুক্ত উপধর্ম্মের প্রতি কিরূপ আচরণ করিবেন ?

কেহ কেহ বলেন, তাহার একেবারে উচ্ছেদ কর্ত্তব্য। মহম্মদ তাহাই করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার পরবর্ত্তী মহাপুরুষগণের তরবারির জোর তত বেশী না থাকিলে, তিনি কৃত-

---

* ইহার অনুবাদ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

কার্য্য হইতে পারিতেন না। যীশুখৃষ্ট নিজে যীহুদা ধর্ম্মের উপরেই আপনার প্রচারিত ধর্ম্ম-তত্ত্ব সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তার পর খৃষ্টীয় ধর্ম্ম যে রোমক-সাম্রাজ্য হইতে প্রাচীন উপ-ধর্ম্মকে একেবারে দূরীকৃত করিয়াছিল,তাহার একমাত্র কারণ এই যে, রোমক-সাম্রাজ্যের প্রাচীন ধর্ম্ম তখন একেবারে জীবনশূন্য হইয়াছিল। যাহা জীবনশূন্য, তাহার মৃত দেহটা ফেলিয়া দেওয়া বড় কঠিন কাজ নহে। পক্ষান্তরে, শাক্যসিংহের ধর্ম্ম, প্রাচীন ধর্ম্মের সঙ্গে কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই।

গীতাকারও বৈদিক ধর্ম্মের প্রতি খড়্গহস্ত নহেন। তিনি জানিতেন যে, তাঁহার কথিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ, কখনও লৌকিক ধর্ম্মের সমস্ত স্থান অধিকার করিতে পারিবে না। তবে লৌকিক ধর্ম্ম বজায় থাকিতে ইহার দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে সেই লৌকিক ধর্ম্মের বিশুদ্ধসাধন হইতে পারিবে। এজন্য তিনি সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করিতে ইচ্ছুক নহেন। যাঁহারা বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তাঁহাকে আমরা গণনা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার কৃত যে বিদ্রোহ, তাহার সীমা এই পর্য্যন্ত যে,বেদে ধর্ম্ম আছে, তাহা অসম্পূর্ণ; নিষ্কাম কর্ম্মযোগাদির দ্বারা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। এই জন্য তিনি বৈদিক সকাম ধর্ম্মকে নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু নিকৃষ্ট বলিয়া যে তাহার কোনও প্রকার গুণ নাই, এমন কথা বলেন না। তাহার গুণসম্বন্ধে এখানে গীতাকার যাহা বলেন, বুঝাইতেছি।

যাহারা কর্ম্ম করে (সকলেই কর্ম্ম করে), তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইতেছে। প্রথম,যাহারা নিষ্কামকর্ম্মী এবং যাহারা নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারা জ্ঞানমার্গে আরোহণ করিয়াছে,তাহাদের সপ্তদশ শ্লোকে"আত্মরতি" বা "আত্মারাম"বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়,যাহারা কেবল আপন ইন্দ্রিয়সুখের জন্য কর্ম্ম করে। ষোড়শ শ্লোকে তাহাদিগকে "ইন্দ্রিয়ারাম"বলা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তৃতীয় শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা প্রচলিত ধর্ম্মানুসারে যজ্ঞাদি করিয়া যজ্ঞাবিশিষ্ট ভোজন করে। দশম হইতে পঞ্চদশ শ্লোকে তাহাদেরই কথা বলা হইল। তাহাদের অন্ততঃ এই প্রশংসা করা যাইতে পারে যে, তাহারা "ইন্দ্রিয়ারাম" নহে—প্রচলিত ধর্ম্মানুসারে চলিয়া থাকে। যদিও তাহাদের ধর্ম্ম উপধর্ম্ম মাত্র, তথাপি তাহারা ঈশ্বরোপাসক; কেন না, ঈশ্বর যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। এই কথার তাৎপর্য্য আমরা পরে বুঝিব। দেখিব যে, কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, আমি ভিন্ন দেবতা নাই। যাহারা অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারা আমারই উপাসনা করে। সে উপসনাকে তিনি অবৈধ উপাসনা বলিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাহাও তাঁহার উপাসনা, এবং তিনিই তাহার ফলদাতা, ইহাও বলিয়াছেন।

এখন জিজ্ঞাস্য, কাহাদের মতটা উদার? যাঁহারা বলেন যে,বৈধ অবৈধ উপাসনা অনন্ত নরকের পথ, না যাঁহারা বলেন যে,বৈধ হউক আর অবৈধ হউক. উপাসনা মাত্র, ঈশ্বরের গ্রাহ্য? কি বৈধ, অবৈধ তাহা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। কাহাদের মত উদার? যাঁহারা বলেন, জ্ঞানের অভাব জন্য উপাসক ঈশ্বর কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবে,না যাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর জ্ঞানের মাপ করেন না, উপাসকের হৃদয়ের ভাব দেখেন? কে নরকে যাইবে,—যে বলে যে, নিরাকারের উপাসনা না করিলেই অনন্ত নরক, না যে যেমন বুঝে, তেমনই উপাসনা করে।

গঙ্গা বা Casapian Sea বা অমাদের লালদীঘি সবই জল। কিন্তু জল গঙ্গা নহে, Caspian Sea নহে বা লালদীঘি নহে। "জল মনুষ্যজীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়"

বলিলে কখনও বুঝাইবে না যে, গঙ্গা মনুষ্য-জীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বা Cspian Sea তজ্জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় বা লালদীঘি তজ্জন্য বা প্রয়োজনীয়। অতএব বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপক বলিয়া যজ্ঞ বিষ্ণু, অতএব "যজ্ঞার্থে" বলিলে 'বিষ্ণ্বর্থে" বুঝিতে হইবে, এ কথা খাটে না।

আর কোনও অর্থ শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রেত হইতে পারে কি না,এখন দেখা যাউক। আর কোন অভিপ্রায়ই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তবে শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে যা হউক একটা কিছু পাওয়া যায়। সে কথার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবগণ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করেন। সেই দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু একজন। সেই যজ্ঞে ইনি অন্য দেবতাদিগের উপর প্রাধান্য লাভ করেন এবং তজ্জন্য যজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। অতএব এই বিষ্ণু ঈশ্বর নহেন। আর পাঁচটা দেবতার মধ্যে একজন মাত্র—আদৌ আর পাঁচটা দেবতার সঙ্গে সমান। শঙ্করাচার্য্য-কৃত ব্যাখ্যা এই যে,"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরঃ।" এখন যাহা বলিবেন যে, যদি "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইহা স্বীকার করিলে, যজ্ঞ ঈশ্বর, ইহা যে বেদে কথিত হইয়াছে, এমন কথা কোনও মতেই স্বীকার করা যায় না।

শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিত দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে কেহ জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। এক্ষণে ভারতবর্ষে কেহই নাই যে, তাঁহার পাদুকা বহন করিবার যোগ্য। তবে দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া আমাদের স্মরণ করিতে হইবে যে,গীতা যে আদ্যন্ত সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম-বিনির্গত, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন বা করিতে বাধ্য। কাজেই এখানে অপরের উক্তি কিছু আছে বা যোড়া তাড়া আছে, এমন কথা তিনি মুখেও আনিতে পারেন না। পক্ষান্তরে, যদি যজ্ঞের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অর্থাৎ সকাম কর্ম্মের উৎসাহ দেওয়া হয়। তাহাতে অর্থবিরোধ উপস্থিত হয়। কেন না, এ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ সকাম কর্ম্ম অপ্রশংসিত ও নিষ্কামকর্ম্ম অনুজ্ঞাত করিয়া আসিতেছেন। এই জন্য এখানে যজ্ঞার্থে ঈশ্বর বলিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাহা বলিয়াও পরবর্ত্তী কয়টি শ্লোকেও কোন উপায় নাই। সে সকলে যজ্ঞার্থ কাম্য কর্ম্মই বুঝাইতে হইয়াছে। গীতায় এইরূপ কাম্য কর্ম্মের বিধি থাকার কারণ ষোড়শ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে,প্রথমে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা-প্রাপ্তির জন্য অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্মযোগানুষ্ঠান করিবে। ইহার জন্য 'ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদি যুক্তি পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে ; কিন্তু অনাত্মজ্ঞের কর্ম্ম না করার অনেক দোষ আছে, ইহাই কথিত হইতেছে।

শ্রীধর স্বামী শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী। তিনি নবম শ্লোকের ব্যাখ্যায় যজ্ঞার্থে ঈশ্বর বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সামান্যতঃ অকর্ম্ম (কর্ম্মশূন্যতা) হইতে কাম্যকর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, এই জন্য পরবর্ত্তী শ্লোক কয়টি কথিত হইয়াছে।

সেই পরবর্ত্তী শ্লোক কি, তাহা নিম্নে জানিতে পারিবেন। তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে যদি আমরা কেহ শঙ্করাচার্য্যকৃত নবম শ্লোকের যজ্ঞ শব্দের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হই, তবে তাহার আর একটা সদর্থের সন্ধান করা আমাদের কর্ত্তব্য।

যজ্ঞ শব্দের মৌলিক অর্থই এখানে গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি ? যজ্ ধাতু দেব পূজার্থে। অতএব যজ্ঞের মৌলিক অর্থ দেবোপাসনা। যেখানে বহু দেবতার উপসনা স্বীকৃত,সেখানে সকল দেবতার পূজা যজ্ঞ। কিন্তু যেখানে এক ঈশ্বরই সর্ব্বদেবময়, যথা—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-
পূর্ব্বকম্॥" ২৩॥ গীতা, ৯ অ।

সেখানে যজ্ঞার্থে ঈশ্বরারাধনা। ভগবান্ তাহাই স্বয়ং বলিতেছেন—

"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব
চ।" ২৪॥ গীতা, ৯ অ।

যজ্ ধাতু এবং যজ্ঞ শব্দ এইরূপ ঈশ্বরারাধনার্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। উপরিধৃত শ্লোকে তিনটি উদাহরণ আছে। আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে—

"ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্।" গীতা, ২৫, ১০ অ।

"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থবিরাণাং হিমালয়ঃ।"
গীতা, ২৫, ১০ অ।

অন্য গ্রন্থেও যজ্ঞ শব্দের ঈশ্বরারাধনার্থে ব্যবহার অনেক দেখা যায় যথা মহাভারতে "বাক্‌যজ্ঞেনার্চ্চিতো দেবঃ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দন।" শান্তিপর্ব্ব, ৪৭ অধ্যায়॥

এখন এই নবম শ্লোকে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বরারাধনা বুঝিলে কি প্রত্যবায় আছে? তাহা করিলে, এই শ্লোকের সদর্থও হয়, সুসঙ্গত অর্থও হয়।

কিন্তু যজ্ঞ শব্দের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবার পক্ষে কিছু আপত্তি আছে। একটি আপত্তি এই:—এই শ্লোকের পরবর্ত্তী কয় শ্লোকে যজ্ঞ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে; সেখানে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বর, এমন অর্থ বুঝায় না। "সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ" "যজ্ঞভাবিতাঃ দেবাঃ" "যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ" "যজ্ঞঃ কর্ম্ম সমুদ্ভব" "যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্" ইত্যাদি প্রয়োগে যজ্ঞ শব্দে বিষ্ণু বা ঈশ্বর বুঝাইতে পারে না। এখন ৯ম শ্লোকে যজ্ঞ শব্দ এক অর্থে ব্যবহার করিয়া, তাহার পরেই দশম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ শ্লোকে ভিন্নার্থে সেই শব্দ ব্যবহার করা নিতান্ত অসম্ভব। সামান্য লেখকও এরূপ করে না, গীতাপ্রণেতা যে এরূপ করিয়েন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। হয় গীতাকর্ত্তা রচনায় নিতান্ত অপটু, নয় শঙ্করাদিকৃত যজ্ঞ শব্দের এই অর্থ ভ্রান্ত। এ দুইয়ের একটাও স্বীকার যায় না। যদি তা না যায়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, হয় নবম হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত একার্থেই যজ্ঞ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, নয় নবম শ্লোকের পর একটা যোড়াতাড়া আছে।

প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, যজ্ঞ বিষ্ণুর নাম নয়। অভিধানে কোথাও নাই যে, যজ্ঞ বিষ্ণুর নাম। কোথাও এমন প্রয়োগও নাই। 'হে যজ্ঞ!' বলিলে কেহই বুঝিবে না যে, 'হে বিষ্ণো!' বলিয়া ডাকিতেছি। "বিষ্ণুর দশ অবতার" এ কথার পরিবর্ত্তে কখনও বলা যায় না যে, "যজ্ঞের দশ অবতার"। "যজ্ঞ শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধারী বনমালী" বলিলে লোকে হাসিবে। তবে শঙ্করাচার্য্য কেন বলেন যে, যজ্ঞার্থে বিষ্ণু? কেন বলেন, তাহা তিনি বলিয়াছেন। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ" যজ্ঞ বিষ্ণু ইহা বেদে আছে।

শতপথ ব্রাহ্মণে * কথিত আছে যে, অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, মখ, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যজ্ঞকালে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমাদিগের মধ্যে যিনি শ্রম, তপ, শ্রদ্ধা, যজ্ঞ আহুতির দ্বারা যজ্ঞের ফল প্রথমে অবগত হইতে পারিবেন, তিনি আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন। তাহা প্রথমে পাইলেন। তিনি দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন। এক্ষণে শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"তদ্বিষ্ণুঃ প্রথমং প্রাপ। স দেবানাং শ্রেষ্ঠোঽভবৎ। তস্মাদাহুর্বিষ্ণুর্দেবানাং শ্রেষ্ঠ ইতি।

---

* ১৪। ১। ১।

স বঃ স বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ সঃ। স যঃ স যজ্ঞোঽসৌ স আদিত্যঃ।

অর্থ—ইহা বিষ্ণু প্রথমে পাইলেন। তিনি দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ হইলেন। তাই বলে, বিষ্ণু দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ, যে সেই বিষ্ণু, যজ্ঞ সেই। যে সেই যজ্ঞ, সেই আদিত্য।"

পুনশ্চ তৈত্তিরীয়সংহিতায় "শিপিবিষ্টায়" শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা আছে।—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপিঃ। যজ্ঞ এব পশুষু প্রতিষ্ঠতি* ভট্ট ভাস্কর মিশ্রও লিখিয়াছেন, "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপিরিতি শ্রুতেঃ।"

অতএব শঙ্করাচার্য্যের কথা ঠিক—শ্রুতিতে যজ্ঞকে বিষ্ণু বলা হইয়াছে। কিন্তু কি অর্থে? একটা অর্থ এই হইতে পারে যে, বিষ্ণু যজ্ঞ, কেন না, সর্ব্বব্যাপী। ভট্ট ভাস্কর মিশ্রও তাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপিরিতি শ্রুতেঃ সর্ব্বপ্রাণাভ্যন্তর্যামিত্বেন প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ।"

এই গীতার ভিতর সন্ধান করিলেই পাওয়া যাইবে,—

"অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥"

গীতা, ৯অ, ১৬।

আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি ঘৃত, আমি অগ্নি, আমি হবন।

যদি তাই হয়, তবে বিষ্ণু যজ্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ বিষ্ণু নহে। বিষ্ণু সর্ব্বময়, এজন্য তিনি মন্ত্র, তিনি ঘৃত, তিনি অগ্নি; কিন্তু মন্ত্র ও বিষ্ণু নহে ঘৃতও বিষ্ণু নহে, অগ্নিও বিষ্ণু নহে। অতএব বিষ্ণু যজ্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ বিষ্ণু নহে. ইহা যদি সত্য হয়, তবে শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা খাটে না।

---

* ইহা আমি muir সংগ্রহ হইতে তুলিলাম। কিন্তু একটু সন্দেহের বিষয় আছে।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥১৭॥

যে মনুষ্যের আত্মাতেই রতি, যিনি আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই যিনি সন্তুষ্ট, তাঁহার কার্য্য নাই। ১৭।

দ্বিবিধ মনুষ্য, এক ইন্দ্রিয়ারাম (১৫ শ্লোক দেখ), দ্বিতীয় আত্মারাম। যে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, সেই আত্মারাম; সাংখ্যযোগ তাহারই জন্য। এই শ্লোকে তাহারই কথা হইতেছে।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কেহই কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না। কর্ম্ম ব্যতীত কাহারও জীবনযাত্রাও নির্ব্বাহ হয় না। আবার এখন বলা হইতেছে যে, ব্যক্তিবিশেষের কর্ম্ম নাই। অতএব কর্ম্ম বা কার্য্য শব্দের বিশেষ বুঝিতে হইবে। বৈদিকাদি সকাম কর্ম্ম এখানে অভিপ্রেত। ভাবার্থ এই যে, যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তাহার পক্ষে উপরিকথিত যজ্ঞাদির প্রয়োজন নাই।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৮॥

তাঁহার কর্ম্মের কোন প্রয়োজন নাই; এবং কর্ম্ম অকরণেও কোন প্রত্যবায় নাই। সর্ব্বভূতমধ্যে কাহারও আশ্রয় ইহাঁর প্রয়োজন নাই। ১৮।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥১৯॥

অতএব সতত অসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিবে। পুরুষ অসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে মুক্তিলাভ করে। ১৯।

অসক্ত অর্থে আসক্তিশূন্য অর্থাৎ ফলকামনাশূন্য। পাঠক দেখিবেন যে, ৮ম বা ৯ম শ্লোকের পর ১৮শ শ্লোক পর্য্যন্ত বাদ দিয়া পড়িলে, এই 'তস্মাৎ' (অতএব) শব্দ অতিশয় সুসঙ্গত হয়। মধ্যে যে কয়টি শ্লোক আছে, এবং যাহার ব্যাখ্যায়

এত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার পর এই 'তস্মাৎ' শব্দ বড় সঙ্গত বোধ হয় না। ৮ম শ্লোকে বলা হইল যে, কর্ম্ম না করিলে, তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। ৯ম শ্লোকে বলা হইল যে, ঈশ্বরারাধনা ভিন্ন অন্যত্র কর্ম্ম, বন্ধনের কারণ মাত্র। অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম কর, অনাসক্ত হইয়া ঈশ্বরারাধনার্থ যে কর্ম্ম, তাহার দ্বারা মনুষ্য মুক্তিলাভ করে। ৮ম, তার পর ৯ম, তার পর ১৯শ শ্লোক পড়িলে, এইরূপ অর্থ হয়। মধ্যবর্ত্তী নয়টি শ্লোক কিছু অসংলগ্ন বোধ হয়। মধ্যবর্ত্তী কয়টি শ্লোকের যে ব্যাখ্যা হয় না, এমতও নহে। তাহা উপরে দেখাইয়াছি। অতএব এই নয়টি শ্লোক যে প্রক্ষিপ্ত, ইহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥২০॥

জনকাদি কর্ম্মের দ্বারাই জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। তুমিও লোকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কর্ম্ম কর।২০।

এই লোকসংগ্রহ শব্দের অর্থে ভাষ্যকারেরা বুঝেন, দৃষ্টান্তের দ্বারা লোকের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন। শ্রীধর স্বামী বলেন যে, লোককে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তন, অর্থাৎ আমি কর্ম্ম করিলে সকলে কর্ম্ম করিবে, না করিলে অজ্ঞেরা জ্ঞানীর দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পতিত হইবে, এই লোকরক্ষণই লোকসংগ্রহ। শঙ্করও এইরূপ বুঝাইয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য বলেন, লোকের উন্মার্গপ্রবৃত্তি-নিবারণ লোকসংগ্রহ। পরশ্লোকে গীতাকার এই কথা পরিষ্কার করিতেছেন।

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥২১॥

যে যে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠলোকে আচরণ করেন, ইতর লোকেও তাহাই করে। তাঁহারা যাহা প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, লোকে তাহারই অনুবর্ত্তী হয়। ২১।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, যে, আত্মজ্ঞানীদিগের কর্ম্ম নাই। এক্ষণে কথিত হইতেছে যে, কর্ম্ম না থাকিলেও তাঁহাদের কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। কেন না, তাঁহারা কর্ম্ম না করিলে, সাধারণ লোক, যাহারা আত্মজ্ঞানী নহে তাহারাও তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম হইতে বিরত হইবে। কর্ম্ম হইতে বিরত হইলে স্ব স্ব ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে। অতএব সকলেরই কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা জ্ঞানমার্গাবলম্বী ছিলেন। জ্ঞানমার্গাবলম্বীর কর্ম্ম নাই, ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা কর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন; এবং সেই দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষ কর্ম্মে অনুরাগশূন্য, সুতরাং অকর্ম্মা লোকের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া এই অধঃপতনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভগবান্ উপরিলিখিত যে মহাবাক্যের দ্বারা কর্ম্মবাদ ও জ্ঞানবাদের সামঞ্জস্য বা একীকরণ করিলেন, ভারতবর্ষীয়েরা তাহা স্মরণ রাখিলে, তদনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করিলে, জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই তাঁহাদের তুল্যরূপে উদ্দেশ্য হইলে, তাঁহারা কখনই আজিকার দিনের সভ্যতর জাতি হইতে নিকৃষ্টদশাগ্রস্ত হইতেন না— পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী, পরজাতিদত্তশিক্ষা-বিপদগ্রস্ত হইতেন না।

শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল এই গীতাতেই কর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তিত করিয়াছেন, এমত নহে, মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে সঞ্জয়যানপর্ব্বাধ্যায়েও তিনি ঐরূপ কহিয়াছেন। তাহা গ্রন্থান্তরে উদ্ধৃত করিয়াছি, এখানেও উদ্ধৃত করিলাম:—

"শুচি ও কুটুম্বপরিপালক হইয়া বেদাধ্য-

য়ন করত জীবনযাপন করিবে, এইরূপ শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বিধি বিদ্যমান থাকিলেও ব্রাহ্মণ-গণের নানাপ্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ কর্ম্মবশতঃ, কেহ বা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, এই-রূপ স্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষলাভ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা কার্য্য-সাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতী; যাহাতে কোনও কর্ম্মানু-ষ্ঠানের বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিষ্ফল। অতএব যেমন পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির জলপান করিবামাত্র পিপাসাশান্তি হয়, তদ্রূপ ইহকালে যে সকল কর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। হে সঞ্জয়! কর্ম্মবশতই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে, সুতরাং কর্ম্মই সর্ব্বপ্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম্ম অপেক্ষা অন্য কোনও বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয়।

"দেখ, দেবগণ কর্ম্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন। সমীরণ কর্ম্মবলে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন; দিবাকর কর্ম্মবলে আলস্য-শূন্য হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন; চন্দ্রমা কর্ম্মবলে নক্ষত্রমণ্ডলীপরিবৃত হইয়া মাসার্দ্ধ উদিত হইতেছেন; হুতাশন কর্ম্ম-বলে প্রজাগণের কর্ম্ম-সংসাধন করিয়া নির-বচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন; পৃথিবী কর্ম্মবলে নিতান্ত দুর্ভর ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন, স্রোতস্বতী-সকল কর্ম্ম-বলে প্রাণিগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছে; অমিতবশালী দেব-রাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করি-বার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কর্ম্মবলে দশদিক্ ও নভোমণ্ডল হইতে বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্র-মত্তচিত্তে ভোগাভিলাষ বিসর্জ্জন ও প্রিয় বস্তু-সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্ বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয়-নিরোধন পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি দেবগণের আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র, আদিত্য, যম, কুবের, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সর, বিশ্বাবসু ও নক্ষত্রগণ কর্ম্মপ্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন; মহর্ষিগণ ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।"

আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিদিগেরও কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, ইহা বলিয়া ভগবান্ কর্ম্মপরায়ণতার মাহাত্ম্য আরও পরিস্ফুট করিবার জন্য নিজের কথা বলিতেছেন :—

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥২৩॥

হে পার্থ! এই তিন লোকে আমার কিছুমাত্র কর্ত্তব্য নাই। অপ্রাপ্ত অথবা অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি আমি কর্ম্ম করিয়া থাকি। ২২।

কর্ম্মে অলস না হইয়া যদি আমি কখনও কর্ম্ম না করি, তবে হে পার্থ! মনুষ্য সকলে সর্ব্ব-প্রকারে আমারই পথের অনুবর্ত্তী হইবে।২৩।

এখানে বক্তা স্বয়ং ভগবান্ জগদীশ্বর। ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন নাই, কোনও বিকার নাই, সুখ দুঃখ কিছুই নাই; অতএব তাঁহার কোনও কর্ম্ম নাই। তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং জগৎ চলিবার নিয়মও করিয়াছেন, সেই নিয়মের বলে জগৎ চলি-

তেছে, তাহাতে তাঁহার হস্তক্ষেপণের কোনও প্রয়োজন নাই। এজন্য তাঁহার কর্ম্ম নাই। তবে তিনি যদি মনুষ্যত্বের আদর্শ-প্রচার জন্য ইচ্ছাক্রমে মনুষ্য-শরীর ধারণ করেন, তাহা হইলে তিনি মনুষ্যধর্ম্মী বলিয়া তাঁহার কর্ম্ম আছে। যদি তিনি নিজের ঐশী শক্তির দ্বারা সকল প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারেন, তথাপি মনুষ্যধর্ম্মী হেতু কর্ম্মের দ্বারাই তাঁহাকে প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে হয়। তিনি আদর্শ-মনুষ্য, কাজে কাজেই তিনি আদর্শ কর্ম্মী। অতএব তিনি কদাচ আলস্য-পরবশ হইয়া কর্ম্ম না করিলে লোকেও আদর্শ-মনুষ্যের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তনে অলস ও কর্ম্মে অমনোযোগী হইবে, যে অলস ও কর্ম্মে অমনোযোগী, সে উৎসন্ন যায়। তাই ভগবান্ পুনশ্চ বলিতেছেন,—

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥২৪॥

যদি আমি কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে এই লোক-সকল আমি উৎসন্ন দিব, সঙ্করের কর্ত্তা হইব এবং এই প্রজা-সকলের মালিন্য-হেতু হইব। ২৪।

ভাষ্যকারেরা এই সঙ্কর শব্দে বর্ণসঙ্করই বুঝাইয়াছেন। হিন্দুরা জাতিগত বিশুদ্ধিরক্ষার জন্য অতিশয় যত্নশীল; এজন্য বর্ণসঙ্কর একটা কদর্য্য সামাজিক দোষ বলিয়া প্রাচীন হিন্দুদিগের বিশ্বাস। মনু বলেন, নিকৃষ্ট বর্ণ সঙ্করজাতি রাজ্যনাশের কারণ এবং এই গীতাতেই আছে—

"সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।"

কিন্তু আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না যে, সংসারে এত গুরুতর অমঙ্গ থাকিতে ঈশ্বরের আলস্যে বর্ণসঙ্করোৎপত্তিভয়টাই এত প্রবল কেন? এমন ত কিছু বলিতে পারি না যে, ঈশ্বর বা শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ধরিয়া ব্রাহ্মণীর নিকট, ক্ষত্রিয়কে ধরিয়া ক্ষত্রিয়ার নিকট বৈশ্যকে ধরিয়া বৈশ্যার নিকট এবং শূদ্রকে ধরিয়া শূদ্রার নিকট প্রেরণ করিয়া বর্ণসাঙ্কর্য্য নিবারণ করেন। দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, লোকক্ষয়, সর্ব্বদেশব্যাপী রোগ, হত্যা, চৌর্য্য এবং দান, তপস্যা প্রভৃতি ধর্ম্মের তিরোভাব ঈশ্বরের আলস্যে, এ সকলের কোনও শঙ্কার কথা না বলিয়া, বর্ণসাঙ্কর্য্যের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ এত ত্রস্ত কেন? সঙ্করজাতির বাহুল্য যে আধুনিক সমাজের উপকারী, ইহাও সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। অতএব সঙ্কর অর্থে বর্ণসঙ্কর বুঝিলে, এই শ্লোকের অর্থ আমাদিগের ক্ষুদ্রবুদ্ধিগম্য হয় না।

কিন্তু সঙ্কর শব্দে বর্ণসঙ্করই বুঝিতে হইবে, সংস্কৃত ভাষার এমন কিছু নিশ্চয়তা নাই। সঙ্কর অর্থে মিলন, মিশ্রণ। ভিন্নজাতীয় বা বিরুদ্ধভাবাপন্ন পদার্থের একত্রীকরণ ঘটিলে সাঙ্কর্য্য উপস্থিত হয়। তাহার ফল বিশৃঙ্খলা, ইংরেজিতে যাহাকে disorder বলে। শ্রীকৃষ্ণোক্তির তাৎপর্য্য এই আমি বুঝি যে, তিনি কর্ম্মবিরত হইলে সামাজিক বিশৃঙ্খলতা ঘটিবে। আদর্শপুরুষের দৃষ্টান্তে সকলেই আলস্যপরবশ এবং কর্ম্মে অমনোযোগী হইলে, সামাজিক বিশৃঙ্খলতা যথার্থই সম্ভব।

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ২৫

হে ভারত! যেমন অবিদ্বানেরা কর্ম্মে আসক্তিবিশিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে, তেমনই লোকসংগ্রহচিকীর্ষু বিদ্বানেরা অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবেন। ২৫।

অবিদ্বানেরা ফলকামনা করিয়া কর্ম্ম করে, বিদ্বানেরা লোকরক্ষার্থে অর্থাৎ ধর্ম্মার্থে ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবেন।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥২৬

বিদ্বানেরা কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানদিগের

বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। আপনারা অবহিত হইয়া ও সর্ব্বকর্ম্ম করিয়া, তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। ২৬।

যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা কর্ম্ম না করিলে অজ্ঞানেরা বিবেচনা করিতে পারে যে, আমাদিগেরও এই সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে। অতএব জ্ঞানীদিগের দৃষ্টান্তদোষে অজ্ঞানদিগের এইরূপ বুদ্ধিভেদ জন্মিতে পারে।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ২৭॥

প্রকৃতির গুণসকলের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম ক্রিয়মাণ। কিন্তু যাহার বুদ্ধি অহঙ্কারে বিমুগ্ধ, সে আপনাকে কর্ত্তা মনে করে।২৭।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥২৮॥

হে মহাবাহো! গুণকর্ম্মবিভাগের তত্ত্ব যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বুঝেন যে, ইন্দ্রিয়সকলই বিষয়ে বর্ত্তমান; এজন্য তাঁহারা কর্ম্মে আসক্ত হন না।২৮।

যাঁহারা শরীর হইতে ভিন্ন আত্মা মানেন না, তাঁহারা উপরিব্যাখ্যাত দুই শ্লোকের অর্থ বুঝিবেন না। ঐ দুই শ্লোক এবং তৎপূর্ব্বে বিদ্বান এবং অবিদ্বান্, জ্ঞানী অজ্ঞান ইত্যাদি শব্দ যে ব্যবহৃত হইয়াছে, সে কেবল এই আত্মজ্ঞান লইয়া। যাঁহার আত্মজ্ঞান আছে, অর্থাৎ যিনি জানেন যে, শরীর হইতে পৃথক্ অবিনাশী আত্মা আছেন, তাঁহাকেই বিদ্বান্ বা জ্ঞানী বলা হইতেছে। বলা হইতেছে যে, অবিদ্বান্ বা অজ্ঞানেরা কর্ম্মে আসক্ত বা ফলকামনাবিশিষ্ট; এবং বিদ্বান্ জ্ঞানীরা কর্ম্মে অনাসক্ত বা ফলকামনাশূন্য। কিন্তু এই প্রভেদ ঘটে কেন? আত্মজ্ঞান থাকিলেই ফলকামনা পরিত্যাগ করে, এবং আত্মজ্ঞান না থাকিলেই ফলকামনাবিশিষ্ট হয়, এই প্রভেদ ঘটে কেন, তাহই এই দুই শ্লোকে বুঝান হইতেছে। ইন্দ্রিয়ের যাহা ভোগ্য, তাহাকেই বিষয় বলে। কেন না, তাহাই ইন্দ্রিয়ের বিষয়। ইন্দ্রিয়ে ও বিষয়ে যে সংযোগ, সংঘটন, তাহাই কর্ম্ম। যাহার আত্মজ্ঞান নাই, সে আত্মার অস্তিত্ব অবগত নহে, সে জানে যে, ইন্দ্রিয়ে ও বিষয়ে যে সংঘটন, তাহা আমা হইতে ঘটিল; অতএব আমিই কর্ম্মের কর্ত্তা। "আমিই কর্ম্মের কর্ত্তা" এই বিবেচনাই অহঙ্কার। সে বুঝে যে, আমি কর্ম্ম করিয়াছি, এজন্য আমিই কর্ম্মের ফলভোগ করিব, তাই সে ফলকামনা করে। আর যাঁহার আত্মজ্ঞান আছে, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে, ইন্দ্রিয়-সকল আত্মার কোন অংশ নহে, ইহা যাঁহার বোধ আছে, তিনি জানেন যে, ইন্দ্রিয় বা প্রকৃতি কর্ম্ম করিল। কেন না, তদ্দ্বারাই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সংঘটিত হইল। আত্মা কর্ম্ম করেন নাই, সুতরাং আত্মা তাহার ফলভোগী নহেন। আত্মাই আমি, অতএব আমি তাহার ফলভোগ করিবনা, এই বোধে, তাঁহারা ফলকামনা করেন না। অতএব আত্মজ্ঞানী নিষ্কাম কর্ম্মের মূল, এবং এই তত্ত্বের দ্বারা জ্ঞানযোগের এবং কর্ম্মযোগের সমুচ্চয় হইতেছে। জ্ঞান ব্যতীত কর্ম্ম নিষ্কাম হয় না, এবং নিষ্কাম কর্ম্ম ব্যতীত জ্ঞানের পরিপাক হয় না। নিষ্কাম কর্ম্মও কর্ম্ম অভ্যস্ত না হইলে ঘটে না। আমরা পরে দেখিব যে, কথিত হইতেছে, কর্ম্ম হইতেই জ্ঞানে আরোহণ করিতে হয়। সে কথা বলিবার কারণ এইখানে নির্দ্দিষ্ট হইল।

প্রকৃতেগুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥২৯

যাহারা প্রকৃতির গুণে বিমূঢ়, তাহারা ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মে অনুরাগযুক্ত হয়। সেই সকল মন্দবুদ্ধি অল্পজ্ঞান ব্যক্তিদিগকে জ্ঞানিগণ বিচালিত করিবেন। ২৯।

অর্থাৎ তাহাদিগকে কর্ম্মফল কামনা পরিত্যাগ করিতে বলিলে, তাহা তাহারা পারিবে না। তবে উপদেশ বা দৃষ্টান্তের ফল এমত ঘটিতে পারে যে, তাহারা সকাম কর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে। সকাম কর্ম্ম অভ্যস্ত না হইলে নিষ্কাম কর্ম্ম সম্ভবে না; এই জন্য তাহাদিগের বুদ্ধি বিচালিত করা বা বুদ্ধিভেদ জন্মান নিষিদ্ধ হইতেছে।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥৩০॥

আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া আধ্যাত্ম জ্ঞানের দ্বারা নিস্পৃহ, মমতাশূন্য ও শোকশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর। ৩০।

গোড়ার কথাটা এই হইয়াছিল যে, অর্জ্জুন আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করিয়া তাদৃশ পাপকর্ম্মের দ্বারা রাজ্যলাভ করিতে অনিচ্ছুক, অতএব যুদ্ধ করিবেন না স্থির করিলেন। তদুত্তরে ভগবান্ প্রথমে আত্মজ্ঞানে তাঁহাকে উপদিষ্ট করিলেন। তার পর কর্ম্মের মাহাত্ম্য ও অবশ্য-কর্ত্তব্যতা বুঝাইলেন। বুঝাইলেন যে, সকলকে কর্ম্ম করিতেই হয়। অন্য কর্ম্ম না করিলেও, জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম করিতে হয়। তবে যাহার আত্মজ্ঞান নাই, সে মূর্খ ফলকামনা করিয়া কর্ম্ম করে; কিন্তু নিষ্কাম হইয়াই হউক আর সকাম হইয়াই হউক, অনুষ্ঠের কর্ম্ম করিতেই হইবে। যদি করিতেই হইল, তবে নিষ্কাম হইয়া করাই ভাল; কেন না, নিষ্কাম কর্ম্মই পরম ধর্ম্ম; অতএব তুমি নিষ্কাম হইয়া, ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া, রাজ্যলাভ হইবে বা না হইবে, সে চিন্তা না করিয়া, কর্ম্মের ফলাফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া, যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে যুদ্ধ কর।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

যে সকল মনুষ্য শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া আমার এই মতের নিত্য অনুষ্ঠান করে, তাহারা কর্ম্ম হইতে অর্থাৎ কর্ম্মফলভোগ হইতে মুক্ত হয়। ৩১।

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥৩২॥

যাহারা অসূয়াপরবশ হইয়া আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়, বিনষ্ট এবং বিবেকশূন্য বলিয়া জানিও। ৩২।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞানবান্‌ও, যাহা আপন প্রকৃতির অনুকূল, সেইরূপই চেষ্টা করে। জীবগণ প্রকৃতিরই অনুগামী হয়। নিগ্রহে কোন ফল হয় না। ৩৩।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥৩৪॥

ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের রাগদ্বেষ অবশ্য ভাবী। তাহার বশগামী হইও না, তাহা শ্রেয়োমার্গের বিঘ্নকারক। ৩৪।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥৩৫॥

পরধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্ম্মের অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠানও ভাল। বরং স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, পরধর্ম্ম ভয়াবহ। ৩৫।

তেত্রিশ, চৌত্রিশ, পঁয়ত্রিশ এই তিন শ্লোকে যাহা কথিত হইল, তাহার মর্ম্মার্থ বুঝাইতেছি। সকলেই আপন আপন প্রকৃতির বশ, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। জ্ঞানবান্‌ও আপন স্বভাবের অনুকূল যে কার্য্য, তাহাই করিয়া থাকেন। নিষেধ বা পীড়নের দ্বারাও আপন

স্বভাবের প্রতিকূল কার্য্যে কাহাকে নিযুক্ত বা সুদক্ষ করা যায় না। কিন্তু লোকে যদি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়, তবে সে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকে। স্বধর্ম্ম কি, তাহা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই যে স্বধর্ম্ম, এমন অর্থ করা যায় না। কেন না, যে সকল সমাজের মধ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাই, সে সকল সমাজের প্রতি এই উপদেশ অপ্রযোক্তব্য হয়। কিন্তু ভগবদুক্ত ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন, মনুষ্যমাত্রেরই রক্ষা ও পরিত্রাণের উপায়। অতএব স্বধর্ম্ম এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, ইহজীবনে যে, যে কর্ম্মকে আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাই তার স্বধর্ম্ম। যে সমাজে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচলিত, এবং যে সমাজে সে ধর্ম্ম প্রচলিত নহে, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মীরা পুরুষ-পরম্পরায় একজাতীয় কার্য্যকেই আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। অন্য সমাজে, লোক আপন আপন ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, সুযোগ এবং শক্তি অনুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। শক্তি ও প্রবৃত্তির অনুযায়ী বলিয়া অথবা আজীবনঅভ্যস্ত বলিয়াস্বধর্ম্মই লোকের অনুকূল। কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত হইয়া, ধনাদির লোভে বিমুগ্ধ হইয়া, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকে পরধর্ম্ম অবলম্বন করে। তাহাদের প্রায় ঘোরতর অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এই অমঙ্গল পারলৌকিক অবস্থা-সম্বন্ধেই বুঝেন। কিন্তু ইহলোকেও যে স্বধর্ম্মত্যাগ এবং পরধর্ম্ম অবলম্বন অমঙ্গলের কারণ, তাহা আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাই। যে সকল পুরুষ স্বধর্ম্মে থাকিয়া, তাহার সদনুষ্ঠান জন্য প্রাণপণ যত্ন করেন এবং তাহার সাধন জন্য মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করেন, তাঁহারাই ইহলোকে বীর বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকেন; এবং স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে, তাঁহারাই ইহলোকে যথার্থ সুখী হয়েন। কিন্তু পরধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ যাহা নিজের অনুষ্ঠেয় নয়, এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহা সুসম্পন্ন করিতে পারিলেও, কেহ যে সুখী বা যশস্বী হইতে পারিয়াছেন, এমন দেখা যায় না। অতএব পরধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্ম্মের অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠানও ভাল। বরং স্বধর্ম্মে মরণও ভাল, তথাপি পরধর্ম্ম অবলম্বনীয় নহে।

অর্জ্জুন উবাচ—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিযোজিতঃ॥৩৬

পরে অর্জ্জুন বলিতেছেন—

হে বার্ষ্ণেয়! পুরুষ কাহার দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া পাপাচরণ করে? কাহার নিয়োগে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলের দ্বারা পাপে নিযুক্ত হয়? ৩৬।

পূর্ব্বে কথা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের রাগদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। পুরুষের ইচ্ছা না থাকিলেও সে স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া উঠে, ইহাই এরূপ কথায় বুঝায়। অর্জ্জুন এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কেন এরূপ ঘটিয়া থাকে? কে এরূপ করায়?

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥৩৭॥

ইহা কাম। ইহা ক্রোধ। ইহা রজোগুণোৎপন্ন মহাশন এবং অত্যুগ্র। ইহলোকে ইহাকে শত্রু বিবেচনা করিবে। ৩৭।

আগে শব্দার্থ সকল বুঝা যাউক। রজোগুণ কি, তাহা স্থানান্তরে কথিত হইবে। মহাশন অর্থে যে অধিক আহার করে। কাম দুষ্পূরণীয়, এজন্য মহাশন।

পাঠক দেখিবেন যে, কাম, ক্রোধ উভয়ে-

রই নামোল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে বুঝায় যে, কাম ও ক্রোধ একই; দুইটি পৃথক্ রিপুর কথা হইতেছে না। ভাষ্যকারেরা বুঝাইয়াছেন যে, কাম প্রতিহত হইলে অর্থাৎ বাধা পাইলে, ক্রোধে পরিণত হয়; অতএব কাম, ক্রোধ একই।

তবে কথাটা এই হইল যে, স্বধর্ম্মানুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইহা সকলে পারে না। কেন না, স্বভাবই বলবান্; স্বভাবের বশীভূত বলিয়াই লোকে অনিচ্ছুক হইয়াই পরধর্ম্মাশ্রয় করে; পাপাচরণ করে। ইহার কারণ, কামের বলশালিতা। কাম অর্থে রিপুবিশেষ না বুঝিলে সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়মাত্রেরই বিষয়াকাঙ্ক্ষা বুঝিলে এই সকল শ্লোকের প্রকৃত উদার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে।

ভগবদ্বাক্যের যাথার্থ্য এবং সার্ব্বজনীনতার প্রমাণস্বরূপ পরবর্ত্তী দেশী বিদেশী ইতিহাস হইতে তিনটি উদাহরণ প্রয়োগ করিব।

প্রথম, রাজার স্বধর্ম্ম রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন। তিনি ধর্ম্মপ্রচারক বা ধর্ম্মনিয়ন্তা নহেন। এখানে Religion অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিতেছি। কিন্তু মধ্যকালে ইউরোপে রাজগণ ধর্ম্মনিয়ন্তৃত্ব গ্রহণ করায় মনুষ্যজাতির কি ভয়ানক অমঙ্গল ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে সুপরিচিত। উদাহরণস্বরূপ, St. Bartholomew. Sicilian Vespers এবং স্পেনের Inquisition এই তিনটি নামের উত্থাপনই যথেষ্ট। কথিত আছে, পঞ্চম চার্লসের সময়ে এক Ntherland দেশে দশলক্ষ মনুষ্য কেবল রাজারধর্ম্ম হইতে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া প্রাণে নিহত হইয়াছিল। আজকাল ইংরেজরাজ্যে ভারতবর্ষে রাজার এরূপ পরধর্ম্মাবলম্বনপ্রবৃত্তি থাকিলে, ভারতবর্ষে কয় জন হিন্দু থাকিত?

দ্বিতীয় উদাহরণ, বাঙ্গালা দেশে ইংরেজরাজত্বের প্রথম সময়ে। রাজার ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, বাণিজ্য বৈশ্যের ধর্ম্ম। রাজা এই সময়ে বৈশ্যধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন—East India Company বাণিজ্যব্যবসায়ী হইয়াছিলেন। ইহার ফল ঘটিয়াছিল বাঙ্গালীর শিল্পনাশ, বাণিজ্যনাশ, অর্থনাশ। বাঙ্গালার কার্পাসবস্ত্র, পট্টবস্ত্র, রেশম, পিত্তল কাঁসা, সব ধ্বংসপুরে গেল; আভ্যন্তরিক বাণিজ্য কতক একবারে অন্তর্হিত হইল, কতক অন্যের হাতে গেল; বাঙ্গালা এমন দারিদ্র্য-সমুদ্রে ডুবিল যে, আর উঠিল না। কোম্পানীকেও শেষ বাণিজ্য ছাড়িতে হইল। মানুষ সব ছাড়ে, আফিং ছাড়ে না। সে বাণিজ্যের এখনও আফিংটুকু আছে।

তৃতীয় উদাহরণ, আমেরিকার স্ত্রীজাতির আধুনিক স্বধর্ম্মত্যাগে ও পৌরুষকর্ম্মে প্রবৃত্তি, ইহাতে ঘটিতেছে, স্ত্রীজাতির বৈষয়িক ভিন্নপ্রকার অবনতি, গৃহে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং জাতীয় সুখ-হানি। যে স্ত্রীলোক স্বগর্ভসম্ভূত শিশুকে স্তন্যদানে অসমর্থা, তাহাকে স্মরণ করিয়া সহমরণাভিলাষিণী হিন্দুমহিলা অবশ্যই বলিবেন, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেণাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥৩৮॥

যেমন ধূমে বহ্নি আবৃত, মলে দর্পণ এবং গর্ভ জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই কামের দ্বারা (জ্ঞান) আবৃত থাকে। ৩৮।

"জ্ঞান" শব্দটি মূলে নাই,—তৎপরিবর্ত্তে "ইদম্" আছে। কিন্তু পরশ্লোকে "জ্ঞান" শব্দই আবৃতের বিশেষ্য; এজন্য এ শ্লোকের অনুবাদেও সেইরূপ করা গেল।

৩৩শ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, জ্ঞানবান্‌ও আপন প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করে। "সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।"

জ্ঞানবান্ জ্ঞান থাকিতে কেন এরূপ করে? তাহাই বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন যে,

জ্ঞান এই কামের দ্বারা আবৃত থাকে; জ্ঞান এ অবস্থায় অকর্ম্মণ্য হয়।

উপমা তিনটি অতি চমৎকার; কিন্তু উপমার কৌশল বুঝাইবার পূর্ব্বে বলা আবশ্যক, "মল" শব্দে শঙ্করাচার্য্য "মল" অর্থাৎ "ময়লাই" বুঝিয়াছেন। কিন্তু শ্রীধর স্বামী বলেন, "মলেন" কি না "আগন্তুকেন"। এ অবস্থায় দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব যে "মল" শব্দের অভিপ্রেত, ইহাই বুঝিতে হইতেছে।

উপমা তিনটির প্রতি দৃষ্টি করা যাউক। যাহা উপমিত এবং যাহা উপমেয়, উভয়ই স্বাভাবিক। বহ্নির স্বাভাবিক আবরণ ধূম; দর্পণ থাকিলেই ছায়া বা প্রতিবিম্ব থাকিবে, নহিলে দর্পণত্ব নাই; এবং গর্ভেরও স্বাভাবিক আবরণ জরায়ু। তেমনই জ্ঞানের আবরণ কামও স্বাভাবিক। ইহা পূর্ব্বেই কথিত আছে। উপমেয় ও উপমিত উভয়ই প্রকাশাত্মক, বহ্নি প্রকাশাত্মক, দর্পণ প্রকাশাত্মক, গর্ভ প্রকাশাত্মক;—তেমনই জ্ঞানও প্রকাশাত্মক। প্রকাশের জন্য প্রয়োজন, ক্রিয়াবিশেষ ফুৎকারাদির দ্বারা ধূমাবরণ, অপসারণের দ্বারা বিম্বাবরণ এবং প্রসবের দ্বারা উল্বাবরণ বিনষ্ট হইয়া অগ্নি, দর্পণ ও গর্ভের প্রকাশ হয়, তেমনই ইন্দ্রিয়-দমনের দ্বারা কামাবরণ বিনষ্ট হইয়া জ্ঞানের প্রকাশ পায়। ইহা ৪১ শ্লোকে দেখিব।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥৩৯॥

হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীদিগের নিত্যশত্রু, কামরূপে দুষ্পূর, এবং অগ্নিতুল্য হইয়া জ্ঞানকে আবৃত রাখে। ৩৯।

কামই জ্ঞানীদিগের নিত্যশত্রু। ভোগকালে সুখদায়ক, পরিণামে দুঃখদায়ক এবং ভোগকালেও যাহা নিষ্প্রয়োজনীয়, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করিয়া দুঃখদায়ক, এই জন্য নিত্যশত্রু *। ইহা দুষ্পূর—কেন না, কিছুতেই ইহার পূরণ নাই; এবং ইহা সন্তাপহেতু, এই জন্য অগ্নিতুল্য। ৩৯।

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥৪০॥

ইন্দ্রিয়-সকল ও মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠান বলিয়া কথিত হইয়াছে। জ্ঞানকে আবৃত রাখিয়া, এই সকলের দ্বারা, ইহা (কাম) আত্মাকে মুগ্ধ করে। ৪০।

এই কাম কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে? ইন্দ্রিয়-সকলকে এবং মন ও বুদ্ধিকে। আত্মা হইতে পৃথক্ আত্মাকে আশ্রয় করিতে পারে না। আত্মাকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখে।

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞান-
নাশনম্ ॥৪১॥

অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি আগে ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ত করিয়া, জ্ঞানবিজ্ঞানবিনাশী পাপস্বরূপ কামকে বিনষ্ট (বা ত্যাগ) কর। ৪১।

যদি ইন্দ্রিয়গণই কামের অধিষ্ঠানভূমি, তবে আগে ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ত করিতে হইবে। তাহা হইলে কামকে বিনষ্ট করা হইবে।

জ্ঞান বা বিজ্ঞানে প্রভেদ কি? শ্রীধর বলেন, জ্ঞান আত্মবিষয়ক, বিজ্ঞান শাস্ত্রীয়, অথবা "জ্ঞান শাস্ত্রাচার্য্যের উপদেশজাত, বিজ্ঞান নিদিধ্যাসজাত।" শঙ্করাচার্য্য বলেন, "জ্ঞান শাস্ত্র হইতে আচার্য্যলব্ধ আত্মাদির অববোধ আর তাহার বিশেষ প্রকার অনুভবই বিজ্ঞান। পাঠক এই ব্যাখ্যা অপেক্ষা শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল বলিয়া গ্রহণ করিবেন। আমি বুঝি যে, এইটুকু বুঝিতে পারিলেই আমাদের মত লোকের পক্ষে যথেষ্ট

* ভাষ্যকারের এইরূপ ব্যাখ্যা।

হইবে যে, কাম সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান ও আত্মার উন্নতির বিনাশক।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ॥ ৪২ ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥৪৩॥

ইন্দ্রিয়সকল শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত; ইন্দ্রিয়সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ; মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধি হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ। ৪২।

এই বুদ্ধির দ্বারা পরমাত্মাকে বুঝিয়া আপনাকে স্তম্ভিত করিয়া, হে মহাবাহো! তুমি কামরূপ দুরাসদ * শত্রুকে জয় কর।৪৩।

পাঠক প্রথম ৪২ শ্লোকের প্রতি মনোযোগ করুন্। ইহা অনুবাদে দুর্ব্বোধ্য।

বলা হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। মন ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, ইত্যাদি। তবে ইন্দ্রিয়গণ কাহা হইতে শ্রেষ্ঠ? ভাষ্যকারেরা বলেন, দেহাদি হইতে। তাহাই শ্লোকের অভিপ্রায় বটে, কিন্তু আধুনিক পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ইন্দ্রিয় কি দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র?।

অতএব প্রথমে বুঝিতে হয়, ইন্দ্রিয় কি। দর্শনশাস্ত্রে কহে, চক্ষুঃশ্রবণাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্তপদাদি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং মন অন্তরিন্দ্রিয়। কিন্তু এ শ্লোকে মনকে ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ বলা হইতেছে। সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ই এখানে অভিপ্রেত।

দেহাদি হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ হইল কিসে? ভাষ্যকারেরা বলেন, ইন্দ্রিয়-সকল সূক্ষ্ম ও প্রকাশক, দেহাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। কিন্তু এ কথা কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্বন্ধেই সত্য। আর জ্ঞানেন্দ্রিয়-সকল দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র নহে। তবে স্পষ্টতঃ ভাষ্যকারেরা দেহাদি শব্দের দ্বারা স্থূলপদার্থ বা স্থূলভূত অভিপ্রেত করিয়াছেন। স্থূল কথা এই যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ।

বক্তার অভিপ্রায় কি, তাহা মূলে যে "আহুঃ" পদ আছে, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে সন্ধান পাওয়া যাইবে। বক্তা নিজের মত বলিয়া ইহা বলিতেছেন না, এইরূপ কথিত হইয়াছে বলিয়া বলিতেছেন। কে এরূপ বলিয়াছে? সাংখ্যদর্শন স্মরণ করিলেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। তাহা বুঝাইতেছি।

সাংখ্যদর্শনে সমস্ত পদার্থ পঞ্চবিংশতি গণে বিভক্ত হইয়াছে। পর্য্যায়ক্রমে পঞ্চবিংশতি গণ এইরূপ।

১। প্রকৃতি।
২। মহৎ।
৩। অহঙ্কার।
৪ হইতে ১৯। পঞ্চ তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়।
২০-২৪। পঞ্চ স্থূলভূত।
২৫। পুরুষ।

এই পর্য্যায়ের তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়; পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চস্থূলভূত। পুরুষ পরমাত্মা।

এই পর্য্যায়ানুসারে স্থূলভূত (ক্ষিত্যাদি, সুতরাং পাঞ্চভৌতিক দেহাদি) হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। এখানে মন ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্; কিন্তু সাংখ্যমতানুসারে মন ইন্দ্রিয় হইলে অন্যান্য ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, কেন না, অন্যগুলি বহিরিন্দ্রিয়। দ্বিতীয় গণ, অহঙ্কারকে বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যে বুদ্ধি বলিয়াছেন। অতএব বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু এমন বলিতে পারা যায় না, এই সাংখ্যদর্শন গীতাপ্রণয়নকালে জন্মগ্রহণ করিয়া-

---

* দুরাসদ শব্দে দুর্ব্বিজ্ঞেয়, শ্রীধর স্বামী বুঝিয়াছেন।

ছিল। তবে গীতাপ্রণয়নকালে ইহা হইতে ভিন্ন প্রকার সাংখ্যমত প্রচলিত ছিল,তাহার প্রমাণ গীতাতেই আছে। তাহারই সম্প্রসারণে কপিল-প্রচারিত সাংখ্য। গীতার সপ্তমাধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে এইরূপ গণ কথিত হইয়াছে,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

আটটি মাত্র গণ কথিত হইল; পাঁচটি স্থূলভূত, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার। শঙ্করাচার্য্য বলেন,পঞ্চভূতের গণনাতেই পঞ্চতন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয়-সকলের গণনা হইল বুঝিতে হইবে।* আর পাঠক ইহাও দেখিবেন যে, ভগবান্ বলিতেছেন যে, এই আট প্রকার আমার প্রকৃতি, অতএব কাপিল-সাংখ্যের সঙ্গে এ মতের প্রভেদও অতি গুরুতর

যাই হউক, শ্লোকোক্ত পারম্পর্য্য কতক বুঝা গেল, কিন্তু বুদ্ধির আর একটি অর্থ আছে। নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিকে বুদ্ধি বলা যায়। এই অর্থে বুদ্ধি শব্দ যে গীতাতেই ব্যবহৃত হইয়াছে. তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিয়াছি। শ্লোকের অবশিষ্টাংশ বুঝিবার জন্য এই অর্থ স্মরণ করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়দমনের উপায় কথিত হইতেছে। সমস্ত অন্তঃকরণবৃত্তি হইতে শ্রেষ্ঠ যে এই নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি, পরমাত্মা তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ।

৭ এখন ৪৩ শ্লোক সহজে বুঝিব। * এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা সেই পরমাত্মাকে

---

* অপি চ ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৫।৬ শ্লোকে বলিতেছেন,

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥৫॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥৬॥

ইহাতে কাপিল-সাংখ্যের ১৩টি গণ আছে, মন ও আত্মা আরও সাতটি আছে। ইহা গণ বা পদার্থ বলিয়া কথিত হইতেছে না, সমস্ত জগৎকে এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার উদ্দেশ্য নাই। অতএব কাপিল সাংখ্য নহে। বরং কাপিল-সাংখ্যের মূল এইখানে আছে, এমন কথা বলা যাইতে পারে।

† বেদান্তসার -২৮।

* সভ্যসমাজে মনুষ্যের একটি ইন্দ্রিয় এত প্রবল দেখা যায় যে,"ইন্দ্রিয়দোষ" বলিলে সেই ইন্দ্রিয়ের দোষ বলিয়া বুঝায়। ইহার প্রাবল্য-নিবারণের উপায় অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, অনেকে জিজ্ঞাসু হইয়াও লজ্জার অনুরোধে প্রশ্ন করিতে পারেন না। অনেকে এমনও আছেন যে, ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন বা তাঁহাকে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা ধারণ করিতে অক্ষম। অতএব ইন্দ্রিয়দমনের ক্ষুদ্রতর যে সকল উপায় আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

(১) শারীরিক ব্যায়াম। ইহাতে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্য সাধিত হয়। শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্য থাকিলে ইন্দ্রিয়ের দূষণীয় বেগ জন্মিতে পারে না।

(২) আহারের নিয়ম। উত্তেজক পানাহার করিবে। মদ্যাদি বিশেষ নিষেধ। মৎস্যমাংস একেবারে নিষেধ করা যায় না, বিশেষতঃ মৎস্যের অনেক সদ্গুণ আছে, মৎস্য ইন্দ্রিয়ের বিশেষ উত্তেজক। অতএব মৎস্যমাংসের অল্প ভোজনই ভাল। মৎস্য-মাংসের এই দোষ জন্যই ব্রহ্মচারীর পক্ষে হিন্দুশাস্ত্রে

বুঝিয়া আপনাকে নিশ্চল করিয়া কামকে পরাজিত করিতে হইবে। ইহার অপেক্ষা ইন্দ্রিয়-জয়ের উৎকৃষ্ট উপায় আর কোথাও কখনও কথিত হইয়াছে, এমন আমি জানি না

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

নিষিদ্ধ হইয়াছে। মৎস্য হিন্দুমাত্রেরই পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

(৩) আলস্য-পরিত্যাগ। আলস্য ইন্দ্রিয়-দোষের একটি অতিশয় গুরুতর কারণ। আলস্যে কুচিন্তার অবসর পাওয়া যায়,—অন্য চিন্তার অভাব থাকিলে ইন্দ্রিয়সুখচিন্তাই বলবতী হয়। অন্য কর্ম্ম না থাকিলে, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি-চেষ্টাই প্রবল হয়। যাঁহার বিষয়-কর্ম্ম আছে, তিনি বিষয়কর্ম্মে বিশেষ মনোনিবেশ করিবেন, এবং অবসরকালেও বিষয়-কর্ম্মের উন্নতিচেষ্টা করিবেন। তাহাতে দ্বিবিধ শুভফল ফলিবে,—ইন্দ্রিয়ও শাসিত থাকিবে, এবং বিষয়কর্ম্মেরও উন্নতি ঘটিবে। তবে, এরূপ বিষয়কর্ম্ম-চিন্তার দোষ এই ঘটে যে, লোক অত্যন্ত বিষয়ী হইয়া উঠে। সেটা মানসিক অবনতির কারণ হয়। অতএব যাঁহারা পারেন, তাঁহারা অবসরকালে সুসাহিত্য পাঠ বা বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিবেন। যাঁহারা শিক্ষার অভাবে তাহাতে অক্ষম বা অনুরাগী, তাঁহারা আপনার কার্য্য শেষ করিয়া পরের কার্য্য করিবেন। পরিবারবর্গের সহিত কথোপকথন, বালকবালিকাদিগের শিক্ষার তত্ত্বাবধান, আপনার আয়ব্যয়ের তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবাসিগণের সুখস্বচ্ছন্দের তত্ত্বাবধান, সকলেই সমস্ত অবসরকাল অতিবাহিত করিতে পারেন। ইহাতে যাঁহাদের মন যায়, তাঁহারা কোন গুরুতর পরকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন। অনেকে একটা স্কুল বা একটা ডাক্তারখানা স্থাপন ও রক্ষণে ব্রতী হইয়া অনেক পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

(৪) অতি প্রধান উপায় কুসংসর্গ-পরিত্যাগ। যাহারা ইন্দ্রিয়পরবশ, অশ্লীলভাষী, অশ্লীল আমোদ-প্রমোদে অনুরক্ত, তাহাদের ছায়াও পরিত্যাগ করিবে। ইহাদের দৃষ্টান্ত, প্ররোচনা ও কথোপকথনে দেবর্ষিগণও কলুষিত হইতে পারেন। সভ্যসমাজে বাসের একটি প্রধান অমঙ্গল এই কুসংসর্গ।

(৫) সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়—কেবল ঈশ্বরচিন্তার নীচে পবিত্র দাম্পত্য-প্রণয়। এ বিষয়ে অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই।

এই সকল কথা যদিও গীতাব্যাখ্যার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক, তথাপি ইহা লোকের পক্ষে অশেষ মঙ্গলকর বলিয়া এ স্থানে লিখিত হইল।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥১॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

এই অব্যয়যোগ আমি সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম। সূর্য্য মনুকে বলিয়াছিলেন, মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। ১।

এই যোগের ফল অব্যয়, এজন্য ইহাকে অব্যয় বলা হইয়াছে। ইক্ষ্বাকু মনুর পুত্র, এবং সূর্য্যবংশীয় রাজগণের আদি পুরুষ।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥২॥

এইরূপ পরম্পরাপ্রাপ্ত হইয়া এই যোগ রাজর্ষিগণ অবগত হইয়াছিলেন। হে পরন্তপ! এক্ষণে মহৎ কালপ্রভাবে সে যোগ নষ্ট হইয়াছে। ২।

(টীকা অনাবশ্যক।)

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥৩॥

তুমি আমার ভক্ত ও সখা. সেই পুরাতন যোগ অদ্য আমি তোমাকে বলিলাম। এ প্রসঙ্গ উত্তম। ৩।

(টীকা অনাবশ্যক।)

অর্জ্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥৪

আপনার জন্ম পরে, সূর্য্যের জন্ম পূর্ব্বে; আপনি যে ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাহা কি প্রকারে বুঝিতে পারিব? ৪।

(টীকা অনাবশ্যক।)

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ ৫॥

আমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, তোমারও হইয়াছে। আমি সেগুলি সকলই অবগত আছি। হে পরন্তপ! তুমি জান না। ৫।

সহসা অবতারবাদের কথা উত্থাপিত হইল। কর্ম্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য উহার প্রয়োজন আছে। আপাততঃ এই শ্লোকগুলির ভাবে বোধ হয়, যেন অর্জ্জুন অবতারতত্ত্ব অবগত ছিলেন না। এ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ মহাভারতের অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে, ইহা সত্য বটে। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্র নামক মৎপ্রণীত গ্রন্থে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, মহাভারতের সকল অংশ এক সময়ের নহে; এবং যে সকল অংশে কৃষ্ণের অবতারত্ব আরোপিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতে দশ অবতারের কথা মাত্র নাই, এবং ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একত্র বিদ্যমান। তৃতীয়তঃ, দশ অবতারের কথা অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাণগুলিতে আছে; কিন্তু পুরাণে আবার ভিন্নপ্রকারও আছে। ভাগবতে আছে, অবতার বাইশটি; আবার এ কথাও আছে যে, অবতার অসংখ্যেয়। শ্রীকৃষ্ণও এখানে আটটি কি দশটি কি বাইশটির কথা বলিতেছেন না। "বহু" অবতারের কথা বলিতেছেন। ভাগবতের "অসংখ্যেয়"

এবং এই "বহু" শব্দ একার্থবাচক সন্দেহ নাই।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৬॥

আমি অজ; আমি অব্যয়াত্মা, সর্ব্বভূতের ঈশ্বর; তাহা হইয়াও আপন প্রকৃতি বশীকৃত করিয়া আপন মায়ায় জন্মগ্রহণ করি। ৬।

অজ—জন্মরহিত।

অব্যয়াত্মা—যাঁহার জ্ঞানশক্তির ক্ষয় নাই। (শঙ্কর)

ঈশ্বর—কার্ম্মপারতন্ত্র্য-রহিত। (শ্রীধর)

প্রকৃতি—ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, সর্ব্বজগৎ যাঁহার বশীভূত।

এতদ্ব্যতীত মূলে যে "অধিষ্ঠায়" শব্দ আছে, শঙ্করাচার্য্য তাহার অর্থ "বশীকৃত্য" লিখিয়াছেন। কিন্তু শ্রীধর স্বামী "স্বীকৃত্য" লিখিয়াছেন। শঙ্করকৃত ব্যাখ্যা অধিকতর সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা গিয়াছে।

স্থূল কথা এই যে, ভগবানের কথায় এই আপত্তি হইতে পারে, যিনি জন্মরহিত, তাঁহার জন্ম হইল কি প্রকারে? জ্ঞানে মোক্ষ;—যাঁহার জ্ঞান অক্ষয়, তাঁহার জন্ম হইবে কেন? জন্ম কর্ম্মাধীন,—যিনি ঈশ্বর, এজন্য কর্ম্মের অনধীন, তাঁহার জন্ম কেন?

উত্তরে ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য তাহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। আমার যে স্বপ্রকৃতি, অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তম ইতি ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়া, সমস্ত জগৎ যাহার বশে আছে, যদ্দ্বারা মোহিত হইয়া আমাকে বাসুদেব বলিয়া জানিতে পারে না, সেই প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আমি জন্মগ্রহণ করি। আপনার মায়ায়, কি না, সাধারণ লোক যেমন পরমার্থানবন্ধন জন্মগ্রহণ করে, এ সেরূপ নহে:

শ্রীধর স্বামী একটু ভিন্ন প্রকার অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভগবান্ বলিতেছেন যে, আমি আপনার শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতি স্বীকার করিয়া, বিশুদ্ধ উজ্জ্বল সত্ত্বমূর্ত্তির দ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হই।

কথাগুলি বড় জটিল, পাঠকের বুঝিবার সাহায্যার্থ দুই একটি কথা বলা উচিত।

"মায়া" ঈশ্বরের একটি শক্তি। এই মায়া, হিন্দুদিগের ঈশ্বরতত্ত্বে, বিশেষতঃ উপনিষদে ও দর্শনশাস্ত্রে অতি প্রধান স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ বেদান্তে মায়া কিরূপে পরিচিত হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। এই গীতাতেই মায়া কিরূপ বুঝান হইয়াছে, তাহাই বুঝাইতেছি। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, তৃতীয় অধ্যায়ের ৪২ শ্লোকের টীকায় আমরা গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম।—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪॥

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আমার ভিন্ন ভিন্ন অষ্ট প্রকার প্রকৃতি। ৪। ইহা বলিয়াই বলিতেছেন—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥৫॥

ইহা আমার অপরা বা নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি; আমার পরা বা উৎকৃষ্টা প্রকৃতিও জান। ইনি জীবভূতা এবং ইনি জগৎ ধারণ করিয়া আছেন।৫

তবে ঈশ্বরের যে শক্তি জীবস্বরূপা, এবং যাহা জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাই তাঁহার পরা প্রকৃতি বা মায়া। আপনার জীবস্বরূপা এই শক্তিতে ভগবান্ জীবসৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শক্তিকে বশীভূত করিয়া আপনার স্বত্বকে জীবরূপী করিতে পারেন।

ঈশ্বর শরীর ধারণপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইতে পারেন না, ইহার বিচার নিষ্প্রয়োজন; কেন

না, তিনি ইচ্ছাময় ও সর্ব্বশক্তিমান্,—পারেন না, এমন কথা বলিলে তাঁহার শক্তির সীমা নির্দ্দেশ করা হয়। ঈশ্বর শরীরী হইয়া অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহার বিচার আমি গ্রন্থান্তরে * যথাসাধ্য করিয়াছি—পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। আর শরীর ধারণপূর্ব্বক ঈশ্বর অবতীর্ণ হওয়ার কোন প্রয়োজন আছে কি না, ভগবান্ নিজেই পর শ্লোকদ্বয়ে তাহা বলিতেছেন।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

যে যে সময়ে ধর্ম্মের ক্ষীণতা এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সেই সময়ে আপনাকে সৃজন করি। ৭।

সাধুগণের পরিত্রাণ হেতু দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশার্থ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি †। ৮।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি
সোঽর্জ্জুন ॥ ৯ ॥

হে অর্জ্জুন! আমার জন্ম কর্ম্ম দিব্য। ইহা যে তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হয়, সে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় না,—আমাকে প্রাপ্ত হয়। ৯।

দিব্য অর্থে "অপ্রাকৃত" ঐশ্বর বা অলৌকিক।

ভগবানের মানবিক জন্ম কর্ম্ম তত্ত্বতঃ জানিলে, মোক্ষলাভ হইবে কেন? আমি কৃষ্ণচরিত্র-বিষয়ক গ্রন্থে এইরূপ বুঝাইয়াছি যে,মনুষ্যত্বের আদর্শপ্রকাশের জন্য ভগবানের মানব-দেহ-ধারণ। অন্য উদ্দেশ্য সম্ভবে না। আদর্শ-মনুষ্য, আদর্শ-কর্ম্মী। অতএব কর্ম্মযোগীর পক্ষে আদর্শ-কর্ম্মীর কর্ম্ম তত্ত্বতঃ বুঝা আবশ্যক। তদ্ব্যতীত কর্ম্মযোগ, অন্ধকারে লোষ্ট্রক্ষেপ। যদি ইহা না স্বীকার করা যায়, তবে কর্ম্মযোগকথনকালে এই অবতারতত্ত্ব উত্থাপনের কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। যিনি ভগবানের আদর্শকর্ম্মিত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিবেন,তিনি কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থ বিস্তারশঃ পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন। আর একটা অর্থ না হয়, এমন নহে। যাহাকে দার্শনিকেরা জ্ঞানমার্গ কহেন, তাহার অর্থ এইরূপ প্রসিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির পথ। ব্রহ্মকে জানিতে হইবে, কিন্তু ব্রহ্ম কি? ব্রহ্ম নিরাকার, নিরঞ্জন, অপরিচ্ছিন্ন, নিত্য, শুদ্ধমুক্ত, সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। এই ব্রহ্মকে জানিলেই মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু অবতীর্ণ এবং শরীরবিশিষ্ট যে ঈশ্বর, তাঁহাকে নিরাকার ইত্যাদি বলা যাইতে পারে না। তবে কি অবতীর্ণ এবং শরীরবিশিষ্ট ঈশ্বরের জ্ঞানে কোনও ফলোদয় নাই, তাঁহার উপাসনায় মুক্তির সম্ভাবনা নাই? এই শ্লোকে সে সংশয় নিরাকৃত হইতেছে। অবতীর্ণ এবং শরীরী ঈশ্বরের দিব্য জন্ম কর্ম্ম তত্ত্বতঃ জানিলেও মুক্তিলাভ হইতে পারে। কিন্তু তত্ত্বতঃ জানিতে হইবে। যাহাকে তাহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া জানিলে সে লাভ নাই।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

বীতরাগভয়ক্রোধ, মন্ময়, আমাতে উপাশ্রিত, জ্ঞানতপস্যার দ্বারা পূত, অনেকে মদ্ভাবগত হইয়াছে। ১০।

প্রথমে কথার অর্থ। রাগ—অনুরাগ। মন্ময়—ব্রহ্মবিৎ, ঈশ্বরভেদজ্ঞানরহিত। আমাতে

* কৃষ্ণচরিত্র প্রথম খণ্ডে।

† এই সকলের কথাও আমি কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম খণ্ডে বিচার করিয়াছি। পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

উপাশ্রিত। শঙ্কর বলেন, কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ শ্রীধর বলেন,মৎপ্রসাদলব্ধ মদ্ভাবগত, ঈশ্বর-ভাগবত, মোক্ষপ্রাপ্ত।

ভাষ্যকারেরা বলেন যে, এ কথা এখানে বলিবার কারণ এই যে, আমাতে ভক্তিবাদ এই নূতন প্রচারিত হইতেছে না। পূর্ব্বেও অনেকে ঈদৃশ জ্ঞানতপের দ্বারা মোক্ষলাভ করিয়াছেন। তাহাই বটে,কিন্তু বেশীর ভাগ এইটুকু বুঝা কর্ত্তব্য যে, যাঁহারা আদর্শকর্ম্মীর কর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিয়া কর্ম্ম করিয়াছেন,তাঁহাদেরই কথা হইতেছে। পরবর্ত্তী পঞ্চদশ শ্লোক পাঠ করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। ইহা বুঝিতে না পারিলে কর্ম্মযোগের সঙ্গে এই সকল কথার কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

নিষ্কাম কর্ম্মের পক্ষে রাগভয়ক্রোধ থাকিবে না,ঈশ্বরের অভেদজ্ঞান থাকিবে,এবং জ্ঞান ও তপের (Spiritual culture) দ্বারা চরিত্র বিশুদ্ধীকৃত হইবে। ইহা না হইলে কর্ম্ম নিষ্কাম হইবে না।

সকলেই নিষ্কাম কর্ম্মী হইতে পারে না। যাহারা সকাম কর্ম্ম করে, তাহাদের কর্ম্মের কি কোনও ফল নাই? ঈশ্বর সকল কর্ম্মের ফলবিধাতা। ইহা পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে কথিত হইতেছে।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥১১॥

যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারে আমার পথের অনুবর্ত্তী হয়।১১।

অগ্রে প্রথম চরণ বুঝা যাউক। অর্জ্জুন বলিতে পারেন, "প্রভো! আসল থাটা কি, তা ত এখনও বুঝাও নাই। নিষ্কাম কর্ম্মেই তোমাকে পাইব, আর সকাম কর্ম্মে কিছু পাইব না কি? সেগুলা কি পণ্ডশ্রম?" ভগবান্ এই সংশয়চ্ছেদ করিতেছেন। সকলেই একই প্রকার চিত্তভাবের অধীন হইয়া আমার উপাসনা করে না। যে যে ভাবে আমার উপাসনা করে, তাহাকে সেইরূপ ফল দান করি। যে যাহা কামনা করিয়া আমার উপাসনা করে, তাহার সেই কামনা পূর্ণ করি। যে কোনও কামনা করে না,—অর্থাৎ যে নিষ্কাম,সে আমায় পায়। কামনাভাবে তাহার কামনা পূর্ণ হয় না, কিন্তু সে আমায় পায়।

তার পর দ্বিতীয় চরণ। "মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারে আমার পথের অনুবর্ত্তী হয়" এ কথার অর্থ সহসা এই বোধ হয় যে "আমি যে পথে চলি, মানুষ সর্ব্বপ্রকারে সেই পথে চলে।" এখানে সে অর্থ নহে—গীতাকারের "Idiom" ঠিক আমাদের "Idiom" সঙ্গে মিলিবে, এমন প্রত্যাশা করা যায় না। এ চরণের অর্থ এই যে, "উপাসনার বিষয়ে মনুষ্য যে পথই অবলম্বন করুক না, আমি যে পথে আছি, সেই পথেই মানুষকে আসিতে হইবে।" "মানুষ যে যে দেবতারই পূজা করুক না কেন, সে আমারই পূজা করা হইবে; কেন না,এক ভিন্ন দেবতা নাই। আমিই সর্ব্বদেব—অন্য দেবে পূজার ফল আমিই কামনারূপ দিই। এমন কি,যদি মানুষ দেবোপাসনা না করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়াদির সেবা করে. তবে সেও আমার সেবা। কেন না, জগতে আমি ছাড়া কিছু নাই, ইন্দ্রিয়াদিও আমি। আমিই ইন্দ্রিয়াদি-স্বরূপে ইন্দ্রিয়াদির ফল দিই।" ইহা নিকৃষ্ট ও দুঃখময় ফল বটে, কিন্তু যেমন উপাসনা ও কামনা, তদনুরূপ ফল দান করি।

পৃথিবীতে বহুবিধ উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। কেহ নিরাকারের, কেহ সাকারের উপাসনা করেন। কেহ একমাত্র জগদীশ্বরের, কেহ বহু দেবতার উপাসনা করেন; কোনও জাতি ভূতযোনির, কোনও জাতি বা পিতৃলোকের, কেহ সজীবের, কেহ নির্জ্জীবের,

কেহ মনুষ্যের, কেহ গবাদি পশুর, কেহ বা বৃক্ষের বা প্রস্তরখণ্ডের উপাসনা করে। এই সকলই উপাসনা, কিন্তু ইহার মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ আছে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সে উৎকর্ষাপকর্ষ কেবল উপাসকের জ্ঞানের পরিমাণ মাত্র। যে নিতান্ত অজ্ঞ, সে পথিপার্শ্বে পুষ্পচন্দন-সিন্দূরাক্ত শিলাখণ্ড দেখিয়া, তাহাতে আবার পুষ্পচন্দন সিন্দুর লেপিয়া যায়। যে কিঞ্চিৎ জানিয়াছে, সে না হয়, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃতির পরিমাণ-জ্ঞান-সম্বন্ধে দুই জনেই প্রায় তুল্য অন্ধ। যে হিমালয় পর্ব্বতকে বল্মীক-পরিমিত মনে করে, আর যে তাহাকে বপ্র-পরিমিত মনে করে, এ উভয়ে সমান অন্ধ। ব্রহ্মবাদী ও ঈশ্বরস্বরূপ অবগত নহেন—শিলাখণ্ডের উপাসকও নহে। তবে একজনের উপাসনা ঈশ্বরের নিকট গ্রাহ্য, আর একজনের অগ্রাহ্য, ইহা কি প্রকারে বলা যাইবে? হয় কাহারও উপাসনা ঈশ্বরের গ্রাহ্য নহে, নয় সকল উপাসনাই গ্রাহ্য। স্থূল কথা, উপাসনা আমাদিগের চিত্তবৃত্তির, আমাদের জীবনের পবিত্রতা-সম্পাদন জন্য—ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন জন্য নহে। যিনি অনন্ত আনন্দময়, যিনি তুষ্টি অতুষ্টির অতীত, উপাসনার দ্বারা আমরা তাঁহার তুষ্টিসাধন করিতে পারি না। তবে ইহা যদি সত্য হয়, তিনি বিচারক—কেন না, কর্ম্মের ফলবিধাতা—তবে যাহা তাঁহার বিশুদ্ধ স্বভাবের অনুমোদিত, সেই উপাসনাই তাঁহার গ্রাহ্য হইতে পারে। যে উপাসনা কপট, কেবল লোকের কাছে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভের উপায়-স্বরূপ, তাহা তাঁহার গ্রাহ্য নহে—কেন না, তিনি অন্তর্যামী। আর যে উপাসনা আন্তরিক, তাহা ভ্রান্ত হইলেও তাঁহার কাছে গ্রাহ্য। যিনি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক বা তপশ্চারী, তাঁহার উপাসনা যদি কেবল লোকের কাছে পসার করিবার জন্য হয়, তাহার অপেক্ষা যে অভাগী পুত্রের মঙ্গল-কামনায় ষষ্ঠীতলায় মাথা কুটে, তাহার উপাসনাই অধিক পরিমাণে ভগবানের গ্রাহ্য বলিয়া বোধ হয়।

এইরূপ শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিলে, পৃথিবীতে আর ধর্ম্মগত পার্থক্য থাকে না,—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন, নিরাকারবাদী, সাকারবাদী, বহুদেবোপাসক, জড়োপাসক, সকলেই সেই এক ঈশ্বরের উপাসক—যে পথে তিনি আছেন, সেই পথে সকলেই যায়। এই শ্লোকোক্ত ধর্ম্মই জগতে একমাত্র অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম—একমাত্র সর্ব্বজনাবলম্বনীয় ধর্ম্ম। ইহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্মের তুল্য উদার ধর্ম্ম আর নাই—আর এই শ্লোকের তুল্য উদার মহাবাক্যও আর নাই।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥ ১২॥

ইহলোকে যাহারা কর্ম্মসিদ্ধি কামনা করে, তাহারা দেবগণের আরাধনা করে; এবং শীঘ্র মনুষ্যলোকেই তাহাদের কর্ম্মসিদ্ধি হয়। ১২।

অর্থাৎ সচরাচর মনুষ্য কর্ম্মফল কামনা করিয়া দেবগণের আরাধনা করে, এবং ইহলোকেই সেই অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হয়।

সে ফল সামান্য। নিষ্কাম কর্ম্মের ফল অতি মহৎ। তবে ফলের আশা না করিয়া লোকে সামান্য ফলের চেষ্টা করে কেন? ইহা মনুষ্যের স্বভাব, যে যে সুখ শীঘ্র পাওয়া যাইবে, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও, মনুষ্য তাহারই চেষ্টা করে।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥ ১৩॥

গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে আমি

চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি তাহার (সৃষ্টি) কর্ত্তা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা ও বিকাররহিত জানিও। ১৩।

হিন্দুশাস্ত্রের সাধারণ উক্তি এই যে,ব্রাহ্মণ-বর্ণ সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ হইতে,ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, বৈশ্য ঊরু হইতে এবং শূদ্র চরণ হইতে সৃষ্ট হয়। কিন্তু গুণকর্ম্মবিভাগশঃ চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে,এই কথা হিন্দুশাস্ত্রের কথিত সাধারণ উক্তির সঙ্গে আপাততঃ সঙ্গত বোধ হয় না। নানা কারণে এ কথাটার বিস্তারিত বিচার আবশ্যক।

প্রথমতঃ দেখা যায়, হিন্দুশাস্ত্রের কথিত সাধারণ উক্তির আদি বিখ্যাত পুরুষ-সূক্তে।

ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের নবতিতম সূক্তকে পুরুষসূক্ত কহে। উহার প্রথম ঋক্ "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ" ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ-গণ আজিও বিষ্ণুপূজাকালে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ—যাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে বৈদিক কালে জাতিভেদ ছিল না,—তাঁহারা বলেন যে, এই সূক্ত আধুনিক। আমাদের সে বিচারে প্রয়োজন নাই। বৈদিক সূক্ত সবই অতি প্রাচীন, ইহা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। আমার বলিবার কথা, ঐ সূক্তে যাহা আছে, তাহাতে ঠিক এমন বুঝায় না যে, মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছে, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, ইত্যাদি। সেই ঋক্‌গুলি উদ্ধৃত করিতেছি,—

"ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোহজায়ত ॥"

শূদ্রের সম্বন্ধে "আজায়ত" বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ সেই পুরুষের মুখ হইলেন এবং ক্ষত্রিয় বাহু (কৃত) হইলেন। * বৈশ্য সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে যে, ইঁহার ঊরুই বৈশ্য।

* ডাক্তার হোগ এই ঋক্ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"Now, according to this passage, which is the most ancient and authorative, we have on the organ of Brahmanism, and caste in general, the Brahmana has not come from the mouth of this primary being, the Purusha, but the mouth of the latter became the Brahmanical caste, that is to say was trnsformed into it. The passage has no doubt an allegorical sense. (বেদের অনেক সূক্তে তাই) Mouth is the seat of speech. The allegory points ont that the Bramans are teachers and instructors of mankind. The arms are the seat sf strength. If the two arms of the Purusha are said to have been made a Kshattriya (warrior), that means, then, that the Kshattriyas have to carry arms to defend the empire. That the things of the Purusha were transformed into the Vaisya, that as the lower parts of the body are the principal repository of food taken, the Vaisya caste is destined to provide food for the others." (এটুকু বড় কষ্ট কল্পনা,—ঊরুতে ডাল ভাত যায় না—কিন্তু এ সকল স্থানে উদর শব্দের প্রয়োগও হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায়। যথা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ৪৭ অধ্যায়ে—

"ব্রহ্মবক্ত্রং ভুজৌ ক্ষত্রং কৃৎস্নমূরূদরং বিশঃ" তার পর) "The creation of the Sudra from the feet of the Purusha indicates that he is destined to be a servant to the others, just as the foot supports the otherparts of the

বেদের মধ্যে কেবল তৈত্তিরীয় সংহিতায় পাওয়া যায় যে,প্রজাপতির মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, মধ্যভাগ হইতে (মধ্যতঃ) বৈশ্য, এবং চরণ হইতে শূদ্র সৃষ্টি করিলেন।

কিন্তু বেদের অন্যান্য ভাগে, চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি অন্যপ্রকার কথিত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে, যথা—

"ভূরিতি বৈ প্রজাপতির্ব্রহ্ম অজনয়ত। ভুব ইতি ক্ষত্রং স্বরিতি বিশম্।" শূদ্রের কথা নাই। *

পুনশ্চ তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণে—

"ঋগ্ভ্যো জাতং বৈশ্যং বর্ণমাহুঃ যজুর্ব্বেদং ক্ষত্রিয়স্যাহর্যোনিম্। সামবেদো ব্রাহ্মণানাং প্রসূতিঃ।" † অর্থাৎ সামবেদ হইতে ব্রাহ্মণের, যজুর্ব্বেদ হইতে ক্ষত্রিয়ের এবং ঋগ্বেদ হইতে বৈশ্যের জন্ম। এখানেও শূদ্রের কথা নাই

body as a firm support." Dr. Haug on the origin of Brahmanism. p. 4.

r. muir ও বলেন, "It is indeed said that the Sudra sprang from Purusha's feet ; but as regards the three superior castes and the members with which they are respectively connected, it is not quite clear which (i. e.) the castes or the members are to be taken as snbjects and which as the predicates, and consequently, whether we are to suppose verse 12. (উদ্ধৃত ঋক্) to declare that the three castes where the members or conversely that the three members were, or became the three castes."—Sanskrit Texts Vol. II, p. 15, 2nd Edition.

* ২।১ ৪।১১ ইত্যাদি।

† ৩।১২।৯ ২

উদাহরণস্বরূপ এই মতগুলি উদ্ধৃত করা গেল। এমন আরও অনেক আছে। সকল উদ্ধৃত করিতে গেলে, পাঠকের বিরক্তিকর হইবে। স্থূল কথা, হিন্দুশাস্ত্রে চাতুর্ব্বর্ণ্য উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত আছে। শ্রীকৃষ্ণও যাহা বলিতেছেন, তাহাও সাধারণ মত হইতে ভিন্ন বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে। তিনি বলেন যে, আমি আমার অঙ্গবিশেষ হইতে বর্ণবিশেষ সৃষ্টি করিয়াছি। তিনি বলেন, গুণকর্ম্মের বিভাগানুসারে করিয়াছি। প্রথমে দেখা যাউক, গুণ কাহাকে বলে।

সত্ত্বরজস্তম এই তিন গুণ। ভাষ্যকারেরা বলেন, সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের কর্ম্ম শমদমাদি, সত্ত্বরজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়, তাহাদিগের কর্ম্ম শৌর্য্যযুদ্ধাদি; রজস্তমঃপ্রধান বৈশ্য, তাহাদিগের কর্ম্ম কৃষিবাণিজ্যাদি; তমঃপ্রধান শূদ্র, তাহাদিগের কর্ম্ম অন্য তিন বর্ণের সেবা। এই রূপ গুণকর্ম্মের বিভাগ অনুসারে সৃষ্ট করিয়াছি, ইহাই ভগবদভিপ্রায়।

এক্ষণে, যে জন্মিবে, সে গর্ভে জন্মিবার পূর্ব্বেই সত্ত্বগুণাধিক্য, রজোগুণাধিক্য বা তমোগুণাধিক্য ইত্যাদি প্রকৃতি সৃষ্ট হয়?

যিনি বলিবেন যে, আগে জীবের জন্ম, তার পর তাহার সত্ত্বপ্রধানাদি স্বভাব, তাঁহাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, মনুষ্যের বংশানুসারে নহে, গুণানুসারে তাহার ব্রাহ্মণত্বাদি। ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই তাহাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে, এমন নহে; সত্ত্বগুণপ্রধান স্বভাব হইলে শূদ্রের পুত্র হইলেও ব্রাহ্মণ হইবে এবং ব্রাহ্মণের পুত্রের তমোগুণপ্রধান স্বভাব হইলে সে শূদ্র হইবে। ভগবদ্বাক্য হইতে ইহাই সহজ উপলব্ধি।

আমি যে একটা নূতন মত নিজে গড়িয়া প্রচার করিতেছি, তাহা নহে। প্রাচীনকালে

শঙ্কর-শ্রীধরের অনেক পূর্ব্বে, প্রাচীন ঋষিগণও এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মতত্ত্বে তাহার কিছু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি,যথা,—

ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং
জিতেন্দ্রিয়ম্।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥

পুনশ্চ—

অগ্নিহোত্রব্রতপরান্ স্বাধ্যায়নিরতান্ শুচীন্।
উপবাসরতান্ দান্তাংস্তান্ দেবা ব্রাহ্মণান্
বিদুঃ॥
ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণ-
কারকাঃ।
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
গৌতমসংহিতা।

ক্ষমাবান্, দমশীল,জিতক্রোধ এবং জিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে, আর সকলে শূদ্র। যাহারা অগ্নিহোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত,শুচি,উপবাসরত,দান্ত, দেবতারা তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে রাজন্! জাতি পূজ্য নহে,গুণই কল্যাণকারক। চণ্ডালও বৃত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

পুনশ্চ, মহাভারতের বনপর্ব্বে মার্কণ্ডেয়-সমস্যাপর্ব্বাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে ঋষিবাক্য আছে, "পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়, আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত,তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি। কারণ,ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।" পুনশ্চ বনপর্ব্ব অজগরপর্ব্বাধ্যায়ে ১৮০ অধ্যায়ে রাজর্ষি নহুষ বলিতেছেন, "বেদমূলক সত্য, দান,ক্ষমা,আনৃশংস্য,অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে। যদ্যপি সত্যাদি ব্রাহ্মণধর্ম্ম শূদ্রেও লক্ষিত হইল, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।" তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, "অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে,অতএব শূদ্রবংশ হইলে যে শূদ্র হয়,এবং ব্রাহ্মণবংশ্য হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র।"

কিন্তু হইতেছিল, নিষ্কাম ও সকাম কর্ম্মের কথা,কর্ম্মের ফলকামনার কথা আসিল কেন? কথাটা বলা হইয়াছে যে,কেহ ইহকালে আশু-লভ্য ফলের কামনায় দেবাদির যজনা করে, কেহ বা নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া থাকে। লোকের মধ্যে এরূপ বিসদৃশ আচরণ দেখা যায় কেন? তাহাদিগের প্রকৃতিভেদবশতঃ। এই প্রকৃতি-ভেদই চাতুর্ব্বর্ণ্য বা বর্ণভেদ। কিন্তু এই বর্ণভেদ কেন? ঈশ্বরেচ্ছা। ঈশ্বর ইহা করিয়াছেন। তবে ঈশ্বর কি কর্ম্ম করেন? করেন বৈ কি। কিন্তু এরূপ কর্ম্ম করিয়াও তিনি অকর্ত্তা। কেন না,তিনি অব্যয়। তিনি যদি অব্যয়,তবে তিনি কর্ম্মফলের অধীন হইতে পারেন না—তাঁহার সুখ-দুঃখ হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। যদি তিনি ফলের অধীন নহেন, তবে তাঁহার কৃত কর্ম্ম নিষ্কাম। তিনি নিষ্কামকর্ম্মী। মনুষ্যও সেই জন্য নিষ্কাম না হইলে ঈশ্বরে মিলিত হইতে পারে না। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হওয়াই মুক্তি। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব নিষ্কামস্বভাব পরমাত্মায় সকাম জীবাত্মা লীন হইতে পারে না। নিষ্কাম কর্ম্মীই মুক্তির অধিকারী।

ঈশ্বর কর্ম্ম করেন,এ কথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের শিষ্যেরা মানিবেন না। তাঁহারা বলিবেন, ঈশ্বর কর্ম্ম করেন না; যাহা হয়, তাঁহার সংস্থাপন-নিয়মে (Law) নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু সেই নিয়ম-সংস্থাপনও কর্ম্ম। যাঁহারা বলিবেন,সেই সকল নিয়ম জড়ের গুণ, যদি তাঁহারা জড়কে ঈশ্বরসৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন, তবে তাঁহারা ঈশ্বরের কর্ম্ম-কারিত্ব

স্বীকার করিলেন। যাঁহারা তাহাও স্বীকার করেন না, তাঁহারা অনীশ্বরবাদী, তাঁহাদের সঙ্গে ঈশ্বরের কর্ম্মকারিত্ব-সম্বন্ধে কোন বিচারই নাই।

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥

কর্ম্ম-সকল আমাকে লিপ্ত করে না। আমারও কর্ম্মে ফলস্পৃহা নাই। এইরূপ আমায় যে জানে, সে কর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ হয় না।১৪।

ঈশ্বরের নিষ্কাম-কর্ম্মিত্ব না জানিলে, নিষ্কাম কর্ম্ম বুঝা যায় না। তাহা জানিলে, কর্ম্ম নিষ্কাম হইবে। তাহা হইলে সকাম কর্ম্মরূপ বন্ধন হইতে অব্যাহিত পাওয়া যায়। পূর্ব্ব-শ্লোকের যে টীকা দেওয়া গিয়াছে, তাহাতে এ কথা পরিস্ফুট করা গিয়াছে।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতমং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

এইরূপ জানিয়া পূর্ব্বকালের মোক্ষাভিলাষিগণ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তুমি পূর্ব্বগামীদিগের পূর্ব্বকালকৃত কর্ম্ম-সকল কর। ১৫।

অর্থাৎ প্রাচীনকালে যাঁহারা মোক্ষকাম, তাঁহারা আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া—কর্ম্মের ফলভাগী নহি, ইহা জানিয়া কর্ম্ম করিতেন। তুমিও সেইরূপ কর্ম্ম কর।

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬ ॥

কর্ম্ম কি, অকর্ম্ম কি, পণ্ডিতেরাও তাহা বুঝিতে পারেন না। অতএব কর্ম্ম কি, তাহা তোমাকে বলিতেছি। তাহা জানিলে অশুভ হইতে মুক্ত হইবে। ১৬।

অকর্ম্ম অর্থে এখানে মন্দকর্ম্ম নহে—অকর্ম্ম অর্থে কর্ম্মশূন্যতা।

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

কর্ম্ম কি, তাহা বুঝিতে হইবে, বিকর্ম্ম কি, তাহা বুঝিতে হইবে। কর্ম্মের গতি দুর্জ্ঞেয়।১৭।

কর্ম্ম,—অর্থে বিহিত কর্ম্ম, যাহা যথার্থ কর্ম্ম।

বিকর্ম্ম—অবিহিত কর্ম্ম।

অকর্ম্ম—কর্ম্মত্যাগ, কর্ম্মশূন্যতা।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥১৮॥

যে কর্ম্মেতেও কর্ম্মশূন্যতা দেখে এবং অকর্ম্মেও কর্ম্ম দেখে, সেই যোগযুক্ত এবং সেই সর্ব্বকর্ম্মকারী। ১৮।

ভগবদারাধনা কর্ম্ম; কিন্তু তাহাতে কর্ম্মের যে বন্ধকতা, তাহা ঘটে না, এই জন্য তাহাকে কর্ম্মস্বরূপ বিবেচনা করিবে না। আর যে কর্ম্ম বিহিত, তাহা করিলে তাহার ফলভাগী হইতে হয়, ফলভাগিত্ব মুক্তির রোধক; এজন্য না করাকেই, অর্থাৎ অকর্ম্মকেই কর্ম্ম বিবেচনা করিবে। শ্রীধরের টীকার মর্ম্মার্থ এই। ইহাতে এ শ্লোক হইতে ইহাই পাওয়া যায় যে, ভগবদারাধনাই কর্ত্তব্য। অন্যান্য অনুষ্ঠান মুক্তির বিঘ্ন।

শঙ্করাচার্য্য অন্যরূপ বুঝাইয়াছেন। তিনি এই শ্লোক উপলক্ষে একটি দীর্ঘ এবং জটিল প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার স্থূল কথা এই—আত্মা ক্রিয়ানির্লিপ্ত; কর্ম্ম ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাই কৃত হইয়া থাকে; কিন্তু ভ্রমক্রমেই আত্মাতে কর্ম্মারোপ হইয়া থাকে। যিনি ইহা জানেন, তিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখেন। তার ইন্দ্রিয়াদির বিহিতানুষ্ঠানে বিরত হইলেও সেই অকর্ম্মকেও তিনি ইন্দ্রিয়াদির কর্ম্ম দেখেন।

কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে, পরবর্ত্তী শ্লোকের উপর দৃষ্টি রাখিলে একটা সোজা অর্থ পাওয়া যায়। কামসংকল্প-বিবর্জ্জিত, ফল-কামনাশূন্য যে কর্ম্ম,সে অকর্ম্ম—কর্ম্মশূন্যতা। আর যিনি অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে বিরত,তাঁহার কর্ত্তব্য-বিরতির ফলভাগিত্ব আছেই আছে—অতএব এখানে কর্ম্মশূন্যতাও কর্ম্ম। কেন না,ফলোৎপত্তির কারণ। যিনি ইহা বুঝিতে পারেন, তিনিই জ্ঞানী।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং
বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

যাঁহার সকল চেষ্টা কাম ও সঙ্কল্পবর্জ্জিত, এবং যাঁহার কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ, তাঁহাকেই জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলেন। ১৯।

"কামসঙ্কল্প" এই পদের অর্থের উপর শ্লোকের গৌরব কিয়ৎপরিমাণে নির্ভর করে। শঙ্করাচার্য্যকৃত অর্থ ;—"কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ "কামৈস্তৎকারণৈশ্চ সঙ্কল্পৈর্ব্বর্জ্জিতাঃ"। শ্রীধরকৃত ব্যাখ্যা এই, "কাম্যতে ইতি কামঃ। ফলং তৎসঙ্কল্পেন বর্জ্জিতাঃ।"মধুসূদনসরস্বতী বলেন, "কামঃ ফলতৃষ্ণা। সঙ্কল্পোঽহং করোমীতি কর্ত্তৃত্বাভিমানস্তাভ্যাং বর্জ্জিতাঃ।"'এইরূপ নানা মুনির নানা মত। মধুসূদন সরস্বতীকৃত সঙ্কল্প শব্দের অর্থ আভিধানিক নহে,কিন্তু এখানে খুব সঙ্গত। শঙ্করাচার্য্যকৃত,কাম এবং তাহার কারণ সঙ্কল্প উভয় বিবর্জ্জিত হইলে কর্ম্মে প্রবৃত্তির অভাব জন্মিবে। যে কর্ম্ম করিবার অভিলাষ রাখে এবং ফলকামনা করে না, সে কর্ম্ম করিবে কেন ? এজন্য শঙ্করাচার্য্য নিজেই বলিয়াছেন,"মুধৈব চেষ্টামাত্রা অনুষ্ঠীয়ন্তে প্রবৃত্তেন চেল্লোকসংগ্রহার্থং নিবৃত্তেন জীবনযাত্রার্থম্।" অর্থাৎ ঈদৃশ ব্যক্তির সমরারম্ভ-সকল অনর্থক চেষ্টা মাত্র। প্রবৃত্তিমার্গে কেবল লোকশিক্ষার্থ এবং নিবৃত্তিমার্গে কেবল জীবনযাত্রানির্ব্বাহার্থ। পাঠকদিগের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে, তাহা হইলেও কাম ও সঙ্কল্পবর্জ্জিত হইল না।

মধুসূদন সরস্বতীও "লোকশিক্ষার্থং" ও "জীবনযাত্রার্থং" কথা দুইটা রাখিয়াছেন, কিন্তু"কামসঙ্কল্পবর্জ্জিত"পদের তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পাঠক নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারেন। ফলতৃষ্ণা এবং অহঙ্কার-রহিত যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহাই বিহিত, এবং তাহাই কর্ম্মশূন্যতা।

সচরাচর লোকে ফলকামনাতেই কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়—এবং আমি এই কর্ম্ম করিতেছি বা করিয়াছি, এই অহঙ্কার তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ভগবদভিপ্রায় এই যে, দুইয়ের অভাবই কর্ম্মের লক্ষণ, কর্ম্মে তদুভয়ের অভাবই কর্ম্মশূন্যতা।

এইরূপ বুঝিলেই কি আপত্তির মীমাংস হইল ? হইল বৈ কি। ফলকামনাতেই লোকে সচরাচর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু ফলকামনা ব্যতীত যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায় না, এমন নহে। যদি তাই হইত, তাহা হইলে নিষ্কাম শব্দের অর্থ নাই —এমন বস্তুর অস্তিত্ব নাই। যদি তাই হইত, তাহা হইলে গীতার এক ছত্রেরও কোন মানে নাই। কথাটা পূর্ব্বে বুঝান হয় নাই। এখন বুঝান যাউক।

কতকগুলি কার্য্য আছে, যাহা মনুষ্যের অনুষ্ঠেয়। যে সে কর্ম্মের ফলকামনা করে না, তাহার পক্ষে অনুষ্ঠেয়। এমন মনুষ্য আছে সন্দেহ নাই যে,জীবনরক্ষা কামনা করে না—মরিতে পারিলেই তাহার সব যন্ত্রণা ফুরায়। কিন্তু আত্মজীবন-রক্ষা তাহার অনুষ্ঠেয়। যে শূলরোগী আত্মহত্যা করে, সে পাপ করে সন্দেহ নাই। শত্রুর জীবনরক্ষা সচরাচর কেহ কামনা করে না, কিন্তু শত্রু মজ্জনোন্মুখ অন্ত প্রকারে মৃত্যুকবলগ্রস্তপ্রায় দেখিলে তাহার রক্ষা আমাদের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। শত্রুকে উদ্ধার-

কালে মনে হইতে পারে,"আমার চেষ্টা নিষ্ফল হইলেই ভাল।"এখানে ফলকামনা নাই, কিন্তু কর্ম্ম আছে।

তবে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, নিষ্কাম কর্ম্মে ফলসিদ্ধির চেষ্টা নাই, এমন কথা বলাও যায় না, এবং গীতার সে অভিপ্রায়ও নয়। মুক্তিই যাহার উদ্দেশ্য, সে মুক্তি কামনা করে এবং মুক্তি-প্রাপ্তির উপযোগী চেষ্টা করে। কামশব্দ গীতায় বা অন্যত্র এমন অর্থে ব্যবহার হয় না যে, তাহারও ফলসিদ্ধির চেষ্টা বুঝায় না। মনে কর, স্বদেশের বা স্বজাতির হিতসাধন একটি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। যে স্বদেশহিতের চেষ্টা করে, সে যে স্বদেশের হিতকামনা করিয়া সে চেষ্টা করে না,এমন কখনই হইতে পারে না। অতএব কাম শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি,তাহা বুঝা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারিটি অপবর্গ—পুরুষার্থ। পুরুষার্থে ইহা ভিন্ন আর কোন প্রয়োজন নাই। যাহা ধর্ম্ম,অর্থ,অর্থাৎ ঐহিক ধন, সৌভাগ্যাদি এবং মোক্ষ, এই তিনের অতিরিক্ত, তাহাই কাম। এই জন্য কাম্য কর্ম্মের দ্বারা, স্বর্গাদিলাভ-সাধনকে কাম শব্দে অভিহিত করা যায়। কিন্তু সেই কাম্যকর্ম্মজনিত যে সুখভোগ,সে আপনার সুখ। অতএব কামের উদ্দিষ্ট যে সুখ—তাহা নিজের সুখ—পরের মঙ্গল নহে। যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য পরহিতাদি, তাহাই নিষ্কম। যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য নিজ হিত, তাহা নিষ্কাম নহে।

কাম শব্দ মাহাভারতের অন্যত্র বিশেষ করিয়া বুঝান আছে।

ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ পঞ্চানাং মনসো হৃদয়স্য চ।
বিষয়ে বর্ত্তমানানাং যা প্রীতিরুপজায়তে
স কাম ইতি মে বুদ্ধিঃ কর্ম্মণাং ফলমুত্তমম্॥

পাঁচটি ইন্দ্রিয়, মন, এবং হৃদয়, স্ব স্ব বিষয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া যে প্রীতি-উপভোগ, আমার বিবেচনায় তাহাই কাম। তাহাই কর্ম্মের উত্তম ফল।

অতএব কাম অর্থে আত্মসুখ।

এখন সেই স্বদেশহিতৈষীর উদাহরণ মনে কর। যদি স্বদেশহিতৈষী কেবলমাত্র স্বদেশের হিতকামনা করিয়া কর্ম্ম করেন,তবে তাঁহারি কর্ম্ম নিষ্কাম। আর যদি আপনার যশ, মান, সম্ভ্রম,উন্নতি প্রভৃতির বাসানায় স্বদেশের ইষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তিনি সকামকর্ম্মা।

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০॥

যিনি কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিরতৃপ্ত হইয়া থাকেন এবং কাহরেও আশ্রয় গ্রহণ করেন না, তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহার কিছুমাত্র কর্ম্ম করা হয় না। ২০।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ২১॥

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধে চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥২২॥

যিনি কামনা ও সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ পরিত্যাগ করেন, যাঁহার মন ও আত্মা বিশুদ্ধ, তিনি কেবল শরীর দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও পাপভাগী হন না; যিনি যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট; দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ও বৈরবিহীন এবং যিনি সিদ্ধ ও অসিদ্ধ তুল্য জ্ঞান করেন, তিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হন না। ২১। ২২।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩॥

যিনি কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, রাগাদি হইতে মুক্ত হইয়াছেন, এবং যাঁহার চিত্ত জ্ঞানে অবস্থান করিতেছে, তিনি যথার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কর্ম্মসকল বিলুপ্ত হইয়া যায়। ২৩।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥২৪॥

অর্পণ (স্রুবাদি যজ্ঞপাত্র) ব্রহ্ম, হবনীয় ঘৃতাদি ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম. ও যিনি হোম করেন, তিনিও ব্রহ্ম, এই প্রকার কর্ম্মস্বরূপ ব্রহ্মে যাঁহার সমাধি হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ২৪।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

কতকগুলি যোগী সম্যক্‌রূপে দেবযজ্ঞই অনুষ্ঠান করেন; কোন কোন যোগী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞরূপ উপায় দ্বারা যজ্ঞাদি কর্ম্মসকল আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। ৫।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥২৬॥

কেহ কেহ সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে আর কেহ কেহ বা ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়-সকল আহুতি দিয়া থাকেন ।২৬।

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭॥

কেহ কেহ ধ্যেয় বিষয় দ্বারা উদ্দীপিত আত্ম-ধ্যানরূপ যোগাগ্নিতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম ও প্রাণবায়ুর কর্ম্মসকল আহুতি প্রদান করেন। ২৭।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিত-
ব্রতাঃ ॥২৮॥

দৃঢ়ব্রত যতিগণ দ্রব্যদান, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, সমাধি, বেদপাঠ ও বেদজ্ঞান এই কয়েকটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ২৮।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু
জুহ্বতি ॥ ২৯ ॥

কেহ কেহ প্রাণবৃত্তিতে আপনবৃত্তিকে আহুতি প্রদান করিয়া পূরক, আপনবৃত্তিতে প্রাণবৃত্তিকে আহুতি প্রদান করিয়া রেচক এবং প্রাণ অপানের গতি রোধ করিয়া কুম্ভকরূপ প্রাণায়াম করেন; আর কেহ কেহ নিয়তাহার হইয়া প্রাণেন্দ্রিয় সমুদয়কে হোম করিয়া থাকেন। ২৯।

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥৩০॥

এই সকল যজ্ঞবেত্তা যজ্ঞ দ্বারা নিষ্পাপ হন, এবং যজ্ঞশেষরূপ অমৃত ভোজন করত সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করেন। ৩০।

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরু-
সত্তম ॥ ৩১ ॥

হে কুরুসত্তম! যজ্ঞহীন ব্যক্তির পরলোকের কথা দূরে থাকুক, ইহলোকও নাই। ৩১।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমো-
ক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥

এইরূপ ভূরি ভূরি যজ্ঞ দেবমুখে বিস্তৃত আছে, তৎসমুদায়ই কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন. তুমি এইরূপ অবগত হইয়া (জ্ঞাননিষ্ঠ) হইলে মুক্তি লাভ করিবে। ৩২।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৩॥

হে পরন্তপ! ফলের সহিত সমুদয় কর্ম্ম জ্ঞানের অন্তর্ভূত আছে; অতএব হে পার্থ! দ্রব্যময় দৈবযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ ।৩৩।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥৩৪॥

প্রণিপাত, প্রশ্ন ও সেবা দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা

কর, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীরা তোমাকে তাহার উপদেশ প্রদান করিবেন। ৩৪।

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৩৫॥

জ্ঞানলাভ করিলে তুমি আর এ প্রকার বন্ধুবধাদিজনিত মোহে অভিভূত হইবে না; তুমি আপনাতে সমুদয় ভূতকে অভিন্ন অবলোকন করিয়া পরিশেষে পরমাত্মাতে আত্মাকে অভিন্ন দেখিবে। ৩৫।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৩৬॥

যদ্যপি তুমি সকল পাপী অপেক্ষা অধিক পাপী হও, তথাপি সেই জ্ঞানরূপ ভেলা দ্বারা সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবে। ৩৬।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥৩৭॥

যেমন প্রজ্বলিত হুতাশন কাষ্ঠ-সমুদয় ভস্মাবশেষ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমুদয় কর্ম্ম ভস্মীভূত করিয়া থাকে। ৩৭।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি
বিন্দতি॥ ৩৮॥

ইহলোকে জ্ঞানের ন্যায় শুদ্ধিকর আর কিছুই নাই, মুমুক্ষু ব্যক্তি কর্ম্মযোগে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আপনা হইতেই আত্মজ্ঞান লাভ করে। ৩৮।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধি-
গচ্ছতি॥ ৩৯॥

যে ব্যক্তি গুরূপদেশে শ্রদ্ধাবান্, গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয়, তিনিই জ্ঞানলাভ করিয়া অচিরাৎ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। ৩৯।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং
সংশয়াত্মনঃ॥ ৪০॥

কিন্তু জ্ঞান ও শ্রদ্ধাবিহীন সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সংশয়াত্মার ইহলোক ও পরলোক কিছুই নাই এবং সুখও নাই। ৪০।

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥ ৪১॥

হে ধনঞ্জয়! যিনি যোগ দ্বারা কর্ম্ম-সকল ঈশ্বরে সমর্পণ ও জ্ঞান দ্বারা সংশয় ছেদ করিয়াছেন, কর্ম্মসকল সেই অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে বদ্ধ করিতে পারে না। ৪১।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥৪২॥

অতএব আত্মজ্ঞানরূপ অসি দ্বারা হৃদয়নিহিত অজ্ঞানসম্ভূত সংশয় ছেদন করিয়া, কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান কর। হে ভারত! উঠ।৪২

ইতি জ্ঞানবিভাগযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।
সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥১॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি সন্ন্যাস (ত্যাগ) ও কর্ম্মযোগ উভয়ের কথাই কহিতেছ; এক্ষণে উভয়ের মধ্যে যাহা শ্রেয়স্কর, তাহা অবধারিত করিয়া বল। ১।

শ্রীভগবানুবাচ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো
বিশিষ্যতে ॥২॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, — কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মুক্তির কারণ; কিন্তু তন্মধ্যে কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। ২।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ
প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

যাহার দ্বেষ নাই ও আকাঙ্ক্ষা নাই, তিনিই (কর্ম্মানুষ্ঠানকালেও) নিত্য সন্ন্যাসী; কারণ, তাদৃশ নির্দ্বন্দ্ব পুরুষেরাই অনায়াসে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। ৩।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥৪॥

মূর্খেরাই সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়েরই ভিন্ন ভিন্ন ফল কহে, কিন্তু পণ্ডিতেরা এরূপ কহেন না; বাস্তবিকও যিনি সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই উভয়ের মধ্যে একটির সম্যক্ অনুষ্ঠান করেন, তিনি উভয়েরই ফল প্রা[illegible]ন।৪।

যৎ সাঙ্খ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি
গম্যতে।
একং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥৫॥

জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীরা মোক্ষ নামক যে স্থান লাভ করেন, কর্ম্মযোগীরাও সেই স্থান প্রাপ্ত হন; যিনি সন্ন্যাস ও যোগ উভয়ই একরূপ দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী। ৫।

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

হে মহাবাহো! কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস দুঃখপ্রাপ্তির কারণ, কর্ম্মযোগযুক্ত ব্যক্তি সন্ন্যাসী হইয়া অচিরাৎ ব্রহ্মলাভ করেন। ৬।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥৭॥

যিনি যোগযুক্ত হইয়া বিশুদ্ধচিত্ত হন, যাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত, যাঁহার আত্মা সকল ভূতের আত্মাস্বরূপ, তিনি লোকযাত্রা-নির্ব্বাহার্থ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে লিপ্ত হন না। ৭।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্
শ্বসন্ ॥৮॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥

পরমার্থদর্শী কর্ম্মযোগী, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, অশন (ভোজন), গমন, আলাপ, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও মনে করেন, আমি কিছুই করিতেছি না; ইন্দ্রিয়গণই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে। ৮-৯।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০॥

যিনি আসক্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ব্রহ্মে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করেন, পদ্মপত্রের জলের ন্যায় তাঁহাতে পাপ লিপ্ত হয় না।১০।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥১১॥

কর্ম্মযোগিগণ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া শরীর, মন, বুদ্ধি ও মমত্ববুদ্ধি-বিবর্জ্জিত ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। ১১।

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি
নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥১২॥

পরমেশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া কৈবল্য (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন; কিন্তু ঈশ্বরনিষ্ঠাবিমুখ ব্যক্তি কামনাবশতঃ ফল-প্রত্যাশী হইয়া বদ্ধ হয়। ১২।

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্॥১৩॥

জিতেন্দ্রিয় দেহী মনে মনে সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বারবিশিষ্ট দেহপুরে সুখে অবস্থান করেন, তিনি স্বয়ং কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না ও অন্যকেও প্রবৃত্ত করেন না। ১৩।

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ১৪॥

বিশ্বকর্ত্তা ঈশ্বর জীবলোকের কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্ম সকল সৃষ্টি করেন না এবং কাহাকেও কর্ম্মফলভাগী করেন না; স্বভাবই তৎসমুদয়ের প্রবর্ত্তক। ১৪।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥১৫॥

ঈশ্বর কাহার পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না; জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত হয় বলিয়া জীবসকল মোহাবিষ্ট হইয়া থাকে। ১৫।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি
তৎপরম্॥ ১৬॥

যাঁহারা জ্ঞান দ্বারা আত্মার অজ্ঞানকে বিনাশিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান আদিত্যের ন্যায় প্রকাশিত হয়। ১৬।

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥ ১৭॥

ঈশ্বরেই যাঁহাদিগের সংশয়রহিত বুদ্ধি, ঈশ্বরেই যাঁহাদিগের আত্মা, ঈশ্বরেই যাঁহাদিগের নিষ্ঠা এবং ঈশ্বরই যাঁহাদিগের পরম আশ্রয়, তাঁহারা জ্ঞান দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া মোক্ষলাভ করেন। ১৭।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥১৮॥

পণ্ডিতগণ, বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, কুক্কুর ও চণ্ডালকে তুল্যরূপ দেখেন।১৮।

ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে
স্থিতাঃ॥ ১৯॥

যাঁহাদিগের মন সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থান করে, তাঁহারা জীবনাবস্থাতেই সংসার জয় করেন; নির্দ্দোষ ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই সমভাবে আছেন, সুতরাং সমদর্শী ব্যক্তিরা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৯।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য
চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০॥

যিনি ব্রহ্মবিৎ হইয়া ব্রহ্মে অবস্থান করেন, তিনি প্রিয়বস্তু প্রাপ্ত হইয়া হর্ষযুক্ত বা অপ্রিয়বস্তু প্রাপ্ত হইয়া উদ্বিগ্ন হন না; কেন না, তিনি মোহ হইতে মুক্ত হইয়া স্থিরবুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ২০।

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ ২১॥

যাঁহার চিত্ত বাহ্যবিষয়ে আসক্ত হয় না, তিনি অন্তঃকরণে শান্তিসুখ অনুভব করেন, পরিশেষে ব্রহ্মে সমাধি করিয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন। ২১।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥২২॥

যে সকল সুখ বিষয় হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা দুঃখের কারণ ও বিনশ্বর; পণ্ডিতগণ তাহাতে আসক্ত হন না। ২২।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীর-
বিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী
নরঃ॥ ২৩॥

যিনি ইহলোকে শরীরপরিত্যাগের পূর্ব্বে কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যোগী, তিনিই সুখী। ২৩।

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥২৪॥

আত্মাতেই যাঁহার সুখ, আত্মাতেই যাঁহার আরাম ও আত্মাতেই যাঁহার সুখদৃষ্টি, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন। ২৪।

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥২৫॥

যাঁহারা পাপকে বিনাশ করিয়াছেন, সংশয়কে ছেদন করিয়াছেন, চিত্তকে বশীভূত করিয়াছেন এবং সকলের হিতানুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছেন, সেই তত্ত্বদর্শিগণই মোক্ষলাভ করেন। ২৫।

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥২৬॥

যে সকল সন্ন্যাসী চিত্তকে আয়ত্ত করিয়াছেন, কাম ও ক্রোধ হইতে মুক্ত এবং আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা ইহকাল পরকাল উভয়ত্রই মোক্ষলাভ করেন। ২৬।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥২৭॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥২৮॥

যে মোক্ষপরায়ণ মুনি মন হইতে (রূপরসাদি) বাহ্য বিষয়-সকল বহিষ্কৃত, নয়নদ্বয় ভ্রূযুগলের মধ্যে সংস্থাপিত, নাসার অভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপান-বৃত্তিকে সমভাবাপন্ন করিয়া ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি বশীভূত এবং ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ দূর-পরাহত করিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। ২৭।২৮।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ ২৯॥

মানবগণ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা এবং সকল লোকের মহেশ্বর ও সুহৃৎ জানিয়া শান্তি লাভ করেন। ২৯।

ইতি কর্ম্মসন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ।
অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! যিনি ফলে বিতৃষ্ণ হইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী; কিন্তু যিনি অগ্নিসাধ্য ইষ্টি (যজ্ঞকর্ম্মাদি) ও পূর্ত্ত (পুষ্করিণী-খননাদি প্রভৃতি) কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসীও নন, যোগীও নন। ১।

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২॥

হে পাণ্ডব! পণ্ডিতেরা যাহা সন্ন্যাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই যোগ; অতএব কর্ম্মফল পরিত্যাগ না করিলে যোগী হইতে পারে না। ২।

আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৩॥

যে মুনি জ্ঞানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কর্ম্মই তাঁহার সহায়; আর যিনি

তাহাতে আরোহণ করিয়াছেন, কর্ম্মত্যাগই তাঁহার সহায়। ৩।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুসজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

যিনি সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য ও ভোগসাধন কর্ম্মে আসক্ত না হন, তিনি তখন যোগারূঢ় বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। ৪।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৫॥

আত্মা (বিবেকযুক্ত বুদ্ধি) দ্বারা আত্মাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে, কারণ, আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার রিপু। ৫।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

যে আত্মা আত্মাকে জয় করিয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু; আর যে আত্মা আত্মাকে জয় করিতে অসমর্থ হইয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার শত্রুর ন্যায় আত্মার অপকারে প্রবৃত্ত হয়। ৬।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ ও মান অপমান উপস্থিত হইলে কেবল জিতাত্মা প্রশান্ত ব্যক্তির আত্মাই সাক্ষাৎ আত্মভাব অবলম্বন করে। ৭।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥৮॥

যাঁহার আত্মা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, যিনি নির্ব্বিকার ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চন সমজ্ঞান করেন, সেই যোগী যোগারূঢ় বলিয়া উল্লিখিত হন। ৮।

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

যিনি সুহৃদ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু ও অসাধু সকলকেই সমজ্ঞান করেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৯।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

যোগী ব্যক্তি একাকী নির্জ্জনে নিরন্তর অবস্থান এবং আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তঃকরণ ও দেহ বশীভূত করিয়া চিত্তকে সমাধান করিবেন। ১০।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিন-
কুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২॥

জিতচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত একাগ্রমনে পবিত্রস্থানে ক্রমান্বয়ে কুশ, অজিন ও বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত অনতি-উচ্চ অনতি-নীচ স্থিরতর আসন সংস্থাপন করত তাহাতে উপবেশন করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে। ১১-১২।

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিতম্।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চান-
বলোকয়ন্ ॥১৩॥

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥১৪॥

শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সরলভাবে ধারণ এবং দৃষ্টিকে অন্যান্য দিক্ হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বীয় নাসিকার অগ্রভাবে সন্নিবেশিত করিয়া যোগাভ্যাস করিবে; যোগী ব্যক্তি প্রশান্তাত্মা, নির্ভয়, ব্রহ্মচারী, সংযতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া আমাতেই চিত্ত অর্পণপূর্ব্বক অবস্থান করিবে। ১৩-১৪।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥১৫॥

সংযতচিত্ত যোগী এইরূপে অন্তঃকরণকে

সমাহিত করিলে আমার সারূপ্যরূপ মোক্ষপ্রধান শান্তি লাভ করে। ১৫।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥১৬॥

অতি ভোজনশীল বা একান্ত অনাহারী এবং অতি নিদ্রালু বা একান্ত নিদ্রাহীন ব্যক্তির সমাধি হয় না। ১৬।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥১৭॥

যাঁহার আহার, বিহার, কর্ম্মচেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তিনিই দুঃখবিনাশক সমাধি লাভ করিতে পারেন। ১৭।

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে
তদা ॥ ১৮ ॥

যখন বশীভূত চিত্ত সর্ব্বপ্রকার কাম্য বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া আত্মাতেই অবস্থান করে, তখনই তাহা সমাহিত বলিয়া উল্লিখিত হয়। ১৮।

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥১৯॥

জিতচিত্ত যোগী ব্যক্তির চিত্ত আত্মযোগানুষ্ঠানকালে নির্ব্বাত, নিষ্কম্প দীপের ন্যায় নিশ্চল হইয়া থাকে। ১৯।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥২০॥

যে অবস্থায় চিত্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া উপরত হয়, যে অবস্থায় বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা আত্মাকেই অবলোকন করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয়। ২০।

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥২১॥

যে অবস্থায় বুদ্ধিমাত্র-লভ্য, অতীন্দ্রিয়, আত্যন্তিক সুখ উপলব্ধি হয়, যে অবস্থায় অবস্থান করিলে আত্মতত্ত্ব হইতে পরিচ্যুত হইতে হয় না। ২১।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি
বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥

যে অবস্থা লাভ করিলে অন্য লাভকে অধিক বোধ হয় না এবং যে অবস্থা উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচালিত করিতে পারে না। ২২।

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিন্ন-
চেতসা ॥ ২৩ ॥

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ।

সেই অবস্থার নামই যোগ। তাহাতে দুঃখের সম্পর্কও নাই, তাহাই বিশেষরূপে অবগত হইবে এবং অধ্যবসায় সহকারে ও নির্ব্বেদশূন্য চিত্তে অভ্যাস করিবে। সংকল্প-সমুৎপন্ন কামনা-সকল নিঃশেষিত ও অন্তঃকরণ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সমুদয় বিষয় হইতে নিগৃহীত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে। ২৩। ২৪।

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি
চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়া স্থিরবুদ্ধির দ্বারা অল্পে অল্পে বিরতি অভ্যাস করিবে, অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না। ২৫।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥২৬॥

চঞ্চলস্বভাব মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করিবে, সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মার বশীভূত করিবে। ২৬।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥

প্রশান্তচিত্ত, রজোবিহীন, নিষ্পাপ, জীব-

যুক্ত যোগী নিরতিশয় সুখলাভ করিয়া থাকেন। ২৭।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ২৮॥

নিষ্পাপ যোগী এই প্রকারে মনকে সর্ব্বদা বশীভূত করিয়া অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎজনিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ প্রাপ্ত হন।২৮।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥২৯॥

সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শী সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি সকল ভূতে আত্মাকে ও আত্মাতে সকল ভূতকে অবলোকন করেন।২৯।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৩০॥

যে ব্যক্তি আমাতে সকল বস্তু ও সকল বস্তুতে আমাকে দর্শন করে, আমি তাহার অদৃশ্য হই না, সে ব্যক্তিও আমার অদৃশ্য হয় না।৩০।

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥৩১

যে ব্যক্তি আমার সহিত একীভূত হইয়া আমাকে সর্ব্বভূতস্থ মনে করিয়া ভজনা করে, সে যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করুক,আমাতেই অবস্থান করে। ৩১।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥৩২

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আপনার সুখ-দুঃখের ন্যায় সকলের সুখ-দুঃখ দর্শন করে, সেই শ্রেষ্ঠ যোগী।৩২।

অর্জ্জুন উবাচ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥৩৩॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে মধুসূদন! তুমি আত্মার সমতারূপ যে যোগের কথা উল্লেখ করিলে, মনের চঞ্চলতা নিবন্ধন আমি ইহার দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব দেখিতেছি না। ৩৩।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥৩৪

মন স্বভাবতঃ চঞ্চল,ইন্দ্রিয়গণের ক্ষোভকর, অজেয় ও দুর্ভেদ্য, যেমন বায়ুকে নিরুদ্ধ করা অতি কঠিন, মনকে নিগৃহীত করাও সেইরূপ দুষ্কর বোধ হইতেছে। ৩৪।

শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৩৫॥

কৃষ্ণ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! চঞ্চলস্বভাব মন যে দুর্নিগ্রহ, তাহার সংশয় নাই; কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহাকে নিগৃহীত করিতে হয়। ৩৫।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥৩৬

যাহার চিত্ত অবশীভূত, যোগ লাভ করা তাহার পক্ষে দুর্ঘট, যে যত্নশীল ব্যক্তি অন্তঃকরণকে বশীভূত করিয়াছে,সে ব্যক্তি যথোক্ত উপায় দ্বারা যোগলাভ করিতে সমর্থ। ৩৬।

অর্জ্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥ ৩৭॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি (প্রথমে) শ্রদ্ধাবান্,কিন্তু পরে যত্নহীন হইয়া যোগভ্রষ্টচেতা হয়, সে যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়?। ৩৭।

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥৩৮

হে মহাবাহো! সে কি যোগ ও কর্ম্ম (মোক্ষ ও স্বর্গ) উভয় হইতে ভ্রষ্ট, নিরাশ্রয়

ও ব্রহ্মলাভের উপায়ে অনভিজ্ঞ হইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয় না? ।৩৮।

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥৩৯॥

হে কৃষ্ণ! তুমি আমার এই সংশয় ছেদন কর; তোমা ভিন্ন আর কেহ এই সংশয় ছেদন করিতে সমর্থ হইবেন না ।৩৯।

শ্রীভগবানুবাচ ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে ।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥৪০॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি, কি ইহলোকে কি পরলোকে কুত্রাপি বিনষ্ট হয় না; (কারণ) কোন শুভকারীই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না ।৪০।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগীভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৪১॥

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকারীদিগের প্রাপ্য লোকে বহু বৎসর অবস্থান করিয়া সদাচার ও ধনসম্পন্নদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করে ।৪১।

অথবা যোগীনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥৪২॥

অথবা বুদ্ধিমান্ যোগীদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করে; যোগীদিগের কুলে জন্ম অতি দুর্লভ ।৪২।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্ ।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥৪৩॥

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সেই জন্মে পৌর্ব্বদেহিক বুদ্ধি লাভ করে এবং মুক্তিলাভবিষয়ে পূর্ব্বজন্ম অপেক্ষা অধিকতর যত্ন করিয়া থাকে ।৪৩।

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥৪৪॥

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি কোন অন্তরায় বশতঃ ইচ্ছা না করিলেও পূর্ব্বজন্মকৃত অভ্যাসই তাহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করে, তখন সে যোগজিজ্ঞাসু হইয়াই বেদোক্ত কর্ম্মফল অপেক্ষা সমধিক ফল লাভ করে ।৪৪।

প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥৪৫॥

নিষ্পাপ যোগী অধিকতর যত্ন সহকারে অনেক জন্মে সিদ্ধ হইয়া পরিশেষে পরমগতি প্রাপ্ত হয় । ৪৫ ।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬ ॥

যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জ্জুন ! তুমি যোগী হও । ৪৬ ।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭॥

যে ব্যক্তি আমাতে অন্তঃকরণ সমর্পণ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, সে আমার মতে সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম । ৪ ।

ইতি অভ্যাসযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! তুমি আমার প্রতি অনুরক্ত ও আমার আশ্রিত হইয়া যোগাভ্যাসপূর্ব্বক যে প্রকারে আমাকে সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারিবে, তাহা শ্রবণ কর। ১।

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমব-
শিষ্যতে ॥ ২ ॥

আমি যে অনুভব-সহকৃত জ্ঞান সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা বিদিত হইলে শ্রেয়োবিষয়ে আর কিছুই জ্ঞাত হইতে অবশিষ্ট থাকে না। ২।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি
তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥

সহস্র সহস্র মনুষ্যমধ্যে কোন ব্যক্তি আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত যত্নবান্ হয়, আর যত্নশীল সিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রকৃতরূপে আমাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়। ৩।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

আমার মায়ারূপ প্রকৃতি ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আটপ্রকারে বিভক্ত। ৪।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মেঽপরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥৫॥

হে মহাবাহো! এই প্রকৃতি অপরা (নিকৃষ্ট), এতদ্ভিন্ন আর একটি জীবস্বরূপ পরা (উৎকৃষ্ট অর্থাৎ চেতনময়ী) প্রকৃতি আছে; উহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ৫।

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত-সমুদয় এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রস্বরূপ প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে, অতএব আমিই এই সমস্ত বিশ্বের পরম কারণ ও আমিই ইহার প্রলয়কর্ত্তা। ৬।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥৭॥

হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; যেমন সূত্রে মণিসকল গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে।৭।

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮॥

হে কৌন্তেয়! আমি সলিলে রসরূপে, চন্দ্রসূর্য্যে প্রভারূপে, সমুদয় বেদে ওঁকাররূপে, আকাশে শব্দরূপে, মনুষ্য সকলে পৌরুষরূপে অবস্থান করিতেছি। ৮।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥

পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধরূপে, অনলে তেজোরূপে, সর্ব্বভূতে জীবনরূপে ও তপস্বিগণে তপস্যারূপে অবস্থান করিতেছি। ৯।

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০॥

হে পার্থ! তুমি আমাকে সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ বলিয়া বিদিত হও। আমি বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি, তেজস্বীদিগের তেজ। ১০।

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥১১॥

হে ভরতর্ষভ! আমি বলবানের কাম ও রাগরহিত বা দুরাকাঙ্ক্ষাশূন্য বল ও সর্ব্বভূতের ধর্ম্মানুগত কাম।১১।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ১২।

যে সমস্ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব আছে, তাহা আমা হইতেই উৎপন্ন এবং আমারই অধীন; কিন্তু আমি কদাচ ঐ সকলের বশীভূত নহি। ১২।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ১৩॥

জগতীস্থ সমুদায় লোক এই ত্রিগুণাত্মক ভাবে বিমোহিত হইয়া আমাকে বিদিত হইতে সমর্থ হয় না। ১৩।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ১৪॥

অলৌকিক গুণময়ী নিতান্ত দুস্তরা আমার এক মায়া আছে; যাহারা আমাকে আশ্রয় করে, তাহারাই ঐ মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। ১৪।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥১৫॥

ঐ মায়া দ্বারা যাহাদিগের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে এবং যাহারা আসুর ভাব অবলম্বন করিয়াছে, সেই সমস্ত দুষ্কর্ম্মকারী, নরাধম, মূর্খ কদাচ আমাকে প্রাপ্ত হয় না। ১৫।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥১৬॥

আর্ত্ত, আত্মজ্ঞানাভিলাষী, অর্থাভিলাষী ও জ্ঞানী এই চারি প্রকার পুণ্যবান্ লোক আমার আরাধনা করিয়া থাকে। ১৭।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তো বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ১৭॥

তন্মধ্যে অতিমাত্র ভক্ত ও যোগযুক্ত জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ; আমি জ্ঞানবানের ও জ্ঞানবান্ আমার একান্ত প্রিয়। ১৭।

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥ ১৮॥

পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার উপাসকই মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু আমার মতে জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ, তিনিই মদেকচিত্ত হইয়া আমাকে একমাত্র উত্তম গতি অবধারণ করত আশ্রয় করিয়া থাকেন। ১৮।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥১৯॥

বহু জন্ম অতিক্রান্ত হইলে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি 'বাসুদেবই এই চরাচর বিশ্ব,' এইরূপ বিবেচনা করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন; কিন্তু তাদৃশ মহাত্মা নিতান্ত দুর্ল্লভ। ১৯।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ ২০॥

অন্য উপাসকেরা স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত ও কামমদ দ্বারা হতজ্ঞান হইয়া প্রসিদ্ধ নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক ভূত প্রেত প্রভৃতি ক্ষুদ্র দেবতাদিগের আরাধনা করিয়া থাকে। ২০।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ২১॥

যে যে ভক্ত শ্রদ্ধা সহকারে যে যে কোন

দেবতার অর্চ্চনা করিতে অভিলাষ করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেই অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করিয়া থাকি। ২১।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥২১॥

তাঁহারা সেই শ্রদ্ধা সহকারে সেই সকল দেবতার আরাধনা করেন; তৎপরে আমা হইতেই হিতকর অভিলষিত-সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২২।

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥ ২৩ ॥

কিন্তু সেই সকল অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের দেবলব্ধ ফল-সমুদয় ক্ষয় হইয়া যায়, দেবযাজী ব্যক্তিরা দেবতা প্রাপ্ত হয়, আর আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৩।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ ২৪ ॥

আমি অব্যক্ত, কিন্তু নির্ব্বোধ মনুষ্যেরা আমার নিত্য সর্ব্বদা অব্যয় ও অতি উৎকৃষ্ট স্বরূপ অবগত না হইয়া আমাকে মনুষ্য, মীন ও কূর্ম্মাদি ভাবাপন্ন মনে করে। ২৪।

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥২৫॥

আমি যোগমায়ায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছি, সকলের সমক্ষে কদাচ প্রকাশমান হই না, এই নিমিত্ত মূঢ়েরা আমাকে জন্মহীন ও অব্যয় বলিয়া অবগত নয়। ২৫।

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্তু বেদ ন কশ্চন॥২৬॥

হে অর্জ্জুন! আমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন বিষয়ই বিদিত আছি, কিন্তু আমাকে কেহই জ্ঞাত নয়। ২৬।

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত!
সর্ব্বভূতানি সংমোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥২৭॥

হে শত্রুতাপন ভারত! জন্মগ্রহণ করিলে ভূত সকল ইচ্ছা-দ্বেষ-সমুত্থিত-শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-নিমিত্ত মোহে বিমোহিত হইয়া থাকে। ২৭।

যেষামন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥২৮

কিন্তু যে সমস্ত পুণ্যাত্মাদিগের পাপ বিনষ্ট ও শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বনিমিত্ত মোহ অপগত হইয়াছে, সেই সমস্ত কঠোরব্রতপরায়ণ মহাত্মারাই আমাকে আরাধনা করেন। ২৮।

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্॥ ২৯॥

যাঁহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া জরা-মৃত্যু হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইবার যত্ন করেন, তাঁহারাই সমগ্র অধ্যাত্মবিষয়, নিখিল কর্ম্ম, সনাতনব্রহ্ম অবগত হইতে সমর্থ হন। ২৯।

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥ ৩০ ॥

যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে সম্যক্ বিদিত হইয়াছেন, সেই সুমস্ত সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি মৃত্যুকালেও আমাকে বিস্মৃত হন না। ৩০।

ইতি জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

কিন্তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে॥১
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি
নিয়তাত্মভিঃ॥২॥

অর্জ্জুন কহিলেন—হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্ম্ম কাহাকে কহে? অধিভূত ও অধিদৈবই বা কি? মনুষ্যদেহে অধিযজ্ঞ কি এবং সেই অধিযজ্ঞ কিরূপে অবস্থান করিতেছে? সংযত-চিত্ত ব্যক্তিরা মৃত্যুকালে কি প্রকারে ব্রহ্মকে বিদিত হন? ১।২।

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ॥৩॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! যিনি অব্যয় ও জগতের মূল কারণ, তিনিই ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মের অংশস্বরূপ জীব দেহ অধিকার করিয়া অবস্থান করিলে তাহাকে অধ্যাত্ম বলা যায়; যাহাতে ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেই কর্ম্ম। ৩।

অধিভূতঃ ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর॥৪॥

নশ্বর দেহাদি পদার্থ ভূত-সকলকে অধিকার করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত উহাকে অধিভূত বলা যায়। সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী বৈরাজ পুরুষ দেবতাদিগের অধিপতি বলিয়া তাহাকে অধিদৈবত বলা যায়; আর আমিই এই দেহে যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে অবস্থান করিতেছি, এই নিমিত্ত অধিযজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকি। ৪।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥৫॥

যিনি অন্তকালে আমাকে স্মরণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রয়াণ করেন, তিনি নিঃসন্দেহ আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ৫।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব-
ভাবিতঃ॥৬॥

যে ব্যক্তি একান্তমনে অন্তকালে যে যে বস্তু স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, সে সেই বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্॥৭॥

অতএব সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর; আমাতে মন এবং বুদ্ধি অর্পণ করিলে তুমি নিঃসন্দেহে আমাকেই পইবে।৭

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানু-
চিন্তয়ন্॥৮॥

হে পার্থ! অভ্যাসরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া অনন্যমনে সেই দিব্য পরম পুরুষকে চিন্তা করিলে তাঁহাতেই লীন হয়। ৮।

কবিং পুরাণমনুশাসিতার-
মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্‌যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥৯॥
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন,
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্,
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥১০॥

কবি, পুরাতন, বিশ্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, সকলের বিধাতা, অচিন্ত্যরূপ, আদিত্যের

ন্যায় স্বপ্রকাশ, অজ্ঞানান্ধকারের উপরি বর্ত্তমান, পরমদিব্য পুরুষকে যিনি স্মরণ করেন, তিনিই মৃত্যুকালে অবিচলিতচিত্তে ভক্তি ও যোগবলে ভ্রূযুগলমধ্যে প্রাণবায়ু সমাবেশিত করিয়া সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। ৯-১০।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি,
বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি,
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥

বেদবেত্তারা যাঁহাকে অক্ষয় বলিয়া থাকেন এবং বিষয়াসক্তিশূন্য যতিগণ যাঁহাতে প্রবেশ করেন ও যাঁহাকে বিদিত হইবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, আমি সেই প্রাপ্য-বস্তুলাভের উপায় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১১।

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগ-
ধারণাম্ ॥ ১২ ॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্দেহং স যাতি পরমাং
গতিম্ ॥ ১৩ ॥

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়দ্বার-সমুদয় সংযত, হৃদয়-কমলে নিরুদ্ধ ও ভ্রূমধ্যে প্রাণবায়ু সন্নিবেশিত করিয়া যোগজনিত ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মের অভিধান (বাচক) "ও" এই একাক্ষর উচ্চারণ ও আমাকে স্মরণ করত কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রয়াণ করেন, তিনি পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। ১২-১৩।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য
যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

যিনি অনন্যমনে সতত আমাকে স্মরণ করেন, সেই সমাহিতচিত্ত যোগী আমাকে অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হন। ১৪।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং
গতাঃ ॥ ১৫ ॥

মহাত্মারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়াও মোক্ষ-রূপ পরমসিদ্ধি লাভ করিয়া দুঃখের আলয়, অনিত্য পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না। ১৫।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥১৬

হে অর্জ্জুন! প্রাণিগণ ব্রহ্মলোক অবধি সমুদয় লোক হইতেই পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হয়; কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর জন্ম-গ্রহণ করিতে হয় না। ১৬।

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো
জনাঃ ॥ ১৭ ॥

দৈব সহস্রযুগে ব্রহ্মার একদিন এবং ঐরূপ সহস্র যুগে এক রাত্রি হয়। যাঁহারা ইহা বিদিত হইয়াছেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই অহোরাত্রবেত্তা। ১৭।

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥১৮॥

ব্রহ্মার দিবস আগত হইলে অব্যক্ত কারণ হইতে ব্যক্ত চরাচর ভূত-সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; আর রাত্রি উপস্থিত হইলে সেই কারণরূপ অব্যক্ত পদার্থে সমস্ত বস্তু বিলীন হইয়া যায়। ১৮।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥১৯॥

সেই ভূত-সমূহ ব্রহ্মার দিবসাগমে বারং-বার জন্মগ্রহণ করিয়া রাত্রিসমাগমে বিলীন হয়, এবং পুনরায় দিবাসমাগমে কর্ম্মাদি-পরতন্ত্র ও সমুৎপন্ন হইয়া পুনরায় রাত্রিসমাগমে বিলীন হইয়া থাকে। ১৯।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥২০॥

সেই চরাচরের কারণরূপ, অব্যক্ত অপেক্ষাও পরতর, অতিশয় অব্যক্ত, সনাতন আর একটি ভাব আছে; উহা সমস্ত বিনষ্ট হইলেও কদাচ বিনষ্ট হয় না। ২০।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥২১॥

যে অব্যক্ত ভাব অক্ষয় বলিয়া বেদে উক্ত আছে, তাহাকে পরমা গতি কহে; যাহাকে পাইয়া পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হয়, তাহাই আমার পরম ধাম। ২১।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥২২

হে পার্থ! সেই পরম পুরুষকে একান্ত ভক্তি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়; ভূত-সকল তাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে এবং তিনিই এই বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।২২

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥২৩

হে ভরতর্ষভ! যে কালে গমন করিলে যোগিগণ অনাবৃত্তি বা আবৃত্তি প্রাপ্ত হন, আমি সেই কালের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি। ২৩।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥২৪

যে স্থানে দিবস শুক্লবর্ণ ও অগ্নির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এবং ছয়মাস উত্তরায়ণ, ব্রহ্মবেত্তারা তথায় গমন করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৪।

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥২৫॥

আর যে স্থানে রাত্রি, ধূম ও কৃষ্ণবর্ণ এবং ছয় মাস দক্ষিণায়ন, কর্ম্মযোগীরা তথায় চন্দ্রপ্রভাশালী স্বর্গলাভ করিয়া নিবৃত্ত হন ও পুনরায় সংসারে আগমন করেন। ২৫।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥২৬॥

জগতের শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ দুইটি শাশ্বত গতি আছে, তন্মধ্যে একতর দ্বারা অনাবৃত্তি ও অন্যতর দ্বারা আবৃত্তি হইয়া থাকে। ২৬।

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন॥২৭

হে পার্থ! যোগী ব্যক্তি এই দুইটি গতি অবগত হইয়া কদাচ বিমোহিত হন না; অতএব তুমি সকল কালে যোগানুষ্ঠানপরায়ণ হও। ২৭।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব,
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎসর্ব্বমিদং বিদিত্বা,
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥ ২৮॥

শাস্ত্রে বেদ, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের যে ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, জ্ঞানীরা এই নির্ণীত তত্ত্ব অবগত হইয়া তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করেন এবং জগতের মূলকারণ বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৮।

ইতি ব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে-
ঽশুভাৎ। ১ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! তুমি অসূয়াশূন্য; অতএব যাহা অবগত হইলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, আমি সেই গোপনীয় উপাসনা-সহকৃত ঈশ্বরজ্ঞান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

এই উৎকৃষ্ট জ্ঞানবিদ্যা শ্রেষ্ঠ, রাজগণেরও গোপনীয়, অতি পবিত্র, প্রত্যক্ষফলপ্রদ,ধর্ম্মানুগত ও অব্যক্ত; ইহা অনায়াসেই অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। ২।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥৩

হে পরন্তপ! যাহারা এই ধর্ম্মে বিশ্বাস না করে, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যু-পরিকীর্ণ সংসার-পথে নিয়ত পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ৩।

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্বস্থিতঃ ॥৪॥

হে অর্জ্জুন! আমি অব্যক্তরূপে সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছি, আমাতে ভূত-সকল অবস্থান করিতেছে, কিন্তু আমি কিছুতেই অবস্থিত নহি। ৪।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ৫ ॥

আর আমাতেও কোন ভূত অবস্থান করিতেছে না,আমার এই ঐশিকী অঘটন-ঘটনা-চাতুরী নিরীক্ষণ কর; আমার আত্মা ভূত-সকল ধারণ ও পালন করিতেছে,কিন্তু কোন ভূতেই অবস্থান করিতেছে না। ৫।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥৬॥

যেমন সমীরণ সর্ব্বত্রগামী ও মহৎ হইলেও প্রতিনিয়ত আকাশে অবস্থান করে, তদ্রূপ সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করিয়া রহিয়াছে। ৬।

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥৭

হে কৌন্তেয়! কল্পক্ষয়কালে ভূতগণ আমার ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায় লীন হয় এবং কল্পপ্রারম্ভে আমি পুনরায় উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। ৭।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ। ৮ ॥

আমি স্বীয় মায়ায় অধিষ্ঠিত হইয়া জন্মান্তরীণ কর্ম্মানুসারে প্রলয়কলাবিলীন কর্ম্মাদিপরবশ ভূত-সমুদয় বারংবার সৃষ্টি করিতেছি। ৮।

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥

হে ধনঞ্জয়! আমি সেই সকল সৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম্মের আয়ত্ত নহি, আমি সকল কর্ম্মেই অনাসক্ত হইয়া উদাসীনের ন্যায় নিরন্তর অবস্থান করিয়া থাকি। ৯।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥১০॥

মায়া আমার অধিষ্ঠান মাত্র লাভ করিয়া এই সচরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছে এবং আমার অধিষ্ঠান নিমিত্তই এই জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে। ১০।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ১১॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং
শ্রিতাঃ॥ ১২॥

আমি সকল ভূতের ঈশ্বর, আমি মানুষ-বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছি বলিয়া মূঢ় ব্যক্তিরা আমার পরম তত্ত্ব অবগত না হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। বিফল-আশাসম্পন্ন, বিফলকর্ম্ম-পরায়ণ, বিফল জ্ঞানযুক্ত, বিচেতন ব্যক্তিরা রাক্ষসী, আসুরী ও মোহিনী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া আছে। ১১-১২।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥১৩॥

কিন্তু হে পার্থ! মহাত্মগণ দৈবীপ্রকৃতি আশ্রয়পূর্ব্বক আমাকে সকল ভূতের কারণ ও অব্যয়রূপ অবগত হইয়া অনন্যমনে আরাধনা করেন। ১৩।

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥১৪॥

সতত ভক্তিযুক্ত ও অবহিত হইয়া আমার নামকীর্ত্তন এবং যত্নবান্, নিয়মী ও দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে নমস্কার করিয়া থাকেন এবং প্রতিনিয়ত সাবধান হইয়া ভক্তি সহকারে আমার উপাসনা করেন। ১৪।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥১৫॥

আর কেহ তত্ত্বজ্ঞানরূপ যজ্ঞ, কেহ অভেদ ভাবনা, কেহ পৃথক্ ভাবনা দ্বারা, কেহ সর্ব্বাত্মক বলিয়া ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপে আমাকে আরাধনা করিয়া থাকেন। ১৫।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোহহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ ১৬॥

আমি ক্রতু, যজ্ঞ, স্বধা, ঔষধ, মন্ত্র, আজ্য, অগ্নি ও হোম। ১৬।

পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥১৭॥

আমি এই জগতের পিতা, পিতামহ, মাতা ও বিধাতা। আমি পবিত্র, জ্ঞেয় বস্তু, ওঁকার, ঋক্, সাম, যজু। ১৭।

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥১৮॥

আমি কর্ম্মফল, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, প্রভব, প্রলয়, আধার, লয়ের স্থান ও অব্যয় বীজ। ১৮।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্লাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥ ১৯॥

আমি উত্তাপ প্রদান, বারিবর্ষণ ও আকর্ষণ করিতেছি; আমিই অমৃত, মৃত্যু ও সৎ, অসৎ। এ কারণ লোকে আমাকে নানারূপে উপাসনা করিয়া থাকে। ১৯।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা,
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্দিবি দেবভোগান্॥ ২০॥

হে অর্জ্জুন! ত্রিবেদ-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানপর, সোমপায়ী, বিগতপাপ মহাত্মগণ যজ্ঞ দ্বারা আমার সৎকার করিয়া সুরলোকলাভের অভিলাষ করেন; পরিশেষে অতি পবিত্র সুরলোক প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট দেবভোগ-সকল উপভোগ করিয়া থাকেন। ২০

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং,
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না,
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ২২।

অনন্তর পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন; এইরূপে তাঁহারা বেদত্রয়বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানপর ও ভোগাভিলাষী হইয়া গমনাগমন করিয়া থাকেন। ২২।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং
বহাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

যাহারা অনন্যমনে আমাকে চিন্তা ও আরাধনা করে, আমি সেই সকল মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে যোগক্ষেম প্রদান করিয়া থাকি। ২২।

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-
পূর্ব্বকম্ ॥ ২৩ ॥

হে কৌন্তেয়! যাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে অন্য দেবতার আরাধনা করে, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আমাকেই পূজা করিয়া থাকে। ২৩।

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥২৪॥

আমি সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু; কিন্তু তাহারা আমাকে যথার্থতঃ বিদিত হইতে পারে না, এই নিমিত্ত স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া থাকে। ২৪।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি
মাম্ ॥ ২৫ ॥

দেবব্রতপরায়ণ ব্যক্তিরা দেবগণকে, পিতৃ-ব্রত-নিষ্ঠ ব্যক্তিরা পিতৃগণকে ও ভূতসেবকেরা ভূতসকলকে এবং আমার উপাসকেরা আমাকে প্রাপ্ত হয়। ২৫।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

যিনি ভক্তি সহকারে আমাকে ফল, পত্র, পুষ্প ও তোয় প্রদান করেন, আমি সেই প্রযতাত্মা ব্যক্তির সেই সমুদয় দ্রব্য ভক্ষণ ও পান করিয়া থাকি। ২৬।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥২৭॥

হে অর্জ্জুন! যাহা ভক্ষণ, যাহা হোম, যে তপঃসাধন করিয়া থাক, তৎসমুদয় আমাকে সমর্পণ করিও। ২৭।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥২৮

তাহা হইলে কর্ম্মজনিত শুভাশুভ ফল হইতে বিমুক্ত হইবে এবং কর্ম্মার্পণরূপ যোগ-যুক্ত হইয়া আমাকে লাভ করিবে। ২৮।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন
প্রিয়ঃ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু
চাপ্যহম্ ॥ ২৯॥

আমি সকল ভূতে একরূপ; কেহ আমার শত্রু বা মিত্র নাই, যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমার আরাধনা করে, তাহারা আমাতে অবস্থান করিয়া থাকে এবং আমিও সেই সকল ভক্তগণে অবস্থান করিয়া থাকি। ২৯।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥৩০॥

যদি দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যমনে আমার উপাসনা করে, তবে সেই সাধু; তাহার অধ্যবসায় অতি সুন্দর। ৩০।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ
প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

সে অবিলম্বে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া নিরন্তর শান্তি লাভ করে; হে কৌন্তেয়! তুমি নিশ্চয় জানিও, আমার ভক্ত কখন বিনষ্ট হয় না। ৩১।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপ-
যোনয়ঃ।

স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং
গতিম্ ॥ ৩২ ॥

হে পার্থ! যাহারা নিকৃষ্ট-কুলজাত বা

নিতান্ত পাপাত্মা, যাহারা কৃষ্যাদিনিরত বৈশ্য ও যাহারা অধ্যয়নবিরহিত শূদ্র ও যাহারা স্ত্রীলোক, তাহারাও আমাকে আশ্রয় করিলে অত্যুৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে। ৩২।

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥ ৩৩॥

অতি পবিত্র ব্রাহ্মণ ও ভক্তিপরায়ণ রাজর্ষিগণ (যে পরমগতি লাভ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?) তুমি এই অনিত্য অসুখকর (মর্ত্ত্য) লোক প্রাপ্ত হইয়া আমার আরাধনা কর। ৩৩।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥২৪॥

আমাতে মন সমর্পণ পূর্ব্বক আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হও, সর্ব্বদা আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর। তুমি এইরূপে আমাতে আত্মা সমাহিত করিলে আমাকে লাভ করিবে। ৩৪।

ইতি রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ।
ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে মহাবাহো! তুমি আমার বাক্যশ্রবণে নিতান্ত প্রীত হইতেছ; এক্ষণে আমি তোমার হিতবাসনায় পুনরায় যে সমস্ত উৎকৃষ্ট বাক্য কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ১।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥ ২॥

মহর্ষি ও সুরগণও আমার প্রভব অবগত নন, (যেহেতু) আমি সকল বিষয়েই তাঁহাদিগের আদি। ২।

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥৩॥

যিনি আমাকে অনাদি, জন্মবিহীন ও সর্ব্বলোকের ঈশ্বর বলিয়া জানেন, তিনি জীবলোকে মোহবিরহিত ও পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। ৩।

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ॥৪॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ॥৫॥

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব, অভাব, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপঃ, দান, যশঃ, অযশঃ প্রাণিগণের এই সকল নানাবিধ ভাব আমা হইতেই জন্মে। ৪। ৫।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥৬॥

পূর্ব্বতন সনক-সনন্দাদি চারিজন ও ভৃগু প্রভৃতি সাতজন মহর্ষি এবং স্বায়ংভুবাদি চতুর্দ্দশ মনুগণ আমারই প্রভাবসম্পন্ন ও আমারই মন হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা এই লোক ও প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন।৬।

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র
সংশয়ঃ॥ ৭॥

যিনি আমার এই বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য সম্যক্ বিদিত হইয়াছেন, তিনি সংশয়রহিত জ্ঞান প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই। ৭।

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥৮॥

পণ্ডিতেরা আমাকে সকলের কারণ ও আমা হইতে সমস্ত প্রবর্ত্তিত জানিয়া প্রীত-মনে আমার অর্চ্চনা করেন। ৮।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥৯॥

তাঁহারা আমাতে মন ও প্রাণ সমর্পণ করিয়া একান্ত সন্তোষ ও পরমশান্তি লাভ করিয়া থাকেন। ৯।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি
তে॥ ১০॥

আমি সেই সমস্ত প্রীতচিত্ত উপাসকদিগকে বুদ্ধি প্রদান করি, তাঁহারা তদ্দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১০।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥১১॥

আমি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া দীপ্তিশীল জ্ঞান-প্রদীপ দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার নিবারণ করিয়া থাকি। ১১।

অর্জ্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥১২॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি
মে॥ ১৩॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে বাসুদেব! তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র, শাশ্বত পুরুষ, দিব্য আদিদেব, জন্মবিহীন ও সর্ব্ব-ব্যাপক; ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল ও ব্যাসদেব ইঁহারা সকলেই তোমাকে উক্তরূপ কহিয়া থাকেন এবং তুমিও আপ-নাকে ঐরূপ নির্দ্দেশ করিলে। ১২ ১৩।

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন
দানবাঃ॥ ১৪॥

হে কেশব! এক্ষণে তুমি যেরূপ কহি-তেছ, আমি তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ করি না; হে ভগবন্! দেব ও দানবগণ কেহই তোমাকে সম্যক্ অবগত নহেন। ১৪।

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব! জগৎপতে॥১৫॥

হে পুরুষোত্তম! হে ভূতেশ! হে জগৎ-পতে! হে দেবদেব! হে ভূতভাবন! তুমি আপনিই আপনাকে বিদিত হইতেছ। ১৫।

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্ব্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য
তিষ্ঠসি॥ ১৬॥

তুমি যে সমস্ত বিভূতি দ্বারা এই লোক-সমুদয় ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ, এক্ষণে সেই সকল দিব্য বিভূতি সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন কর।১৬।

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া॥১৭॥

হে যোগিন্! আমি কিরূপে তোমাকে সতত চিন্তা করিয়া অবগত হইতে সমর্থ হইব এবং কোন্ কোন্ পদার্থেই বা তোমাকে চিন্তা করিব? ১৭।

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মে-
ঽমৃতম্॥ ১৮॥

এক্ষণে তুমি পুনরায় সবিস্তরে আপনার

ঐশ্বর্য ও বিভূতি কীর্ত্তন কর; তোমার অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুতেই আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না।

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥১৯

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমার বিভূতির ইয়ত্তা নাই, অতএব এক্ষণে প্রধান প্রধান বিভূতি-সকল কীর্ত্তন করিতেছি. শ্রবণ কর। ১৯।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥২০॥

আমি আত্মা ও সকল প্রাণীর অন্তঃকরণে অবস্থান করিতেছি, আমি সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত। ২০।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥

আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতির্ম্মণ্ডলীর মধ্যে সমুজ্জ্বল সূর্য্য, মরুদ্‌গণের মধ্যে মরীচি ও নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র। ২১।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥২২

আমি চারি বেদের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়-সমুদয়ের মধ্যে মন ও ভূতগণের মধ্যে চৈতন্য। ২২।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥২৩॥

আমি একাদশ রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ-রাক্ষসের মধ্যে কুবের, বসুগণের মধ্যে পাবক, পর্ব্বতমধ্যে সুমেরু। ২৩।

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥২৪॥

হে পার্থ! আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি বলিয়া জানিও। আমি সেনানীগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয় ও জলাশয়-সকলের মধ্যে সাগর। ২৪।

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥২৫

আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্য-সকলের মধ্যে ওঁকার, যজ্ঞগণের মধ্যে জপযজ্ঞ, স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয় ॥ ২৫।

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥২৬

আমি বৃক্ষসমূহের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বের মধ্যে চিত্ররথ ও সিদ্ধ-সমুদয়ের মধ্যে মহামুনি কপিল। ২৬।

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥২৭॥

আমি অশ্বগণমধ্যে অমৃতমন্থনোদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা, মাতঙ্গমধ্যে ঐরাবত, মনুষ্যমধ্যে রাজা। ২৭।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥২৮

আমি আয়ুধমধ্যে বজ্র ও ধেনুমধ্যে কামধেনু, আমি পুত্রোৎপত্তি হেতু কন্দর্প, সবিষসর্পগণমধ্যে বাসুকি। ২৮।

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥২৯॥

নির্বিষ ভুজঙ্গগণের মধ্যে অনন্ত, জলচর-সকলের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা ও নিয়মিগণের মধ্যে যম। ২৯।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥৩০

আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, গণনাকারীদিগের মধ্যে কাল, মৃগগণের মধ্যে মৃগেন্দ্র, পক্ষীমধ্যে গরুড়। ৩০।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১

আমি বেগবান্‌দিগের মধ্যে পবন, শস্ত্র-

ধারীদিগের মধ্যে রাম, মৎস্যগণের মধ্যে মকর ও স্রোতস্বতীর মধ্যে জাহ্নবী। ৩১।

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥৩২

হে অর্জ্জুন! আমি সৃষ্টপদার্থসকলের আদি, অন্ত ও মধ্য, বিদ্যাসকলের মধ্যে আত্ম-বিদ্যা; আমি বাদিগণের বাদ্য। ৩২।

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥৩৩

আমি অক্ষর-সকলের মধ্যে অকার ও সমাসমধ্যে দ্বন্দ্ব আমি অনন্তকাল ও সর্ব্বতো-মুখ বিধাতা। ৩৩।

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

আমি সর্ব্বসংহারক মৃত্যু ও অভ্যুদয়-লাভের যোগ্য প্রাণীদিগের অভ্যুদয়, আমি নারীগণের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্য, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। ৩৪।

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূণাং কুসুমাকরঃ ॥৩৫

আমি সামবেদের মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দো-মধ্যে গায়ত্রী, মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ, ঋতুর মধ্যে বসন্ত। ৩৫।

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥৩৬

আমি প্রতারকদিগের দ্যূত, তেজস্বী-দিগের তেজ; আমি জয়, অধ্যবসায়, সত্ত্ব-বান্দিগের সত্ত্ব। ৩৬।

বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥৩৭

আমি বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিদিগের মধ্যে ব্যাস, কবিগণের মধ্যে উশনা। ৩৭।

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮ ॥

আমি শাসনকর্ত্তাদিগের দণ্ড, জয়াভিলাষী-দিগের নীতি, গোপ্য বিষয়ের মধ্যে মৌন-ভাব, জ্ঞানবান্দিগের জ্ঞান। ৩৮।

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥৩৯॥

হে অর্জ্জুন! আমি সকল ভূতের বীজ, এই চরাচর ভূত আমা হইতে স্বতন্ত্র নয়।৩৯।

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥

হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতির ইয়ত্তা নাই। আমি সংক্ষেপে এই বিভূতি-বিস্তার কীর্ত্তন করিলাম। ৪০।

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥৪১॥

বস্তুতঃ যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্যযুক্ত ও প্রভাব-বল-সম্পন্ন, সেই সমস্ত আমার প্রভাবের অংশ দ্বারা সম্ভূত হইয়াছে। ৪১।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ ॥

হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে আমার বিভূতির বিষয় পৃথক্রূপে জানিবার প্রয়োজন নাই, যে হেতু, আমি একাংশ দ্বারা এই বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি। ৪২।

ইতি বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম॥১

অর্জ্জুন কহিলেন,—তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া যে পরম গুহ্য আত্মা ও দেহ প্রভৃতির বিষয় কীর্ত্তন করিলে, তদ্দ্বারা আমার (আমি হন্তা, ইহারা হত হইতেছে এইরূপ) মোহ দূর হইল। ১।

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥২॥

হে কমলপত্রাক্ষ! আমি তোমার মুখে ভূতগণের উৎপত্তি, প্রলয় এবং তোমার অক্ষয় মাহাত্ম্য সবিস্তারে শ্রবণ করিলাম। ২।

এবমেতদ্যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩॥

হে পরমেশ্বর! তুমি আপনার ঐশিকরূপের বিষয় যেরূপ কীর্ত্তন করিলে, আমি তাহা দর্শন করিতে অভিলাষ করি। ৩।

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥৪॥

হে প্রভো! এক্ষণে তুমি যদি আমাকে তাহা দর্শন করিবার সম্যক্ উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া থাক, তাহা হইলে হে যোগেশ্বর! সেই অব্যয় রূপ প্রদর্শন কর। ৪।

শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! তুমি আমার নানাবর্ণ ও ননাপ্রকার আকারবিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপ প্রত্যক্ষ কর। ৫।

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬॥

হে ভারত! অদ্য আমার কলেবরে আদিত্য, বসু, রুদ্র ও মরুদ্গণ, অশ্বিনীতনয়দ্বয় এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য অন্য বহুতর বস্তু-সকল দেখ। ৬।

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥৭॥

হে গুড়াকেশ! আমার দেহে সচরাচর বিশ্ব এবং অন্য যে কিছু অবলোকন করিবার অভিলাষ থাকে, তাহাও নিরীক্ষণ কর। ৭।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

কিন্তু তুমি স্বীয় চক্ষু দ্বারা আমার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করি, তুমি তদ্দ্বারা আমার অসাধারণ যোগ অবলোকন কর। ৮।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন,—হে রাজন্! মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া পার্থকে পরম ঐশিক রূপ প্রদর্শন করিলেন। ৯।

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥১০॥

(তাহা) বহুমুখ ও বহুনয়নসম্পন্ন, দিব্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত, দিব্যায়ুধধারী। ১০।

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥১১॥

দিব্যমাল্য ও অম্বরে পরিশোভিত, দিব্য-

গন্ধ-চর্চ্চিত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, প্রভাময়, অনন্ত এবং সর্ব্বত্র মুখবিশিষ্ট। ১১।

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥১২॥

যদি নভোমণ্ডলে এককালে সহস্র সূর্য্য সমুদিত হয়, তাহা হইলে, তাঁহার তৎকালীন তেজঃপুঞ্জের উপমা হইতে পারে। ১২।

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥১৩॥

ধনঞ্জয় তাঁহার দেহে বহু প্রকারে বিভক্ত একস্থানস্থিত সমগ্র বিশ্ব নিরীক্ষণ করিলেন।১৩

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥১৪॥

অনন্তর অর্জ্জুন সাতিশয় বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন। ১৪।

অর্জ্জুন উবাচ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে,
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥১৫॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে দেব! আমি তোমার দেহে সমস্ত দেবতা, জরায়ুজ ও অণ্ডজ প্রভৃতি সমস্ত ভূত, পদ্মাসনস্থিত ভগবান্ ব্রহ্মা এবং দিব্য মহর্ষি ও উরগগণ অবলোকন করিতেছি। ১৫।

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং,
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং,
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥ ১৬॥

হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! আমি তোমার বহুতর বাহু, উদর, বক্ত্র ও নেত্রসম্পন্ন অনন্ত রূপ নিরীক্ষণ করিলাম; কিন্তু ইহার আদি, অন্ত ও মধ্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ১৬।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ,
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্-
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥ ১৭॥

আমি তোমাকে কিরীটধারী, গদাচক্রবিশিষ্ট, প্রদীপ্ত হুতাশন-সূর্য্য-সঙ্কাশ তেজস্তুল্য নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য এবং অপ্রমেয় নিরীক্ষণ করিতেছি। ১৭।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং,
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা,
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥ ১৮॥

তুমি অক্ষয় পরমব্রহ্ম, জ্ঞাতব্য, বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়, শাশ্বত ধর্ম্মপ্রতিপালক ও সনাতন (ইহা) জানি। ১৮।

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং,
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥১৯॥

তুমি উৎপত্তি-স্থিতি-সংহার-রহিত, তুমি অনন্তবীর্য্য ও অনন্তবাহু, হুতাশন তোমার মুখমণ্ডলে সতত প্রদীপ্ত হইতেছে, চন্দ্র সূর্য্য তোমার নেত্র, তুমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে এই বিশ্বকে সন্তপ্ত করিতেছ।১৯।

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি,
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং,
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ ২০॥

হে মহাত্মন্! তুমি একাকী হইলেও স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ এবং দিক্‌পুঞ্জে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, তোমার এই অদ্ভুত ও উগ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া লোকত্রয় ভীত হইতেছে। ২০।

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি,
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ,
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥২১॥

এই সকল সুরগণ শঙ্কিত-মনে তোমার শরণাপন্ন হইতেছে; কেহ কেহ বা আমাদিগকে রক্ষা কর বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছেন, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্বস্তি বলিয়া তোমার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ২১।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা,
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা,
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥২২॥

রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, মরুৎ, পিতৃ, গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর, বিশ্বদেব ও সিদ্ধগণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় সাতিশয় বিস্মিত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন। ২২।

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং,
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং,
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥২৩॥

হে মহাবাহো! আমি এই সমস্ত লোক সমভিব্যাহারে তোমার বহু নয়ন ও অনেক মুখসম্পন্ন, বহু বাহু, বহু উরু ও বহুচরণসংযুক্ত অনেক-উদর-পরিশোভিত ও বহুদংষ্ট্রাকরাল আকার নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইতেছি। ২৩।

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং,
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা,
ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো ॥২৪॥

হে বিষ্ণো! আমি তোমার নভোমণ্ডল-স্পর্শী, বহুবর্ণসম্পন্ন, বিবৃতানন, বিশাললোচন, ও অতি প্রদীপ্ত মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া কোন ক্রমেই ধৈর্য্য ও শান্তি অবলম্বন করিতে সমর্থ হইতেছি না, আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত বিচলিত হইয়াছে। ২৪।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি,
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম,
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥২৫॥

হে দেবেশ! তোমার কালাগ্নি-সন্নিভ, দংষ্ট্রাকরাল মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া আমার দিগ্‌ভ্রম জন্মিয়াছে; আমি কিছুতেই সুখলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না, হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও। ২৫।

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ,
সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ,
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি,
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু,
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥

মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা, অন্যান্য মহীপালগণ আমাদিগের যোদ্ধবর্গ সমভিব্যাহারে সত্বরে তোমার ভয়ঙ্কর আস্য-বিবরে প্রবেশ করিতেছেন; তন্মধ্যে কাহার উত্তমাঙ্গ চূর্ণীকৃত এবং কেহ বা তোমার বিশাল দশনসন্ধিতে সংলগ্ন হইয়াছে। ২৬-২৭।

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ,
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা,
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥

যেমন নদী-প্রবাহ সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই সকল বীরপুরুষেরা তোমার অতি প্রদীপ্ত মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। ২৮।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা,
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।

তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥

যেমন ইচ্ছাপূর্ব্বক বেগশালী পতঙ্গ-সকল বিনাশের নিমিত্ত অতি প্রদীপ্ত হুতাশনমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ এই সকল লোকেরা বিনষ্ট হইবার নিমিত্ত তোমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ২৯।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং,
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০ ॥

তুমি প্রজ্বলিত মুখ বিস্তার করিয়া এই সমুদয় লোককে গ্রাস করিতেছ। হে বিষ্ণো! তোমার প্রখর তেজ বিশ্বকে পরিপূর্ণ করিয়া লোক-সকলকে সন্তপ্ত করিতেছে। ৩০।

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো,
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং,
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১ ॥

এই উগ্রমূর্ত্তিধারী কে, আমাকে বল। তোমাকে নমস্কার করি; হে দেববর! তুমি প্রসন্ন হও। আদিপুরুষ তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি; কেন না, কি জন্য তোমার এরূপ চেষ্টা, আমি তাহা জানি না। ৩১।

শ্রীভগবানুবাচ।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো,
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে,
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—আমি লোকক্ষয়কারী ভয়ঙ্কর সাক্ষাৎ কালরূপী হইয়া লোক-সকলকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তুমি না মারিলেও প্রতিপক্ষীয় বীরপুরুষ সকলেই বিনষ্ট হইবেন। ৩২।

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব,
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব,
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥

অতএব তুমি যুদ্ধার্থ উত্থিত হইয়া শত্রুগণকে পরাজয় করত যশোলাভ ও অতি সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর; আমি পূর্ব্বেই ইহাদিগকে নিহত করিয়া রাখিয়াছি, এক্ষণে তুমি এই বিনাশের নিমিত্তমাত্র হও। ৩৩।

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ,
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা,
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪ ॥

আমি দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণকে বিনষ্ট করিয়া রাখিয়াছি; তুমি ইহাদিগকে সংহার কর, ব্যথিত হইও না, অনতিবিলম্বে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও; তুমি অবশ্যই শত্রুদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। ৩৪।

সঞ্জয় উবাচ।

এতৎ শ্রুত্বা বচনং কেশবস্য,
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং,
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন,—কৃষ্ণের এই বাক্য শুনিয়া অর্জ্জুন কম্পিতকলেবরে ও কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণকে নমস্কার করত ভীতমনে গদ্গদবচনে কহিলেন। ৩৫।

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা,
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি,
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে হৃষীকেশ! তোমার নাম কীর্ত্তন করিলে সকলে যে নিতান্ত হৃষ্ট

ও একান্ত অনুরক্ত হইয়া থাকে, সিদ্ধগণ যে নমস্কার করিয়া থাকেন এবং রাক্ষসেরা যে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়া থাকে, তাহা যুক্তিযুক্ত। ৩৬।

কস্মাচ্চ তেন নমেরন্মহাত্মন্,
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস,
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ॥ ৩৭॥

হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি ভগবান ব্রহ্মা অপেক্ষা গুরুতর ও তাঁহার আদিকর্ত্তা এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তের মূল কারণ অবিনাশী ব্রহ্ম, এই নিমিত্তই সকলে তোমাকে নমস্কার করিয়া থাকে। ৩৭।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যং চ পরমঞ্চ ধাম,
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥ ৩৮॥

হে অনন্তরূপ! তুমি আদিদেব, পুরাতন পুরুষ ও বিশ্বের একমাত্র নিধান। তুমি বিশ্বের জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য ও পরম ধাম। তুমি এই বিশ্বের সর্ব্বত্রই বিরাজমান আছ। ৩৮।

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ,
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ,
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥ ৩৯॥

তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক, প্রজাপতি ও প্রপিতামহ, আমি তোমাকে সহস্র সহস্রবার নমস্কার করি। ৩৯।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে,
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং,
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥ ৪০॥

হে সর্ব্বেশ্বর! আমি তোমার সম্মুখে নমস্কার করি, আমি তোমার পশ্চাতে নমস্কার করি; আমি তোমার চতুর্দ্দিকেই নমস্কার করি, তুমি অনন্তবীর্য্য, অমিতপরাক্রমসম্পন্ন, তুমি সমুদয় বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছ, এই নিমিত্ত সকলে তোমাকে সর্ব্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। ৪০।

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং,
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং,
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥ ৪১॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি,
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং,
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥ ৪২॥

তোমার মহিমা অবগত না হইয়া প্রমাদ বা প্রণয়পূর্ব্বক আমি তোমাকে মিত্র বিবেচনা করিয়া হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! বলিয়া যে সম্বোধন করিয়াছি এবং তুমি একাকীই থাক বা বন্ধুজন-সমক্ষেই অবস্থান কর, বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজন-বিষয়ে তোমাকে যে উপহাস করিবার নিমিত্ত তিরস্কার করিয়াছি, এক্ষণে তুমি সেই সকল ক্ষমা কর। ৪১-৪২।

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য,
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো,
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥ ৪৩॥

হে অপ্রতিমপ্রভাব! তুমি স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের পিতা, পূজ্য ও গুরু, ত্রিলোক-মধ্যে তোমা অপেক্ষা সমধিক বা তোমার তুল্য প্রভাবসম্পন্ন আর কেহই নাই। ৪৩।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং,
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ,
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥ ৪৪॥

হে দেব! অতএব আমি দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তোমায় প্রণাম করিয়া প্রসন্ন করিতেছি,

যেমন পিতা পুত্রের, মিত্র মিত্রের, স্বামী প্রিয়তমার অপরাধ সহ্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ তুমিও আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। ৪৪।

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা,
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং,
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ৪৫॥

হে দেব! আমি তোমার অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি! কিন্তু আমার অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইতেছে। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রসন্ন হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপ ধারণ ও আমাকে প্রদর্শন কর। ৪৫।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন,
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥ ৪৬॥

কিরীটসমলঙ্কৃত গদাচক্রলাঞ্ছিত সেই পূর্ব্ববৎ রূপ-দর্শনের অভিলাষী হইয়াছি; হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! এক্ষণে সেই চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণ কর। ৪৬।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং,
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং,
যন্মে ত্বদন্যেন ন হি দৃষ্টপূর্ব্বম্॥৪৭॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্নমনে যোগমায়ার প্রভাবে তোমাকে তেজোময় অনন্ত বিশ্বরূপ পরমরূপ প্রদর্শন করিয়াছি, তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই ইহা পূর্ব্বে নিরীক্ষণ করেন নাই। ৪৭।

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্যোঽহং নৃলোকে,
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥ ৪৮।

হে কুরুপ্রবীর! তোমা ব্যতিরেকে মনুষ্যলোকে আর কেহই বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, ক্রিয়াকলাপ ও অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা আমার ঈদৃশ রূপ অবলোকন করিতে সমর্থ হন না। ৪৮।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো,
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং,
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য॥ ৪৯॥

তুমি ইহা নয়নগোচর করিয়া ব্যথিত ও বিমোহিত হইও না, এক্ষণে ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রীতমনে পুনরায় আমার পূর্ব্বরূপ প্রত্যক্ষ কর। ৪৯।

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা,
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং,
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা॥ ৫০॥

সঞ্জয় কহিলেন,—বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই বলিয়া পুনঃ স্বীয় মূর্ত্তি দেখাইলেন এবং সৌম্যমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক বিশ্বরূপদর্শনভীত অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন। ৫০।

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥৫

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে জনার্দ্দন! আমি এক্ষণে তোমার প্রশান্ত মানুষমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া সচেতন ও প্রকৃতিস্থ হইলাম। ৫১।

শ্রীভগবানুবাচ।

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শন-
কাঙ্ক্ষিণঃ॥৫২॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—তুমি আমার যে নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য মূর্ত্তি অবলোকন করিলে,

দেবগণ উহা নেত্রগোচর করিবার নিমিত্ত নিয়ত অভিলাষ করিয়া থাকেন। ৫২।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥৫৩॥

কিন্তু কেহই বেদাধ্যয়ন, দান, তপ ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমার ঐ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না। ৫৩।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

হে পরন্তপ অর্জ্জুন! অনন্যসাধারণ ভক্তি প্রদর্শন করিলেই আমাকে এইরূপে জ্ঞাত হইতে পারে এবং আমাকে দর্শন ও আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। ৫৪।

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আমার কর্ম্মানুষ্ঠান করে, যে আমার ভক্ত ও একান্ত অনুরক্ত, যে পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিবারের প্রতি আসক্তি-রহিত, যাহার কাহারও সহিত বিরোধ নাই এবং আমিই যাহার পরমপুরুষার্থ, সেই ব্যক্তিই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫৫।

ইতি বিশ্বরূপদর্শনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন,- (হে কৃষ্ণ!) যে সকল ভক্ত তদ্গতচিত্তে তোমার উপাসনা করে এবং যাহারা কেবল অক্ষয় অব্যক্ত ব্রহ্মের আরাধনা করিয়া থাকে, এই উভয়বিধ লোকের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়? । ১ ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—(হে অর্জ্জুন!) যাহারা আমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ও নিবিষ্টমনা হইয়া পরমভক্তি সহকারে আমাকে উপাসনা করিয়া থাকে, তাহারাই প্রধান যোগী। ২।

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥৪॥

যাহারা সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠাননিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অক্ষয় অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত অচিন্তনীয় সর্ব্বব্যাপী হ্রাস-বৃদ্ধিবিহীন কূটস্থ এবং নিত্য পরব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। ৩-৪।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥৫॥

দেহাভিমানীরা অতি কষ্টে অব্যক্ত গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়, অতএব যাহারা অব্যক্ত-

ব্যক্তে আসক্তমনা হয়, তাহারা অধিকতর দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ৫।

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥৬॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥৭॥

যাহারা মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে সমস্ত কার্য্য সমর্পণ পূর্ব্বক একান্ত ভক্তি সহকারে আমাকেই ধ্যান ও উপাসনা করে, হে পার্থ! আমি তাহাদিগকে অচিরকালমধ্যে এই মৃত্যুর আকর সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। ৬-৭।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥৮॥

তুমি আমাতে স্থিরতররূপে চিত্ত আহিত (স্থাপিত) ও বুদ্ধি সন্নিবেশিত কর, তাহা হইলে পরকালে আমাতেই বাস করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। ৮।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥৯

হে ধনঞ্জয়! যদি আমার প্রতি চিত্ত স্থির রাখিতে না পার তাহা হইলে আমার অনুস্মরণরূপ অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ কর। ৯।

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥১০॥

যদি তদ্বিষয়েও অসমর্থ হও, তাহা হইলে তুমি আমার প্রীতিসম্পাদনার্থ মঙ্গলকার্য্য-সকল অনুষ্ঠান করিলেও মোক্ষলাভে সমর্থ হইবে। ১০।

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥১১॥

যদি ইহাতেও অশক্ত হও, তাহা হইলে একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হইয়া সংযতচিত্তে সকল কর্ম্মফল পরিত্যাগ কর। ১১।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥১২

বিবেকশূন্য অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলপরিত্যাগ শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিলেই শান্তিলাভ হয়। ১২।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

যে ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি দ্বেষশূন্য, কৃপালু, মমতাবিহীন, নিরহঙ্কার, সমদুঃখসুখ, ক্ষমাবান্, সতত প্রসন্নচিত্ত, অপ্রমত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও দৃঢ়নিশ্চয়, যিনি আমাতেই মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন এবং সুখ ও দুঃখ সমান জ্ঞান করেন, তিনি আমার প্রিয়। ১৩-১৪।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥১৫

লোক-সকল যাঁহা হইতে উদ্বিগ্ন হয় না, যিনি লোকদিগকে উদ্বিগ্ন করেন না এবং যিনি অনুচিত হর্ষ, অমর্ষ, (বিষাদ), ভয় ও উদ্বেগশূন্য, তিনিই আমার প্রিয়। ১৫।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

যিনি নিস্পৃহ, শুচি, দক্ষ, পক্ষপাতরহিত ও আধি-(মনঃপীড়া) শূন্য এবং সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী—যিনি সকাম কর্ম্ম-সকল পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। ১৬।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

যিনি শোক, হর্ষ, দ্বেষ, আকাঙ্ক্ষা ও পুণ্য-

পাপ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিমান্ হন, তিনিই আমার প্রিয়। ১৭।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮॥

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ো
নরঃ ॥ ১৯ ॥

যিনি সর্ব্ব আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ, নিন্দা ও প্রশংসা তুল্যরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন ও যিনি মৌনী, যিনি যৎ কিঞ্চিৎ লাভে সন্তুষ্ট হন, কোন স্থলেই প্রতি নিয়ত বাস করেন না এবং স্থিরমতি ও স্থির-ভক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। ১৮-১৯।

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে
প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

যিনি মৎপরায়ণ হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে উক্তপ্রকার ধর্ম্মরূপ অমৃত পান করেন, তিনিই আমার অতীব প্রিয়। ২০।

ইতি ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব॥১॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কেশব! প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সকল জানিতে ইচ্ছা করি। ১।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি
তদ্বিদঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! এই ভোগায়তন শরীরকে ক্ষেত্র বলিয়া থাকে। যিনি ইহা বিদিত হইয়াছেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। ২।

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম॥৩

আমি সকল ক্ষেত্রেরই ক্ষেত্রজ্ঞ; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে বৈলক্ষণ্য জ্ঞান, তাহাই আমার অভিপ্রেত যথার্থ জ্ঞান। ৩।

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥৪॥

এক্ষণে ক্ষেত্র যে প্রকার ধর্ম্মবিশিষ্ট, যে সমস্ত ইন্দ্রিয়বিকারযুক্ত, যেরূপে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে উদ্ভূত হয়, যেরূপে স্থাবরজঙ্গমাদি-ভেদে বিভিন্ন হয়, স্বরূপতঃ যেরূপ এবং যে প্রকার প্রভাবসম্পন্ন, তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৪।

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৫ ॥

বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ হেতুবিশিষ্ট নির্ণীতার্থ বহুবিধ বেদ, তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপলক্ষণ দ্বারা উহা নিরূপিত করিয়াছেন। ৫।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥৬॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥৭॥

পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মূলপ্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়, পাঁচ ইন্দ্রিয়-বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীরজ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি ও ধৈর্য্য এই কয়েকটি ক্ষেত্রধর্ম্ম। উক্ত ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়াদিবিকারশালী ক্ষেত্র সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। ৬-৭।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥৮॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৯ ॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ১০ ॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১১ ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতো-
ন্যথা ॥ ২২ ॥

আত্মশ্লাঘারাহিত্য, অদাম্ভিকতা, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, আচার্য্যোপাসনা (গুরুসেবা), শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্মসংযম, বিষয়-বৈরাগ্য, নিরহ-ঙ্কারিতা, এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ ও দোষের বারংবার সমালোচন, প্রীতিত্যাগ এবং পুত্রকলত্র ও গৃহাদির প্রতি অনাসক্তি এবং ইষ্ট ও অনিষ্টাপাতে সমচিত্ততা, আমার প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জ্জনে অবস্থান, জনসমাজে বিরাগ, আত্মজ্ঞানপরায়ণতা এবং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পদার্থের স্বরূপ-দর্শন ইহাই জ্ঞান; ইহারই বিপরীত অজ্ঞান। ৮-১২।

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

এক্ষণে জ্ঞেয় বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর; উহা বিদিত হইলে লোকে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অনাদি ও নির্বিশেষস্বরূপ ব্রহ্মই জ্ঞেয়, তিনি সৎও নন, অসৎও নন। ১৩।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৪॥

সর্ব্বত্রই তাঁহার কর, চরণ, চক্ষু, মস্তক ও মুখ বিরাজিত আছে; তিনি সকলকে আবৃত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ১৪।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥১৫॥

তিনি ইন্দ্রিয়বিহীন, কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয় ও রূপ, রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গুণ-সকল প্রকাশ করেন; তিনি আসক্তিশূন্য ও সকল বস্তুর আধার; তিনি নির্গুণ, কিন্তু সর্ব্বগুণ-পালক। ১৫।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥১৬

তিনি চরাচর এবং সকল ভূতের অন্তরে ও বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছেন। তিনি সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত অবিজ্ঞেয়; তিনি জ্ঞানিদিগের অতি সন্নিকৃষ্ট ও অজ্ঞানদিগের দূরবর্ত্তী। ১৬।

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥১৭

তিনি ভূতমধ্যে অবিভক্ত থাকিয়া বিভক্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন; তিনি ভূতগণের পোষক; তিনি প্রলয়কালে সমুদায় গ্রাস করেন ও সৃষ্টিকালে নানারূপ পরিগ্রহ করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকেন। ১৭।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য
বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮ ॥

তিনি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর জ্যোতিঃ ও অন্ধকারের অতীত; তিনি জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয়, তিনি জ্ঞানগম্য। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। ১৮।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৯ ॥

আমি তোমার নিকট ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনটি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম, আমার ভক্তগণ ইহা অবগত হইয়া আমার ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে সমর্থ হয়। ১৯।

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি-
সম্ভবান্ ॥ ২০ ।

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি; দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিবিকার এবং সুখদুঃখাদি গুণ-সমুদয় প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। ২০।

কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥২১
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্
গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥২২॥

শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের কর্ত্তৃত্ববিষয়ে প্রকৃতি এবং সুখ-দুঃখভোগবিষয়ে পুরুষই কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; পুরুষ দেহে অধিষ্ঠান করিয়া তজ্জনিত সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। ইন্দ্রিয়গণের সহিত তাঁহার সম্পর্কই সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণের একমাত্র কারণ।২১-২২।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ
পরঃ ॥২৩ ॥

তিনি এই দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও দেহ হইতে ভিন্ন; কারণ, তিনি সাক্ষিস্বরূপ, অনুগ্রাহক, বিধানকর্ত্তা প্রতিপালক মহেশ্বর ও অন্তর্যামী।২৩।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভি-
জায়তে ॥২৪।

যে ব্যক্তি এইরূপে পুরুষ ও সমগ্র গুণের সহিত প্রকৃতিকে অবগত হন, তিনি শাস্ত্রসম্মত পথ অতিক্রম করিলেও মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।২৪।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাঙ্খ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥২৫

কেহ কেহ ধ্যান ও মনন দ্বারা দেহমধ্যে আত্মাকে সন্দর্শন করে; কেহ কেহ প্রকৃতি-পুরুষের বৈলক্ষণ্যরূপ যোগ দ্বারা, কেহ বা কর্ম্মযোগ দ্বারা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়। ২৫।

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতি-
পরায়ণাঃ ॥২৬॥

কেহ কেহ বা আত্মাকে বিদিত না হইয়া অন্যের নিকট উপদেশবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, সেই সমস্ত শ্রুতিপরায়ণ ব্যক্তিরা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকে।২৬।

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥২৭॥

হে ভরতর্ষভ! ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থই উৎপন্ন হইতেছে।২৭।

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৮

স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থ-সমুদয় বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও ঈশ্বর কদাচ বিনষ্ট হন না, তিনি সকল ভূতে নির্ব্বিশেষরূপে অবস্থান করিতেছেন। যিনি সেই পরমেশ্বরকে দেখিতেছেন, তিনিই যথার্থ দেখিতেছেন। ২৮।

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং
গতিম্ ॥ ২৯ ॥

লোক-সকল সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করিলে অবিদ্যার দ্বারা আত্মাকে বিনষ্ট করে না, এই নিমিত্ত মোক্ষ-পদ প্রাপ্ত হয়। ২৯।

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥৩০॥

প্রকৃতি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম-সমুদয় সম্পাদন করেন, কিন্তু আত্মা স্বয়ং কোন কর্ম্ম করেন না; যিনি ইহা সন্দর্শন করিয়াছেন, তিনি সম্যগ্দর্শী। ৩০।

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥৩১

যখন লোক একমাত্র প্রকৃতিতে অবস্থিত ভূত-সকলের ভিন্নভাব প্রত্যক্ষ করে, তখন সেই প্রকৃতি হইতেই পূর্ণব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩১।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন
লিপ্যতে ॥ ৩২ ॥

হে কৌন্তেয়! এই অব্যয় পরমাত্মা দেহে অবস্থান করিলেও অনাদিত্ব ও নির্গুণত্ব প্রযুক্ত কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করেন না এবং কোন প্রকার কর্ম্মফল দ্বারাও কদাচ লিপ্ত হন না। ৩২।

যথা সর্ব্বগতঃ সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপ-
লিপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

যেমন আকাশ সকল পদার্থে অবস্থান করিলেও কোন পদার্থ দ্বারা উপলিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা সকল দেহে অবস্থান করিলেও দৈহিক গুণ-দোষ দ্বারা কখনও লিপ্ত হন না। ৩৩।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি.
ভারত ॥ ৩৪ ॥

হে ভারত! যেমন সূর্য্য একমাত্র হইলেও সমস্ত বিশ্বকে সুপ্রকাশিত করেন, তদ্রূপ এক-মাত্র আত্মা সমস্ত দেহ প্রকাশিত করিয়া থাকেন। ৩৪।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে
পরম্ ॥ ৩৫ ॥

যাঁহারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের অন্তর এবং ভৌতিক প্রকৃতি হইতে মোক্ষো-পায় বিদিত হন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩৫।

ইতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।
পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো
গতাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—আমি পুনরায় উৎকৃষ্ট জ্ঞান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহর্ষিগণ ইহা অবগত হইয়া দেহান্তে মোক্ষ-লাভ করিয়া থাকেন। ১।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥২॥

ইহা আশ্রয় করিলে আমার সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করেন না এবং প্রলয়কালেও ব্যথিত হন না। ২।

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥৩॥

হে ভারত! মহৎ প্রকৃতি গর্ভাধানস্থান;

আমি তাহাতে সমস্ত জগতের বীজ নিক্ষেপ করিয়া থাকি, তাহাতেই ভূত-সকল উৎপন্ন হয়। ৩।

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥৪॥

হে কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যে সকল স্থাবরজঙ্গমাত্মক মূর্ত্তি সম্ভূত হয়, মহৎ প্রকৃতি সেই মূর্ত্তি-সমুদায়ের যোনি (মাতৃস্থানীয়) এবং আমি বীজপ্রদ পিতা। ৪।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ ৫॥

হে মহাবাহো! প্রকৃতিসম্ভব সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি গুণ দেহের অভ্যন্তরে অব্যয় দেহীকে আশ্রয় করিয়া আছে। ৫।

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥৬॥

হে নিষ্পাপ! তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মলত্ব প্রযুক্ত নিতান্ত ভাস্বর ও নিরুপদ্রব; এই নিমিত্ত উহা দেহীকে সুখী ও জ্ঞানসম্পন্ন করে। ৬।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥৭॥

রজোগুণ অনুরাগাত্মক এবং অভিলাষ ও আসক্তি হইতে সমুদ্ভূত; উহা দেহীকে কর্ম্মে নিবদ্ধ করিয়া রাখে। ৭।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥ ৮॥

হে ভারত! তমোগুণ অজ্ঞান-সমুৎপন্ন ও সকল দেহীর মোহজনক; উহা প্রাণিগণকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা অভিভূত করিয়া রাখে। ৮।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥ ৯॥

হে ভারত! সত্ত্বগুণ প্রাণিগণকে সুখে মগ্ন, রজোগুণ কর্ম্মে সংসক্ত এবং তমোগুণ জ্ঞানকে তিরোহিত করিয়া প্রমাদের বশীভূত করে। ৯।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥১০॥

হে ভারত! সত্ত্বগুণ রজ ও তমকে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমকে, তমোগুণ রজ ও সত্ত্বকে অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হয়। ১০।

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥ ১১॥

যখন সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হয়, তখন এই দেহে সমুদয় ইন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞানরূপ প্রকাশ জন্মে। ১১।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥ ১২॥

হে ভরতর্ষভ! রজোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ, স্পৃহা ও অশান্তি সঞ্জাত হইয়া থাকে। ১২।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥১৩॥

হে কুরুনন্দন! তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে বিবেকভ্রংশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ সঞ্জাত হয়। ১৩।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥১৪
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥ ১৫॥

সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে যদি কেহ কলেবর পরিত্যাগ করে, সে হিরণ্যগর্ভোপাসকদিগের প্রকাশময় লোক-সকল প্রাপ্ত হয়; রজোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে যদি কাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যযোনিতে তাহার জন্ম হইয়া থাকে, আর যদি কেহ তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে দেহত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার পশ্বাদিযোনিতে জন্ম হয়। ১৪-১৫।

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥ ১৬॥

সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল সুনির্ম্মল সাত্ত্বিক সুখ, রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ এবং তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞান। ১৬।

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥১৭॥

সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজ হইতে লোভ ও তম হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান সমুত্থিত হইয়া থাকে। ১৭।

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥ ১৮॥

সাত্ত্বিকলোক ঊর্দ্ধে ও রাজসিক লোক মধ্যে অবস্থান করেন এবং জঘন্যগুণসঞ্জাত প্রমাদমোহাদির বশীভূত তামসিক লোকেরা অধোগতি লাভ করিয়া থাকে। ১৮।

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥ ১৯॥

মানব বিবেকী হইয়া গুণ-সকলকে সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া নিরীক্ষণ করিলে এবং গুণ হইতে অতিরিক্ত আত্মাকে অবগত হইলে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৯।

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥ ২০॥

দেহী দেহসম্ভূত এই তিনটি গুণ অতিক্রম করিয়া জন্মমৃত্যুজরাজনিত দুঃখপরম্পরা হইতে পরিত্রাণ লাভ করত মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ২০।

অর্জ্জুন উবাচ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে॥ ২১॥

অর্জ্জুন কহিলেন—হে বাসুদেব! মনুষ্য কোন্ চিহ্ন ও কিরূপ আচারসম্পন্ন হইলে এই তিনটি গুণ অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়? । ২১।

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥২২॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে অর্জ্জুন! যিনি প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইলে দ্বেষ করেন না এবং ঐ সকল নিবৃত্ত হইলেও অভিলাষ করেন না, (তিনিই গুণাতীত পুরুষ)। ২২।

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥২৩॥

যিনি উদাসীনেরন্যায় আসীন হইয়া সুখ-দুঃখাদি গুণকার্য্য দ্বারা বিচালিত হন না, প্রত্যুত গুণসকল স্বকার্য্যেই ব্যাপৃত আছে, তৎসমুদয়ের সহিত আমার কোন সংস্রব নাই—ইরূপ বিবেচনা করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন, (তিনিই গুণাতীত পুরুষ)। ২৩।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥২৪॥

যিনি সমদুঃখ সুখ, আত্মনিষ্ঠ ও ধীমান্, যিনি লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চন সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন, যাঁহার প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই একরূপ, যিনি আত্মনিন্দা ও আত্মপ্রশংসা তুল্যরূপই বিবেচনা করিয়া থাকেন, (তিনিই গুণাতীত পুরুষ)। ২৪।

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥২৫॥

যিনি মান ও অপমান এবং শত্রু ও মিত্র

তুল্যরূপই বিবেচনা করিয়া থাকেন এবং যিনি সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী, তিনিই গুণাতীত পুরুষ ।।২৫।।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ।২৬।

যে ব্যক্তি অসাধারণ ভক্তিযোগ সহকারে আমাকে সেবা করেন, তিনি উক্ত সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হন । ২৬ ।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ।।২৭।।

আমি নিত্য ও অক্ষয় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, এবং আমিই ঐকান্তিক সুখের একমাত্র আস্পদ । ২৭ ।

ইতি গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ।।১।।

শ্রীভগবান্ কহিলেন— সংসাররূপ এক অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে । উহার মূল ঊর্দ্ধে, উহার শাখা অধোতে, বেদ-সমুদয় উহার পত্র ; যিনি এই অশ্বত্থ বৃক্ষ বিদিত হইয়াছেন, তিনি বেদবেত্তা । ১ ।

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি,
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ।।২।।

ঐ বৃক্ষের শাখা অধ ও ঊর্দ্ধদেশে বিস্তীর্ণ হইয়াছে ; উহা সত্ত্বাদি গুণ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে এবং রূপ রস প্রভৃতি বিষয়-সকল উহার পত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে । এই বৃক্ষের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ-কর্ম্ম-প্রসূতি মূল-সকল অধঃপ্রদেশে জীবলোকে বিস্তীর্ণ হইতেছে । ২ ।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে,
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা ।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ।। ৩ ।।
ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং,
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে,
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

এই বৃক্ষের রূপ নিরীক্ষিত হয় না, ইহার আদি নাই, অন্ত নাই এবং ইহা কিরূপে অবস্থান করিতেছে, তাহাও অবগত হওয়া যায় না । এই বদ্ধমূল অশ্বত্থ-বৃক্ষ সুদৃঢ় নির্ম্মমত্বরূপ শস্ত্র দ্বারা ছেদ করিয়া উহার মূলভূত বস্তু অনুসন্ধান করিবে, উহা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না । ৩৪ ।

নির্ম্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষা,
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ।। ৫ ।।

যাঁহা হইতে এই চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তি

বিস্তৃত হইয়াছে, আমি সেই আদিপুরুষের শরণাপন্ন হই, এই বলিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিতে হইবে; যাঁহারা অভিমান, মোহ, ও পুত্র-কলত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সুখ ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, সেই সমস্ত আত্মজ্ঞানপরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য মহাত্মারা অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৫।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না; চন্দ্র, সূর্য্য ও হুতাশন যাহাকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হন না, তাহাই আমার পরম পদ।৬।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥

এই জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ। ইনি প্রকৃতিবিলীন পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করেন।৭।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥৮॥

যেমন, বায়ু কুসুমাদি হইতে গন্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ যখন জীব শরীর লাভ ও শরীর পরিত্যাগ করে, তখন পূর্ব্বদেহ হইতে ইন্দ্রিয়-সমুদয় গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে। ৮।

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥

এই জীব শ্রোত্র, চক্ষু, ত্বক্, রসনা, ঘ্রাণ ও মনোমধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া শব্দাদি বিষয়-সমুদয় উপভোগ করে। ৯।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥

বিমূঢ় ব্যক্তিরা দেহান্তরগামী দেহাবস্থিত বা বিষয়োপভোগলিপ্ত ইন্দ্রিয়যুক্ত জীবকে কদাচ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না, জ্ঞান-চক্ষুঃসম্পন্ন মহাত্মারাই উহা অবলোকন করিয়া থাকেন। ১০।

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্য-
চেতসঃ ॥ ১১ ॥

যোগী ব্যক্তিরা যত্নবান্ হইয়া দেহে অবস্থিত জীবকে দর্শন করেন; কিন্তু অবিশুদ্ধ-চিত্ত বিমূঢ় ব্যক্তিরা যত্ন করিলেও তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে পারে না। ১১।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।১২।

চন্দ্র, অনল ও নিখিল ভুবনবিকাশী সূর্য্য আমারই তেজে তেজস্বী। ১২।

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা
রসাত্মকঃ ॥ ১৩ ॥

আমি ওজঃপ্রভাবে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া ভূতসকলকে ধারণ এবং রসাত্মক চন্দ্র হইয়া ওষধি-সমুদয়ের পুষ্টিসাধন করিতেছি। ১৩।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম ॥১৪॥

আমি জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণ ও অপান বায়ু সমভিব্যাহারে দেহমধ্যে প্রবেশ করত চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য পাক করিতেছি। ১৪।

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো,
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো,
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫ ॥

আমি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছি, আমা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও উভয়ের অভাব জন্মিয়া থাকে, আমি চারি বেদ দ্বারা বিদিত হই এবং আমি বেদান্তকর্ত্তা ও বেদবেত্তা।১৫।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥১৬

ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটী পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে সমুদয় ভূতই ক্ষর ও কূটস্থ পুরুষ অক্ষর। ১৬।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭॥

ইহা ভিন্ন অন্য একটি উত্তম পুরুষ আছেন, তাঁহার নাম পরমাত্মা, সেই অব্যয় পরমাত্মা এই ত্রিলোকমধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত প্রতিপালন করিতেছেন। ১৭।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥১৮॥

আমি ক্ষর ও অক্ষর এই দুই প্রকার পুরুষ অপেক্ষা উত্তম, এই নিমিত্ত বেদ ও লোকমধ্যে পুরুষোত্তম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকি। ১৮।

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত॥১৯॥

হে ভারত! যে ব্যক্তি মোহশূন্য হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া বিদিত হয়, সেই সর্ব্ববেত্তা সর্ব্বপ্রকারে আমাকে আরাধনা করে। ১৯।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥২০॥

হে অনঘ ভারত! আমি এই পরম গুহ্য শাস্ত্র কীর্ত্তন করিলাম, ইহা বিদিত হইলে লোক বুদ্ধিমান্ ও কৃতকার্য্য হয়। ২০।

ইতি পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্॥১॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥২।
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥৩॥

অভয়, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান উপায়ে পরিনিষ্ঠা, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ ঋজুতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দা-বর্জ্জন, প্রাণীর প্রতি দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, হ্রী (কুকর্ম্ম করিতে লোকলজ্জা), অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ ও অনভিমানিতা। হে অর্জ্জুন! যাহারা দৈব সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা উক্ত ষড়্‌বিংশতি গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১-৩।

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥৪॥

হে পার্থ! যাহারা আসুর সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানে অভিভূত হয়। ৪।

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব॥৫॥

দৈব সম্পদ্ মোক্ষের ও আসুর সম্পদ্

বন্ধের হেতু ; হে পাণ্ডব ! তুমি দৈব সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব শোক করিও না ।৫।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে
শৃণু ॥ ৬ ॥

হে পার্থ ! ইহলোকে দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার ভূত সৃষ্ট হইয়াছে ; দৈব লোকের বিষয় বিস্তারিতরূপে কহিয়াছি, এক্ষণে অসুরদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।৬।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু
বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

আসুরস্বভাব লোক সকল ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির বিষয় অবগত নয় ; (একারণ) তাহাদিগের শৌচ নাই, আচার নাই ও সত্য নাই । ৭ ।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্ ।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥৮॥

তাহারা জগৎকে অসত্য, স্বাভাবিক, ঈশ্বরশূন্য, স্ত্রীপুরুষসম্ভূত ও কামজনিত কহে। ৮।

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥৯॥

সেই সকল অল্পবুদ্ধি লোক এইরূপ জ্ঞান আশ্রয় করত মলিন-চিত্ত, উগ্রকর্ম্মা ও অহিতকারী হইয়া জগতের ক্ষয়ের নিমিত্ত সমুদ্ভূত হয়। ৯ ।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচি-
ব্রতাঃ ॥ ১০ ॥

দম্ভ, অভিমান, মদ, অশুচি ব্রত ও দুষ্পূরণীয় কামনা অবলম্বন এবং মোহ বশতঃ অসৎ প্রতিগ্রহ (এই মন্ত্রের দ্বারা এই দেবতাকে আরাধনা করিয়া প্রচুর ধনাদি প্রাপ্ত হইব, এবম্ভূত দুরাগ্রহ) করিয়া ক্ষুদ্রদেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয় । ১০ ।

চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি
নিশ্চিতাঃ । ১১ ।

আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥১২॥

আমরণ অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কামোপভোগই পরম পুরুষার্থ বলিয়া নিশ্চয় করে। শত শত আশাপাশে বদ্ধ ও কাম-ক্রোধের বশীভূত হইয়া কামভোগার্থ অন্যায় পূর্ব্বক অর্থ-সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। ১১-১২ ।

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥১৩॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি ।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্
সুখী ॥ ১৪ ॥

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো
ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞান-
বিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকে-
ঽশুচৌ । ১৬ ।

আজি আমার এই মনোরথ পরিপূর্ণ হইল ও এই মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে, আমার এই ধন আছে, পুনরায় এই অর্থ হইবে। আমি এই শত্রুকে বিনাশ করিয়াছি, অন্য শত্রুকেও বিনাশ করিব ; আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্, আমি সুখী। আমি ধনবান্, আমি কুলীন, আমার সমান আর কে আছে ? আমি যাগ করিব, দান করিব ও আমোদ করিব, এই প্রকার অজ্ঞানে বিমোহিত অনেকাবধ চিত্ত-

বিভ্রম ও মোহজালে আচ্ছন্ন এবং কামভোগে আসক্ত হইয়া অতি কুৎসিত নরকে নিপতিত হয়। ১৩-১৬।

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্‌ ॥১৭॥

আপনা আপনি সম্মানিত, অহঙ্কৃত ও ধনমানমদে প্রমত্ত হইয়া দম্ভসহকারে অবিধিপূর্ব্বক নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। ১৭।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥১৮॥

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও অসূয়া আশ্রয় করিয়া আপনার ও পরের দেহে আমার দ্বেষ করে। ১৮।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্‌ সংসারেষু নরাধমান্‌।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভেনাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥১৯॥

আমি সেই সমস্ত দ্বেষপরবশ, ক্রূরস্বভাব, অশুভকারী নরাধমকে নিরন্তর সংসারে আসুরযোনিমধ্যে নিক্ষেপ করি। ১৯।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্‌ ॥ ২০ ॥

হে কৌন্তেয়! তাহারা আসুর যোনি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে লাভ করিতে পারে না, সুতরাং অধমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২০।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥

কাম, ক্রোধ ও লোভ নরকের এই ত্রিবিধ দ্বার, অতএব এই তিনটি পরিত্যাগ করিবে। ২১।

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ২২ ॥

হে কৌন্তেয়! যে ব্যক্তি নরকের এই ত্রিবিধ দ্বার হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনি আপনার কল্যাণ আচরণ করেন এবং তৎপরে মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ২২।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌ ॥ ২৩ ॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারে (কার্য্যে) প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, সুখ প্রাপ্ত হয় না, পরমগতিও প্রাপ্ত হয় না। ২৩।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥২৪

অতএব কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থা-বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ; তুমি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম অবগত হইয়া তাহার অনুষ্ঠান কর। ২৪।

ইতি দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, তাহাদের নিষ্ঠা কীদৃশী? সত্ত্ব? কি রজঃ? অথবা তমঃ? ১।

শ্রীভগবানুবাচ।
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং
শৃণু ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! দেহিগণের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা তিন প্রকার;—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, তাহা শ্রবণ কর। ২।

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব
সঃ ॥ ৩ ॥

হে ভারত! সকলের শ্রদ্ধাই সত্ত্বগুণের অনুযায়িনী, পুরুষও শ্রদ্ধাময়, তন্মধ্যে পূর্ব্বে যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, পরেও সেইরূপ শ্রদ্ধাবান্ হইবেন। ৩।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা
জনাঃ ॥ ৪ ॥

সাত্ত্বিক লোক দেবগণের, রাজসিকেরা যক্ষ ও রাক্ষসগণের, এবং তামসিকগণ ভূত ও প্রেতসমূহের যাগ করিয়া থাকে। ৪।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ।
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥৬॥

যে সকল হীনচেতা ব্যক্তি দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, রাগ ও বলসম্পন্ন হইয়া শরীরস্থ ভূতগণকে ক্লেশিত করিয়া অশাস্ত্রবিহিত ঘোরতর তপস্যা করে, তাহারা আমাকেই ক্লেশিত করিয়া থাকে, তাহাদিগকে অতি ক্রূরস্বভাব বলিয়া জানিবে। ৫-৬।

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥

সকলের প্রীতিকর আহার তিন প্রকার, সেইরূপ যজ্ঞ, তপ এবং দানও তিন প্রকার; উহাদের এই ভেদ শ্রবণ কর। ৭।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধা স্থিরা হৃদ্যা আহারা সাত্ত্বিক-
প্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

জীবন, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, সুখ ও রুচি-বর্দ্ধন রস ও স্নেহযুক্ত, দীর্ঘকালস্থায়ী মনোহর আহার সাত্ত্বিকদিগের প্রীতিকর। ৮।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥৯॥

অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রূক্ষ, অতি বিদাহী এবং দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ আহার রাজসগণের অভিলষিত। ৯।

যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতং চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥১০॥

বহুক্ষণের পক্ব, গতরস, দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত (বাসি), উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র ভোজ্য তামসিকদিগের প্রীতিকর। ১০।

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১॥

ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তিরা একাগ্রমনে কেবল কর্ত্তব্য জ্ঞানে যে অবশ্য কর্ত্তব্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই সাত্ত্বিক। ১১।

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥১২॥

ফললাভ বা মহত্ত্ব-প্রকাশের নিমিত্ত যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই রাজসিক। ১২।

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩॥

(শাস্ত্রোক্ত) বিধি, অন্নদান, মন্ত্র, দক্ষিণা ও শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞ তামসিক বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ১৩।

দেবদ্বিজ-গুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শুচিতা, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা শারীরিক তপ বলিয়া উক্ত হয়। ১৪।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥১৫॥

অভয়, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং বেদাভ্যাস বাঙ্ময় তপ। ১৫।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬॥

চিত্তশুদ্ধি, অক্রূরতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি মানসিক তপ। ১৬।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥১৭॥

ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে যে তপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক। ১৭।

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥১৮॥

সৎকার, মান, পূজালাভ ও দম্ভ প্রকাশের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত তপ রাজসিক, এই তপস্যা অনিয়ত ও ক্ষণিক। ১৮।

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥১৯॥

যে তপস্যা দুরাগ্রহ ও আত্মপীড়া দ্বারা অথবা অন্যের উৎসাদনার্থ (বিনাশার্থ) অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামসিক। ১৯।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥

কেবল দাতব্যজ্ঞানে দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান, তাহাই সাত্ত্বিক। ২০।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥২১॥

প্রত্যুপকার বা স্বর্গাদির উদ্দেশে ক্লেশ সহকারে যে দান অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই রাজসিক। ২১।

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

অনুপযুক্ত কালে ও অনুপযুক্ত পাত্রে সৎকারবর্জ্জিত, তিরস্কারসহকৃত যে দান, তাহাই তামসিক। ২২।

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥২৩॥

ব্রহ্মের নাম তিন প্রকার;—ওঁ, তৎ ও সৎ, পূর্ব্বে এই ত্রিবিধ নাম দ্বারা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছিল। ২৩।

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥২৪

এই নিমিত্ত ব্রহ্মবাদীদিগের বিধানোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপ ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ২৪।

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥

মুমুক্ষু ব্যক্তিরা ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল "তৎ" এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক নানাবিধ যজ্ঞ, তপ ও দানক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ২৫।

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥২৬॥

হে পার্থ! অস্তিত্ব, সাধুত্ব ও মঙ্গলকর্ম্মে সৎশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ২৬।

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

যজ্ঞ, তপ ও দানে এবং ঈশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্মে সৎশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ২৭।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

হে পার্থ! অশ্রদ্ধা-সহকৃত হোম, দান, তপস্যা ও অন্যান্য কর্ম্ম অসৎ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, কেন না, তৎসমুদয় কি ইহলোকে বা কি পরলোকে কুত্রাপি সফল হয় না। ২৮।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্কেশিনিসূদন ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন,— হে হৃষীকেশ! হে মহাবাহো! হে কেশিনিসূদন! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রকৃততত্ত্ব পৃথক্‌রূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, তুমি তাহা কীর্ত্তন কর। ১।

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥২॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! পণ্ডিতেরা কাম্যকর্ম্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস এবং সকল প্রকার কর্ম্মফলত্যাগকেই ত্যাগ কহিয়া থাকেন। ২।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥৩॥

কেহ কেহ (সাংখ্য-মনীষীরা কহেন, ক্রিয়াকলাপ দোষের ন্যায় পরিত্যাগ করা বিধেয়। অন্যেরা কহিয়া থাকেন, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই কয়েকটি কার্য্য কোনরূপেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। ৩।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ॥৪॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রধান! এক্ষণে তুমি প্রকৃত ত্যাগ কিরূপ, তাহা শ্রবণ কর; তামসাদিভেদে ত্যাগ তিন প্রকার। ৪।

যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥৫॥

যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কদাচ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, ইহার অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কর। এই কয়েকটি কার্য্য বিবেকীদিগের চিত্তশুদ্ধির কারণ। ৫।

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥৬॥

হে পার্থ! আমার নিশ্চয় মত এই যে, আসক্তি ও কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া, এই সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃ। ৬।

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৭॥

নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু মোহবশতঃ যে নিত্যকর্ম্মত্যাগ, তাহা তামস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। ৭।

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং
লভেৎ ॥ ৮ ॥

নিতান্ত দুঃখজনক বলিয়া কায়ক্লেশ ও ভয় প্রযুক্ত যে কর্ম্ম পরিত্যাগ করা, তাহা রাজস ত্যাগ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, রাজসত্যাগী পুরুষ ত্যাগফললাভে সমর্থ হয় না। ৮।

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
ত্যক্ত্বা সঙ্গং ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো
মতঃ ॥৯॥

হে অর্জ্জুন! আসক্তি ও কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য বোধে যে কার্য্যানুষ্ঠান, তাহা সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ৯।

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥১০॥

সত্ত্বগুণসম্পন্ন, মেধাবী ও সংশয়বিরহিত ত্যাগী ব্যক্তি দুঃখাবহ বিষয়ে দ্বেষ ও সুখাবহ বিষয়ে অনুরাগ প্রদর্শন করেন না। ১০।

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১১॥

দেহী নিঃশেষে সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ

করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যিনি কর্ম্মফলত্যাগী, তাঁহাকেই ত্যাগী বলা যাইতে পারে। ১১।

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্কচিৎ ॥১২॥

কর্ম্মের ইষ্ট, অনিষ্ট, ইষ্টানিষ্ট এই ত্রিবিধ ফল অভিহিত হইয়া থাকে; যাঁহারা ত্যাগী নন, তাঁহারা পরলোক প্রাপ্ত হইলে ঐ সমস্ত ফল লাভ করেন; কিন্তু সন্ন্যাসীরা উহা লাভ করিতে কদাচ সমর্থ হন না। ১২।

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥১৩॥

হে মহাবাহো! সর্ব্বকর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত বেদান্তের অনুসারে যে পঞ্চবিধ কারণ নিরূপিত আছে, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর।১৩।

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥

শরীর, অহঙ্কার, চক্ষুরাদি বিবিধ ইন্দ্রিয়, নানাবিধ চেষ্টা ও দৈব এই পাঁচ প্রকার কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে। ১৪।

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫॥

ন্যায্য বা অন্যায্যই হউক, মনুষ্য কায়, মন ও বাক্য দ্বারা যে কার্য্য অনুষ্ঠান করে, সেই পাঁচটিই তাহার কারণ। ১৫।

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬ ॥

এইরূপ কারণ অবধারিত হইলে যে অসংস্কৃত বুদ্ধি বশতঃ নিরুপাধি আত্মার কর্ত্তৃত্ব নিরীক্ষণ করে, সেই দুর্ম্মতি কখন সাধুদর্শী নয়। ১৬

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥১৭॥

যিনি আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন না, যাঁহার বুদ্ধি কার্য্যে আসক্ত হয় না, তিনি লোক-সমুদয়কে বিনষ্ট করিয়াও বিনাশ করেন না ও তাঁহাকে বিনাশজনিত ফলভোগও করিতে হয় না। ১৭।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ॥১৮॥

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা কর্ম্মে প্রবৃত্তিসম্পাদনের হেতু। আর করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা ক্রিয়ার আশ্রয়। ১৮।

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥১৯॥

সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা সত্ত্বাদিগুণভেদে ত্রিবিধ কথিত আছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১৯।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥২০॥

লোকে যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূতগণের মধ্যে অভিন্নরূপে অবস্থিত ও অব্যয় পরমাত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করে, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান। ২০।

পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥২১॥

যে জ্ঞান দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ পৃথক্‌রূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা রাজসিক।২১।

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥২২।

কিন্তু যাহা একমাত্র প্রতিমাদিতে ঈশ্বর পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছেন, এইরূপ অবাস্তবিক অযৌক্তিক তুচ্ছ জ্ঞান, তাহা তামসিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ২২।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥২৩॥

কর্ত্তৃত্বাভিমান-বিরহিত নিষ্কাম ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুরাগ ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত নিত্যকর্ম্মই সাত্ত্বিক। ২৩।

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥ ২৪॥

সকাম ও অহঙ্কারপরতন্ত্র ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বহুল আয়াসকর কর্ম্মই রাজসিক।২৪।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তত্তামসমুচ্যতে॥২৫॥

ভাবী শুভাশুভ, বিত্তক্ষয়,হিংসা ও পৌরুষ পর্য্যালোচনা না করিয়া মোহবশতঃ যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামসিক। ২৫।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥২৬॥

অনাসক্ত, নিরহঙ্কার, ধৈর্য্য ও উৎসাহ-সম্পন্ন এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে বিকার-বিরহিত কর্ত্তাই সাত্ত্বিক। ২৬।

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥২৭॥

অনুরাগপরায়ণ, কর্ম্মফলপ্রার্থী,লুব্ধপ্রকৃতি, হিংস্রক, অশুচি ও হর্ষশোক-সমন্বিত কর্ত্তাই রাজসিক। ২৭।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈকৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥২৮॥

অনবহিত, বিবেকহীন,উদ্ধত,শঠ, পরাপমানী অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তাই তামসিক। ২৮।

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয়॥ ২৯॥

হে ধনঞ্জয়! গুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৈর্য্যের ত্রিবিধ ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, আমি উহা সম্যক্‌রূপে পৃথক্ পৃথক্ কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। ২৯।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥৩০॥

হে পার্থ! যে বুদ্ধি দ্বারা (ধর্ম্মে) প্রবৃত্তি, (অধর্ম্মে) নিবৃত্তি, কার্য্য, অকার্য্য, ভয়, অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ অবগত হওয়া যায়, তাহা সাত্ত্বিকী। ৩০।

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যং চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥৩১॥

হে পার্থ! যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য প্রকৃতরূপে অবগত হওয়া যায় না, তাহা রাজসী। ৩১।

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥৩২॥

হে পার্থ! যে বুদ্ধি অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ও সমস্ত পদার্থ বিপরীত-রূপে প্রতিপন্ন করে, তাহা তামসী। ৩২।

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ ৩২॥

হে পার্থ! যে ধৃতি চিত্তের একাগ্রতা নিবন্ধন অন্য বিষয় ধারণ না করিয়া মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সমুদয় ধারণ করে, তাহা সাত্ত্বিকী। ৩৩।

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী॥৩৪॥

হে পার্থ! হে অর্জ্জুন! যে ধৃতি প্রসঙ্গতঃ ফললাভের অভিসন্ধি করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ধারণ করিয়া থাকে, তাহা রাজসী। ৩৪।

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ
তামসী ॥ ৩৫।

হে পার্থ! অবিবেচক পুরুষ যাহার প্রভাবে স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ ও গর্ব্ব পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাহাই তামসিক ধৈর্য্য।৩৫।

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগ-
চ্ছতি ॥৩৬॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে ত্রিবিধ সুখ আমার নিকট শ্রবণ কর।৩৬।

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদ-
জম্ ॥ ৩৭ ॥

যে সুখে অভ্যাস বশতঃ আসক্ত হইতে হয় এবং যাহা লাভ করিলে দুঃখের অবসান হইয়া থাকে ও যাহা অগ্রে বিষের ন্যায় ও পরিণামে অমৃতের ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং যদ্দ্বারা আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে, তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত হয়।৩৭।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং
স্মৃতম্ ॥৩৮॥

বিষয়ে ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোগ বশতঃ যাহা অগ্রে অমৃততুল্য, পরিশেষে বিষতুল্য প্রতীয়মান হয়, তাহা রাজস সুখ।৩৮।

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥৩৯॥

যে সুখ অগ্রে এবং পশ্চাতে আত্মার মোহ সম্পাদন করে, যাহা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে সমুত্থিত হয়, তাহা তামসিক সুখ।৩৯।

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্ম্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভি-
র্গুণৈঃ। ৪০।

পৃথিবী বা স্বর্গে এই স্বাভাবিক গুণত্রয়-বিরহিত কোন প্রাণী কদাচ দৃষ্টিগোচর হয় না।৪০।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥৪১॥

হে পরন্তপ! এই স্বভাবপ্রভব গুণত্রয় দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্ম বিভক্ত হইয়াছে।৪১।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাব-
জম্ ॥ ৪২ ॥

শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা, আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই কয়েকটি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম।৪২।

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্য-
পলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥৪৩॥

শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, সমরে অপরাঙ্মুখতা, দান ও ঈশ্বরভাব এই কয়েকটি ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম।৪৩।

কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪ ॥

কৃষি, গো-রক্ষণ ও বাণিজ্য এই কয়েকটি বৈশ্যের স্বাভাবিক কার্য্য এবং একমাত্র পরিচর্য্যাই শূদ্রজাতির স্বাভাবিক কর্ম্ম।৪৪।

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥৪৫॥

মনুষ্য স্ব স্ব কর্ম্মনিরত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, এক্ষণে স্বকর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগের যেরূপে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর।৪৫।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি
মানবঃ ॥ ৪৬ ॥

যাঁহা হইতে সকলের প্রবৃত্তি প্রাদুর্ভূত হইতেছে, যিনি এই বিশ্ব-সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া

...হিয়াছেন. মনুষ্য স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ।৪৬।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥৪৭॥

সম্যক অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ; কেন না, স্বভাববিহিত কার্য্যানুষ্ঠান করিলে দুঃখভোগ করিতে হয় না ।৪৭।

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥৪৮॥

হে কৌন্তেয় ! যেমন ধূমরাশি দ্বারা হুতাশন সমাচ্ছন্ন থাকে, তদ্রূপ সমস্ত কার্য্যই দোষ দ্বারা সংস্পৃষ্ট আছে, অতএব স্বাভাবিক কার্য্য দোষযুক্ত হইলেও কদাচ পরিত্যাগ করিবে না। ৪৮।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥৪৯॥

আসক্তিবিবর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয় ও স্পৃহাশূন্য মনুষ্য সন্ন্যাস দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিরূপ সত্ত্বশুদ্ধ কর্ম্মনিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।৪৯।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥৫০॥

হে কৌন্তেয় ! সিদ্ধ পুরুষ যাহাতে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, এক্ষণে সেই জ্ঞাননিষ্ঠার বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।৫০।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥৫১॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥৫২॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫৩॥

মনুষ্য বিশুদ্ধবুদ্ধিসংযুক্ত হইয়া ধৈর্য্য দ্বারা বুদ্ধি সংযত করিবে, শব্দাদি বিষয়-ভোগ পরিত্যাগ করিয়া রাগ ও দ্বেষ-বিরহিত হইবে। বাক্য,কায় ও মনোবৃত্তি সংযত করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয়,ধ্যান ও যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক লঘু আহার ও নির্জ্জনে বাস করিবে, এবং অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম,ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মমতাশূন্য হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিবে, এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে তিনি ব্রহ্মে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন। ৫১-৫৩।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥৫৪॥

তিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া শোক ও লোভের বশীভূত হন না, সকল প্রাণিগণের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন এবং আমার প্রতিও তাঁহার দৃঢ়ভক্তি জন্মে ।৫৪।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫॥

তিনি ভক্তিপ্রভাবে আমার স্বরূপ ও আমার সর্ব্বব্যাপিত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন ।৫৫।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥৫৬॥

লোকে আমাকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম-সমুদয় অনুষ্ঠান করত আমারই অনুকম্পায় অব্যয় শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।৫৬।

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥

তুমি মনোবৃত্তি দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হও এবং বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিয়া সতত আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর ।৫৭।

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥৫৮॥

মচ্চিত্ত হইলে তুমি আমার অনুগ্রহে দুস্তর দুঃখসকল উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইবে, কিন্তু যদি অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।৫৮।

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥৫৮॥

যদি তুমি অহঙ্কার প্রযুক্ত যুদ্ধ করিব না, এইরূপ অধ্যবসায় করিয়া থাক, তাহা হইলে ইহা নিতান্ত নিষ্ফল হইতেছে, কারণ, প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবে।৫৯।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥৬০॥

হে কৌন্তেয়! তুমি মোহবশতঃ এক্ষণে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ না, তোমাকে ক্ষত্রিয়সুলভ শূরতার বশীভূত হইয়া তাহা অবশ্যই অনুষ্ঠান করিতে হইবে।৬০।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া ॥৬১॥

হে অর্জ্জুন! যেমন সূত্রধর দারুযন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম ভূত-সকলকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর ভূতসকলের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন।।৬১॥

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥৬২॥

হে ভারত! এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহার অনুকম্পায় পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে।৬২।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু।।৬৩।।

আমি এই পরম গুহ্যজ্ঞানের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে ইহা সম্যক্ আলোচনা করিয়া, যেরূপ অভিলাষ হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর।৬৩।

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥৬৪॥

তুমি আমার একান্ত প্রিয়তর, এই নিমিত্ত তোমাকে পুনর্ব্বার পরম গুহ্য হিতকর বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর।৬৪।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥৬৫॥

তুমি আমাতে চিত্ত সমর্পণ এবং আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান ও আমাকে নমস্কার কর, তুমি আমার অতিশয় প্রিয়পাত্র, এই নিমিত্ত অঙ্গীকার করিতেছি, তুমি আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে।৬৫।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬॥

তুমি সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত করিব, এক্ষণে তুমি আর শোকাকুল হইও না।৬৬।

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি।।৬৭।।

আমি তোমাকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিলাম, তুমি ইহা ধর্ম্মানুষ্ঠানশূন্য, ভক্তিবিহীন ও শুশ্রূষাবিরহিত ব্যক্তিকে বিশেষতঃ যে

লোক আমার প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়া থাকে, তাহাকে কদাচ শ্রবণ করাইবে না। ৬৭।

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ম্॥৬৮॥

যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার ভক্তগণের নিকট এই পরম গুহ্য বিষয় কীর্ত্তন করিবেন, তিনি নিঃসন্দেহে আমাকে প্রাপ্ত হইবেন।৬৮।

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥৬৯॥

এই নরলোকে তাঁহা অপেক্ষা আমার প্রিয়কারী ও প্রিয়তম (আর কেহই) হইবে না। ৬৯।

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥৭০॥

যে ব্যক্তি আমাদিগের এই ধর্ম্মানুগত সংবাদ অধ্যয়ন করিবে, তাহার জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমারই অর্চ্চনা করা হইবে। ৭০।

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্য-
কর্ম্মণাম্॥ ৭১॥

যে মনুষ্য অসূয়াপরবশ না হইয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে এই সংবাদ শ্রবণ করিবে, সে সর্ব্ব-পাপবিমুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মাদিগের শুভ লোকসকল প্রাপ্ত হইবে। ৭১।

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসংমোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয়॥ ৭২॥

হে পার্থ! তুমি একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ করিয়াছ ত? হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞান-জনিত মোহ প্রণষ্ট হইল ত?। ৭২।

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥৭৩॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে অচ্যুত! তোমার অনুগ্রহে মোহান্ধকার নিরাকৃত হওয়াতে আমি স্মৃতিলাভ করিয়াছি, আমার সকল সন্দেহই দূর হইয়াছে, এক্ষণে তুমি যাহা কহিলে, আমি অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিব।৭৩।

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্॥ ৭৪॥

সঞ্জয় কহিলেন,—(মহারাজ!) আমি বাসুদেব ও অর্জ্জুনের এইরূপ অদ্ভুত ও লোম-হর্ষণ কথোপকথন শ্রবণ করিলাম। ৭৪।

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ
স্বয়ম্॥ ৭৫॥

ব্যাসের অনুগ্রহে আমি যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই পরম গুহ্য যোগ শ্রবণ করিয়াছি।৭৫।

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্ম্মুহুঃ॥৭৬॥

হে রাজন্! কৃষ্ণার্জ্জুনের এই পবিত্র ও অদ্ভুত সংবাদ স্মরণ করিয়া বারংবার হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইতেছি। ৭৬।

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ
পুনঃ॥ ৭৭॥

হে রাজন্! আমি শ্রীহরির সেই অলৌকিক রূপ স্মরণ পূর্ব্বক বারংবার বিস্ময় ও হর্ষসাগরে ভাসমান হইতেছি। ৭৭।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥৭৮॥

এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, যে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অবস্থান করিতে-ছেন, তাহাদেরই রাজ্যলক্ষ্মী, অভ্যুদয় ও নীতিলাভ হইবে। ৭৮।

ইতি মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

গীতামাহাত্ম্যম্।

ঋষিরুবাচ।

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত মে বদ।
পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্॥১॥

সূত উবাচ।

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যদ্ধি সপ্ততমং পরম্।
শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্॥২॥
কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ॥৩॥
অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীর্ত্তয়ন্তি চ।
তস্মাৎ কিঞ্চিদ্বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতম্॥৪॥
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥৫॥
সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ॥৬॥
সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতা-নাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ॥৭॥
গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ।
মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালক-হাস্যতাম্॥৮॥
যে শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্।
ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ॥৯॥
গীতাজ্ঞানেন সংবোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জ্জুনায় বৈ।
ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং বাথ নির্গুণম্॥১০॥
সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভক্তিমুক্তিসমুচ্ছ্রিতৈঃ।
ক্রমশশ্চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেম-ভক্ত্যাদি-কর্ম্মণি॥১১॥
সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্।
শ্রদ্ধাহীনস্য তৎ কার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ॥১২॥
গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্।
স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ॥১৩॥
যস্মাদ্গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুল-শীলতাম্॥১৪॥
গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবন্তদ্গৃহাশ্রমম্॥১৫॥
গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ প্রারব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং মানং মহত্তমম্॥১৬॥
গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং জগুঃ।
ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠা তপো যশঃ॥১৭॥
গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
গীতাগীতং ন যজ্জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্।
তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্॥১৮॥
তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রযোজিকা।
সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে॥১৯॥
যোঽধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে।
স্বপন্ জাগ্রন্ চলংস্তিষ্ঠন্ শত্রুভির্ন স হীয়তে॥২০॥
শালগ্রামশিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে।
তীর্থে নদ্যাং পঠেদ্গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্॥২১॥
দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি।
যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ॥২২॥
গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ॥২৩॥

যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভাসু চ।
যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং
লভেৎ ॥ ২৪ ॥
গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে।
ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন
সদক্ষিণাঃ ॥ ২৫ ॥
যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম্।
শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রাপ্নোতি পরং পদম্॥২৬॥
গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরাৎ।
বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্য্যা প্রিয়া
ভবেৎ ॥ ২৭ ॥
যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে॥২৮॥
অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ।
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চ্চনং গৃহে ॥২৯॥
তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ ক্বচিৎ।
ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ॥৩০॥
বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচন।
লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিঞ্চাব্যভি-
চারিণীম্ ॥ ৩১॥
জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীবগণৈঃ সহ।
প্রারব্ধং ভুঞ্জতো বাপি গীতাভ্যাসরতস্য
চ ॥৩২॥
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে।
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ।
ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমম্ভসা ॥৩৩॥
অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদিকৃতঞ্চ যৎ।
অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পর্শস্পর্শজং তথা ॥ ৩৪ ॥
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জ্জনিতঞ্চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন
তৎক্ষণাৎ ॥৩৫॥
সর্ব্বত্র প্রতিভোক্তা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্ব্বশঃ।
গীতাপাঠং প্রকুর্ব্বাণো ন লিপ্যতে কদাচন॥৩৬॥
রত্নপূর্ণাং মহীং সর্ব্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ।
গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধস্ফটিকবৎ সদা ॥ ৩৭॥

যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা।
স সাগ্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ
পণ্ডিতঃ ॥ ৩৮॥
দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি।
স এব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ব্ববেদার্থদর্শকঃ ॥৩৯॥
গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ত্ততে।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে॥৪০॥
নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেঽপি সর্ব্বদা।
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহ-
রক্ষকাঃ ॥৪১ ॥
গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদধ্রুবপার্ষদৈঃ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে॥৪২॥
যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা।
মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধয়া সহ॥৪৩॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ! গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্॥৪৪॥
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো
গুরুঃ ॥ ৪৫ ॥
গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকং পালয়া-
ম্যহম্ ॥৪৬॥
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রা হরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা ॥৪৭॥
গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি
তৎক্ষণাৎ ॥৪৮॥
গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মা বলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনা ॥৪৯
অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥৫০॥
ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্॥৫১

পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥৫২॥
ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥৫৩॥
তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেৎ ধ্রুবম্॥৫৪॥
এক মধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্॥৫৫॥
অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ।
প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্॥৫৬॥
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্তপঞ্চচতুষ্টয়ম্।
ত্রিদ্ব্যেকমেকমর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতন্তথা ॥৫৭॥
গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ।
স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥৫৮॥
গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ॥৫৯॥
গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রয়াতি যঃ।
স বৈকুণ্ঠমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥৬০॥
গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ॥৬১॥
গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ।
যদ্‌যৎ কর্ম্ম চ সর্ব্বত্র গীতাপাঠপ্রকীর্ত্তিমৎ।
তত্তৎ কর্ম্ম চ নির্দ্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ ॥৬২॥
পিতৄনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি।
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্‌যান্তি স্বর্গতিম্॥৬৩॥
গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।
পিতৃলোকং প্রয়ান্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বাদতৎপরাঃ॥৬৪॥
গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতঃ।
কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ ॥৬৫॥
পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্ ॥৬৬॥
শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ৬৭ ॥
গীতাদানপ্রভাবেন সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥৬৮॥
সম্যক্ শ্রুত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ।
তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেপ্সিতম্ ॥ ৬৯ ॥
দেহং মানুষমাশ্রিত্য চাতুর্ব্বর্ণ্যেষু ভারত।
ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্।
হস্তাত্ত্যক্ত্বামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্নুতে ॥৭০॥
জনঃ সংসারদুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ।
পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ ॥৭১॥
গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ;
নির্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং-পদম্॥৭২॥
গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনেষূচ্চারকেষু চ।
জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৭৩ ॥
যোঽভিমানেন গর্ব্বেণ গীতানিন্দাং করোতি চ।
সমেতি নরকং ঘোরং যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥ ৭৪ ॥
অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৭৫ ॥
গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ।
স শূকরভবাং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি ॥ ৭৬ ॥
চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ।
ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ ॥৭৭॥
যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ।
নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ॥৭৮॥
গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা।
নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥৭৯॥
বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্যবস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ।
অনেকৈর্ব্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ ॥৮০॥

সূত উবাচ।

মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্।
গীতান্তে পঠতে যস্তু যথোক্তফলভাগ্-
ভবেৎ ॥৮১॥

গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥ ৮২ ॥

এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ
শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতি-
মাপ্নুয়াৎ ॥৮৩॥

শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ।
তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্বসুখাব-
হম্ ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্ ॥

মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মুচিরাম গুড় মহাশয় এই জগৎ পবিত্র করিবার জন্য, কোন শকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহা লেখে না। ইতিহাস এরূপ অনেক প্রকার বদ্‌মাইসি করিয়া থাকে। এ দেশে ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, নচেৎ উচিত ব্যবস্থা করা যাইত।

যশোদা দেবীর গর্ভে সাফল্যরাম গুড়ের ঔরসে তাঁহার জন্ম। ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই; কেন না, উচ্চবংশের কথা কিছুই বলিতে পারা গেল না। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তিনি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব। গুড় শুনিয়া কেহ মনে না করেন যে, তিনি মিষ্ট-বিশেষ হইতে জন্মিয়াছিলেন।

সাফল্যরাম গুড় কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নিবাস সাধুভাষায় মোহনপল্লী, অপর ভাষায় মোনাপাড়া। মোহনপল্লী ওরফে মোনাপাড়ায় কেবল ঘরকতক কৈবর্ত্তের বাস। গুড়মহাশয় এক ব্রাহ্মণ—যেমন একচন্দ্র রজনী আলোকময়ী করেন, যেমন এক বিষ্ণুই পুরুষোত্তম, যেমন এক বার্ত্তাকুদগ্ধ গুড় মহাশয়ের অন্নরাশির উপর শোভা করিতেন, তেমনি সাফল্যরাম একা মোহনপল্লী উজ্জ্বল করিতেন। শ্রাদ্ধশান্তিতে কাঁচা কদলী, আতপ তণ্ডুল এবং দক্ষিণা, ষষ্ঠী-মাকালের পূজায়—অন্নপ্রাশনাদিতে নারিকেল নাড়ু, ছোলা, কলা আদি তাঁহার লাভ হইত। সুতরাং যাজনক্রিয়ায় বিশেষ মনোযোগ ছিল। তাঁহারই ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়া মুচিরাম শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিলেন।

জন্মগ্রহণের পর মুচিরাম দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। দেখিয়া যশোদা, সেটা বালকের অসাধারণ পৌরুষের লক্ষণ বিবেচনা করিয়া, অতিশয় গর্ব্বান্বিতা হইলেন। যথাকালে মুচিরামের অন্নপ্রাশন হইল। নামকরণ হইল মুচিরাম। এত নগেন্দ্র, গজেন্দ্র, চন্দ্রভূষণ, বিধুভূষণ থাকিতে তাঁহার মুচিরাম নাম হইল কেন, তাহা আমি সবিশেষ জানি না, তবে দুষ্টলোকে বলিত যে, যশোদা দেবীর যৌবনকালে কোন কালো-কোলো কোঁকড়া-চুল নধরশরীর মুচিরাম দাসনামা কৈবর্ত্তপুত্র তাঁহার নয়নপথের পথিক হইয়াছিল, সেই অবধি মুচিরাম নামটি যশোদার কাণে মিষ্ট লাগিত।

যাহাই হউক, যশোদা নাম রাখিলেন মুচিরাম। নাম পাইয়া মুচিরামশর্ম্মা দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে "মা" "বাবা" "দু" "দে" ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখিলেন। তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তির বলে মিছাকান্নায় এক বৎসর পার হইতে না হইতেই সুপণ্ডিত হইলেন। তিন বৎসর যাইতে না যাইতে গুরুভোজন-দোষ উপস্থিত হইল এবং পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতেই মহামতি মুচিরাম মাকে পিতৃ উচ্চারণ করিতে এবং বাপকে শালা বলিতে শিখিলেন; যশোদা কাঁদিয়া বলিতেন, এমন গুণের ছেলে বাঁচ্‌লে হয়।

পাঁচ বৎসরে সাফল্যরাম গুড়মহাশয়

কিছু গোলে পড়িলেন। যশোদা ঠাকুরাণীর সাধ, পাঁচ বৎসরে পুত্রের হাতে-খড়ি হয়। সর্ব্বনাশ! সাফলরামের তিনপুরুষের মধ্যে সে কাজ হয় নাই। মাগী বলে কি? যে দিন কথা পড়িল, সেদিন সাফলরামের নিদ্রা হইল না।

যমুনার জল উজান বহিতে পারে, তবু গৃহিণীর বাক্য নড়িতে পারে না। সুতরাং সাফলরাম হাতে-খড়ির উদেযাগ দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিন ক্রোশের মধ্যে পাঠশালা বা গুরুমহাশয় নাই। কে লেখাপড়া শিখাইবে? সাফলরাম বিষণ্ণবদনে বিনীতভাবে যশোদা দেবীর শ্রীপাদপদ্মে এই সংবাদ সুনিবেদিত করিলেন। যশোদা বলিলেন, "ভাল, তুমি কেন আপনিই হাতে-খড়ি দিয়া ক, খ, শিখাও না।" সাফলরাম একটু ম্লান হইয়া বলিলেন, "হাঁ, তা আমি পারি, তবে কি জান, শিষ্যসেবক যজমানের জ্বালায়—আজি কি রান্না হইল?" শুনিবামাত্র যশোদা দেবীর মনে পড়িল, আজি কৈবর্ত্তেরা পাতিলেবু দিয়া গিয়াছে। বলিলেন, "অধঃপেতে মিন্সে"—এই বলিয়া পতিপুত্রপ্রাণা যশোদা দেবী বিষণ্ণমনে সজলনয়নে পাতিলেবু দিয়া পান্তা ভাত খাইতে বসিলেন।

অগত্যা মুচিরাম অন্যান্য বিদ্যা অভ্যাসে সানুরাগ হইলেন। অন্যান্য বিদ্যার মধ্যে—"পরা অপরা চ"—গাছে উঠা, জলে ডোবা, এবং সন্দেশ চুরি। কৈবর্ত্ত যজমানদিগের কল্যাণে গুড়ের ঘরে সন্দেশের অভাব নাই। নারিকেলসন্দেশ এবং অন্যান্য যে সকল জাতীয় সন্দেশের সঙ্গে ছানার সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই, যাহা সর্ব্বদা মুচিরামের ঘরে থাকিত, সে সকল মুচিরামের বিদ্যাভ্যাসের কারণ হইল। কৈবর্ত্তের ছেলেদের সঙ্গে মুচিরামের প্রত্যহ একটি নূতন কোন্দল হইত—শুনা গিয়াছে, কৈবর্ত্তদিগের ঘরেও খাবার চুরি যাইত।

নবম বৎসরে মুচিরামের উপনয়ন হইল। তার পর সাফলরাম এক বৎসর প্রিয়তম পুত্রকে সন্ধ্যা আহ্নিক শিখাইলেন। এক বৎসরে মুচিরাম আহ্নিক শিখিয়াছিলেন কি না, আমরা জানি না। কেন না, প্রমাণাভাব। তার পর মুচিরাম কখন সন্ধ্যা আহ্নিক করেন নাই।

তার পর একদিন সাফলরাম গুড় অকস্মাৎ ওলাউঠারোগে প্রাণত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যশোদার আর দিন যায় না, যজমানদিগের পৌরোহিত্য কে করে? কৈবর্ত্তেরা আর এক ঘর বামন আনিল। যশোদা অন্নকষ্টে—ধান ভানিতে আরম্ভ করিলেন।

যখন মুচিরামের বয়স দশ বৎসর, কৈবর্ত্তেরা চাঁদা করিয়া একটা বারোইয়ারি পূজা করিল। যাত্রা দিবার জন্য বারোইয়ারির কৈবর্ত্তেরা শস্তা দরে হারাণ অধিকারীকে তিন দিনের জন্য বায়না করিয়া আনিয়া কলাগছের উপর সরা জ্বালিয়া, তিন রাত্রি যাত্রা শুনিল। মুচিরাম এই প্রথম যাত্রা শুনিল। যাত্রার গান, যাত্রার গল্প অনেক শুনিয়াছিল—কিন্তু একটা আস্তযাত্রা, এই প্রথম শুনিল, চূড়া ধড়া ঠেঙ্গা লাঠি সহিত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এই প্রথম দেখিল। আহ্লাদ উছলিয়া উঠিল। নিশ্চিত সংবাদ রাখি যে, পরদিন মুচিরাম গালাগালি, মারামারি বা চুরি, মাতাকে প্রহার, এ সকলের কিছুই করে নাই।

মুচিরামের একটা গুণ ছিল, মুচিরাম সুকণ্ঠ। প্রথমদিন যাত্রা শুনিয়া বহুযত্নে একটা গানের মোহাড়াটা শিখিয়াছিল। পর দিন প্রভাত হইতে মাঠে মাঠে সেই গান গাইয়া

ফিরিতে লাগিল। দৈবাৎ হারাণ অধিকারী লোটা হাতে, পুষ্করিণীতে হস্তমুখপ্রক্ষালনাদির অনুরোধে যাইতেছিলেন, প্রভাত বায়ু-পরিচালিত হইয়া মুচিরামের সুস্বর অধিকারী মহাশয়ের কাণের ভিতর গেল। কাণে যাইতে যাইতে মনের ভিতর গেল—মনের ভিতর গিয়া কল্পনার সাহায্যে, টাকার সিন্দুকের ভিতরও প্রবেশ করিল! অধিকারী মহাশয়ের নিকট গলার আওয়াজ, টাকার আওয়াজে পরিণত হয়। সে দোষে অধিকারী মহাশয় একা দোষী নহেন, জিজ্ঞাসা করিলে অনেক উকীল মহাশয়েরা ইহার কিছু নিগূঢ় তত্ত্ব বলিয়া দিতে পারিবেন। তাঁহাদের কাছেও গলার আওয়াজ টাকার আওয়াজে পরিণত হয়। উকীল বাবুদেরই বা দোষ কি? Glorious British Constitution! হায়! গলাবাজি সার!

অধিকারী মহাশয়—মানুষের সঙ্গে প্রেম করেন না—ব্রিটিশ পার্লিমেণ্টের মত, এবঞ্চ কুরঙ্গিণীসদৃশ মনুষ্যকণ্ঠেই মুগ্ধ—অতএব তিনি হাত নাড়িয়া মুচিরামকে ডাকিলেন। মুচিরাম আসিল। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার যাত্রার দলে থাকিবে?"

মুচিরাম আহ্লাদে আটখানা। মাকে জিজ্ঞাসার অপেক্ষা রাখিল না—তখনই সঙ্গে যায়। কিন্তু অধিকারী মনে করিল যে, পরের ছেলে না বলিয়া লইয়া যাওয়া কিছু নয়। অতএব মুচিরামকে সঙ্গে করিয়া তাহার মার নিকটে গেল।

শুনিয়া যশোদা বড় কাঁটা-কাটা আরম্ভ করিল—সবে একটি ছেলে—আর কেহ নাই—কি প্রকারে ছাড়িয়া দিবে? এদিকে আবার অন্ন জুটে না—যদি একটা খাবার উপায় হইতেছে—কেমন করিয়াই বা না বলেন. বিধাতা কি আর এমন সুযোগ করিয়া দিবেন? আমি না দেখিতে পাই, তবু ত মুচিরাম ভাল খাইবে, ভাল পরিবে। যশোদা যাত্রাওয়ালার দুঃখ জানিত না, অগত্যা পাঁচ টাকা মাসিক বেতন রফা করিয়া যশোদা মুচিরামকে হারাণ অধিকারীর হস্তে সমর্পণ করিল। তার পর আছাড়িয়া পাড়িয়া স্বামীর জন্য কাঁদিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মুচিরাম অল্পদিনেই দেখিল যে, যাত্রাওয়ালার জীবন সুখের নয়। যাত্রাওয়ালা কেবল কোকিলের মত গান করিয়া ডালে ডালে মুকুল ভোজন করিয়া বেড়ায় না! অল্পদিনে মুচিরামের শরীর শীর্ণ হইল। এ গাম ও গ্রাম ছুটাছুটী করিতে করিতে সকল দিন আহার হয় না; রাত্রি জাগিয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত; চুলের ভারে মাথায় উকুনে ঘা করিল; গায়ে খড়ি উড়িতে লাগিল; অধিকারীর কাণমলায় দুই কাণে ঘা হইল। শুধু তাই নয়; অধিকারী মহাশয়ের পা টিপিতে হয়, তাঁকে বাতাস করিতে হয়, তামাক সাজিতে হয়, আরও অনেক রকম দাসত্ব করিতে হয়। অল্পদিনেই মুচিরামের সোণার মেঘ বাষ্পরাশিতে পরিণত হইল।

মুচিরামের আরও দুর্ভাগ্য এই যে, বুদ্ধিটা বড় তীক্ষ্ণ নহে। গীতের তাল যে পুষ্করিণীতীরস্থ দীর্ঘবৃক্ষে ফলে না, ইহা বুঝিতে তাহার বহুকাল গেল। ফলে, তালিমের সময়ে তালের কথা পড়িলে, মুচিরাম অন্যমনস্ক হইত—মনে পড়িত, ম কেমন তালের বড়া কুড়াইয়া দিয়া.....চক্ষু দিয়া এবং রসনা আপনার দিয়া জলাইত।

রাম হ? আবা[illegible] করা আরও দায়—

কিছুতেই মুখস্থ হইত না—কাণমলায় কাণমলায় কাণ রাঙ্গা হইয়া গেল। সুতরাং আসরে গায়িবার সময়ে পিছন হইতে তাহাকে বলিয়া দিতে হইত। তাহাতে মধ্যে মধ্যে বড় গোল বাধিত—সকল সময়ে ঠিক শুনিতে বা বুঝিতে পারিত না। একদিন পিছন হইতে বলিয়া দিতেছে—

"নীরদকুন্তলা—লোচনচঞ্চলা দধতি সুন্দররূপং"

মুচিরাম গায়িল—"নীরদ-কুন্তলা" থামিল। —অবার পিছন হইতে বলিল, "লোচনচঞ্চলা" মুচিরাম ভাবিয়া চিন্তিয়া গায়িল. "লুচি চিনি ছোলা।" পিছন হইতে বলিয়া দিল—"দধতি সুন্দররূপং" মুচিরাম না বুঝিয়া গায়িল. "দধিতে সন্দেশরূপং।" সে দিন আর গায়িতে পাইল না।

মুচিরামকে কৃষ্ণ সাজিতে হইত—কিন্তু কৃষ্ণের বক্তব্য সকল তাহাকে পিছন হইতে বলিয়া দিতে হইত—কেবল "আ—বা—আ—বা ধবলী" টি মুখস্থ ছিল। একদিন মানভঞ্জন যাত্রা হইতেছে—পিছন হইতে মুচিরামকে বক্তৃতা শিখাইয়া দিতেছে। কৃষ্ণকে ডাকিতে হইবে, "মানময়ি রাধে! একবার বদন তুলে কথা কও।" মুচিরাম সবটা শুনিতে না পাইয়া কতকদূর বলিল, "মানময়ি রাধে, একবার বদন তুলে—" সেই সময়ে বেহালাওয়ালা মৃদঙ্গীর হাতে তামাকের কল্কে দিয়া বলিতেছিল, "গুড়ুক খাও"—শুনিয়া মুচিরাম বলিল, "রাধে, একবার বদন তুলে—গুড়ুক খাও।" হাসির চোটে যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

মুচিরাম প্রথমে বুঝিতে পারিল না—হাসি কিসের,—যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল কেন? কিন্তু যখন দেখিল অধিকারী সাজঘর হইতে, বে[ত] আসিয়া এক গাছা পটিয়া ধরিয়া, [স্ম]রণ হই[য়া] তাহার দিকে ধাবমা[ন] তখন মুচিরাম হঠাৎ বুঝিল যে, এই বাঁক তাহার পৃষ্ঠদেশে অবতীর্ণ হইবার কিছু গুরুতর সম্ভাবনা—অতএব কথিত পৃষ্ঠদেশ স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া আশু প্রয়োজন। এই ভাবিয়া মুচিরাম অকস্মাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া নৈশ অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল।

অধিকারী মহাশয় বাঁকহস্তে তৎপশ্চাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া, মুচিরামকে না দেখিতে পাইয়া তাহার ও তাহার পিতামহ, মাতা ও ভগিনীর নানাবিধ অযশ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মুচিরামও এক বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া নানাবিধ অস্ফুটস্বরে অধিকারী মহাশয়ের পিতৃমাতৃসম্বন্ধে তদ্রূপ অপরাধ করিতে লাগিল। অধিকারী মুচিরামের সন্ধান না পাইয়া সাজঘরে গিয়া, বেশ ত্যাগ করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। দেখিয়া মুচিরাম বৃক্ষচ্ছায়া ত্যাগ করিয়া, রুদ্ধদ্বারসমীপে দাঁড়াইয়া অধিকারীকে নানাবিধ অবক্তব্য কদর্য্য ভাষায় মনে মনে সম্বোধন করিতে লাগিল; এবং উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উত্থিত করিয়া তাহাকে কদলী-ভোজনের অনুমতি করিল। তৎপরে রুদ্ধকবাটকে বা কবাটের অন্তরালস্থিত অধিকারীর বদনচন্দ্রকে একটি লাথি দেখাইয়া মুচিরাম ঠাকুরবাড়ীর রোয়াকে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল।

প্রভাতে উঠিয়া অধিকারীমহাশয় গ্রামান্তরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শুনিলেন, মুচিরাম আইসে নাই—কেহ কেহ বলিল, "তাহাকে খুঁজিয়া আনিব?" অধিকারী মহাশয় গালি দিয়া বলিলেন, "জুটবে হয়, আপনি জুটবে, এখন আমি খুঁজে বেড়াতে পারি না।' দয়ালুচিত্ত বেহালাওয়ালা বলিল, "ছেলেমানুষ - যদি নাই জুটতে পারে—আমি খুঁজে আনিব।" অধিকারী ধমকাইলেন—মনের প্রত্যাহ[ী]ন মনে ইচ্ছা, মুচিরামের হাত হইতে উদ্ধার

পান, এবং সেই সঙ্গে তাহার পাওনা টাকাগুলি ফাঁকি দেন। বেহালাওয়ালা ভাবিল—মুচিরাম কোনরূপে জুটিবে। আর কিছু বলিল না।

যাত্রার দল চলিয়া গেল—মুচিরাম জুটিল না। রাত্রি-জাগরণ—দেবালয়বারাণ্ডায় সে অকাতরে নিদ্রা দিতেছিল। উঠিয়া দল চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এমন বুদ্ধি নাই যে, অধিকারী কোন্ পথে গিয়াছে, সন্ধান করিয়া সেই পথে যায়; কেবল কাঁদিতে লাগিল। পূজার বামন অনুগত করিয়া বেলা তিন প্রহরে ভুটি ঠাকুরের প্রসাদ খাইতে দিল। খাইয়া, মুচিরাম কান্নার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ করিল। যত রাত্রি নিকট হইতে লাগিল তত ভাবিতে লাগিল—আমি কেন পলাইলাম! আমি কেন দাঁড়াইয়া মার খাইলাম না!

দ্বিজ দর্পনারায়ণ বলে, এবার যখন বাঁক উঠিবে দেখিবে, পিঠ দিও। তোমার গোষ্ঠীর বাপ-চৌদ্দপুরুষ বুড়া সেনরাজার আমল হইতে কেবল পিঠ পাতিয়া দিয়াই আসিতেছে। তুমি পলাইবে কোথায়? এ সুসভ্যজাতের অধিকারীরা মুচিরাম দেখিলে বাক পেটাই করিয়া থাকে—মুচিরামেরা পিঠ পাতিয়াই দেয়। কেহ পলায় না—রাখাল ছাড়া কি গরু থাকিতে পারে বাপু? ঘাস-জলের প্রয়োজন হইলেই তোমার যখন রাখাল ভিন্ন উপায় নাই, তখন পাঁচনবাড়িকে প্রাতঃপ্রণাম করিয়া গোজন্ম সার্থক কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঈশানবাবু একজন সৎকুলোদ্ভূত কায়স্থ। অতি ক্ষুদ্র লোক—কেন না, বেতন এক শত টাকামাত্র—কোন জেলার ফৌজদারী আপিসের হেড কেরাণী! বাঙ্গালা দেশে মনুষ্যত্ব বেতনের ওজনে নির্ণীত হয়—কে কত বড় বাঁদর, তার ল্যাজ মাপিয়া ঠিক করিতে হয়। এমন অধঃপতন আর কখন কোন দেশের হয় নাই। বন্দী চরণশৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য দেখাইয়া বড়াই করে।

ঈশানবাবু ক্ষুদ্র ব্যক্তি—ল্যাজ খাটো, বানরত্বে খাটো—কিন্তু মনুষ্যত্বে নহে। যে গ্রামে হারাণ অধিকারী এই অপূর্ব মানভঞ্জন যাত্রা করিয়াছিলেন, ঈশানবাবুর সেই গ্রামে বাস। যাত্রাটা যে সময়ে হইয়াছিল, সে সময়ে তিনি ছুটী লইয়া বাড়াতে ছিলেন। যাত্রার ব্যাপার তিনি কিছু জানিতেন কি না, বলিতে পারি না, যাত্রার পরদিন সন্ধ্যাকালে তিনি পথে বেড়াইতেছেন, দেখিলেন, একটি ছেলে—শুষ্ক শরীর, দীর্ঘকেশ—অনুভবে যাত্রার দলের ছেলে—পথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে।

ঈশানবাবু ছেলেটির হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদচিস্ কেন বাবা?"

ছেলে কথা কয় না। ঈশানবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

ছেলে বলিল, "আমি মুচিরাম।"

ঈশা। তুমি কাদের ছেলে?

মুচি। বামনদের।

ঈশা। কোন্ বামনদের?

মুচি। আমি গুড়েদের ছেলে।

ঈশা। তোমার বাড়া কোথায়?

মুচি। আমাদের বাড়ী মোনাপাড়া।

ঈশা। সে কোথা?

তা ত মুচিরামের বিদ্যার মধ্যে নহে। যাই হোক্, ঈশানবাবু অল্পসময়ে মুচিরামের দুর্ঘটনা বুঝিয়া লইলেন; "তোমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব," এই বলিয়া মুচিরামকে আপনার বাড়ী লইয়া গেলেন; মুচিরাম হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। ঈশানবাবু

তাহার আহারাদি ও অবস্থিতির উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কিন্তু যোনাপাড়ার ত কোন ঠিকানা হইল না। সুতরাং মুচিরাম ঈশানবাবুর গৃহে বাস করিতে লাগিল। সেখানে আহার-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা উত্তম, এবং কাণমলার অত্যন্তাভাব, দেখিয়া মুচিরামও বাড়ীর জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইল না।

এদিকে ঈশানবাবুর ছুটী ফুরাইল—সপরিবারে কর্ম্মস্থানে আসিবেন। অগত্যা মুচিরামও সঙ্গে চলিল। কর্ম্মস্থানে গিয়াও ঈশান যোনাপাড়ার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেন না। অগত্যা মুচিরাম তাঁহার গলায় পড়িল। মুচিরামও যেখানে আহারের ব্যবস্থা উত্তম, সেখানে গলায় পড়িতে নারাজ নহে—তবে ঈশানবাবুর একটি ব্যবস্থা মুচিরামের বড় ভাল লাগিল না। ঈশানবাবু বলিলেন, "বাপু, যদি গলায় পড়িবে, একটু লেখাপড়া শিখিতে হইবে।" ঈশানবাবু তাহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন।

এদিকে মুচিরামের মা অনেক দিন হইতে ছেলের কোন সংবাদ না পাইয়া পাড়ায় পাড়ায় বিস্তর কাঁদাকাটি করিয়া বেড়াইয়া শেষে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিল। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রুগ্ন হইল। রুগ্ন হইয়া মরিয়া গেল।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এদিকে যশোদানন্দন শ্রীশ্রীমুচিরাম শর্ম্মা—ঈশানমন্দিরে সুবিরাজমান- সম্পূর্ণরূপে মাতৃবিস্মৃত। যদি কখন মাকে মনে পড়িত, তবে সে আহারের সময়—ঈশানবাবুর ঘরের প্রফুল্ল-মল্লিকাসন্নিভ সিদ্ধান্ন, দানাদার গব্য ঘৃত, ঝোলে নিমগ্ন রোহিতমৎস্য, পৃথিবীর ন্যায় নিটোল গোলাকার সম্ভর্জ্জিত লুচির রাশি—এই সকল পাতে পাইলে মুচিরাম মনে করিতেন, "মা বেটী কি ছাই-ই আমাকে খাওয়াইত!" সে সময়ে মাকে মনে পড়িত—অন্য সময়ে নহে।

মুচিরামের পাঠশালার লেখাপড়া সমাপ্ত হইল—অর্থাৎ গুরুমহাশয় বলিল, সমাপ্ত হইয়াছে। মুচিরামের কোন গুণ ছিল না, এমত বলি না; তাহা হইলে এ ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইতাম না। মুচিরামের কণ্ঠস্বর ভাল ছিল বলিয়াছি—গুণ নম্বর এক। গুণ নম্বর দুই, তাহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর হইল। আর কিছুই হইল না। ঈশানবাবু মুচিরামকে ইংরেজি স্কুলে পাঠাইলেন।

মুচিরাম ধেড়ে ছেলে, স্কুলে ঢুকিয়া বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হইল। মাষ্টারেরা তামাসা করে, ছোট ছোট ছেলেরা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসে। মুচিরাম রাগ করে, কিন্তু পড়ে না। সুতরাং মাষ্টারেরা হারাণ অধিকারীর পথে গেলেন। আবার কাণমলায় কাণমলায় মুচিরামের কাণ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। প্রথমে কাণমলা, তার পর বেত্রাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, চপেটাঘাত, কীলাঘাত, এবং ঘুস্যাঘাত। ঈশানবাবুর ঘরের তপ্তলুচির জোরে মুচিরাম নির্ব্বিবাদে সব হজম করিল।

এইরূপে মুচিরাম তপ্তলুচি ও বেত খাইয়া স্কুলে পাঁচ সাত বৎসর কাটাইল। কিছু হইল না। ঈশানবাবু তাহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। ঈশানবাবুর দয়ার শেষ নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি—মুচিরামের হাতের লেখাও ভাল—ঈশানবাবু মুচিরামের একটি দশ টাকার মুহুরিগিরি করিয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, "ঘুস ঘাস লইও না বাপু, তা হলে তাড়াইয়া দিব।" মুচিরাম শর্ম্মা প্রথম দিনেই একটা হুকুমের চোরাও নকল দিয়া আট গণ্ডা পয়সা হাত

করিলেন, এবং সন্ধ্যার অল্পকাল পরেই তাহা প্রতিবাসিনী কুলটাবিশেষের পাদপদ্মে উৎসর্গ করিলেন।

এদিকে ঈশানবাবুও প্রাচীন হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ইহার পরেই পেন্সন লইয়া স্বকর্ম্ম হইতে অবসর লইলেন এবং মুচিরামকে পৃথক্ বাসা করিয়া দিয়া সপরিবারে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। মুচিরাম ঈশানবাবুকে একটু ভয় করিত—এক্ষণে তাহার পোয়া-বারো পড়িয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পোয়া-বারো—মুচিরাম জেলা লুঠিতে লাগিল। প্রথমে লোকের কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া দুই চারি আনা লইত। তার পর দাঁও শিখিল। ফেলু সেখের ধানগুলি জমীদার জোর করিয়া কাটিয়া লইতে উদ্যত, সাহেব দয়া করিয়া পুলিসকে হুকুম দিলেন, ফেলুর সম্পত্তি রক্ষা করিবে। সাহেব হুকুম দিলেন, কিন্তু পরওয়ানাখানি লেখা আর হয় না। পরওয়ানা লেখা মুচিরামের হাত। পরওয়ানা যাইতে যাইতে ধান থাকে না; ফেলু মুচিরামকে এক টাকা, দুই টাকা, তিন টাকা, ক্রমে পাঁচ টাকা স্বীকার করিল—তৎক্ষণাৎ পরওয়ানা বাহির হইল। তখন ম্যাজিষ্ট্রেটেরা স্বহস্তে জোবানবন্দী লইতেন না—এক এক কোণে বসিয়া এক এক জন মুহুরি ফিস্‌ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, আর যাহা ইচ্ছা তাহা লিখিত। সাক্ষীরা একরকম বলিত, মুচিরাম আর একরকম জোবানবন্দী লিখিতেন, মোকদ্দমা বুঝিয়া কি সাক্ষী প্রতি চারি আনা, আট আনা, এক টাকা পাইতেন। মোকদ্দমা বুঝিয়া মুচি দাঁও মারিতেন; অধিক টাকা পাইলে সব উল্টা লিখিতেন। এইরূপে নানা প্রকার ফিকির ফন্দিতে মুচিরাম অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন—তিনি একা নহে, সকলেই করিত তবে মুচি কিছু অধিক নিলজ্জ—কখন কখন লোকের টেঁক হইতে টাকা কাড়িয়া লইত।

যাই হৌক, মুচি শীঘ্রই বড়মানুষ হইয়া উঠিল—কোন মুচি না হয়? অচিরাৎ সেই অকুতনাম্নী প্রতিবাসিনী স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইল! মদ, গাঁজা, গুলী, চরস, আফিঙ্গ—যাহার নাম করিতে আছে এবং যাহার নাম করিতে নাই—সকলই মুচিবাবুর গৃহকে অহর্নিশি আলোক ও ধূমময় করিতে লাগিল। মুচিরামের চেহারা ফিরিতে লাগিল গালে মাস লাগিল—হাড় ঢাকিয়া আসিল—বর্ণ জাপান লেদার ছাড়িয়া দিল্লীর নাগরায় পৌঁছিল। পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য জন্মিতে লাগিল—শাদা, কালো, নীল, জরদা, রাঙ্গা, গোলাপী প্রভৃতি নানা বর্ণের বস্ত্রে মুচিরাম সর্ব্বদা রঞ্জিত। রাত্রিদিন মাথায় তেড়িকাটা, অধরে তাম্বূলের রাগ এবং কণ্ঠে নিধুর টপ্পা। সুতরাং মুচিরামের পোয়া-বারো।

দোষের মধ্যে সাহেব বড় খিটখিট করে। মুচিরাম একে ঘোরতর বোকা, কোন কর্ম্ম ভাল করিয়া করিতে পারিত না, তাহাতে আবার দুর্জ্জয় লোভ—সকলতাতে মুচিরাম গালি খাইত। সাহেবটাও বড় বদরাগী—অনেক সময়ে মুচিরামকে কাগজপত্র ছুড়িয়া মারিত। কখন খাইতে খাইতে সাহেব রিপোর্ট শুনিতেছে—সে সময়ে মুচিরামকে রুটী-বিসকুট ছুড়িয়া মারিত। সাহেবের ভিতরে ভিতরে হৃদয়ে দয়া ছিল।—নচেৎ মুচিরামের চাকরী অধিককাল টিকিত না।

সৌভাগ্যক্রমে সে সাহেব বদলী হইয়া গেল, আর একজন আসিল। ইংলণ্ড হইতে

আমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য যে সকল রাজপুরুষ প্রেরিত হন, অনেকেই সুবুদ্ধি ও সুপণ্ডিত বটে. কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক একজন অতি নির্ব্বোধ ব্যক্তি উচ্চবেতন পাইবার জন্য প্রেরিত হইয়া থাকেন। এই সাহেবটি তাহারই একজন।

এই নূতন সাহেবটির নাম Grongerhom – লিখিবার সময় লোকে গঙ্গারহাম—বলিবার সময়ে বলিত গঙ্গারাম সাহেব। গঙ্গারাম সাহেব মোকদ্দমা করিতে গিয়া কেবল ডিসমিশ করিতেন। ইহাতে দুইটি সুবিধা ছিল—এক, এক ছত্র রায় লিপিবদ্ধ হইত, দ্বিতীয়, আপীল নাই। অন্যান্য সকল কর্ম্মের ভার সেরেস্তাদার এবং হেড কেরাণীর উপর ছিল। যত দিন সাহেব ঐ জেলায় ছিলেন, একদিনের জন্য একখানি চিঠি স্বহস্তে মুশাবিদা করেন নাই – হেড কেরাণী সব করিত।

সাহেব প্রথম আসিয়া, মুচিরামের কালোকোলো নধর সুচিক্কণ শরীরটি দেখিয়া এবং তাহার আভূমিপ্রণত ডবল সেলাম দেখিয়া একেবারে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আপিসের মধ্যে এই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক। সে বিশ্বাস তাঁহার কিছুতেই গেল না, যাইবারও কোন কারণ ছিল না—কেন না, কাজ-কর্ম্মের তিনি খবর রাখিতেন না। একদিন আপিসের মীর মুন্সী, মিরজা গোলাম, সফর খাঁ সাহেব, দুনিয়াদারি নামাফিক মনে করিয়া ফৌত করিলেন। সাহেব পরদিনেই মুচিরামকে ডাকিয়া তৎপদে অভিষিক্ত করিলেন। মীর মুনশীর বেতন কুড়ি টাকা—কিন্তু বেতনে কি করে? পদটি রুধিরে পরিপ্লুত। অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ মুচিরাম শর্ম্মা রুধির সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

দোষ কি? অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। দুইটা একজনে পারে না—দিও-জিনিস হইতে দর্পনারায়ণ পুতিতুণ্ড পর্য্যন্ত কেহ পারিল না। মুচিরাম বিদ্যাচিন্তা করিতে সক্ষম নহেন, কোষ্ঠীতে লেখে নাই—অতএব বিষ্ণুশর্ম্মার উপদেশানুসারে মৃত্যুভয়রহিত হইয়া অর্থচিন্তায় প্রবৃত্ত। যদি সেই হিতোপদেশগুলি অধীত হইবার যোগ্য হয়—যদি সে গ্রন্থ এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেও পূজার যোগ্য হয়—তবে মুচিরামও প্রাজ্ঞ। আর এ দেশের সকল মুচিই প্রাজ্ঞ।

বিষ্ণুশর্ম্মা ভারতবর্ষের মাকিয়াবেল্লি—চাণক্য ভারতের রোশ-ফুকেল। যাহারা এরূপ গ্রন্থ বিদ্যালয়ে বালকদিগকে পড়াইবার নিয়ম করিয়াছে, দর্পনারায়ণ তাহাদিগকে পাইলে বেত্রাঘাত করিতে ইচ্ছুক আছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মুচিরাম দুই তিন বৎসর মীর মুন্সীগিরি করিল—তার পর কালেক্টরীর পেস্কারী খালি হইল। পেস্কারীতে বেতন পঞ্চাশ টাকা—আর উপার্জ্জনের ত কথাই নাই। মুচিরাম ভাবিল, কপাল ঠুকিয়া একখানা দরখাস্ত করিব।

তখন কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি হইত। সেখানে সে সময়ে হোম নামা এক সাহেব কালেক্টর ছিলেন। হোম সাহেবের মেজাজ-মরজি কিছু বেতর। মুচিরামের আর কোন বুদ্ধি ছিল না—কিন্তু সাহেবের মেজাজ বুঝা বুদ্ধিটা ছিল; প্রায় বানরগোষ্ঠীর সে বুদ্ধি থাকে।

দর্পনারায়ণ ভণে, কে বানর? যে মেজাজ বুঝে, না যাহার মেজাজ বুঝিতে হয়? যে কলা খায়, না যে কদলী প্রলোভন দেখায়?

মুচিরাম একখানি ইংরেজি দরখাস্ত লিখাইয়া লইল—মুচিরামের নিজ বিদ্যা দরখাস্ত

পর্য্যন্ত কুলায় না। যে দরখাস্ত লিখিল, মুচিরাম তাহাকে বলিয়া দিলেন, "দেখিও, যেন ভাল ইংরেজি না হয়। আর যাহা হৌক, দরখাস্তের ভিতর যেন গোটা কুড়ি 'মাই লার্ড' আর 'ইওর লার্ডশিপ' থাকে।" লিপিকার সেই রকম দরখাস্ত লিখিয়া দিল। তখন শ্রীমুচিরাম বেশভূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। আপনার চারখানির ঢিলা পায়জামা পরিত্যাগ করিয়া থানের ধুতি শ্রীঅঙ্গে পরিধান করিলেন, চুড়িদার আস্তীন আল্পাকার চাপকান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুকফাঁপ বন্ধকওয়ালা ঢিলে আস্তীন লাংক্লথের চাপকান গ্রহণ করিলেন। লাটুদার পাগড়ি ফেলিয়া দিয়া স্বহস্তে মাথায় বিড়া জড়াইলেন; এবং চাদনির আমদানী নূতন চকচকে জুতা ত্যাগ করিয়া চটিতে চারুচরণদ্বয় মণ্ডন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে গঙ্গারাম সাহেবকে হরিয়েক রকম সেলাম করিয়া, কাঁদো কাঁদো মুখ করিয়া, একখানি সুপারিস চিঠি বাহির করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপ চিঠি, দরখাস্ত ও বিহিত সজ্জাসহিত সেই শ্রীমুচিরাম চন্দ্র, যথায় হোমসাহেব এজলাসে বসিয়া জুলিয়া জলুস করিতেছিলেন, তথায় গিয়া দর্শন দিলেন।

উচ্চ টঙ্গ, রেল দেওয়া পিঞ্জরের ভিতর হোমসাহেব এজলাস করিতেছেন। চারিদিকে অনেক মাথায় পাগড়ি ও বসিয়াছে—লোকে কথা কহিলেই চাপরাশী বাবাজিউরা দাড়ি ঘুরাইয়া গালি দিতেছেন—সাহেব নথ কামড়াইতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে পার্শ্বস্থ কুকুরটিকে কোলে টানিয়া লইতেছেন। এক ফোঁটা গুড় পড়িলে যেমন সহস্র সহস্র পিপীলিকা তাহা বেষ্টন করে, খালি চাকরীটির মালিক হোমসাহেবকে তেমনি উমেদওয়ার ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহেব উমেদওয়ারদিগের দরখাস্ত শুনিতেছেন। অনেক বড় বড় ইংরেজিনবীশ আসিয়াছেন সেকেলে কেঁদো কেঁদো স্কলার্শিপ হোল্ডর। সাহেব তাহাদিগকে এক এক কথায় বিদায় করিলেন। "I dare say you are up in Shakespeare and Milton and Bacon and so forth unfortunately we don't want quotations from Shakespeare and Milton and Bacon in the office. So you can go, Baboo." অনেকে শামলা মাথায় দিয়া চেন ঝুলাইয়া পারিপাটী বেশ করিয়া আসিয়াছিলেন; সাহেব দৃষ্টিমাত্র তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। "You are very rich I see: I want a poor man who work for his bread. You can go." শামলা-চেনের দল, অভিমন্যুসম্মুখে কুরুসৈন্যের ন্যায় বিমুখ হইতে লাগিল। বাকি রহিল মুচিরাম, এবং তাঁহার সমকক্ষ জনকয়—বানর। সাহেব মুচিরামের দরখাস্ত পড়িলেন—হাসিয়া বলিলেন, "Why do you call me, my Lord? I am not a Lord."

মুচিরাম যোড়হাতে হিন্দীতে বলিল, "বান্দা কো মালুম থা কি হুজুর লাট ঘরানা হৈঁয়।"

এখন হোমসাহেবের সঙ্গে একটা লার্ড হোমের দূরসম্বন্ধ ছিল; সেই জন্য তাঁহার মনে বংশমর্য্যাদা সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। মুচিরামের উত্তর শুনিয়া আবার হাসিয়া বলিলেন, "হো শাকতা; লার্ড ঘরানা হো শাক্তা; লার্ড ঘরানা হোনে সে হি লার্ড হোতা নেহি।"

সকলেই বুঝিল যে, মুচিরাম কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছে। মুচিরাম যোড়হাতে প্রত্যুত্তর করিল, "বান্দা লোক কে ওয়াস্তে হুজুর লার্ড হৈঁয়!"

সাহেব মুচিরামকে আর দুই চারিটা কথা

জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহাকেই পেস্কারিতে বাহাল করিলেন।

Struggle for existenc ; Survival of the Fittest! মুচির দলই এ পৃথিবীতে চিরজয়ী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মুচিরাম বাবু—এখন তিনি একটা ভারি রকম বাবু, এখন তাঁহাকে শুধু মুচিরাম বলা যাইতে পারে না—মুচিরাম বাবু পেস্কারী লইয়া বড় ফাঁফরে পড়িলেন। বিদ্যাবুদ্ধিতে পেস্কারী পর্য্যন্ত কুলায় না—কাজ চলে কি প্রকারে? "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়"—মুচিরাম বাবুর বোঝা বাহিত হইল। ভজগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নামে একজন ডাইদনবীশ সেই কালেক্টরী আফিসে থাকে। ভজগোবিন্দ বার বৎসর ডাইদনবীশ আছে। সে বুদ্ধিমান্, কর্ম্মঠ, কালেক্টরীর সকল কর্ম্ম-কাজ বার বৎসর ধরিয়া শিখিয়াছে। কিন্তু মুরুব্বি নাই—ভাগ্য নাই—এ পর্য্যন্ত কিছু হয় নাই। তাহার বাসা-খরচ চলে না। মুচিরাম তাহাকে অবলম্বন করিলেন। ভজগোবিন্দ মুচিরামের বাসায় থাকে, খায় পরে, কর্ম্মের সহায়তা করে, রাত্রিকালে বাবুর ঘরে বাহিরে মোসাহেবী করে, এবং আফিসের সমস্ত রাজকর্ম্ম করিয়া দেয়। মুচিরাম তাহাকে টাকাটা সিকেটা দেওয়াইয়া দেন। ভজগোবিন্দের সাহায্যে মুচিরামের কর্ম্মকাজ মাহেশের রথের মত গড়গড় করিয়া চলিল। হোম সাহেব অনেক প্রশংসা করিতেন। বিশেষ মুচিরাম বিশুদ্ধ প্রণালীতে সেলাম করিত, এবং "মাই লার্ড" ও "ইওর অনার" কিছুতেই ছাড়িত না।

মুচিরাম বাবুর উপার্জ্জনের আর সীমা রহিল না। হাতে অনেক টাকা জমিয়া গেল। ভজগোবিন্দ বলিল, "টাকা ফেলিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই, তালুক মুলুক করুন।" মুচিরাম সম্মত হইলেন, কিন্তু যে যে জেলায় কর্ম্ম করে, সে জেলায় বিষয় খরিদ নিষেধ। ভজগোবিন্দ বলিল যে, বেনামীতে কিনুন। কাহার বেনামীতে? ভজগোবিন্দের ইচ্ছা, ভজগোবিন্দের নামেই বিষয় খরিদ হয়, কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারিল না। এদিকে মুচিরাম কাহারও বাসায় গল্প শুনিয়া আসিলেন যে, স্ত্রীর অপেক্ষা আত্মীয় কেহ নাই! কথাটায় তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল কি না, জানি না—কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন যে, স্ত্রীর নামে বিষয় করাই বেনামীর শ্রেষ্ঠ। এই এখনকার দেবোত্তর। আগে লোকে বিষয় করিত ঠাকুরের নামে—এখন বিষয় করিতে হয় ঠাকরুণের নামে। উভয় স্থলেই বিষয়-কর্ত্তা "সেবাইৎ" মাত্র—পরম ভক্ত—পাদ-পদ্মে বিক্রীত। এইরূপ রাধাকান্ত জিউর স্থানে রাধামণি, শ্যামসুন্দরের স্থানে শ্যামাসুন্দরী দেবী মালিক হওয়ায় ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, জানি না—তবে একটা কথা বুঝা যায়। আগে মন্দিরে গেলেই সেবাইৎকে খাইতে হইত চরণতুলসী—এখন খাইতে হয় চরণ—পাপমুখে কি বলিব?

স্ত্রীর বেনামীতে বিষয় করা শ্রেয়ঃ, ইহা মুচিরাম বুঝিলেন; কিন্তু এই সঙ্কল্পে একটা সামান্য রকম বিঘ্ন উপস্থিত হইল—মুচিরামের স্ত্রী নাই। এ পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ করা হয় নাই। অনুকল্পের অভাব ছিল না। কিন্তু এ স্থলে অনুকল্প চলিবে কি না, তদ্বিষয়ে পেস্কার মহাশয় কিছু সন্দিহান হইলেন। ভজগোবিন্দের সঙ্গে কিছু বিচার হইল—কিন্তু ভজগোবিন্দ এক প্রকার বুঝাইয়া দিল যে, এ স্থলে অনুকল্প চলিবে না। অতএব মুচিরাম দারগ্রহণে কৃত-

সম্মত হইলেন। কোন্ কুল পবিত্র করিবেন, তাহার অন্বেষণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে ভজগোবিন্দ জানাইল যে তাঁহার একটি অবিবাহিতা ভগিনী আছে—ভজগোবিন্দের পিতৃকুল উজ্জ্বল করায় ক্ষতি নাই। অতএব মুচিরাম একদিন সন্ধ্যার পর শুভলগ্নে মাথায় টোপর দিয়া হাতে সূতা বাঁধিয়া, এবং পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া ভদ্রকালী নাম্নী, ভজগোবিন্দের সহোদরাকে সৌভাগ্যশালিনী করিলেন। তাহার পর হইতে ভদ্রকালীর নামে অনেক জমীদারী পত্তনী খরিদ হইতে লাগিল। ভদ্রকালী হঠাৎ জেলার মধ্যে একজন প্রধানা ভূম্যধিকারিণী হইয়া দাঁড়াইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

ভদ্রকালীর দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয় —মুচিরামের এমনই অদৃষ্ট—বিবাহের পর দুই বৎসরের মধ্যেই ভদ্রকালী চৌদ্দবৎসরের হইল। চৌদ্দ বৎসরের হইয়াই ভদ্রকালী ভজগোবিন্দের একটি চাকরীর জন্য মুচিরামের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। সুতরাং মুচিরাম চেষ্টা-চরিত্র করিয়া ভজগোবিন্দের একটি মুহুরিগিরি করিয়া দিলেন।

ইহাতে মুচিরাম কিছু বিপন্ন হইলেন। এক্ষণে ভজগোবিন্দের নিজের কাজ হইল— সে মনোযোগ দিয়া নিজের কাজ করে, মুচিরামের কাজ করিয়া দিবার তাহার তত অবকাশ থাকে না। ভজগোবিন্দ সুপাত্র—শীঘ্রই হোম সাহেবের প্রিয়পাত্র হইল। মুচিরামের কাজের যে সকল ত্রুটি হইতে লাগিল, হোম সাহেব তাহা দেখিয়াও দেখিতেন না। আভূমিপ্রণত সেলাম এবং মাই লার্ড বুলির গুণে সে সকলের প্রতি অন্ধ হইয়া রহিলেন। মুচিরামের প্রতি তাঁহার দয়া অচলা রহিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে হোম সাহেব বদলি হইয়া গেলেন, তাঁহার স্থানে খড সাহেব আসিলেন। খড অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। অতি অল্প দিনেই বুঝিলেন—মুচিরাম একটি বৃক্ষভ্রষ্ট বানর—অকর্ম্মা অথচ ভারি রকমের ঘুষখোর। মুচিরামকে আপিস হইতে বহিষ্কৃত করা মনে স্থির করিলেন। কিন্তু খড সাহেব যেমন বিচক্ষণ, তেমনি দয়াশীল ও ন্যায়বান্। মিছে ছুতাছলে কাহাকেও অন্নহীন করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক; কাহাকেও একেবারে অন্নহীন করিতে অনিচ্ছুক। মুচিরাম যে বিপুল সম্পত্তি করিয়াছে—খড সাহেব তাহা জানিতে পারেন নাই। খড সাহেব মুচিরামকে দুই একবার ইস্তফা দিতে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মুচিরাম চোখে জল আনিয়া দুই চারিবার "গরিব খানা বেগর মারা যায়েগা" বলাতে নিরস্ত হইয়াছিলেন। তার পর, তাহাকে পেস্কারীর তুল্য বেতনে আবকারির দারোগাই দিতে চাহিয়াছিলেন—অন্যান্য মফস্বলি চাকরি করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন,—কিন্তু আবার মুচিরাম চোখে জল আনিয়া বলে যে, আমার শরীর ভাল নহে, মফস্বলে গেলে মরিয়া যাইব—হুজুরের চরণের নিকট থাকিতে চাই। সুতরাং দয়ানুচিত্ত খড সাহেব নিরস্ত হইলেন। কিন্তু তাহাকে লইয়া আর কাজও চলে না। অগত্যা খড সাহেব মুচিরামকে ডেপুটী কালেক্টর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন। সেই সময়ে হোম সাহেব বাঙ্গালী আপিসে সেক্রেটরি ছিলেন— রিপোর্ট পৌঁছিবামাত্র মুচিরাম ডেপুটী বাহাদুরিতে নিযুক্ত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

মুচিরামের মাথায় বজ্রাঘাত হইল; তিনি পেস্কারীতে ঘুষ লইয়া অসংখ্য টাকা রোজগার

করেন—আড়াইশত টাকার ডেপুটীগিরিতে তাহার কি হইবে? মুচিরাম সিদ্ধান্ত করিলেন—ডেপুটীগিরি অস্বীকার করিলে ঋড সাহেব নিশ্চয় বুঝিবে যে, মুচিরাম ঘুষের লোভে পেস্কারী ছাড়িতেছে না—তাহা হইলে শীঘ্রই তাড়াইয়া দিবে। তখন দুইদিক্ যাইবে। অগত্যা মুচিরাম ডেপুটীগিরি স্বীকার করিলেন।

মুচিরাম ডেপুটী হইয়া প্রথম রুবকারী দস্তখতকালীন পড়িয়া দেখিলেন, লেখা আছে, শ্রীযুক্ত বাবু মুচিরাম গুড় রায় বাহাদুর ডেপুটী কালেক্টর। প্রথমটা বড়ই আহ্লাদ হইল—কিন্তু শেষ কিছু লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। যে মুহুরি রুবকারী লিখিয়াছিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে গুড় টা নাই লিখিলে! শুধু মুচিরাম রায় বাহাদুর লেখায় ক্ষতি কি? কি জান, আমরা গুড় বটে, আমাদের খেতাব রায়। তবে যখন অবস্থা তেমন ছিল না, তখন রায় খেতাব আমরা লিখিতাম না। তা, এখন গুড়েও কাজ নাই—রায়েও কাজ নাই, শুধু মুচিরাম রায় বাহাদুর লিখিলেই হইবে।" মুহুরি ইঙ্গিত বুঝিল, হাকিমের মন সবাই রাখিতে চায়। সে মুহুরি দ্বিতীয় রুবকারীতে লিখিল, "বাবু মুচিরাম রায়, রায় বাহাদুর।" মুচিরাম দেখিয়া কিছু বলিলেন না, দস্তখত করিয়া দিলেন। সেই অবধি মুচিরাম "রায়" বলিতে লাগিল; কেহ লিখিত "মুচিরাম রায় বাহাদুর," কেহ লিখিত, "রায় মুচিরাম রায় বাহাদুর।" মুচিরামের একটা যন্ত্রণা ঘুচিল—গুড় পদবীতে তিনি বড় নারাজ ছিলেন, এখন সে জ্বালা গেল। তবে লোকে অসাক্ষাতে বলিত "গুড়ের পো"—অথবা "গুড়ের ডেপুটি।" আর স্কুলের ছেলেরা কবিতা করিয়া শুনাইয়া শুনাইয়া বলিত,

"গুড়ের কলসীতে ডুবিয়ে হাত,
বুঝতে নারি সার কি মাত।"

কেহ বলিত,

"সরা মালসায় খুসি নই।
ও গুড় তোর নাগরী কই!"

মুচিরাম তাহাদের তাড়াইয়া মারিতে গেলেন, তাহারা তাঁহাকে মুখ ভেঙ্গাইয়া, উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ সন্দর্শন করাইয়া, উচ্চৈঃস্বরে কবিতা আওড়াইতে আওড়াইতে পলাইল। লাভের মধ্যে মুচিরাম লম্বা কোঁচা বাধিয়া আছাড় খাইলেন—ছেলেদের আনন্দের সীমা থাকিল না। শেষে মুচিরাম স্কুলের ছেলেদের মাসে মাসে কিছু সন্দেশ বরাদ্দ করিয়া দিয়া সে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন। কিন্তু আর একটা নূতন গোল হইল। শীতকালে খেজুরে সন্দেশ উঠিল—ময়রারা তাহার নাম দিল ডেপুটী মণ্ডা!

বাজারে যাহা হউক, সাহেবমহলে মুচিরামের বড় সুখ্যাতি হইল। বৎসর বৎসর রিপোর্ট হইতে লাগিল, এরূপ সুযোগ্য ডেপুটী আর নাই। এরূপ সুখ্যাতির কারণ—

প্রথম। মুচিরাম গুড় মূর্খ, কাজে কাজেই সাহেবদিগের প্রিয়।

দ্বিতীয়। মুচিরাম অতি সামান্য ইংরেজি জানিত, যাহারা ভাল ইংরেজি জানিত, তাহাদিগকে খাটো করিবার জন্য সাহেবেরা বলিতেন, মুচিরাম ইংরেজিতে সুশিক্ষিত; অথচ পাণ্ডিত্যাভিমানী নহে। তাঁহারা বলিতেন, মুচিরাম তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের দৃষ্টান্তস্থল।

তৃতীয়। মুচিরাম নির্ব্বিরোধী লোক ছিলেন; সাহেবেরা অপমান করিলেও সম্মান বোধ করিতেন। একবার তিনি কমিশনর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সাহেব তখন মেমসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গরমমেজাজ ছিলেন, এত্তালা হইবামাত্র বলিলেন—"নেকাল দেও শালাকো।" বাহির হইতে মুচিরাম শুনিতে পাইয়া সেখান হইতে

দুই হাতে সেলাম করিয়া বলিল, "বহুৎ খুব হুজুর। হামারা বহিনকো খোদা জিতা রাখে।

চতুর্থ। তোষামোদে মুচিরাম অদ্বিতীয়। তাহার পরিচয় অনেক পাওয়া গিয়াছে।

পঞ্চম। মুচিরাম ডেপুটীর হাতে প্রায় হপ্তম পঞ্চমের কাজ ছিল—অন্য কাজ বড় ছিল না। হপ্তম পঞ্চমের মোকদ্দমায় একে সহজেই বড় বিচার আচারের প্রয়োজন হইত না, তাতে অবার মুচিরাম বিচার আচারের বড় ধার ধারিতেন না—চোখ বুজিয়া ডিক্রী দিতেন— নথির কাগজও বড় পড়িতেন না। সুতরাং মাসকাবারে দেখিয়া সাহেবেরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। জনরব যে,মুচিরামের একবারে হঠাৎ সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে পদবৃদ্ধি হইবে, কতকগুলা চেঙ্গড়া ছোঁড়া শুনিয়া বলিল, "আরও পদবৃদ্ধি? ছটা পা হবে না কি?"

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে চট্টগ্রামের কালেক্টরীতে কিছু গোলযোগ উপস্থিত হইল। গোল মিটাইবার জন্য সেখানকার কমিশনর একজন ভারি বিচক্ষণ ডেপুটী কালেক্টর পাইবার প্রার্থনা করিলেন। বোর্ড বলিলেন—বিচক্ষণ ডেপুটি? সে ত মুচিরাম ভিন্ন আর কাহাকে দেখি না—তাহাকেই চট্টগ্রাম পাঠান হোক্। গবর্ণমেণ্ট সেই কথা মঞ্জুর করিয়া মুচিরামকে চাটিগাঁ বদলি করিলেন।

সংবাদ পাইয়া মুচিরাম বলিলেন,এইবার চাকরী ছাড়ীতে হইল। তাঁহার শোনা ছিল, চাটিগাঁ গেলেই লোকে জ্বর-প্লীহা হইয়া মরিয়া যায়। আরও শোনা ছিল যে, চাটিগাঁ যাইতে সমুদ্র-পার যাইতে হয়— একদিন একরাত্রের পাড়ি। সুতরাং চাটিগাঁ যাওয়া কি প্রকারে হইতে পারে? বিশেষ ভদ্রকালী—ভদ্রকালী এখন পূর্ণযৌবনা। সে বলিল, "আমি কোন মতেই চাটিগাঁ যাইব না কি তোমায় যাইতে দিব না। তুমি যদি যাও, তবে আমি বিষ খাইব।" এই বলিয়া ভদ্রকালী একটা বড় খোরা লইয়া তেঁতুল গুলিতে বসিলেন। ভদ্রকালী তেঁতুল ভালবাসিতেন—মুচিরাম বলিতেন, "ওতে ভারি অম্ল হয়, খেও না!" তাই ভদ্রকালী তেঁতুল গুলিতে বসিলেন। মুচিরাম হাঁ হাঁ করিয়া নিষেধ করিতে লাগিলেন, ভদ্রকালী তাহা না শুনিয়া "বিষ খাইব" বলিয়া সেই তেঁতুলগোলায় লবণ ও শর্করা সহযোগ পূর্ব্বক আধসের চালের অন্ন মাখিয়া লইলেন। মুচিরাম অশ্রুপূর্ণ-লোচনে শপথ করিলেন যে,তিনি কখনই চাটিগাঁ যাইবেন না ভদ্রকালী কিছুতেই শুনিল না,সমুদায় তেঁতুল-মাখা ভাতগুলি খাইয়া বিষপানের কার্য্য সমাধা করিল। মুচিরাম তৎক্ষণাৎ চাকরীতে ইস্তফা পাঠাইয়া দিলেন।

স্থূল কথা, মুচিরামের জমীদারীর আয় এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে,ডেপুটীগিরির সামান্য বেতন, তাঁহার ধর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল না। সুতরাং সহজে চাকরী ছাড়িয়া দিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

চাকরী ছাড়িয়া দিয়া মুচিরাম,ভদ্রকালীকে বলিলেন. "প্রিয়ে!" (তিনি সকের যাত্রার বাছা বাছা সম্বোধন পদগুলি ব্যবহার করিতেন) "প্রিয়ে! বিষয় যেমন আছে, তেমনি একটি বাড়ী নাই। একটা বাড়ীর মত বাড়ী করিলে হয় না?"

ভদ্র। দাদা বলে এখানে বড় বাড়ী করিলে, লোকে বল্‌বে, ঘুষের টাকায় বড়-মানুষ হয়েছে।

মুচি। তা, এখানেই না বাড়ী করায় কাজ কি? এখানে বুক পুরে বড়মানুষী করা যাবে না। চল, আর কোথাও গিয়া বাস করি।

ভদ্রকালী সম্মত হইলেন, কিন্তু নিজ

পিত্রালয় যে গ্রামে; সেই গ্রামে, বাস করাই বিধেয় বলিয়া পরামর্শ দিলেন। ফলে ভদ্রকালী আর কোন গ্রামের নাম বড় জানিতেন না।

মুচিরাম বিনীতভাবে ইহাতে কিছু আপত্তি করিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, যত বড়মানুষের বাড়ী কলিকাতায়, তিনিও বড়-মানুষ, সুতরাং কলিকাতাই তাঁহার বাসযোগ্য, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। এখন ভদ্রকালীর এক মাতুল একদা কালীঘাটে পূজা দিতে আসিয়া এককালে কলিকাতা বেড়াইয়া গিয়াছিলেন এবং বাটী গিয়া গল্প করিয়াছিলেন যে, কলিকাতার কুলকামিনীগণ সজ্জিতা হইয়া রাজপথ আলোকিত করে। ভদ্রকালীর সেই অবধি কলিকাতাকে ভূতলস্থ স্বর্গ বলিয়া বোধ ছিল। তাঁহার অনেকগুলি অলঙ্কার হইয়াছে, পরিয়া সর্ব্বজননয়নপথ-বর্ত্তিনী হইতে পারিলে অলঙ্কারের সার্থকতা হয়। ভদ্রকালী তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় বাস করার প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন।

তখন ভজগোবিন্দ ছুটী লইয়া আগে কলিকাতায় বাড়া কিনিতে আসিল। বাড়ীর দাম শুনিয়া মুচিরামের বাবুগিরির সাধ কিছু কমিয়া আসিল। যাহা হউক, টাকার অভাব ছিল না—অট্টালিকা ক্রীত হইল। যথাকালে মুচিরাম ও ভদ্রকালী কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া নূতন গৃহে বিরাজমান হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ভদ্রকালী কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার মনস্কাম পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কলিকাতার কুলকামিনী রাজপথ আলোকিত করা দূরে থাকুক, পল্লীগ্রাম অপেক্ষা কঠিনতর কারাগারে নিবদ্ধ, যাহারা রাজপথ কলুষিত করিয়া দাঁড়ায়, তাহাদিগের শ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা ভদ্রকালী রাখেন না, সুতরাং তাঁহার কলিকাতায় আসা বৃথা হইল বিশেষ দেখিলেন, অঙ্গের অলঙ্কার দেখিয়া কলিকাতার স্ত্রীলোক হাসে। ভদ্রকালীর অলঙ্কারের গর্ব্ব ঘুচিয়া গেল।

মুচিরামের কলিকাতায় আসা বৃথা হইল না। তিনি প্রত্যহ গাড়ী করিয়া বাজার যাইতেন এবং যাহা দেখিতেন তাহাই কিনিতেন। বাবুটি নূতন আমদানী দেখিয়া বিক্রেতৃগণ পাঁচ টাকার জিনিসে দেড়শত টাকা হাঁকিত এবং নিতান্তপক্ষে পঞ্চাশ টাকা না পাইলে ছাড়িত না। হঠাৎ মুচিরামের নাম বাজিয়া গেল যে, বাবুটি মধুচক্রবিশেষ। পাড়ার যত বানর মধু লুটিতে ছুটিল। জুয়াচোর, মাতাল, নিষ্কর্ম্মা ভালধুতি চাদর জুতা লাঠিতে অঙ্গ পরিশোভিত করিয়া, চুল ফিরাইয়া, বাবুকে সম্ভাষণ করিতে আসিল। মুচিরাম তাহাদিগকে কলিকাতার বড় বড় বাবু মনে করিয়া তাহাদিগকে বিশেষ আদর করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারাও আত্মীয়তা করিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় আড্ডা করিল। তামাক পোড়ায়, খবরের কাগজ পড়ে, মদ খায়, তাস পেটে, বাজনা বাজায়, গান করে, পোলাও ধ্বংসায় এবং বাবুর প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনিয়া আনে টাকাটায় আপনারা বার আনা মুনাফা রাখে; বলে, দাঁওয়ে সিকি দামে কিনিয়াছি। উভয়পক্ষের সুখের সীমা রহিল না।

যে গলিতে মুচিরাম বাড়ী লইয়াছিলেন, সেই গলিতে একজন প্রথম শ্রেণীর বাটপাড় বাস করিতেন। তাঁহার নাম রামচন্দ্র দত্ত। রামচন্দ্র বাবু প্রথমশ্রেণীর বাটপাড়, একটু ব্রাণ্ডি বা একখানা কাটলেটের লোভে কাহারও আনুগত্য করিবার লোক নহেন। তাঁহার ত্রিতল গৃহ, প্রস্তরমুকুর কাষ্ঠ কাচ-কার্পেটাদিতে সকুসুম উদ্যানতুল্য রঞ্জিত,

তাঁহার দরওয়াজার অনেকগুলা বাহবান্ গালপাট্টা বাঁধিয়া সিদ্ধি ঘোঁটে ; আস্তাবলে অনেকগুলি অশ্বের পদধ্বনি শুনা যায়, তিনখানা গাড়ী আছে. সোণাবাঁধা হুঁকা, হীরাবাঁধা গৃহিণী, হাণ্ডনোট-বাঁধা ইংরেজ খাদক, এবং তাড়াবাঁধা "কাগজ" সকলই ছিল। তথাপি তিনি জুয়াচোর জুয়াচুরিতেই এ সকল হইয়াছিল। তিনি যখন শুনিলেন, টাকার বোঝা লইয়া একটা গ্রাম্য গর্দ্দভ পাড়ায় আসিয়া চরিয়া বেড়াইতেছে, তখন ভাবিলেন যে, গর্দ্দভের পৃষ্ঠ হইতে টাকার বোঝাটি নামাইয়া লইয়া তাহার উপকার করিতে হইবে। আহা! অবোধ পশু! এত ভারি বোঝা বহিবে কি প্রকারে? বোঝাটি নামাইয়া লইয়া তাহার উপকার করি।

প্রথম প্রয়োজন, মুচিরামের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়। রামচন্দ্র বাবু বড় লোক— মুচিরামের বাড়ী আগে যাইবেন না। ইঙ্গিত পাইয়া একজন অনুচর মুচিরামের কাণে তুলিয়া দিল, রামচন্দ্র-বাবু কলিকাতার অতি প্রধান লোক, আর মুচিরামের প্রতিবাসী— মুচিরামের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য অতি ব্যস্ত। সুতরাং মুচিরাম গিয়া উপস্থিত।

এইরূপে উভয়ে উভয়ের নিকট পরিচিত হইলেন। উভয়ে উভয়ের বাড়ী যাতায়াত হইতে লাগিল। ঘন ঘন যাতায়াতে ক্রমে সৌহার্দ্দ-বৃদ্ধি। রামচন্দ্র-বাবুর সেই ইচ্ছা। তিনি চতুর, মুচিরাম নির্ব্বোধ ; মুচি গ্রাম্য, তিনি নাগরিক। অল্পকালেই মুচিরামমৎস্য ফাঁদে পড়িল। রামচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুতা করিল।

রামচন্দ্র তাঁহার মুরুব্বি হইলেন, মুচিরামের নাগরিকজীবনযাত্রানির্ব্বাহে শিক্ষাগুরু হইলেন।

——

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

যিনি নাগরিক জীবননির্ব্বাহে মুচিরামের শিক্ষাগুরু—কলিকাতারূপ গোচারণভূমে তাঁহার রাখাল। কালীঘাট হইতে চিৎপুর পর্য্যন্ত, যখন মুচিরাম বলদ সুখের গাড়ী টানিয়া যায়, রামবাবু তখন তাহার গাড়োয়ান; সখের ছেকড়ায় এই খোঁড়া টাটুটী জুড়িয়া, রামচন্দ্র পাকা কোচমানের মত মিঠাকড়া চাবুক লাগাইতেন। তাঁহার হস্তে ক্রমে গ্রাম্য বানর সহুরে বানরে পরিণত হইল। কি গতিকের বানর, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ পড়িলে বুঝা যাইতে পারে। এই সময় তিনি ভজগোবিন্দকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

"তোমার পুত্রের বিবাহ শুনিয়া আহ্লাদ হইল। টাকার তেমন আনুকূল্য করিতে পারিলাম না, মাপ করিও। দুইখানা গাড়ী কিনিয়াছি, একখানা বেরুষ, একখানা ব্রোন-বেরি। একটা আরবের জুড়িতে ২২০০ টাকা পড়িয়াছে। ছবিতে, আয়নাতে, কারপেটে অনেক টাকা পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতায় এত খরচ তাহা জানিলে কখন আসিতাম না। সেখানে সাত সিকায়, কাপড় ও মজুরিসমেত আমার একটা চাপকান তৈয়ার হইত, এখানে একটা চাপকানে ৬৫৲ টাকা পড়িয়াছে। একসেট রূপার বাসনে অনেক টাকা লাগিয়াছে। থাল, বাটি, গেলাস, সে বাসনের কথা বলিতেছি না, এ সেট টেবিলের জন্য। বর-কন্যাকে আমার হইয়া আশীর্ব্বাদ করিবে।"

এই হলো বানরামী নম্বর এক। তার পর মুচিরাম, কলিকাতায় যে কেহ একটু খ্যাতি-যুক্ত, তাহারই বাড়ীতে, রামচন্দ্র-বাবুর পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে আরম্ভ করিলেন। কোন নামজাদা বাবু তাঁহার বাটীতে আসিলে অন্য

সার্থক মনে করিতেন। কিসে আসে, সেই চেষ্টায় ফিরিতেন। এইরূপ আচরণে, রামবাবুর সাহায্যে, কলিকাতার সকল বর্দ্ধিষ্ণু লোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল। টাকর মান সর্ব্বত্র; মুচিরামের টাকা আছে; সুতরাং সকলেরই কাছে তাঁহার মান হইল।

তার পর মুচিরাম কলিকাতার ইংরেজ-মহল আক্রমণ করিলেন। রামবাবুর পরিচয়ে হত ছোট বড় ইংরেজের বাড়ী যাতায়াত করিলেন। অনেক জায়গাতেই ঝাঁটা-লাথি খাইলেন। কোন কোন স্থানে মিষ্টকথা পাইলেন। অনেক স্থানেই একজন মাতালো জমীদার বলিয়া পরিচিত হইলেন।

তার পর ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনে ঢুকিলেন; নাম লেখাইয়া বৎসর বৎসর টাকা দিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র বাবুর সঙ্গে প্রতি অধিবেশনে যাইতে আরম্ভ করিলেন। রামবাবু কথিত মহামহিম সমাসভার "একটি বড় কামান।" তিনি যখনই বড় কামান দাগিতে যাইতেন, এই ছোট মুচিপিস্তলটি সঙ্গে লইয়া যাইতেন, সুতরাং পিস্তলটি ক্রমে মুখ খুলিয়া পুটপাট করিতে আরম্ভ করিল। মুচিরামও ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সভার একজন বক্তা হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বকিতেন মাথামুণ্ড, কিন্তু ছাপার বিজ্ঞাপনীতে যাহা বাহির হইত, সে আর একপ্রকার। মুচিরাম নিজে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। যাহারা বুঝে, তাহারা পড়িয়া নিন্দা করিত না। সুতরাং মুচিরাম ক্রমে একজন প্রসিদ্ধ বক্তা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে লাগিলেন। যেখানে লোকে বড়লোক বলিয়া গণ্য হয়, মুচিরাম তাহার কোন জায়গায় যাইতেই ছাড়িতেন না। বেলবিডীরে গেলে বড় লোক বলিয়া গণ্য হয়, সুতরাং সে বেলিবিডীরে যাইত। যাইতে যাইতে সে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের নিকট সুপরিচিত হইল। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর তাহাকে একজন নম্র, নিরহঙ্কারী, নিরীহ লোক বলিয়া জানিলেন। জমাদারী সভায় একজন নায়ক বলিয়া পূর্ব্বেই রামচন্দ্রের নিকট পরিচয় পাইয়াছিলেন।

সম্প্রতি বাঙ্গাল কৌন্সিলে একটি পদ খালি হইল। একজন জমীদারী সভার অধিনায়ককে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, ইহাও লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর স্থির করিলেন। বাছনি করিতে মনে মনে ভাবিলেন, "মুচিরামের ন্যায় এ পদের যোগ্য কে? নিরহঙ্কারী, নিরীহ, ইংরেজি কহিতে ভাল পারে না; অতএব তাহা হইতে কার্য্যের কোন গোলযোগ উপস্থিত হইবে না। অতএব মুচিরামকে বাহাল করিব।"

অচিরাৎ আনরেবল বাবু মুচিরাম রায় বাঙ্গাল কৌন্সিলে আসন গ্রহণ করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বড় বাড়াবাড়িতে অনারেবল মুচিরাম রায়ের রুধির শুকাইয়া আসিল। ভজগোবিন্দ ফিকিরফন্দিতে অল্পদামে অধিক লাভের বিষয়গুলি কিনিয়া দিয়াছিলেন—তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় ক্রীতসম্পত্তির আয় বাড়িয়াছিল—কিন্তু এখন তাহাতেও অনাটন হইয়া আসিল দুই একখানি তালুক বাঁধা পড়িল—রামচন্দ্র বাবুর কাছে। রামচন্দ্র বাবুর সঙ্কল্প এত দিনে সিদ্ধ হইয়া আসিতেছিল—এই জন্য তিনি আত্মীয়তা করিয়া মুচিরামকে এত বড় বাবু করিয়া তুলিয়াছিলেন। রামচন্দ্র অর্দ্ধেক মূল্যে তালুকগুলি বাঁধা রখিলেন—জানেন যে, মুচিরাম কখনও শুধরাইতে পারিবেন না—অর্দ্ধেক মূল্যে বিষয়গুলি তাঁহার হইবে! আরও

তালুক বাঁধা পড়ে, এমন গতিক হইয়া আসিল। এই সময়ে ভজগোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে শুনিয়াছিল যে, গবর্ণর প্রভৃতি বড় বড় সাহেব তাহার ভগ্নীপতির হাতধরা। এই সুযোগে একটা বড় চাকরী যোটাইয়া লইতে হইবে, এই ভরসায় ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। আসিয়া শুনিলেন, মুচিরামের গতিক ভাল নহে। তাহার উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিলেন;—বলিলেন, "মহাশয়, আপনি কখন তালুকে যান নাই। গেলেই কিছু পাওয়া যাইবে! তালুকে যান।"

মুচিরাম আনন্দিত হইল, ভাবিল, "তাই ত! এমন সোজা কথাটা আমার মনে আসিল না।" মুচিরাম খুসী হইয়া ভজগোবিন্দের কথায় স্বীকৃত হইল।

চন্দনপুর নামে তালুক—সেইখানে বাবু গেলেন। প্রজাদিগের অবস্থা বড় ভাল। সে বৎসর নিকটবর্ত্তী স্থানসকলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত—কিন্তু সে মহলে কিছু না। কখন মুচিরাম প্রজাদিগের নিকট মাঙ্গনমাথট লয়েন নাই। মুচিরাম নির্ব্বিরোধী লোক—তাহাদের উপর কোন অত্যাচার করিতেন না। আজ ভজগোবিন্দের পরামর্শে সশরীরে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমার কন্যার বিবাহ উপস্থিত, বড় দায়গ্রস্ত হইয়াছি, কিছু ভিক্ষা দাও।" প্রজারা দয়া করিল, প্রজা সুখে থাকিলে জমীদারকে সকল সময়ে দয়া করিতে প্রস্তুত। জমীদার আসিয়াছে সংবাদ পাইয়া পালে পালে প্রজা টেঁকে টাকা লইয়া মুচিরামদর্শনে আসিতে আরম্ভ করিল। মুচিরামের চেষ্ট টাকায় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, কিন্তু ইহাতে আর একদিকে তাঁহার আর একপ্রকার সৌভাগ্যের উদয় হইল!

প্রজারা দলে দলে মুচিরাম-দর্শনে আসে; কোন দিন পঞ্চাশ, কোন দিন ষাট, কোন দিন আশী, কোন দিন একশত, এইরূপ। যাহাদের বাড়ী নিকট, তাহারা দর্শন করিয়া ফিরিয়া যায়, যাহাদের বাড়ী দূর, তাহারা দোকান হইতে খাদ্যসামগ্রী কিনিয়া একটা বাগানের ভিতর রাঁধিয়া বাড়িয়া খায়। মহালটি একে খুব বড়—মুচিরামের এত বড় জমীদারী আর নাই, তাহাতে গ্রামগুলির মধ্যে বিলখাল অনেক থাকায়, দুই চারিজন প্রজাকে প্রায় রাঁধিয়াখাইয়া যাইতে হইত। একদিন অনেক দূর হইতে প্রায় একশত প্রজা আসিয়াছে। তাহাদের বাড়ী একটা ভারি জলা পার; নিকাশ প্রকাশে তাহাদের বেলা গেল, তাহারা বাড়ী ফিরিতে পারিল না; বাগানে রাঁধাবাড়া করিতে লাগিল। রাত্রি থাকিতে থাকিতে যাত্রা করিবে। তাহারা যখন খাইতে বসিল, সেই সময়ে নিকটস্থ মাঠ পার হইয়া অশ্বযানে, একটি সাহেব যাইতেছিলেন।

সাহেবটির নাম মীনওয়েল্। তিনি ঐ জেলার প্রধান রাজপুরুষ ম্যাজিষ্ট্রেট্ কালেক্টর। সাহেবটি ভাল লোক—ন্যায়বান্—হিতৈষী, এবং পরিশ্রমী। দোষের মধ্যে বুদ্ধিটা একটু ভোঁতা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে বৎসর ঐ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; সাহেব দুর্ভিক্ষ তদারকে বাহির হইয়াছিলেন। নিকটস্থ কোন গ্রামে তাঁহার তাম্বু পাড়িয়াছিল। তিনি এখন অশ্বারোহণে তাম্বুতে যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, একটা বাগানের ভিতর কতকগুলা লোক ভোজন করিতেছে।

দেখিয়াই সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহারা সকলে দুর্ভিক্ষপীড়িত উপবাসী দরিদ্র লোক, কোন বদান্য ব্যক্তি ইহাদের ভোজন করাইতেছে। বিশেষ তত্ত্ব জানিবার জন্য নিকটে একজন চাষাকে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন।

এখন সাহেবটি লোক বড় ভাল হইলেও আত্মগরিমাবর্জ্জিত নহেন। তাঁহার মনে মনে শ্লাঘা ছিল যে, তিনি বাঙ্গালা বড় ভাল জানেন। সুতরাং চাষার সঙ্গে বাঙ্গালায় কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

সাহেব চাষাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "টোমাডিগের গড়ামে ডুরভাখখা কেমন আছে ?"

চাষা ত জানে না "ডুর্ভাখ্খা" কাহাকে বলে। সে ফাঁপরে পড়িল। ডুরভাখখা কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম হইবে, ইহা এক প্রকার স্থির হইল। কিন্তু "কেমন আছে ?" ইহার উত্তর কি দিবে ? যদি বলে যে, সে ব্যক্তিকে আমি চিনি না, তাহা হইলে সাহেব হয় ত এক ঘা চাবুক দিবে, যদি বলে, সে ভাল আছে, তাহা হইলে সাহেব হয় ত ডুরভাখ্খাকে ডাকিয়া আনিতে বলিবে ; তাহা হইলে কি করিবে ? চাষা ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিল, "বেমার আছে।"

"বেমার Sick ? সাহেব ভাবিতে লাগিলেন, 'Well there may be much sickness without there being any scarcity—the fellow does not understand perhaps ; I am afraid these people don't understand there own language—I say ডুরভাখ্খা কেমন আছে, অটিক আছে কিংবা অল্প আছে ?"

এখন চাষা কিছু ভাব পাইল। স্থির করিল যে, এ যখন সাহেব, তখন অবশ্য হাকিম (সে দেশে নীলকর নাই।) হাকিম যখন জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, ডুরভাখ্খা অধিক আছে কি অল্প আছে—তখন ডুরভাখ্খা একটা টেক্সের নাম না হইয়া যায় না। ভাবিল; কই, আমরা ত ডুরভাখ্খার টেক্স দিই না ; কিন্তু যদি বলি যে, আমাদের গ্রামে সে টেক্স নাই, তবে বেটা এখনই টেক্স বসাইয়া যাইবে ; অতএব মিছা কথাই ভাল। সাহেব পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের গড়ামে ডুরভাখ্খা আছে ?"

চাষা উত্তর করিল, "হুজুর, আমাদের গাঁয়ে ভারি ডুরভাখ্খা আছে !"

সাহেব ভাবিলেন, "Humph ! I thought as much." পরে বাগানে যে সকল লোক খাইতেছিল, তৎপ্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে বোজন করিল ?" (উদ্দেশ্য 'করাইল')

চাষা। প্রজারা ভোজন কচ্ছে।

সাহেব চটিয়া, "টাহা হামি জানে they eat, that I see, but who pays ? টাকা কাহাড় ?"

এখন সে চাষা জানে যে, যত টাকা আসিতেছে, সকলই জমীদারের সিন্দুকে যাইতেছে ; সে নিজেও কিছু দিয়া আসিয়াছিল ; অতএব বিনা বিলম্বে উত্তর করিল, "টাকা জমীদারের।"

সাহেব। Ah ! there it ; they do their duty—জমীদারের নাম কি ?

চাষা। মুচিরাম রায়।

সাহেব। কট ডিবস বোজন কড়িয়াছে ?

চাষা। তা ধর্ম্মাবতার ; প্রজারা রোজ রোজ আসে, খাওয়া দাওয়া করে।

ড়ামের নাম কি ?

চাষা। চন্দনপুর।

সাহেব নোটবুক বাহির করিয়া তাহাতে পেন্সিলে লিখিলেন, For Famine Report Babu Muchiram Ray, Zemindar of Chinonpur feeds every day a large number of his ryots."

সাহেব তখন ঘোড়ায় চাবুক মারিয়া টাপে চলিলেন। চাষা আসিয়া গ্রামে রটাইল, একটা সাহেব টাকায় আনা হিসাবে টেক্স

বসাইতে আসিয়াছিল, চাষামহাশয়ের বুদ্ধি-কৌশলে বিমুখ হইয়াছে।

এদিকে মীন্‌ওয়েল্‌ সাহেব যথাকালে ফেমিন্‌ রিপোর্ট লিখিলেন। একটি পারাগ্রাফ শুধু মুচিরাম রায় সম্বন্ধে! তাহাতে প্রতিপন্ন হইল যে, মুচিরাম জমীদারদিগের আদর্শস্থল। এই দুঃসময়ে অন্নদান করিয়া সকল প্রজা-গুলির প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

রিপোর্ট কমিশনরের হস্ত হইতে কিছু উজ্জ্বলতর বর্ণে রঞ্জিত হইয়া, কমিশনর সাহেব লেখক ভাল—গবর্ণমেণ্টে গেল। গভর্ণমেণ্টের এই বিবেচনা যে যার প্রজা, সেই যদি দুর্ভি-ক্ষের সময়ে তাহাদের আহার যোগায়, তাহা হইলে "দুর্ভিক্ষ প্রশ্নের" উত্তম মীমাংসা হয়। অতএব মুচিরামের ন্যায় বদান্য জমীদারদিগকে সম্মানিত ও উৎসাহিত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তজ্জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণ-মেণ্টের নিকট অনুরোধ করিলেন যে, বাবু মুচিরাম রায় মহাশয়কে—পাঠক একবার হরি হরি বল রাজাবাহাদুর উপাধি দেওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট বলিলেন, তথাস্তু। গেজেট হইল, রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর। তোমরা সবাই আর একবার হরি বল।

বিজ্ঞানরহস্য

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

বিজ্ঞানরহস্য

আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত।

১৮৭১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকা-নিবাসী অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ ইয়ঙ্ সাহেব যে আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত দৃষ্টি করিয়াছিলেন, এরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড মনুষ্যচক্ষে প্রায় আর কখন পড়ে নাই। তত্তুলনায় এট্‌না বা বিসিউবিয়াসের অগ্নিবিপ্লব, সমুদ্রোচ্ছ্বাসের তুলনায় দুগ্ধ-কটাহে দুগ্ধোচ্ছ্বাসের তুল্য বিবেচনা করা যাইতে পারে।

যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যার সবিশেষ অনুশীলন করেন নাই, এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাঁহাদের বোধগম্য করার জন্য সূর্য্যের প্রকৃতিসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

সূর্য্য অতি বৃহৎ তেজোময় গোলক। এই গোলক আমরা অতি ক্ষুদ্র দেখি, কিন্তু উহা বাস্তবিক কত বৃহৎ, তাহা পৃথিবীর পরিমাণ না বুঝিলে বুঝা যাইবে না। সকলে জানেন যে, পৃথিবীর ব্যাস ৭৯৯১ মাইল। যদি পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ এক মাইল প্রস্থ এমন খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে উনিশ কোটি, ছয়ষট্টি লক্ষ, ছাব্বিশ হাজার এইরূপ বর্গ মাইল পাওয়া যায়। এক মাইল দীর্ঘে, এক মাইল প্রস্থে এবং এক মাইল ঊর্দ্ধে এরূপ ২৫৯,৮০০০০০,০০০ ভাগ পাওয়া যায়। আশ্চর্য্য বিজ্ঞানবলে পৃথিবীকে ওজন করাও গিয়াছে। ওজনে পৃথিবী যত টন হইয়াছে, তাহা নিম্নে অঙ্কের দ্বারা লিখিলাম। ৬,০৬৯,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, এক টন সাতাশ মনের অধিক।

এই সকল অঙ্ক দেখিয়া মন অস্থির হয়; পৃথিবী যে কত বৃহৎ পদার্থ, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এক্ষণে যদি বলি যে, এমন অন্য কোন গ্রহ বা নক্ষত্র আছে যে, তাহা পৃথিবী অপেক্ষা ত্রয়োদশ গুণে বৃহৎ, তবে কে না বিস্মিত হইবে? কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্য পৃথিবী হইতে ত্রয়োদশ লক্ষ গুণে বৃহৎ। ত্রয়োদশ লক্ষটি পৃথিবী একত্র করিলে সূর্য্যের আয়তনের সমান হয়।

তবে আমরা সূর্য্যকে এত ক্ষুদ্র দেখি কেন?—উহার দূরতাবশতঃ। পূর্ব্বতন গণনানুসারে সূর্য্য পৃথিবী হইতে সার্দ্ধ নয় কোটি মাইল দূরে স্থিত বলিয়া জানা ছিল। আধুনিক গণনায় স্থির হইয়াছে যে, ৯১,৬৭৮০০০ মাইল অর্থাৎ এক কোটি চতুর্দ্দশ লক্ষ, উনসপ্ততি সহস্র সার্দ্ধ সপ্তদশ যোজন পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরতা। * এই ভয়ঙ্কর দূরতা অনুমেয় নহে। দ্বাদশ সহস্র পৃথিবী শ্রেণী-পরম্পরায় বিন্যস্ত হইলে পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত পায় না।

এই দূরতা অনুভব করিবার জন্য একটি উদাহরণ দিই। অস্মদাদির দেশে রেলওয়ে ট্রেণ ঘণ্টায় ২০ মাইল যায়। যদি পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইত, তবে কত

* নূতন গণনায় আরও কিছু বাড়িয়াছে।

কালে সূর্য্যলোকে যাইতে পারিতাম? উত্তর— যদি দিন রাত্রি ট্রেণ, অবিরত ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে, তবে ৫২০ বৎসর ৬ মাস ১৬ দিনে সূর্য্যলোকে পৌছান যায় অর্থাৎ যে ব্যক্তি ট্রেণে চড়িবে, তাহার সপ্তদশ পুরুষ ঐ ট্রেণে গত হইবে।

এক্ষণে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে যাহা অণুবৎ ক্ষুদ্রাকৃতি দেখি, তাহাও বাস্তবিক অতি বৃহৎ। যদি সূর্য্যমধ্যে আমরা একটি বালির মত বিন্দুও দেখিতে পাই, তবে তাহাও লক্ষ ক্রোশ বিস্তার হইতে পারে।

কিন্তু সূর্য্য এমনি প্রচণ্ড রশ্মিময় যে, তাহার গায়ে বিন্দু-বিসর্গ কিছু দেখিবার সম্ভাবনা নাই। সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া দেখিলেও অন্ধ হইতে হয়। কেবল সূর্য্যগ্রহণের সময়ে সূর্য্য-তেজঃ চন্দ্রান্তরালে লুক্কায়িত হইলে, তৎপ্রতি দৃষ্টি করা যায়। তখনও সাধারণ লোকে চক্ষুর উপর কালিমাখা কাচ না ধরিয়া, হৃত-তেজা সূর্য্য প্রতিও চাহিতে পারে না।

সেই সময়ে যদি কালিমাখা কাচ ত্যাগ করিয়া, উত্তম দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যপ্রতি দৃষ্টি করা যায়, তবে কতকগুলি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়। পূর্ণগ্রাসের সময়ে অর্থাৎ যখন চন্দ্রান্তরালে সূর্য্যমণ্ডল লুক্কায়িত, তখন দেখা যায়, মণ্ডলের চারি পার্শ্বে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় কিরীটমণ্ডল তাহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহাকে "করোনা" বলেন। কিন্তু এই কিরীটমণ্ডল ভিন্ন আর এক অদ্ভুত বস্তু কখন কখন দেখা যায়। কিরীটমূলে, ছায়াবৃত সূর্য্যের অঙ্গের উপরে সংলগ্ন, অথচ তাহার বাহিরে কোন দুর্জ্ঞেয় পদার্থ উদ্গত দেখা যায়। ঐ সকল উদ্গত পদার্থ দেখিতে এত ক্ষুদ্র যে, তাহা দূরবীক্ষণ-যন্ত্র ব্যতিরেকে দেখা যায় না; কিন্তু দূরবীক্ষণ-যন্ত্রে দেখা যায় বলিয়াই উহাকে বৃহৎ অনুমান করিতে হইতেছে। উহা কখন কখন অর্দ্ধলক্ষ মাইল উচ্চ দেখা গিয়াছে। ছয়টি পৃথিবী উপর্য্যুপরি সাজাইলে এত উচ্চ হয় না। এই সকল উদ্গত পদার্থের আকার কখন পর্ব্বতশৃঙ্গবৎ, কখন অন্য প্রকার, কখন সূর্য্য হইতে বিযুক্ত দেখা গিয়াছে। তাহার বর্ণ কখন উজ্জ্বল রক্ত, কখন গোলাপী, কখন নীল-কপিশ।

পণ্ডিতেরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এ সকল সূর্য্যের অংশ। প্রথমে কেহ কেহ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, এ সকল সৌর-পর্ব্বত; পরে সূর্য্য হইতে তাহাদের বিয়োগ দেখিয়া সে মত ত্যাগ করিলেন।

এক্ষণে নিঃসংশয় প্রমাণ হইয়াছে যে, এই সকল বৃহৎ পদার্থ সূর্য্যগর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত। যেরূপ পার্থিব আগ্নেয় গিরি হইতে দ্রব্য বা বায়বীয় পদার্থ-সকল উৎপতিত হইয়া গিরি-শৃঙ্গের উপরে মেঘাকারে দৃষ্ট হইতে পারে, এই সকল সৌর-মেঘও তদ্রূপ। উৎক্ষিপ্ত বস্তু যতক্ষণ না সূর্য্যোপরি পুনঃপতিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্তূপাকারে পৃথিবী হইতে লক্ষ্য হইতে থাকে।

এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, এইরূপ একখানি সৌর-মেঘ বা স্তূপ দূর-বীক্ষণে দেখিলে কি বুঝিতে হয়। বুঝিতে হয় যে, এক প্রকাণ্ড প্রদেশ লইয়া এক বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। সেই সকল উৎ-পাতকালে সূর্য্যগর্ভনিক্ষিপ্ত পদার্থরাশি এতা-দৃশ বহুদূরব্যাপী হয় যে, তন্মধ্যে এই পৃথিবীর ন্যায় অনেকগুলি পৃথিবী ডুবিয়া থাকিতে পারে।

এইরূপ সৌরোৎপাত অনেকেই প্রফেসর ইয়ঙের পূর্ব্বে দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রফেসর

ইয়ঙ্ যাহা দেখিয়াছেন, তাহা আবার বিশেষ বিস্ময়কর। বেলা দুই প্রহরের সময়ে তিনি সূর্য্যমণ্ডল দূরবীক্ষণ দ্বারা অবেক্ষণ করিতেছিলেন। তৎকালে গ্রহণাদি কিছু ছিল না। পূর্ব্বে গ্রহণের সাহায্য ব্যতীত কেহ কখন এই সকল ব্যাপার নয়নগোচর করে নাই, কিন্তু ডাক্তার হাগিন্স্ প্রথমে বিনা গ্রহণে এ সকল ব্যাপার দেখিবার উপায় প্রদর্শন করেন। প্রফেসর ইয়ঙ এরূপ বিজ্ঞানকুশলী যে সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজের সময়েও ঐ সকল সৌর স্তূপের আতপচিত্র পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কথিত সময়ে প্রফেসর ইয়ঙ্ দূরবীক্ষণে দেখিতেছিলেন যে, সূর্য্যের উপরিভাগে একখানি মেঘবৎ পদার্থ দেখা যাইতেছে। অন্যান্য উপায় দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে,পৃথিবী যেরূপ বায়বীয় আবরণে বেষ্টিত, সূর্য্যমণ্ডলও তদ্রূপ। ঐ মেঘবৎ পদার্থ সৌর-বায়ুর উপরে ভাসিতেছিল। পাঁচটি স্তম্ভের ন্যায় আধারের উপরে উহা আরূঢ় দেখা যাইতেছিল। প্রফেসর ইয়ঙ পূর্ব্বদিন বেলা দুই প্রহর হইতে ঐরূপই দেখিতেছিলেন। তদবধি তাহার পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণই দেখেন নাই। স্তম্ভগুলি উজ্জ্বল, মেঘখানি বৃহৎ—তদ্ভিন্ন মেঘের নিবিড়তা বা উজ্জ্বলতা কিছুই ছিল না। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রাকার কতকগুলি পদার্থের সমষ্টির ন্যায় দেখাইতেছিল। এই অপূর্ব্ব মেঘ সৌর বায়ুর উপরে পঞ্চদশ সহস্র মাইল উর্দ্ধে ভাসিতেছিল। ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রফেসর ইয়ঙ্ ইহার দৈর্ঘ্য-প্রস্থও মাপিয়াছিলেন। তাহার দৈর্ঘ্য লক্ষ মাইল—প্রস্থ ৫৪,০০০ মাইল। বরিটি পৃথিবী সারি সারি সাজাইলে তাহার প্রস্থের সমান হয় না।

দুই প্রহর বাজিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা হইলে মেঘ এবং তন্মূলস্বরূপ স্তম্ভগুলির অবস্থানপরিবর্ত্তনের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। সেই সময়ে প্রফেসর ইয়ঙ সাহেবকে দূরবীক্ষণ রাখিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইল। একটা বাজিতে পাঁচ মিনিট থাকিতে, যখন তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন দেখিলেন যে, নিম্ন হইতে উৎক্ষিপ্ত কোন ভয়ঙ্কর বলের বেগে মেঘখণ্ড ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে,তৎপরিবর্ত্তে সৌর-গগন ব্যাপিয়া ঘনবিকীর্ণ উজ্জ্বল সূত্রাকার পদার্থ সকল উর্দ্ধে ধাবিত হইতেছে। ঐ সূত্রাকার পদার্থসকল অতি প্রবলবেগে উর্দ্ধে ধাবিত হইতেছিল।

সর্ব্বাপেক্ষা এই বেগই চমৎকার। আলোক বা বৈদ্যুতীয় শক্তি প্রভৃতি ভিন্ন গুরুত্ববিশিষ্ট পদার্থের এরূপ বেগ শ্রুতিগোচর হয় না। ইয়ঙ সাহেব যখন প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, ঐ সকল উজ্জ্বল সূত্রাকার পদার্থ লক্ষ মাইলের উর্দ্ধে উঠে নাই। পরে দশ মিনিটের মধ্যে যাহা লক্ষ মাইলে ছিল, তাহা দুই লক্ষ মাইলে উঠিল। দশ মিনিটে লক্ষ মাইল গতি হইলে,প্রতি সেকেণ্ডে ১৬৫ মাইল গতি হয়। অতএব উৎক্ষিপ্ত পদার্থের দৃষ্ট গতি এই।

এই গতি কি ভয়ঙ্কর, তাহা মনেরও অচিন্ত্য। কামানের গোলা অতি বেগবান্ হইলেও কখন এক সেকেণ্ডে অর্দ্ধ মাইল যাইতে পারে না। সচরাচর কামানের গোলার বেগের বহু শত গুণ এই সৌর-পদার্থের বেগ, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

দুই লক্ষ মাইল উর্দ্ধেতে এই বেগ দেখা গিয়াছিল। যে উৎক্ষিপ্ত পদার্থ দুই লক্ষ মাইল উর্দ্ধে এত বেগবান্, নির্গমকালে তাহার বেগ কিরূপ ছিল? সকলেই জানেন যে, যদি আমরা একটা ইষ্টকখণ্ড উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত করি, তাহা হইলে যে বেগে তাহা নিক্ষিপ্ত হয়,সেই বেগ শেষ পর্য্যন্ত থাকে না, ক্রমে মন্দীভূত

হইয়া পরিশেষে একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, ইষ্টকখণ্ডও ভূপতিত হয়। ইষ্টক-বেগের হ্রাসের দুই কারণ;—প্রথম, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তি, দ্বিতীয়, বায়ুজনিত প্রতিবন্ধকতা। এই দুই কারণই সূর্য্যলোকে বর্ত্তমান। যে বস্তু যত গুরু, তাহার মাধ্যাকর্ষণী শক্তি তত বলবতী। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণী শক্তি সূর্য্যের নাড়ীমণ্ডলে ২৮ গুণ অধিক। তদুল্লঙ্ঘন করিয়া লক্ষ ক্রোশ পর্য্যন্ত যদি কোন পদার্থ উত্থিত হয়, তবে তাহা যখন সূর্য্যকে ত্যাগ করে, তৎকালে তাহার গতি প্রতি সেকেণ্ডে অবশ্যই ১৬৬ মাইল ছিল। ইহা গণনা দ্বারা সিদ্ধ, কিন্তু যদিও এই বেগে ৎক্ষিপ্ত হইলে ক্ষিপ্ত বস্তু লক্ষ ক্রোশ উঠিতে পারিবে, তাহা যে ঐ লক্ষ ক্রোশের শেষার্দ্ধ লঙ্ঘনকালে প্রতি সেকেণ্ডে ১৬৬ মাইল উঠিবে এমন নহে। শেষার্দ্ধ বেগ গড়ে ৬৫ মাইল মাত্র হইবে। প্রাক্‌টর সাহেব গুডওয়ার্ডসে লিখিয়াছেন যে, যদি বিবেচনা করা যায় যে, সূর্য্যলোকে বায়বীয় প্রতিবন্ধকতা নাই, তাহা হইলে এই উৎক্ষিপ্ত পদার্থ সূর্য্যমধ্য হইতে যে বেগে নির্গত হইয়াছিল, তাহা প্রতি সেকেণ্ডে ২৫৫ মাইল। কর্ণহিলের একজন লেখক বিবেচনা করেন যে, এই পদার্থ সেকেণ্ডে ৫০০ মাইলের অধিক বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু সূর্য্যলোকে যে বায়বীয় পদার্থ নাই, এমন বিবেচনা করিতে পারা যায় না। সূর্য্য যে গাঢ় বাষ্পমণ্ডল-পরিবৃত, তাহা নিশ্চিত হইয়াছে। প্রক্‌টর সাহেব সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীতে বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার যেরূপ বল, সৌর-বায়ুর প্রতিবন্ধকতার যদি সেইরূপ বল হয়, তাহা হইলে এই পদার্থ যখন সূর্য্য হইতে নির্গত হয়, তখন তাহার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে আনুমানিক সহস্র মাইল ছিল।

এই বেগে মনের অচিন্ত্য। এরূপ বেগে নিক্ষিপ্ত পদার্থ এক সেকেণ্ডে ভারতবর্ষ পার হইতে পারে—পাঁচ সেকেণ্ডে কলিকাতা হইতে বিলাত পৌঁছিতে পারে এবং ২৪ সেকেণ্ডে অর্থাৎ অর্দ্ধ মিনিটের কমে পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আসিতে পারে

আর এক বিচিত্র কথা আছে। আমরা যদি কোন মৃৎপিণ্ড ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করি, তাহা আবার ফিরিয়া আসিয়া পৃথিবীতে পড়ে। তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তির বলে এবং বায়বীয় প্রতিবন্ধকতায় ক্ষেপণীর বেগ ক্রমে বিনষ্ট হইয়া, যখন ক্ষেপণী একবারে বেগহীন হয়, তখন মাধ্যাকর্ষণের বলে পুনর্ব্বার তাহা ভূপতিত হয়। সূর্য্যলোকেও অবশ্য তাহাই হওয়া সম্ভব। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণী শক্তি বা বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার শক্তি কখন অসীম নহে। উভয়েরই সীমা আছে। অবশ্য এমন কোন বেগবতীর গতি আছে যে, তদ্দ্বারা উভয় শক্তিই পরাভূত হইতে পারে। এই সীমা কোথায়, তাহাও গণনা দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। যে বস্তু নির্গমকালে প্রতি সেকেণ্ডে ৩৮০ মাইল গমন করে, তাহা মাধ্যাকর্ষণী শক্তি এবং বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার বল অতিক্রম করিয়া যায়। অতএব উপরিবর্ণিত বেগবান্ উৎক্ষিপ্ত পদার্থ, আর সূর্য্যলোকে ফিরিয়া আইসে না। সুতরাং প্রফেসর ইয়ঙ্ যে সৌরোৎপাত দৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদুৎক্ষিপ্ত পদার্থ আর সূর্য্যলোকে ফিরে নাই। তাহা অনন্তকাল অনন্ত আকাশে বিচরণ করিয়া ধূমকেতু বা অন্য কোন খেচররূপে পরিগণিত হইবে কি, কি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে!

প্রক্টর সাহেব সিদ্ধান্ত করেন যে, উৎক্ষিপ্ত বস্তু লক্ষ ক্রোশ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল বটে, কিন্তু অদৃশ্যভাবে যে তদধিক দূর ঊর্দ্ধগত

হয় নাই, এমন নহে। যতক্ষণ উহা উত্তপ্ত এবং জ্বালাবিশিষ্ট ছিল, ততক্ষণ তাহা দৃষ্টি-গোচর হইয়াছিল, ক্রমে শীতল হইয়া অনুজ্জ্বল হইলে, আর তাহা দেখা যায় নাই। তিনি স্থির করিয়াছেন যে, উহা সার্দ্ধ তিন লক্ষ মাইল উঠিয়াছিল। অতএব সৌরোৎপাত-নিক্ষিপ্ত পদার্থ অদ্ভুত বটে—লক্ষযোজনব্যাপী, মনোগতি, এক নূতন সৃষ্টির আদি।

আকাশে কত তারা আছে ?

ঐ যে নীল নৈশ নভোমণ্ডলে অসংখ্য বিন্দু জ্বলিতেছে, ওগুলি কি ?

ওগুলি তারা। তারা কি ? প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে পাঠশালার ছাত্রমাত্রেই তৎক্ষণাৎ বলিবে যে, তারা সব সূর্য্য। সূর্য্য ত দেখিতে পাই বিশ্বদাহকর, প্রচণ্ড কিরণ-মালার আকর; তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবারও মনুষ্যের শক্তি নাই; কিন্তু তারা সব ত বিন্দু মাত্র; অধিকাংশ তারাই নয়নগোচর হইয়া উঠে না। এমন বিসদৃশের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায় ? কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলিব যে, এগুলি সূর্য্য ? এ কথার উত্তর পাঠশালার ছাত্রের দেয় নহে, এবং যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করেন নাই, তাঁহারা এই কথাই অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিবেন। তাঁহাদিগকে আমরা এক্ষণে ইহাই বলিতে পারি যে, এ কথা অলঙ্ঘ্য প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে। সেই প্রমাণ কি, তাহা বিবৃত করা এ স্থলে আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যার সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে সেই প্রমাণ এখানে বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা জ্যোতিষ সম্যক্ অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে সেই প্রমাণ বোধগম্য করা অতি দুরূহব্যাপার। বিশেষ দুইটি কঠিন কথা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে; প্রথমতঃ, কি প্রকারে নভঃস্থ জ্যোতিষ্কের দূরতা পরি-মিত হয়; দ্বিতীয়, আলোক-পরীক্ষক নামক আশ্চর্য্য যন্ত্র কি প্রকার, এবং কি প্রকারে ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং সে বিষয়ে আমরা প্রবৃত্ত হইলাম না। সন্দিহান পাঠকগণের প্রতি আমাদিগের অনুরোধ এই, তাঁহারা ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উপর বিশ্বাস করিয়া বিবেচনা করুন যে, এই আলোকবিন্দুগুলি সকলই সৌরপ্রকৃত। কেবল আত্যন্তিক দূরতা বশতঃ আলোক-বিন্দুবৎ দেখায়।

এখন কত সূর্য্য এই জগতে আছে ? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করাই এখানে আমা-দিগের উদ্দেশ্য। আমরা পরিষ্কার চন্দ্রবিযুক্তা নিশিতে নির্ম্মল নিরম্বুদ আকাশমণ্ডল প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাই যে, আকাশে নক্ষত্র যেন আর ধরে না। আমরা বলি, নক্ষত্র অসংখ্য। বাস্তবিক কি নক্ষত্র অসংখ্য ? বাস্তবিক শুধু চক্ষে আমরা যে নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহা কি গণিয়া সংখ্যা করা যায় না ?

ইহা অতি সহজ কথা। যে কেহ অধ্যব-সায়ারূঢ় হইয়া স্থিরচিত্তে গণিতে প্রবৃত্ত হই-বেন, তিনিই সফল হইবেন। বস্তুতঃ দূরবীক্ষণ ব্যতীত যে তারাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়,

তাহা অসংখ্য নহে—সংখ্যায় এমন অধিকও নহে। তবে তারা-সকল যে অসংখ্য বোধ হয়, তাহা উহার দৃশ্যতঃ বিশৃঙ্খলতা জন্য মাত্র। যাহা শ্রেণীবদ্ধ এবং বিন্যস্ত, তাহা অপেক্ষা যাহা শ্রেণীবদ্ধ নহে এবং অবিন্যস্ত, তাহা সংখ্যায় অধিক বোধ হয়। তারা-সকল আকাশে শ্রেণীবদ্ধ এবং বিন্যস্ত নহে বলিয়াই আশু অসংখ্য বলিয়া বোধ হয়।

বস্তুতঃ যত তারা দূরবীক্ষণ ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ গণিত হইয়াছে। বর্লিন্ নগরে যত তারা ঐরূপে দেখা যায়, অর্গেলন্দর তাহার সংখ্যা করিয়া তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই তালিকায় ৩২৫৬টী মাত্র তারা আছে। পারিস নগর হইতে যত তারা দেখা যায়, হম্বোল্‌টের মতে তাহা ৪১৪৬টি মাত্র। গেলামির আকাশমণ্ডল নামক গ্রন্থে চক্ষুর্দৃশ্য তারার যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই প্রকার;

১ম শ্রেণী	...	...	২০
২য় শ্রেণী	...	...	৬৫
৩য় শ্রেণী	...	...	২০০
৫ম শ্রেণী	...	...	১১০০
৬ষ্ঠ শ্রেণী	...	...	৩২০০
			৪৫৮৫

এই তালিকায় চতুর্থশ্রেণীর তারার সংখ্যা নাই। তৎসমেত আন্দাজ ৫০০০ পাঁচ হাজার তারা দৃষ্ট হয়।

কিন্তু বিষুবরেখার যত নিকটে আসা যায়, তত অধিক তারা নয়নগোচর হয়। বর্লিন ও পারিস নগর হইতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, এ দেশে তাহার অধিক তারা দেখা যায়, কিন্তু এ দেশেও ছয় সহস্রের অধিক দেখা যাওয়া সম্ভবপর নহে।

এককালীন আকাশের অর্দ্ধাংশ ব্যতীত আমরা দেখিতে পাই না। অপরার্দ্ধ অধস্তলে থাকে,সুতরাং মনুষ্যচক্ষে এককালীন যত তারা দেখা যায়, তাহা তিন সহস্রের অধিক নহে।

এতক্ষণ আমরা কেবল শুধু চক্ষের কথা বলিতেছিলাম। যদি দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে আকাশমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, তারা অসংখ্যই বটে। শুধু চোকে যেখানে দুই একটি মাত্র তারা দেখিয়াছি, দূরবীক্ষণে সেখানে সহস্র তারা দেখা যায়।

গেলামি এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য মিথুন রাশির একটি ক্ষুদ্রাংশের দুইটি চিত্র দিয়াছেন। ঐ স্থান বিনা দূরবীক্ষণে যেরূপ দেখা যায়,প্রথম চিত্রে তাহাই চিত্রিত আছে। তাহাতে পাঁচটি মাত্র নক্ষত্র দেখা যায়। দ্বিতীয় চিত্রে দূরবীক্ষণে যেরূপ দেখা যায়, তাহাই অঙ্কিত রহিয়াছে। তাহাতে পাঁচটি তারার স্থানে তিন সহস্র দুই শত পাঁচটি তারা দেখা যায়।

দূরবীক্ষণের দ্বারাই বা কত তারা মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার সংখ্যা ও তালিকা হইয়াছে। সুবিখ্যাত সর উইলিয়ম হর্শেল্ প্রথম এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি বহুকালাবধি প্রতিরাত্রিতে আপন দূরবীক্ষণ-সমীপাগত তারা-সকল গণনা করিয়া তাহার তালিকা করিতেন। এইরূপে ৩৪০০ বার আকাশ পর্য্যবেক্ষণের ফল তিনি প্রচার করেন। যতটা আকাশ চন্দ্র কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ আট শত গাগনিক খণ্ড মাত্র তিনি এই ৩৪০০ বারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহাতে আকাশের ২৫০ ভাগের এক ভাগের অধিক হয় না। আকাশের এই ২৫০ ভাগের এক ভাগ মাত্রে ৯০০০০ অর্থাৎ প্রায়

এক লক্ষ তারা গণনা করিয়াছেন। স্ত্রু ব নামা বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ গণনা করিয়াছেন যে, এইরূপে সমুদায় আকাশমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তালিকা-নিবদ্ধ করিতে অশীতি বৎসর লাগে।

তাহার পরে সর্ ইউলিয়মের পুত্র সর্ জন্ হর্শেল্ ঐরূপ আকাশসন্ধানে ব্রতী হয়েন। তিনি ২৩০০ বার আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আরও সপ্ততি সহস্র তারা সংখ্যা করিয়াছিলেন।

অর্গেলন্দর নবম শ্রেণী পর্য্যন্ত তারা স্বীয় তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। তাহাতে সপ্তম শ্রেণীর ১৩০০০ তারা, অষ্টম শ্রেণীর ৪০০০০ তারা, এবং নবম শ্রেণীর ১৪২০০০ তারা। উচ্চতম শ্রেণীর সংখ্যা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এ সকল সংখ্যাও সামান্য। আকাশে পরিষ্কার রাত্রে এক স্থূল শ্বেত রেখা নদীর ন্যায় দেখা যায়, আমরা সচরাচর তাহাকে ছায়াপথ বলি। ঐ ছায়াপথ কেবল দৌরবীক্ষণিক নক্ষত্র-সমষ্টি মাত্র। উহার অসীম দূরতা-বশতঃ নক্ষত্র-সকল দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তাহার আলোকসমবায়ে ছায়াপথ শ্বেত বর্ণ দেখায়। দূরবীক্ষণে উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাময় দেখায়। সর্ উইলিয়ম্ হর্শেল্ গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কেবল ছায়াপথমধ্যে ১,৮০০০০০০ এক কোটি আশী লক্ষ তারা আছে।

স্ত্রুব গণনা করেন যে, সমগ্র আকাশমণ্ডলে দুই কোটি নক্ষত্র আছে।

মস্যুর শাকোর্ণাক বলেন, "সর্ উইলিয়ম হর্শেলের আকাশসন্ধান এবং রাশিচক্রে চিত্রাদি দেখিয়া, বেসেলের কৃত কটিবন্ধ সকলের তালিকার ভূমিকাতে যেরূপ গড়পড়তা করা আছে, তৎসম্বন্ধে উইসের কৃত নিয়মাবলম্বন করিয়া আমি ইহা গণনা করিয়াছি যে, সমুদায় আকাশে সাত কোটি সত্তর লক্ষ নক্ষত্র আছে।"

এই সকল সংখ্যা শুনিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। যেখানে আকাশে তিন হাজার নক্ষত্র দেখিয়া আমরা অসংখ্য নক্ষত্র বিবেচনা করি, সেখানে সাত কোটি সপ্ততি লক্ষের কথা দূরে থাকুক্, দুই কোটিই কি ভয়ানক ব্যাপার।

কিন্তু ইহাতে আকাশের নক্ষত্রসংখ্যার শেষ হইল না। দূরবীক্ষণের সাহায্যে গগনাভ্যন্তরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ধূমাকার পদার্থ দৃষ্ট হয়। উহাদিগকে নীহারিকা নাম প্রদত্ত হইয়াছে। যে সকল দূরবীক্ষণ অত্যন্ত শক্তিশালী, তাহার সাহায্যে এক্ষণে দেখা গিয়াছে যে, বহুসংখ্যক নীহারিকা কেবল নক্ষত্রপুঞ্জ। অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন, যে সকল নক্ষত্র আমরা শুধু চক্ষে বা দূরবীক্ষণ দ্বারা গগনে বিকীর্ণ দেখিতে পাই, তৎসমুদায় একটি মাত্র নাক্ষত্রিক জগৎ। অসংখ্য নক্ষত্রময় ছায়াপথ এই নাক্ষত্রিক বিশ্বের অন্তর্গত। এমন অন্যান্য নাক্ষত্রিক জগৎ আছে। এই সকল দূর-দৃষ্ট-তারাপুঞ্জময়ী নীহারিকা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাক্ষত্রিক জগৎ। সমুদ্রতীরে যেমন বালি, বনে যেমন পাতা, একটি নীহারিকাতে নক্ষত্ররাশি তেমনি অসংখ্য এবং ঘনবিন্যস্ত। এই সকল নীহারিকান্তর্গত নক্ষত্রসংখ্যা ধরিলে সাত কোটি সত্তর লক্ষ কোথায় ভাসিয়া যায়। কোটি কোটি নক্ষত্র আকাশমণ্ডলে বিচরণ করিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার ভাবিতে ভাবিতে মনুষ্য-বুদ্ধি চিন্তায় অশক্ত হইয়া উঠে। চিত্ত বিস্ময়বিহ্বল হইয়া যায়। সর্ব্বত্রগামিনী মনুষ্যবুদ্ধিরও গগনসীমা দেখিয়া চিত্ত নিরস্ত হয়।

এই কোটি কোটি নক্ষত্র সকলই সূর্য্য। আমরা যে এক সূর্য্যকে সূর্য্য বলি, সে কত বড় প্রকাণ্ড বস্তু, তাহা সৌরবিপ্লব সম্বন্ধীয়

প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পৃথিবী অপেক্ষা ত্রয়োদশ লক্ষ গুণ বৃহৎ। নাক্ষত্রিক জগৎ-মধ্যস্থ অনেকগুলি নক্ষত্র যে এ সূর্য্যাপেক্ষাও বৃহৎ, তাহা এক প্রকার স্থির হইয়াছে। এমন কি, সিরিয়স (Sirius) নামে নক্ষত্র এই সূর্য্যের ২৬৬৮ গুণ বৃহৎ, ইহা স্থির হইয়াছে। কোন কোন নক্ষত্র যে সূর্য্যাপেক্ষা আকারে কিছু ক্ষুদ্রতর, তাহাও গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে। এইরূপ ছোট বড় মহাভয়ঙ্কর আকারবিশিষ্ট, মহাভয়ঙ্কর তেজোময়, কোটি কোটি সূর্য্য নিরন্তর আকাশে বিচরণ করিতেছে। যেমন আমাদিগের সৌরজগতের মধ্যবর্ত্তী সূর্য্যকে ঘেরিয়া গ্রহ-উপগ্রহাদি বিচরণ করিতেছে, তেমনি ঐ সকল সূর্য্য-পার্শ্বে গ্রহ-উপগ্রহাদি ভ্রমিতেছে,সন্দেহ নাই। তবে জগতে কত কোটি কোটি সূর্য্য, কত কোটি কোটি পৃথিবী, তাহা কে ভাবিয়া উঠিতে পারে? এ আশ্চর্য্য কথা কে বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারে? যেমন পৃথিবীর মধ্যে এক কণা বালুকা, জগৎমধ্যে এই সসাগরা তদপেক্ষাও সামান্য, রেণুমাত্র,—বালুকার বালুকাও নহে। তদুপরি মনুষ্য কি সামান্য জীব! এ কথা ভাবিয়া কে আর আপন মনুষ্যত্ব লইয়া গর্ব্ব করিবে?

ধূলা।

ধূলার মত সামান্য পদার্থ আর সংসারে নাই। আচার্য্য টিণ্ডল ধূলা-সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আচার্য্যের ঐ প্রবন্ধটি দীর্ঘ এবং দুরূহ, তাহা সংক্ষেপে এবং সহজে বুঝান অতি কঠিন কর্ম্ম। আমরা কেবল টিণ্ডল সাহেব-কৃত সিদ্ধান্তগুলিই এ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিব, যিনি তাঁহার প্রমাণ-জিজ্ঞাসু হইবেন, তাঁহাকে আচার্য্যের প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে।

১। ধূলা এই পৃথিবীতে এক প্রকার সর্ব্বব্যাপী। আমরা যাহা যত পরিষ্কার করিয়া রাখি না কেন, তাহা মুহূর্ত্ত জন্য ধূলা-ছাড়া নহে। যত "বাবুগিরি" করি না কেন, কিছুতেই ধূলা হইতে নিষ্কৃতি নাই। যে বায়ু অত্যন্ত পরিষ্কার বিবেচনা করি, তাহাও ধূলায় পূর্ণ। সচরাচর ছায়ামধ্যে কোন রন্ধ্র নিপতিত রৌদ্রে দেখিতে পাই, যে বায়ু পরিষ্কার দেখাইতেছিল, তাহাতেও ধূলা চিক্ চিক্ করিতেছে। সচরাচর বায়ু যে এরূপ ধূলাপূর্ণ,তাহা জানিবার জন্য আচার্য্য টিণ্ডলের উপদেশের আবশ্যকতা নাই, সকলেই তাহা জানে। কিন্তু বায়ু ছাঁকা যায়। আচার্য্য বহুবিধ উপায়ের দ্বারা বায়ু অতি পরিপাটী করিয়া ছাঁকিয়া দেখিয়াছেন। তিনি অনেক চোঙ্গার ভিতর দ্রাবকাদি পূরিয়া তাহার ভিতর দিয়া বায়ু ছাঁকিয়া লইয়া গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাও ধূলায় পরিপূর্ণ। এইরূপ ধূলা অদৃশ্য, কেন না, তাহার কণা-সকল অতি ক্ষুদ্র। রৌদ্রেও উহা অদৃশ্য অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের দ্বারাও অদৃশ্য,কিন্তু বৈদ্যুতিক প্রদীপের আলোক রৌদ্রাপেক্ষাও উজ্জ্বল। উহার আলোক ঐ ছাঁকা বায়ুর মধ্যে প্রেরণ করিয়া তিনি দেখিয়াছেন যে, তাহাতেও ধূলা চিক্ চিক্ করিতেছে। যদি এত যত্নপরিষ্কৃত বায়ুতেও ধূলা, তবে সচরাচর ধনী লোকে যে ধূলা নিবারণ করিবার উপায় করেন, তাহাতে

ধূলা নিবারণ হয় না, ইহা বলা বাহুল্য। ছায়া-মধ্যে রৌদ্র না পড়িলে রৌদ্রে ধূলা দেখা যায় না, কিন্তু রৌদ্রমধ্যে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকের রেখা প্রেরণ করিলে ঐ ধূলা দেখা যায়। অতএব আমরা যে বায়ু মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নিশ্বাসে গ্রহণ করিতেছি, তাহা ধূলিপূর্ণ। যাহা কিছু ভোজন করি, তাহা ধূলিপূর্ণ। কেন না, বায়ুস্থিত ধূলিরাশি দিবারাত্র সকল পদার্থের উপর বর্ষণ হইতেছে। আমরা যে কোন জল পরিষ্কৃত করি না কেন, উহা ধূলিপূর্ণ। কলিকাতার জল পলতার কলে পরিষ্কৃত হইতেছে বলিয়া তাহা ধূলি-শূন্য নহে। ছাঁকিলে ধূলা যায় না।

২। এই ধূলা বাস্তবিক সমুদয়াংশই ধূলা নহে। তাহার অনেকাংশ জৈব পদার্থ। যে সকল অদৃশ্য ধূলিকণার কথা উপরে বলা গেল, তাহার অধিক ভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব। যে ভাগ জৈব নহে, তাহা অধিকতর গুরুত্ববিশিষ্ট; এজন্য তাহা বায়ুপরিস্তত ভাসিয়া বেড়ায় না। অতএব আমরা প্রতিনিশ্বাসে শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব দেহমধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি, জলের সঙ্গে সহস্র সহস্র পান করি; রাক্ষসবৎ অনেককে আহার করি। লণ্ডনের আটটি কোম্পানির কলে ছাঁকা পানীয় জল টিণ্ডলসাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন তিনি আরও অনেক প্রকার জল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জল সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা মনুষ্য-সাধ্যাতীত! যে জল স্ফাটিকপাত্রে রাখিলে বৃহৎ হীরকখণ্ডের ন্যায় স্বচ্ছ বোধ হয়, তাহাও সমল, কীটপূর্ণ। জৈনেরা এ কথা স্মরণ রাখিবেন।

৩। এই সর্ব্বব্যাপী ধূলিকণা সংক্রামক পীড়ার মূল। অনতিপূর্ব্বে এই মত প্রচলিত ছিল যে, কোন এক প্রকার পচনশীল নির্জ্জীব জৈব পদার্থ (Malaria) কর্ত্তৃক সংক্রামক পীড়ার বিস্তার হইয়া থাকে। এ মত ভারতবর্ষে অদ্যাপি প্রবল। ইউরোপে এ বিশ্বাস একপ্রকার উচ্ছিন্ন হইতেছে। আচার্য্য টিণ্ডল প্রভৃতির বিশ্বাস এই যে, সংক্রামক পীড়ার বিস্তারের কারণ সজীব পীড়াবীজ (Germ)। ঐ সকল পীড়াবীজ বায়ুতে এবং জলে ভাসিতে থাকে; এবং শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় জীবজনক হয়। জীবের শরীরমধ্যে অসংখ্য জীবের আবাস। কেশে উৎকুণ, উদরে কৃমি, ক্ষতে কীট, এই কয়টি মনুষ্যশরীরে সাধারণ উদাহরণ। পশু মাত্রেরই গাত্রমধ্যে কীট-সমূহের আবাস। জীবতত্ত্ববিদেরা অবধারিত করিয়াছেন যে, ভূমিতে, জলে বা বায়ুতে যত জাতীয় জীব আছে, তদপেক্ষা অধিক জাতীয় জীব অন্য জীবের শরীরবাসী। যাহাকে উপরে "পীড়াবীজ" বলা হইয়াছে, তাহাও জীবশরীরবাসী জীব বা জীবোৎপাদক জীব। শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তদুৎপাদ্য জীবের জন্ম হইতে থাকে। এই সকল শোণিতনিবাসী জীবের জনকতা-শক্তি অতি ভয়ানক। যাহার শরীরমধ্যে ঐ প্রকার পীড়াবীজ প্রবিষ্ট হয়, সে সংক্রামক পীড়াগ্রস্ত হয়। ভিন্ন ভিন্ন পীড়ার ভিন্ন ভিন্ন বীজ। সংক্রামক জ্বরের বীজে জ্বর উৎপন্ন হয়, বসন্তের বীজে বসন্ত জন্মে; ওলাউঠার বীজে ওলাউঠা; ইত্যাদি।

৪। পীড়াবীজে কেবল সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হয়, এমন নহে। ক্ষতাদি যে শুকায় না, ক্রমে পচে, দুর্গন্ধ হয়, দুরারোগ্য হয়, ইহাও অনেক সময়ে এই সকল ধূলিকণারূপী পীড়াবীজের জন্য। ক্ষতমুখ কখনই এমন আচ্ছন্ন রাখা যাইতে পারে না যে, অদৃশ্য ধূলা তাহাতে লাগিবে না। নিতান্ত পক্ষে তাহা ডাক্তারের অস্ত্র-মুখে ক্ষতমধ্যে প্রবেশ করিবে। ডাক্তার যতই অস্ত্র পরিষ্কার রাখুন না কন

অদৃশ্য ধূলিপুঞ্জের কিছুতেই নিবারণ হয় না। কিন্তু ইহার একটি সুন্দর উপায় আছে। ডাক্তারেরা প্রায় তাহা অবলম্বন করেন। কার্ব্বলিক আসিড নামক দ্রাবক বীজঘাতী; তাহা জলে মিশাইয়া ক্ষতমুখে বর্ষণ করিতে থাকিলে প্রবিষ্ট বীজ-সকল মরিয়া যায়। ক্ষতমুখে পরিষ্কৃত তুলা বাঁধিয়া রাখিলেও অনেক উপকার হয়। কেন না, তুলা বায়ু পরিষ্কৃত করিবার একটি উৎকৃষ্ট উপায়।

গগন-পর্য্যটন।

পুরাণ-ইতিহাসাদিতে কথিত আছে, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় রাজগণ আকাশ-মার্গে রথ চালাইতেন। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহারা সচরাচর এ পাড়া ও পাড়ার ন্যায় স্বর্গলোকে বেড়াইতে যাইতেন, কথায় কথায় সমুদ্রকে গণ্ডূষ করিয়া ফেলিতেন; কেহ জগদীশ্বরকে অভিশপ্ত করিতেন, কেহ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতেন। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের কথা স্বতন্ত্র; সামান্য মনুষ্যদিগের কথা বলা যাউক।

সামান্য মনুষ্যের চিরকাল বড় সাধ, গগন-পর্য্যটন করে। কথিত আছে, তারন্তম-নগরবাসী আর্কাইতস নামক এক ব্যক্তি ৪০০ খৃষ্টাব্দে একটি কাষ্ঠের পক্ষী প্রস্তুত করিয়াছিল; তাহা কিয়ৎক্ষণ জন্য আকাশে উঠিতে পারিয়াছিল। ৬৬ খৃষ্টীয় অব্দে সাইমন্ নামক এক ব্যক্তি রোম নগরে প্রাসাদ হইতে প্রাসাদে উড়িয়া বেড়াইবার উদ্যোগ পাইয়াছিল এবং তৎপরে কনস্তান্তিনোপল নগরে একজন মুসলমান ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দান্তে নামক একজন গণিতশাস্ত্রবিৎ পক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া আপন অঙ্গে সমাবেশ করিয়া থ্রাসিমীন হ্রদের উপর উঠিয়া গগনমার্গে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঐরূপ করিতে করিতে একদিন এক উচ্চ অট্টালিকার উপর পড়িয়া তাঁহার পদ ভগ্ন হয়। মাম্‌স্‌বরিনিবাসী অলিবর নামক একজন ইংরেজেরও সেই দশা ঘটে। ১৬৩৮ সালে গোল্‌ডেউইন-নামক এক ব্যক্তি শিক্ষিত হংসদিগের সাহায্যে উড়িতে চেষ্টা করেন। ১৬৭৮ সালে বেনিয়র নামক একজন ফরাসী পক্ষ প্রস্তুত পূর্ব্বক হস্ত-পদে বাঁধিয়া উড়িয়াছিল। ১৭১০ সালে লরেন্স দে গুজমান নামক একজন ফরাসী দারুনির্ম্মিত বায়ুপূর্ণ পক্ষীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আকাশে উঠিয়াছিল। মাকুর্ইস্ দে বাকবিল নামক একজন আপন অট্টালিকা হইতে উড়িতে চেষ্টা করিয়া নদীগর্ভে পতিত হন। বানসার্ডেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল।

১৭৬৭ সালে বিখ্যাত রসায়নবিদ্যার আচার্য্য ডাক্তার বাক প্রচার করেন যে; জলজন-বায়ু-পরিপূর্ণ পাত্র আকাশে উঠিতে পারে। আচার্য্য কাবালো ইহা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণীকৃত করেন, কিন্তু তখনও ব্যোমযানের কল্পনা হয় নাই।

ব্যোমযানের সৃষ্টিকর্ত্তা মোনগোল্‌ফীর নামক ফরাসী। কিন্তু তিনি জলজন-বায়ুর সাহায্য অবলম্বন করেন নাই। তিনি প্রথমে কাগজের বা বস্ত্রের গোলক নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে উত্তপ্ত বায়ু পুরিতেন। উত্তপ্ত বায়ু লঘুতর হয়, সুতরাং তৎসাহায্যে গোলক সকল উর্দ্ধে উঠিত। আচার্য্য চাল্‌স প্রথমে

জলজন-বায়ুপূরিত ব্যোমযানের সৃষ্টি করেন। গোব্ নামক ব্যোমযানে উক্ত বায়ু পূর্ণ করিয়া প্রেরণ করেন, তাহাতে সাহস করিয়া কোন মনুষ্য আরোহণ করে নাই। রাজপুরুষেরাও প্রাণিহত্যার ভয় প্রযুক্ত কাহাকেও আরোহণ করিতে দেন নাই। এই ব্যোমযান কিয়দ্দূর উঠিয়া ফাটিয়া যায়, জলজন বাহির হইয়া যাওয়ায়, ব্যোমযান তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হয়। গোনেস নামক ক্ষুদ্র গ্রামে উহা পতিত হয়। অদৃষ্টপূর্ব্ব খেচর দেখিয়া গ্রাম্য লোকে ভীত হইয়া, মহা কোলাহল আরম্ভ করে। অনেকে একত্রিত হইয়া গ্রাম্য লোকেরা দেখিতে আসিল যে, কিরূপ জন্তু আকাশ হইতে নামিয়াছে। দুই জন ধর্ম্মযাজক বলিলেন যে, ইহা অলৌকিক জীবের দেহাবশিষ্ট। শুনিয়া গ্রামবাসিগণ তাহাতে ঢিল মারিতে আরম্ভ করিল, এবং খোঁচা দিতে লাগিল। তন্মধ্যে ভূত আছে, বিবেচনা করিয়া গ্রাম্য লোকেরা ভূতশান্তির জন্য দলবদ্ধ হইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল, অবশেষে মন্ত্রবলে ভূত ছাড়িয়া পলায় কি না, দেখিবার জন্য আবার ধীরে ধীরে সেইখানে ফিরিয়া আসিল। ভূত তথাপি যায় না— বায়ুসংস্পর্শে নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করে। পরে একজন গ্রাম্যবীর, সাহস করিয়া তৎপ্রতি বন্দুক ছাড়িল। তাহাতে ব্যোমযানের আবরণ ছিদ্রবিশিষ্ট হওয়াতে, বায়ু বাহির হইয়া, রাক্ষসের শরীর আরও শীর্ণ হইল। দেখিয়া সাহস পাইয়া, আর একজন বীর গিয়া তাহাতে অস্ত্রাঘাত করিল। তখন ক্ষত-মুখ দিয়া বহুল-পরিমাণে জলজন নির্গত হওয়ায়, বীরগণ তাহার দুর্গন্ধে ভয় পাইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু এ জাতীয় রাক্ষসের শোণিত ঐ বায়ু। তাহা ক্ষত-মুখে নির্গত হইয়া গেলে, রাক্ষস ছিন্নমুণ্ড ছাগের ন্যায় "ধড় ফড়" করিয়া মরিয়া গেল। তখন বীরগণ প্রত্যাগত হইয়া তাহাকে অশ্বপুচ্ছে বন্ধন পূর্ব্বক লইয়া গেলেন। এদেশে হইলে সঙ্গে একটি রক্ষাকালী পূজা হইত এবং ব্রাহ্মণেরা চণ্ডীপাঠ করিয়া কিছু লাভ করিতেন। তার পরে, মোন্‌গোল্‌ফার আবার আগ্নেয় ব্যোমযান (অর্থাৎ যাহাতে জলজন না পূরিয়া, উত্তপ্ত সামান্য বায়ু পূরিত হয়) বর্সেল হইতে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে আধুনিক বেলুনের ন্যায় একখানি "রথ" সংযোজন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সেবারও মনুষ্য উঠিল না। সেই রথে চড়িয়া একটি মেষ, একটি কুক্কুর ও একটি হংস স্বর্গ-পরিভ্রমণে গমন করিয়াছিল। পরে স্বচ্ছন্দে গগনবিহার করিয়া, তাহারা সশরীরে মর্ত্ত্যধামে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহারা পুণ্যবান্ সন্দেহ নাই।

এক্ষণে ব্যোমযানে মনুষ্য উঠিবার প্রস্তাব হইতে লাগিল। কিন্তু প্রাণিহত্যার আশঙ্কায় ফ্রান্সের অধিপতি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে যদি ব্যোমযানে মনুষ্য উঠে, তবে যাহারা বিচারালয়ে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাধীন হইয়াছে, এমন দুই ব্যক্তি উঠুক—মরে মরিবে। শুনিয়া বিলাতর দে রোজীর নামক একজন বৈজ্ঞানিকের বড় রাগ হইল—"কি! আকাশ-মার্গে প্রথম ভ্রমণ করার যে গৌরব, তাহা দুর্বৃত্ত নরাধমদিগের কপালে ঘটিবে!" একজন রাজপুর-স্ত্রীর সাহায্যে রাজার মত ফিরাইয়া তিনি মার্কুইস দার্লান্দের সমভিব্যাহারে ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া আকাশপথে পর্য্যটন করেন। সেবার নির্বিঘ্নে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার দুই বৎসর পরে —আবার ব্যোমযানে আরোহণ পূর্ব্বক সমুদ্রপার হইতে গিয়া, অধঃপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ

করেন। যাহা হউক, তিনিই মনুষ্যমধ্যে প্রথম গগন-পর্য্যটক। কেন না, দুষ্মন্ত, পুরূরবা, কৃষ্ণার্জ্জুন প্রভৃতিকে মনুষ্য বিবেচনা করা অতি-ধৃষ্টের কাজ! আর যিনি 'জয় রাম' বলিয়া পঞ্চমবায়ুপথ সমুদ্র পার হইয়াছিলেন, তিনিও মনুষ্য নহেন, নচেৎ তাঁহাকে এই পদে অভিষিক্ত করার আমাদিগের আপত্তি ছিল না।

দে রোজীরের পরেই চার্লস্ ও রবর্ট একত্রে রাজভবন হইতে ছয় লক্ষ দর্শকের সমক্ষে জলজনীয় ব্যোমযানে উড্ডীন হয়েন এবং প্রায় ১৪০০০ ফীট ঊর্দ্ধে উঠেন।

ইহার পরে ব্যোমযানারোহণ বড় সচরাচর ঘটিতে লাগিল। কিন্তু অধিকাংশই আমোদের জন্য। বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব-পরীক্ষার্থ যাঁহারা আকাশ-পথে বিচরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১৮০৪সালে গাই লুকাসের আরোহণই বিশেষ বিখ্যাত। তিনি একাকী ২৩,০০০ ফীট উর্দ্ধে উঠিয়া নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছিলেন। ১৮৩৬ সালে গ্রীন এবং হলণ্ড সাহেব, পনের দিবসের খাদ্যাদি বেলুনে তুলিয়া লইয়া, ইংলণ্ড হইতে গগনারোহণ করেন। তাঁহারা সমুদ্রপার হইয়া আঠার ঘণ্টার মধ্যে জর্ম্মাণীর অন্তর্গত উইলবর্গ নামক নগরের নিকট অবতরণ করেন। গ্রীন অতি প্রসিদ্ধ গগন-পর্য্যটক ছিলেন। তিনি প্রায় চতুর্দ্দশ শত বার গগনারোহণ করিয়াছিলেন। তিনবার বায়ুপথে সমুদ্রপার হইয়াছিলেন, অতএব কলিযুগেও রামায়ণের দৈববলসম্পন্ন কার্য্য সকল পুনঃ সম্পাদিত হইতেছে। গ্রীন, দুইবার সমুদ্রমধ্যে পতিত হয়েন—এবং কৌশলে প্রাণরক্ষা করেন। কিন্তু বোধ হয়, জেমস্‌গ্লেশর অপেক্ষা কেহ অধিক উর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। তিনি ১৮৬২ সালে উল্বর্হাম্‌টন হইতে উড্ডীন হইয়া প্রায় সাত মাইল উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। তিনি বহুশতবার গগনোপরি ভ্রমণ পূর্ব্বক, বহুবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমেরিকার গগন-পর্য্যটক ওয়াইজ সাহেব, ব্যোমযানে আমেরিকা হইতে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া ইউরোপে আসিবার কল্পনায়, তাহার যথাযোগ্য উদ্‌যোগ করিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু সমুদ্রোপরি আসিবার পূর্ব্বে বাত্যামধ্যে পতিত হইয়া অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সাহস অতি ভয়ানক!

পাঠকদিগের অদৃষ্টে সহসা যে গগন-পর্য্যটন-সুখ ঘটিবে, এমন বোধ হয় না, এজন্য গগন-পর্য্যটকেরা আকাশে উঠিয়া কিরূপ দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের প্রণীত পুস্তকাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া এস্থলে সন্নিবেশ করিলে বোধ হয়, পাঠকেরা অসন্তুষ্ট হইবেন না। সমুদ্র নামটি কেবল জল-সমুদ্রের প্রতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু যে বায়ু কর্ত্তৃক পৃথিবী পরিবেষ্টিত, তাহাও সমুদ্রবিশেষ জলসমুদ্র হইতে ইহা বৃহত্তর। আমরা এই বায়বীয় সমুদ্রের তলচর জীব। ইহাতেও মেঘের উপদ্বীপ, বায়ুর স্রোতঃ প্রভৃতি আছে তদ্বিষয়ে কিছু জানিলে ক্ষতি নাই।

ব্যোমযান অল্প উচ্চ গিয়াই মেঘ-সকল বিদীর্ণ করিয়া উঠে। মেঘের আবরণে পৃথিবী দেখা যায় না, অথবা কদাচিৎ দেখা যায়। পদতলে অচ্ছিন্ন, অনন্ত, দ্বিতীয় বসুন্ধরাবৎ মেঘজাল বিস্তৃত। এই বাষ্পীয় আবরণে ভূগোলক আবৃত; যদি গ্রহান্তরে জ্ঞানবান্ জীব থাকে, তবে তাহারা পৃথিবীর বাষ্পীয়াবরণই দেখিতে পায়; পৃথিবী তাহাদিগের প্রায় অদৃশ্য। তদ্রূপ আমরাও বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণের রৌদ্রপ্রদীপ্ত, রৌদ্রপ্রতিঘাতী, বাষ্পীয় আবরণই দেখিতে পাই। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের এইরূপ অনুমান।

এইরূপ পৃথিবী হইতে সম্বন্ধরহিত হইয়া, মেঘময় জগতের উপরে স্থিত হইয়া দেখা যায় যে, সর্ব্বত্র জীবশূন্য, শব্দশূন্য, গতিশূন্য, স্থির, নীরব। মস্তকোপরি আকাশ অতি নিবিড় নীল সে নীলিমা আশ্চর্য্য। আকাশ বস্তুতঃ চিরান্ধকার—উহার বর্ণ গভীর কৃষ্ণ। অমাবস্যার রাত্রিতে প্রদীপশূন্য গৃহমধ্যে সকল দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া থাকিলে যেরূপ অন্ধকার দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশের প্রকৃত বর্ণ তাহাই। তন্মধ্যে স্থানে স্থানে নক্ষত্র-সকল প্রচণ্ডজ্বালাবিশিষ্ট। কিন্তু তদালোকে অনন্ত আকাশের অনন্ত অন্ধকার বিনষ্ট হয় না—কেন না, এই সকল প্রদীপ বহুদূরস্থিত। তবে যে আমরা আকাশকে অন্ধকারময় না দেখিয়া উজ্জ্বল দেখি, তাহার কারণ বায়ু। সকলেই জানেন, সূর্য্যালোক সপ্তবর্ণময়। স্ফটিকের দ্বারা বর্ণগুলি পৃথক্ করা যায়—সপ্ত বর্ণের সংমিশ্রণে সূর্য্যালোক। বায়ু জড় পদার্থ, কিন্তু বায়ু আলোকের পথ রোধ করে না। বায়ু সূর্য্যালোকের অন্যান্য বর্ণের পথ ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু নীলবর্ণকে রুদ্ধ করে। রুদ্ধ বর্ণ বায়ু হইতে প্রতিহত হয়। সেই সকল প্রতিহত বর্ণাত্মক আলোক-রেখা আমাদের চক্ষুতে প্রবেশ করায় আকাশ উজ্জ্বল নীলিমাবিশিষ্ট দেখি—অন্ধকার দেখি না।* কিন্তু যত উর্দ্ধে উঠা যায়, বায়ুস্তর তত ক্ষীণতর হয়, গাগনিক উজ্জ্বল নীলবর্ণ ক্ষীণতর হয়; আকাশের কৃষ্ণত্ব কিছু কিছু সেই আবরণ ভেদ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়; এই জন্য উর্দ্ধলোকে গাঢ় নীলিমা।

শিরে এই গাঢ়নীলিমা—পদতলে তুঙ্গশৃঙ্গবিশিষ্ট পর্ব্বতমালায় শোভিত মেঘলোক—সে পর্ব্বতমালাও বাষ্পীয় মেঘের পর্ব্বত—পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত, তদুপরি আরও পর্ব্বত—কেহ বা কৃষ্ণমধ্য, পার্শ্বদেশ রৌদ্রের প্রভাবিশিষ্ট—কেহ বা রৌদ্রস্নাত, কেহ যেন শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত, কেহ যেন হীরক-নির্ম্মিত। এই সকল মেঘের মধ্য দিয়া ব্যোমযান চলে। তখন, নীচে মেঘ, উপরে মেঘ, দক্ষিণে মেঘ, বামে মেঘ, সম্মুখে মেঘ, পশ্চাতে মেঘ। কোথাও বিদ্যুৎ চমকিতেছে, কোথাও ঝড় বহিতেছে, কোথাও বৃষ্টি হইতেছে, কোথাও বরফ পড়িতেছে। মস্যুর ফনাবল একবার একটি মেঘগর্ভস্থ রন্ধ্র দিয়া ব্যোমযানে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার কৃত বর্ণনা পাঠ করিয়া বোধ হয়, যেমন মুঙ্গেরে রেলপথে পর্ব্বতমধ্য দিয়া বাষ্পীয় শকট গমন করে, তাঁহার ব্যোমযান মেঘমধ্য দিয়া সেইরূপ গমন করিয়াছিল।

ই মেঘলোকে সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্ত অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য—ভূলোকে তাহার সাদৃশ্য অনুমিত হয় না। ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া অনেকে একদিনে দুইবার সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছেন, এবং কেহ কেহ একদিনে দুইবার সূর্য্যোদয় দেখিয়াছেন। একবার সূর্য্যাস্তের পর রাত্রিসমাগম দেখিয়া আবার ততোধিক উর্দ্ধে উঠিলে দ্বিতীয়বার সূর্য্যাস্ত দেখা যাইবে এবং একবার সূর্য্যোদয় দেখিয়া আবার নিম্নে নামিলে সেই দিন দ্বিতীয়বার সূর্য্যোদয় অবশ্য দেখা যাইবে।

ব্যোমযান হইতে যখন পৃথিবী দেখা যায়, তখন উহা বিস্তৃত মানচিত্রের ন্যায় দেখায়; সর্ব্বত্র সমতল—অট্টালিকা, বৃক্ষ, উচ্চভূমি এবং অল্পোন্নত মেঘ, যেন সকলই অনুচ্চ, সকলই সমতল ভূমিতে চিত্রিতবৎ দেখায়। নগর-সকল যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গঠিত প্রতিকৃতি চলিয়া যাইতেছে বোধ হয়। বৃহৎ জনপদ

* কেহ কেহ বলেন যে, বায়ুমধ্যস্থ জলবাষ্প হইতে প্রতিহত নীল রশ্মি-রেখাই আকাশের উজ্জ্বল নীলিমার কারণ।

নের মত দেখায়। নদী শ্বেত সূত্র বা উরগের মত দেখায়। বৃহৎ অর্ণবযান-সকল বালকের ক্রীড়ার জন্য নির্ম্মিত তরণীর মত দেখায়। যাঁহারা লণ্ডন বা পারিস নগরীর উপর উত্থান করিয়াছেন,তাঁহারা দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন—তাঁহারা প্রশংসা করিয়া ফুরাইতে পারেন নাই। গ্লেশর সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, লণ্ডনের উপরে উঠিয়া এককালে ত্রিশ লক্ষ মনুষ্যের বাস-গৃহ নয়নগোচর করিয়াছিলেন। রাত্রিকালে মহানগরী সকলের রাজপথস্থ দীপমালা-সকল অতি রমণীয় দেখায়।

যাঁহারা পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, যত ঊর্দ্ধে উঠা যায়, তত তাপের অল্পতা। সিমলা, দারজিলিং প্রভৃতি পার্ব্বত্য স্থানের শীতলতার কারণ এই, এবং এই জন্য হিমালয় তুষার-মণ্ডিত। (আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে হিমকে ভারতবর্ষীয় কবিগণ "কো হি দোষো গুণসন্নিপাতে" বিবেচনা করিয়াছিলেন, আধুনিক রাজপুরুষেরা তাহাকেও গুণ বিবেচনা করিয়া তথায় রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছেন।) ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থান করিলেও ঐরূপ ক্রমে হিমের আতিশয্য অনুভূত হয়। তাপ, তাপমান-যন্ত্রের দ্বারা মিত হইয়া থাকে। যন্ত্র ভাগে ভাগে বিভক্ত। মনুষ্যশোণিত কিছু উষ্ণ, তাহার পরিমাণ ৯৮ ভাগ। ২২২ ভাগ তাপে জল বাষ্প হয়। ৩২ ভাগ তাপে জল তুষারত্ব প্রাপ্ত হয়। (তাপে জল তুষার হয়, এ কোন্ কথা? বাস্তবিক তাপে জল তুষার হয় না, তাপাভাবেই হয়। ৩২ ভাগ তাপ জলের স্বাভাবিক তাপের অভাববাচক।)

পূর্ব্বে বিজ্ঞানবিদ্‌গণের সংস্কার ছিল যে, ঊর্দ্ধে তিন শত ফিট প্রতি একভাগ তাপ কমে অর্থাৎ তিন শত ফিট উঠিলে এক ভাগ তাপহানি হইবে—ছয় শত ফিট উঠিলে দুই ভাগ কমিবে—ইত্যাদি। কিন্তু গ্লেশর সাহেব বহুবার পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ঊর্দ্ধে তাপহানি এরূপ একটি সরল নিয়মানুগামী নহে। অবস্থা-বিশেষে তাপহানির গৌরব ঘটিয়া থাকে, মেঘ থাকিলে তাপহানি অল্প হয় কারণ, মেঘ তাপরোধক এবং তাপগ্রাহক। আবার দিবাভাগে যেরূপ তাপ হানি ঘটে, রাত্রে সেরূপ নহে। গ্লেশর সাহেবের পরীক্ষার ফল নিম্নলিখিত মত—

ভূমি হইতে হাজার ফিট পর্য্যন্ত মেঘাচ্ছন্নাবস্থায় তাপহানির পরিমাণ ৪.৫ ভাগ মেঘ না থাকিলে ৬২ ভাগ, দশ হাজার ফিট পর্য্যন্ত মেঘচ্ছন্নাবস্থায় ২.২ ভাগ, মেঘ না থাকিলে ২ভাগ। বিশ হাজার ফিট ঊর্দ্ধে মেঘাচ্ছন্ন ১.১ ভাগ; মেঘশূন্যে ১.২ ভাগ। ত্রিশ হাজার ফিট ঊর্দ্ধে মোট ৬.২ ভাগ তাপহ্রাস পরীক্ষিত হইয়াছিল ইত্যাদি।

তাপহ্রাস হেতু ঊর্দ্ধে স্থানে স্থানে তুষার-কণা (Snow) দৃষ্ট হয় এবং ব্যোমযান কখনও কখন তন্মধ্যে পতিত হয়। ঊর্দ্ধে শীতাধিক্য অনেক সময়ে যানারোহীদিগের কষ্টকর হইয়া উঠে, এমন কি, অনেক সময়ে হাত-পা অবশ হয়, এবং চেতনা অপহৃত হয়।

ঊর্দ্ধে তাপাভাবের কারণ তপ্ত বা তাপ্য সামগ্রীর অভাব। রৌদ্র ভূমিতে যেমন প্রখর, ঊর্দ্ধে বরং ততোধিক প্রখরতর বোধ হয়। কিন্তু তাহাতে কি তপ্ত হইবে? ভূমি অতি দূরে, বায়ু অতিক্ষীণ—অল্পপরমাণু। দশ বারটি তুলার বস্তা উপর্য্যুপরি রাখিয়া দেখিবেন—উপরিস্থ তুলার ভারে নিম্নস্থ বস্তার তুলা গাঢ়তর হইয়াছে। সেমনি নিম্নস্থ বায়ু গাঢ়— উপরিস্থ বায়ু ক্ষীণ। ভূমির উপরে যে ভার,তাহার পরিমাণ সাড়ে সাতসের। আমরা মস্তকের উপর অহরহঃ এই ভার বহন করি-

তেছি—তজ্জন্য কোন পীড়া বোধ করি না কেন? উত্তর, "অগাধ-জল-সঞ্চারী" মৎস্য উপরিস্থিত বারিরাশির ভারে পীড়িত না হয় কেন? উপরিস্থ বায়ুস্তর-সমূহের ভারে নিম্নস্থ বায়ুস্তর-সকল ঘনীভূত—যত ঊর্দ্ধে যাওয়া যায়, বায়ু তত ক্ষীণ হইতে থাকে। গগন-পর্য্যটকেরা ইহা পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন, গুরুত্ব অনুসারে ৩৫০ মাইলের ঊর্দ্ধের মধ্যেই অর্দ্ধেক বায়ু আছে; এবং পাঁচ ছয় মাইলের মধ্যেই সমুদয় বায়ুর তিন ভাগের দুই ভাগ আছে। এইজন্য ঊর্দ্ধে উঠিতে গেলে, নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য অত্যন্ত কষ্ট হয়। মস্যুর ফ্লামারিয়ঁ দশ সহস্র ফিট ঊর্দ্ধে উঠিয়া, প্রথমবারে যেরূপ কষ্ট অনুভূত করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা এইরূপ করিয়াছেন, যথা—

"সাতটা বাজিতে এক পোয়া থাকিতে আমার শরীরমধ্যে এক অপূর্ব্ব আভ্যন্তরিক শীতলতা অনুভূত করিতে লাগিলাম। তৎসহিত তন্দ্রা আসিল। কষ্টে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলাম। কর্ণমধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ হইতে লাগিল এবং আধ মিনিট কাল, আমার হৃদ্রোগ উপস্থিত হইল। কণ্ঠ শুষ্ক হইল। আমি একপাত্র জল পান করিলাম—তাহাতে উপকার বোধ হইল। যে বোতলে জল ছিল—তাহা ছিপি খুলিবার সময়ে,যেমন শ্যাম্পেনের বোতলের ছিপি সশব্দে বেগে উঠিয়া পড়ে, জলের বোতলের ছিপি খুলিতে সেইরূপ হইল। ইহার কারণ সহজেই বুঝা যাইতে পারে। তখন আমাদিগের মস্তকের উপর বায়ু এক ভাগ কমিয়াছিল। যখন বোতলে ছিপি আঁটিয়া গগনে যাত্রা করিয়াছিলাম, তখনকার অপেক্ষা এখনকার বায়ুর ভার এক ভাগ কম হইয়াছিল।"

দুই একবার গগন-মার্গে যাতায়াত করিলে এ সকল কষ্ট সহ্য হইয়া আইসে,কিন্তু অধিক ঊর্দ্ধে উঠিলে সহিষ্ণু ব্যক্তিরও কষ্ট হয়। গ্লেশর সাহেব এ সকল কষ্টে বিশেষ সহিষ্ণু ছিলেন, কিন্তু ছয় মাইল ঊর্দ্ধে উঠিয়া তিনিও চেতনাশূন্য ও মুমূর্ষু হইয়াছিলেন। ২৯০০০ ফিট উপরে উঠিলে পর, তাহার দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়া আইসে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আর তাপমান-যন্ত্রের পারদ-স্তম্ভ অথবা ঘড়ির কাঁটা দেখিতে সক্ষম হইলেন না। টেবিলের উপর এক হাত রাখিলেন। যখন টেবিলের উপর হাত রাখিলেন,তখন হস্ত সম্পূর্ণ সবল; কিন্তু তখনই সে হাত আর উঠাইতে পারিলেন না—তাহার শক্তি অন্তর্হিতা হইয়াছিল। তখন দেখিলেন, দ্বিতীয় হস্তও সেই দশাপন্ন হইয়াছে, অবশ। তখন একবার গাত্রালোড়ন করিলেন; গাত্র চালনা করিতে পারিলেন, কিন্তু বোধ হইল যেন, হস্ত-পদাদি নাই। ক্রমে এইরূপে তাঁহার সকল অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল; ভগ্নগ্রীবের ন্যায় মস্তক লম্বিত হইয়া পড়িল, এবং দৃষ্টি একেবারে বিলুপ্ত হইল। এইরূপে তিনি অকস্মাৎ মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছিলেন, এমত সময়ে হঠাৎ তাঁহার চৈতন্যও বিলুপ্ত হইল। পরে ব্যোমযানের সারথি রথ নামাইলে তিনি পুনর্ব্বার জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন।

রথ নামাইল কি প্রকারে? ব্যোমযানের গতি দ্বিবিধ; প্রথম,ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ বা অধঃ হইতে ঊর্দ্ধ। দ্বিতীয়, দিগন্তরে; যেমন শকটাদি অভিলষিত দিকে যায়,সেইরূপ। ব্যোমযান অভিলষিত দিগন্তরে চালনা করা এ পর্য্যন্ত সাধ্যায়ত্ত হয় নাই—চালক মনে করিলে উত্তর পশ্চিমে, বামে বা দক্ষিণে, সম্মুখে বা পশ্চাতে যান চালাইতে পারেন না। বায়ুই ইহার যথার্থ সারথি, বায়ুসারথি যে দিকে লইয়া যায়,ব্যোমযান সেই দিকে চলে। কিন্তু ঊর্দ্ধাধঃ গতি মনুষ্যের আয়ত্ত। ব্যোমযান

লঘু করিতে পারিলেই উর্দ্ধে উঠিবে এবং পার্শ্ববর্ত্তী বায়ুর অপেক্ষা গুরু করিতে পারিলে নামিবে। ব্যোমযানের রথে কতকটা বালুকা বোঝাই থাকে; তাহার কিয়দংশ নিক্ষেপ করিলেই পূর্ব্বাপেক্ষা লঘুতা সম্পাদিত হয়—তখন ব্যোমযান আরও উর্দ্ধে উঠে। এইরূপে ইচ্ছাক্রমে উর্দ্ধে উঠা যায়। আর যে লঘু বায়ু কর্ত্তৃক বেলুন পরিপূরিত থাকায় তাহা গগনমণ্ডলে উঠিতে সক্ষম, তাহার কিয়দংশ নির্গত করিতে পারিলেই উহা নামে। ঐ বায়ু নির্গত করিবার জন্য ব্যোমযানের শিরোভাগে একটি ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্র সচরাচর আবৃত থাকে, কিন্তু তাহার আবরণে একটি দড়ি বাঁধা; সেই দড়ি ধরিয়া টানিলেই লঘু বায়ু বাহির হইয়া যায়, ব্যোমযান নামিতে থাকে।

দিগন্তরে গতি মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে বটে, কিন্তু মনুষ্য বায়ুর সাহায্য অবলম্বন করিতে সক্ষম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন দিগভিমুখে বায়ু বহিতে থাকে। যখন ব্যোমারোহী ভূমির উপরে দক্ষিণ বায়ু দেখিয়া, যানারোহণ করিলেন, তখনই হয় ত কিয়দ্দূরে উঠিয়া দেখিলেন যে, বায়ু উত্তর; আরও উঠিলে হয় ত দেখিবেন যে, বায়ু পূর্ব্বে কি পুনশ্চ দক্ষিণে ইত্যাদি। কোন্ স্তরে কোন্ সময়ে কোন্ দিকে বায়ু বহে, ইহা যদি মনুষ্যের জানা থাকিত, তাহা হইলে ব্যোমযান মনুষ্যের আজ্ঞাকারী হইত। যাঁহারা সুচতুর, তাঁহারা কখন কখন বায়ুর গতি অবধারিত করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে গমন পর্য্যটন করিয়াছেন। ১৮৬৮ সালের আগষ্ট মাসে মস্যুর তিসান্দর কালে নগর হইতে নেপ্‌চ্যুন-নামক বেলুনে গগনারোহণ করেন। চারি ফিট উর্দ্ধে উঠিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের গতি উত্তর-সমুদ্রে। অপরাহ্নে এইরূপ তাঁহারা অকস্মাৎ অনিচ্ছার সহিত অনন্ত সাগরের উপর যাত্রা করিলেন। কিন্তু তখন উপায়ান্তর ছিল না; এই সঙ্কটে তাঁহারা দেখিলেন যে নিম্নে মেঘ-সকল দক্ষিণগামী। তখন তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া সমুদ্র-বিহারে চলিলেন। এইরূপে তাঁহারা ২১ মাইল পর্য্যন্ত সমুদ্রোপরে বাহির হইয়া যান। তাহার পর লঘু বায়ু নির্গত করিয়া দিয়া নীচে নামেন। বায়ুর সেই নিম্ন স্তরে দক্ষিণ বায়ু পাইয়া তৎকর্ত্তৃক বাহির হইয়া পুনর্ব্বার ভূমির উপরে আসেন। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ অবতরণ করেন না। তার পর সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকার হইল। বাষ্পের গাঢ়তা বশতঃ নিম্নে ভূতল দেখা যাইতেছিল না। এমন অবস্থায় তাঁহারা কোথায় যাইতেছিলেন তাহা জানিতে পারেন নাই। অকস্মাৎ নিম্ন হইতে গম্ভীর সমুদ্র-কল্লোল উত্থিত হইল। তখন অন্ধকারে পুনর্ব্বার অনন্ত সাগরোপরি বিচরণ করিতেছেন জানিতে পারিয়া তাঁহারা আবার নিম্নে নামিলেন। আবার দক্ষিণবায়ুর সাহায্যে ভূমি প্রাপ্ত হইলেন।

উত্তর-সমুদ্রে বিচরণকালে তাঁহারা কয়েকটি অদ্ভুত ছায়া দেখিয়াছিলেন। দেখিলেন যে, সমুদ্রে যে সকল বাষ্পীয়াদি জাহাজ চলিতেছিল, উর্দ্ধে মেঘমধ্যে তাহার প্রতিবিম্ব। মেঘমধ্যে তেমনি সমুদ্র চিত্রিত হইয়াছে—সেই চিত্রিত সমুদ্রে তেমনি প্রকৃত জাহাজের ন্যায় ছায়ার জাহাজ চলিতেছে। সেই সকল জাহাজের তলদেশ উর্দ্ধে, মাস্তুল নিম্নে; বিপরীতভাবে জাহাজ চলিতেছে। মেঘরাশি বৃহদ্দর্পণস্বরূপ সমুদ্রকে প্রতিবিম্বিত করিয়াছিল।

মস্যুর ফ্লামারিয়ঁ আর একটি আশ্চর্য্য প্রতিবিম্বে দেখিয়াছিলেন। দিবাভাগে প্রায় পাঁচ সহস্র ফিট উর্দ্ধে আরোহণ করিয়া দেখি-

লেন, তাঁহাদিগের প্রায় শত ফিট মাত্র দূরে, দ্বিতীয় একটি বেলুন চলিয়াছে। আরও দেখিলেন যে, সেই দ্বিতীয় বেলুনটির আকৃতি তাঁহাদিগের বেলুনেরই আকৃতি, যেমন তাঁহাদিগের বেলুনের নিম্নে "রথ" যুক্ত ছিল, এবং তাহাতে যাঁহারা দুই জন আরোহী বসিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বেলুনেও সেইরূপ রথ, এবং সেইরূপ দুই জন আরোহী। আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, সেই দুইজন আরোহীর অবয়ব—তাঁহাদিগেরই অবয়ব! তাঁহারাই সেই দ্বিতীয় বেলুনে বসিয়া আছেন। একটি বেলুনে যেখানে যাহা ছিল--যেখানে যে দড়ি, যেখানে যে সূতা, যেখানে যে যন্ত্র, দ্বিতীয় বেলুনে ঠিক তাহাই আছে। ফ্লামারিয়ঁ দক্ষিণ হস্তোত্তোলন করিলেন—ভৌতিক ফ্লামারিয়ঁ বাম হস্তোত্তোলন করিল। তাঁহার সঙ্গী একটি পতাকা উড়াইলেন—ভৌতিক সঙ্গী একটা তদ্রূপ পতাকা উড়াইল।

আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সেই ভৌতিক ব্যোমযানের ভৌতিক রথের চতুস্পার্শ্বে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল-সকল প্রতিভাত হইতেছিল। মধ্যে হরিৎ শ্বেতাভ মণ্ডল, তন্মধ্যে রথ। তৎপার্শ্বে ক্ষীণ নীল মণ্ডল; তাহার বাহিরে হরিদ্রাবর্ণ মণ্ডল; তৎপরে কপিশ রক্তাভ মণ্ডল, শেষে অতসীকুসুমবৎ বর্ণ; তাহা ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া মেঘের সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে।

এই বৃত্তান্ত বুঝাইবার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে হইতে পারে না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহা জলবাষ্পের উপর প্রতিসৌরবিশ্ব*মাত্র।

গগনপথে পার্থিব শব্দ সহজে গমন করে, কিন্তু সকল সময়ে নহে, এবং সকল শব্দের গতি তুল্যরূপ নহে। মেঘাচ্ছন্নে শব্দরোধ ঘটে। গ্লেশর সাহেব চারি মাইল ঊর্দ্ধ হইতে রেইল্‌ওয়ে ট্রেণের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং বিশ হাজার ফিট উপরে থাকিয়া কামানের শব্দ শুনিয়াছিলেন। একটি ক্ষুদ্র কুক্কুরের রব দুই মাইল উপর হইতে শুনিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু চারি হাজার ফিট উপরে থাকিয়া বহুসংখ্যক মনুষ্যের কোলাহল শুনিতে পান নাই। মস্যূর ফ্লামারিয়ঁ আকাশ হইতে ভূমণ্ডলের বাদ্য শুনিতে পাইতেন। তাঁহার বোধ হইত, যেন মেঘমধ্যে কে সঙ্গীত করিতেছে।

অনেকেই অবগত আছেন যে, যখন পারিস অবরুদ্ধ হয়, তখন ব্যোমযানযোগে পারিস হইতে গ্রাম্য প্রদেশে ডাক যাইত। শিক্ষিত পারাবত-সকল সেই সকল ব্যোমযানে চড়িয়া যাইত। তাহাদের পুচ্ছে উত্তর বাঁধিয়া দিলে লইয়া ফিরিয়া আসিত। লঘুতার অনুরোধে সেই সকল পত্র ফটোগ্রাফের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্রাকারে লিখিত হইত—অতি বৃহৎ পত্র এক ইঞ্চির মধ্যে সমাবিষ্ট হইত। পড়িবার সময়ে অণুবীক্ষণ ব্যবহার করিতে হইত। স্থানাভাব বশতঃ এই কৌতুকাবহ তত্ত্ব আমরা সবিস্তারে লিখিতে পারিলাম না।

উপসংহারকালে বক্তব্য যে, ব্যোমযান এখনও সাধারণের গমনাগমনের উপযোগী বা যথেচ্ছ বিহারের উপায়স্বরূপ হয় নাই। গ্লেশর সাহেব বলেন যে, বেলুনের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না; যানান্তর ইহার দ্বারা সূচিত হইতে পারে; যানান্তর সূচিত না হইলে সে আশা পূর্ণ হইবে না। মনুষ্য কখন উড়িতে পারিবে কি না, মস্যূর ফ্লামারিয়ঁ এই তত্ত্বের সবিস্তারে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, একদিন মনুষ্যগণ অবশ্য পক্ষীদিগের ন্যায় উড়িতে পারিবে; কিন্তু আত্মবলে

* Ant' helia.

নহে। যখন মনুষ্য, পক্ষ বা পক্ষবৎ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া, বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক বলে তাহা সঞ্চালন করিতে পারিবে, তখন মনুষ্যের বিহঙ্গপদ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা। দেলোম নামক একজন ফরাসী একটি মৎস্যাকার বেলুন কল্পনা করিয়াছেন, তিনি বিবেচনা করেন, তৎসাহায্যে মনুষ্য যথেচ্ছ আকাশ-পথে যাতায়াত করিতে পারিবে। কিন্তু সে যন্ত্র হইতে এ পর্য্যন্ত কোন ফলোদয় হয় নাই বলিয়া আমরা তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম না।

চঞ্চল জগৎ।

সচরাচর মনুষ্যের বোধ এই যে, গতি জগতের বিকৃত অবস্থা; স্থিরতা জগতের স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে যে, গতিই স্বাভাবিক অবস্থা; স্থিরতা কেবল গতির রোধ মাত্র। যাহা গতিবিশিষ্ট, কারণ বশতঃ তাহার গতির রোধ হইলে, তাহার অবস্থাকে আমরা স্থিরতা বা স্থিতি বলি। যে শিলাখণ্ড, বা অট্টালিকাকে অচল বিবেচনা করিতেছি, বাস্তবিক তাহা মাধ্যাকর্ষণের বলে গতি-বিশিষ্ট; নিম্নস্থ ভূমি তাহার গতি রোধ করিতেছে বলিয়া, তাহাকে স্থির বলিতেছি। এ স্থিরতাও কাল্পনিক; পৃথিবীস্থ অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিতেছি যে, এই পর্ব্বত বা এই অট্টালিকা, অচল, গতিশূন্য—বস্তুতঃ উহার কেহই অচল বা গতিশূন্য নহে; পৃথিবীর উপরে থাকিয়া উহা পৃথিবীর সঙ্গে আবর্ত্তন করিতেছে। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিতে গেলে জগতে কিছুই গতিশূন্য নহে।

কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্। যাহা পৃথিবীর গতিতে গতিবিশিষ্ট, তাহাকে চঞ্চল বলিবার প্রয়োজন করে না। তথাপি পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই যে, মুহূর্ত্তজন্য স্থির।

চারি পার্শ্বে চাহিয়া দেখ, বায়ু বহিতেছে, বৃক্ষপত্র সকল নাচিতেছে, জল চলিতেছে, জীব-সকল নিজ নিজ প্রয়োজন সম্পাদনার্থ বিচরণ করিতেছে। পরন্তু ইহার মধ্যেও কোন কোন বস্তু গতিশূন্য দেখা যাইতেছে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণে বা অন্য প্রকারে রুদ্ধ বাহ্যক গতি ভিন্ন, ঐ সকল বস্তুর অন্য গতি আছে। সেই সকল গতি আভ্যন্তরিক।

বস্তুমাত্রেরই কিয়ৎপরিমাণে তাপ আছে। যাহাকে শীতল বলি, তাহা বস্তুতঃ তাপশূন্য নহে। তাপের অল্পতাকেই শীতলতা বলি, তাপের অভাব কিছুতেই নাই। যে তুষারখণ্ড-স্পর্শে অঙ্গচ্ছেদের ক্লেশানুভব করিতে হয়, তাহাতেও তাপের অভাব নাই—অল্পতা মাত্র।

যাহাকে তাপ বলি, তাহা পরমাণুগণের আন্দোলন মাত্র। কোন বস্তুর পরমাণুসকল পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট এবং সন্তাড়িত হইলে, তাহা তরঙ্গবৎ আন্দোলিত হইতে থাকে। সেই ক্রিয়াই তাপ। যেখানে সকল বস্তুই তাপযুক্ত, সেখানে সকল বস্তুর পরমাণুই অহরহ পরস্পর কর্ত্তৃক আকৃষ্ট, সন্তাড়িত এবং সঞ্চালিত। অতএব পৃথিবীস্থ সকল বস্তুই আভ্যন্তরিক গতিবিশিষ্ট।

আলোক সম্বন্ধেও সেই কথা। ইথর নামক বিশ্বব্যাপী আকাশীয় তরল পদার্থের পরমাণু-সমষ্টির তরঙ্গবৎ আন্দোলনই আলোক। সেই গতিবিশিষ্ট পরমাণুসকলের সঙ্গে নয়নেন্দ্রিয়ের

সংস্পর্শে আলোক অনুভূত হয়। সেই প্রকার তাপীয় তরঙ্গ সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে তাপ অনুভূত করি। এই সকল আন্দোলন-ক্রিয়া মনুষ্যের অগোচর—উহা তাপরূপে এবং আলোকরূপেই আমরা ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক গ্রহণ করিতে পারি—অন্য রূপে নহে। তবে এই আন্দোলন-ক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কারণ কি? ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদেরা তাহা স্বীকার করিবার বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা এ স্থলে বর্ণনীয় নহে।

পৃথিবীতলে আলোক সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। অতি অন্ধকার অমাবস্যার রাত্রিতেও পৃথিবীতল একেবারে আলোকশূন্য নহে। অতএব সর্ব্বত্রেই আলোকীয় আন্দোলনের গতি বর্ত্তমান।

বিজ্ঞানবিদেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আলোক, তাপ এবং মাধ্যাকর্ষণ তিনটিই পরমাণুর গতি মাত্র। অতএব পৃথিবীর সকল বস্তুই আভ্যন্তরিক গতিবিশিষ্ট। যৌগিক আকর্ষণের বলে সেই সকল গতি সত্ত্বেও কোন বস্তুর পরমাণু সকল বিস্রস্ত বা পৃথগ্‌ভূত হয় না।

পৃথিবীতলে এইরূপ। তার পর, পৃথিবীর বাহিরে বিশ্ব

পৃথিবী স্বয়ং অত্যন্ত প্রখর-বেগবিশিষ্টা এবং অনন্তকাল আকাশমার্গে ধাবমানা। অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি যাহা সৌরজগতের অন্তর্গত, তাহাও পৃথিবীর মত অবস্থাপন্ন সন্দেহ নাই। সেই সকল গ্রহ উপগ্রহে যে সকল পদার্থ আছে, তাহাও পার্থিব পদার্থের ন্যায় সর্ব্বদা বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক গতিবিশিষ্ট। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের দৌরবীক্ষণিক অনুসন্ধানে সে কথার অনেক প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে।

সূর্য্য নামে যে বৃহৎ বস্তু এই সৌর-জগতের কেন্দ্রীভূত, তাহা যেরূপ চাঞ্চল্যপূর্ণ, তাহা মনুষ্যের অনুভব-শক্তির অতীত। যে সূর্য্যমণ্ডলের তাপ আলোক, আকর্ষণ এবং বৈদ্যুতিকী শক্তি পৃথিবীস্থ গতিমাত্রেরই কারণ, সেই সূর্য্যমণ্ডলোপরি বা তদভ্যন্তরে যে নানাবিধ ভয়ঙ্কর এবং অদ্ভুত গতি নিয়ত বর্ত্তিবে, তাহা বলা বাহুল্য। সেই চাঞ্চল্যের একটি উদাহরণ "আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত" নামক প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছিল।

কিন্তু সূর্য্যোপরি এবং সূর্য্যগর্ভে যে নিয়ত গতির আধিপত্য, কেবল ইহাই নহে। সূর্য্য স্বয়ং গতিবিশিষ্ট। বিজ্ঞানবিদেরা স্থির করিয়াছেন যে, সূর্য্য স্বয়ং এই তাবৎ সৌর-জগৎ সঙ্গে লইয়া প্রতি সেকেণ্ডে ৪৮০ মাইল অর্থাৎ ঘণ্টায় ১৭১০০ মাইল আকাশপথে ধাবিত হইতেছে। এই ভয়ঙ্কর বেগে এই পদার্থরাশি কোথায় যাইতেছে? কেহ বলিতে পারে না কোথায় যাইতেছে। আকাশের একটি নাক্ষত্রিক প্রদেশকে ইউরোপীয়েরা হরক্যুলিজ্‌ বলেন। সূর্য্য তন্মধ্যস্থ লাম্‌ডা নামক নক্ষত্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, কেবল এই পর্য্যন্ত নিশ্চিত হইয়াছে।

কিন্তু সূর্য্য এবং সৌর-জগৎ ত বিশ্বের অতি ক্ষুদ্রাংশ। অন্ধকার রাত্রিতে অনন্ত আকাশমণ্ডল ব্যাপিয়া যে সকল জ্যোতিষ্ক জ্বলিতে থাকে, তাহারা সকলেই এক একটি সৌর-জগতের কেন্দ্রীভূত। সে সকল কি গতিশূন্য? তাহাদিগেরও প্রাত্যহিক উদয়াস্তাদি দেখিতে পাই, সেও পৃথিবীর প্রাত্যহিক আবর্ত্তনজনিত চাক্ষুষ ভ্রান্তি মাত্র। নাক্ষত্রিক লোকেও কি জগৎ চঞ্চল?

জ্যোতির্ব্বিদ্যার দ্বারা যত দূর অনুসন্ধান হইয়াছে, ততদূর জানিতে পারা গিয়াছে যে, নক্ষত্রলোকেও গতি সর্ব্বময়ী। যত অনুসন্ধান হইয়াছে, ততই বুঝা গিয়াছে যে, সূর্য্যের যে

প্রকৃতি, নক্ষত্রমাত্রেরই সেই প্রকৃতি। গ্রহ ভিন্ন অন্য তারাকে নক্ষত্র বলিতেছি।

কতকগুলি নক্ষত্র সৌর গ্রহণের ন্যায় বর্ত্তনশীল। যেখানে আমরা চক্ষুতে একটি নক্ষত্র দেখিতে পাই, দূরবীক্ষণ-সাহায্যে দেখিলে তথায় কখন কখন দুইটি, তিনটি বা ততোধিক নক্ষত্র দেখা যায়। কখন কখন ঐ দুই তিনটি নক্ষত্র পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ-রহিত, এবং পরস্পর হইতে দূরস্থিত, অথচ দর্শক যেখান হইতে দেখিতেছেন, সেখান হইতে দেখিতে গেলে আকাশের একদেশে স্থিত দেখায়, এবং একটি সরল রেখার মধ্যবর্ত্তী হইয়া যুগ্ম নক্ষত্রের ন্যায় দেখায়। কিন্তু কখন কখন দেখা যায় যে, যে নক্ষত্রদ্বয় দেখিতে যুগ্ম, তাহা বাস্তবিক যুগ্মই বটে,— পরস্পরের নিকটবর্ত্তী এবং পরস্পরের সহিত নৈসর্গিক সম্বন্ধবিশিষ্ট। এই সকল যুগ্মাদি নক্ষত্র সম্বন্ধে আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা পর্য্যবেক্ষণা ও গণনার দ্বারা স্থিরীকৃত করিয়াছেন যে, উহারা পরস্পরকে বেড়িয়া বর্ত্তন করিতেছে। অর্থাৎ যদি ক, খ, এই দুইটি নক্ষত্রে একটি যুগ্ম নক্ষত্র হয়, তবে ক, খ, উভয়ের মাধ্যাকর্ষণিক কেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে ক, খ, উভয় নক্ষত্র বর্ত্তন করিতেছে। কখন কখন দেখা গিয়াছে যে, এইরূপ দুইটি কেন, বহু নক্ষত্রে এক একটি নাক্ষত্রিক জগৎ। তন্মধ্যস্থ বিভক্ত নক্ষত্রগুলি সকলই ঐ প্রকার আবর্ত্তনকারী। বিচিত্র এই যে, নিউটন পৃথিবীতে বসিয়া, পার্থিব পদার্থের গতি দেখিয়া, পার্থিব উপগ্রহ চন্দ্রের গতিকে উপলক্ষ্য করিয়া, যে সকল মাধ্যাকর্ষণিক গতির নিয়ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, দূরবর্ত্তী এবং সৌরজগতের বহিঃস্থ এই সকল নক্ষত্রের গতিও সেই সকল নিয়মাধীন।

নক্ষত্রগণের প্রকৃতি এবং সূর্য্যের প্রকৃতি যে এক, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। ডাক্তার হগিন্স্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা আলোক-পরীক্ষ যন্ত্রের সাহায্যে জানিয়াছিলেন যে, যে সকল বস্তুতে সূর্য্য নির্ম্মিত, অন্যান্য নক্ষত্রেও সেই সকল বস্তু লক্ষিত হয়। অতএব সূর্য্যোপরি ও সূর্য্যগর্ভে যে প্রকার ভয়ঙ্কর কোলাহল ও বিপ্লব নিত্য বর্ত্তমান বোধ হয়, তারাগণেও সেইরূপ হইতেছে সন্দেহ নাই। যে নক্ষত্র দূরবীক্ষণ-সাহায্যেও অস্পষ্ট-দৃষ্ট আলোকবিন্দু বলিয়া বোধ হয়, তাহাতে ক্ষণমাত্রে যে সকল উৎপাত ঘটিতেছে, পৃথিবীতলে দশবর্ষের নৈসর্গিক ক্রিয়া একত্রিত করিলেও তাহার তুল্য হইবে না। সূর্য্যমণ্ডলে সামান্য মাত্র কোন পরিবর্ত্তনে যে বিপ্লব ও নৈসর্গিক শক্তিব্যয় সূচিত হয়, তাহাতে পলকমাত্রে এই পৃথিবী ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে। প্রচণ্ড বাত্যার কল্লোল অথবা কর্ণবিদারক অশনিসম্পাত-শব্দ হইতে লক্ষ লক্ষগুণে ভীমতর কোলাহল অনবরত সেই সৌরমণ্ডলে নির্ঘোষিত হইতেছে সন্দেহ নাই। আর এই যে সহস্র সহস্র স্থির শীতল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কগণ দেখিতেছি, তাহাতেও সেইরূপ হইতেছে, কেন না, সকলই সূর্য্যপ্রকৃতিবিশিষ্ট, বরং আমাদিগের সূর্য্য অনেক নক্ষত্রের অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং হীনতেজা। সিরিয়স্ নামক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র আমাদিগের নয়ন হইতে যত দূরে আছে, আমাদিগের সূর্য্য তত দূরে প্রেরিত হইলে উহা তৃতীয় ক্ষুদ্র নক্ষত্রের ন্যায় দেখাইত; আকাশের কত শত নক্ষত্র তদপেক্ষা উজ্জ্বল জ্বালায় জ্বলিত। কিন্তু যদি সূর্য্যকে অল্‌দেবরণ (রোহিণী ?), কস্তুর, বেটেলগুস প্রভৃতি নক্ষত্রের স্থানে প্রেরণ করা যায়, তবে সূর্য্যকে দেখা যাইবে কি না সন্দেহ! প্রক্টর সাহেব বলেন যে, আকাশে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, বোধ হয়, তাহার মধ্যে পঞ্চাশ-

৬টী আমাদের সূর্য্যাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইবে না। অতএব সূর্য্যমণ্ডলে যেরূপ চাঞ্চল্যের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়, অধিকাংশ নক্ষত্রে ততোধিক চাঞ্চল্য বর্ত্তমান, সন্দেহ নাই।

কেবল তাহাই নহে, সূর্য্য যেমন অতি প্রচণ্ডবেগে গ্রহগণ সহিত আকাশপথে ধাবমান, অন্যান্য নক্ষত্রগণও তদ্রূপ। বরং অনেক নক্ষত্রের বেগ সূর্য্যাপেক্ষা প্রচণ্ডতর। সিরিয়সের গতি সেকেণ্ডে ২০ মাইল, ঘণ্টায় ৭২০০০ মাইল। বেগা নামক উজ্জ্বল নক্ষত্রের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৫০ মাইল, ঘণ্টায় ১,৮০,০০০ মাইল, কস্তুর প্রতি সেকেণ্ডে ২৫ মাইল, ঘণ্টায় ৯০০০০ মাইল। পোলায়ের গতি সেকেণ্ডে ৪৯ মাইল, প্রায় বেগার ন্যায়। সপ্তর্ষির মধ্যের পাঁচটির গতি সিরিয়সের ন্যায়, একটির গতি বেগার ন্যায়। এই বেগ অতি ভয়ঙ্কর, বিশেষ যখন মনে করা যায় যে, এই সকল প্রচণ্ডবেগশালী পদার্থের আকার অতি প্রকাণ্ড (সিরিয়স্ সূর্য্যাপেক্ষা সহস্র গুণ বৃহৎ), তখন বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না।

নক্ষত্র-সকল অদ্ভুত গতিবিশিষ্ট হইলেও চারি সহস্র বৎসরেও তত্ত্বাবতের স্থানভ্রংশ মনুষ্য-চক্ষে লক্ষিত হয় নাই। ঐ সকল নক্ষত্রের অসীম দূরতাই ইহার কারণ। উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ-সাহায্যে, আশ্চর্য্য মান-যন্ত্র ও বিদ্যা-কৌশলের বলে আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা কিঞ্চিৎ স্থানচ্যুতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাহাতেই ঐ সকল গতি স্থিরীকৃত হইয়াছে।

নাক্ষত্রিক গতিতত্ত্ব অতি আশ্চর্য্য। গগনের একদেশে স্থিত নক্ষত্রও এক দিকেই ধাবমান না হইয়াও নানাদিকে ধাবমান। কখন বা একদিকেই ধাবমান। কোথায় ধাবমান? কেন ধাবমান? সে সকল তত্ত্বের আলোচনা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজনীয়, এবং এক প্রকার অসাধ্য।

যাহা বলা গেল, তাহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, গতিই জাগতিক নিয়ম—স্থিতি নিয়মরোধের ফলমাত্র। জগৎ সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা চঞ্চল। সেই চাঞ্চল্য বিশেষ করিয়া বুঝিতে গেলে, অতি বিস্ময়কর বোধ হয়। জীবনাধারে শোণিতাদির চাঞ্চল্যই জীবন। হৃৎপিণ্ড বা শ্বাসযন্ত্রের চাঞ্চল্য রহিত হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলে পরেও, দৈহিক পরমাণুমধ্যে রাসায়নিক চাঞ্চল্য সঞ্চার হইয়া, দেহ ধ্বংস হয়। যেখানে দৃষ্টিপাত করিব, সেইখানে চাঞ্চল্য, সেই চাঞ্চল্য মঙ্গলকর। যে বুদ্ধি চঞ্চলা, সেই বুদ্ধি চিন্তাশালিনী। যে সমাজ গতিবিশিষ্ট, সেই সমাজ উন্নতিশীল। বরং সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ভাল, তথাপি স্থিরতা ভাল নহে।

কত কাল মনুষ্য?

জলে যেরূপ বুদ্বুদ উঠিয়া তখনই বিলীন হয়, পৃথিবীতে মনুষ্য সেইরূপ জন্মিতেছে ও মরিতেছে। পুত্রের পিতা ছিল, তাহার পিতা ছিল, এইরূপ অনন্ত মনুষ্য-শ্রেণী-পরম্পরা সৃষ্ট এবং গত হইয়াছে, হইতেছে, এবং যত দূর বুঝা যায়, ভবিষ্যতেও হইবে। ইহার আদি কোথা? জগদাদির সঙ্গে কি মনুষ্যের আদি, না পৃথিবীর সৃষ্টির বহু পরে প্রথম মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে? পৃথিবীতে মনুষ্য কত কাল আছে?

খ্রিষ্টানদিগের প্রাচীন গ্রন্থানুসারে মনুষ্যের সৃষ্টি এবং জগতের সৃষ্টি কালি পরশ্ব হইয়াছে।

যে দিন জগদীশ্বর কুম্ভকাররূপে কাদা ছানিয়া পৃথিবী গড়িয়া, ছয় দিনে তাহাতে মনুষ্যাদি পুত্তল সাজাইয়াছিলেন, খ্রিষ্টানেরা অনুমান করেন যে, সে ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে। এ কথা খ্রিষ্টানেরাও কিন্তু আর বিশ্বাস করেন না। আমাদিগের ধর্ম্ম-পুস্তকের কথার প্রতি আমরাও সেইরূপ হতশ্রদ্ধ হইয়াছি। বিজ্ঞানের প্রবাহে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মপুস্তক-সকল ভাসিয়া যাইতেছে। কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে এমন কোন কথা নাই যে,তাহাতে বুঝায় যে, আজি কালি বা ছয় শত বৎসর বা ছয় সহস্র বৎসর বা ছয় বৎসর পূর্ব্বে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে অথবা অনন্ত কাল পূর্ব্বে জগতের সৃষ্টি। আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানেরও সেই মত।

তবে জগতের আদি আছে কি না, কেহ কেহ এই তর্ক তুলিয়া থাকেন। সৃষ্টি অনাদি, এ জগৎ নিত্য; ও সকল কথায় বুঝায় যে, সৃষ্টির আরম্ভ নাই। কিন্তু সৃষ্টি একটি ক্রিয়া—ক্রিয়া মাত্র, কোন বিশেষ সময়ে কৃত হইয়াছে; অতএব সৃষ্টি কোন কালবিশেষে হইয়া থাকিবে। অতএব সৃষ্টি অনাদি বলিলে অর্থ হয় না। যাঁহারা বলেন, সৃষ্টি হইতেছে, যাইতেছে, আবার হইতেছে,এইরূপ অনাদি কাল হইতে হইতেছে, তাঁহারা প্রমাণশূন্য বিষয়ে বিশ্বাস করেন: এ কথার নৈসর্গিক প্রমাণ নাই।

"অসৃজচ্চ জগৎ সর্ব্বং সহ পুত্রৈঃ কৃতাত্মভিঃ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সূচিত হয় যে, জগৎ-সৃষ্টি এবং মনুষ্য বা মনুষ্যজনকদিগের সৃষ্টি এক কালেই হইয়াছিল। এরূপ বাক্য হিন্দু-গ্রন্থে অতি সচরাচর দেখা যায়। যদি এ কথা যথার্থ হয়,তাহা হইলে,যত কাল চন্দ্র-সূর্য্য, তত কাল মনুষ্য। বৈজ্ঞানিকেরা এ তত্ত্বে কি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই সমালোচিত করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞানের অদ্যাপি এমন শক্তি হয় নাই যে, জগৎ অনাদি কি সাদি, তাহার মীমাংসা করেন। কোন কালে সে মীমাংসা হইবে কি না, তাহাও সন্দেহের স্থল। তবে এক কালে, জগতে যে এরূপ ছিল না, বিজ্ঞান ইহা বলিতে সক্ষম। ইহা বলিতে পারে যে, এই পৃথিবী এইরূপ তৃণ-শস্য-বৃক্ষময়ী, সাগর-পর্ব্বতাদি-পরিপূর্ণা, জীবসঙ্কুলা, জীববাসোপযোগিনী ছিল না; গগন এককালে এরূপ সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্রাদি-বিশিষ্ট ছিল না। একদিন—তখন দিন হয় নাই—এককালে জল ছিল না, ভূমি ছিল না—বায়ু ছিল না। কিন্তু যাহাতে এই চন্দ্র সূর্য্য তারা হইয়াছে, যাহাতে জল বায়ু ভূমি হইয়াছে—যাহাতে নদ নদী সিন্ধু বন বিটপী বৃক্ষ—তৃণ লতা পুষ্প পক্ষী মানব হইয়াছে, তাহা ছিল। জগতের রূপান্তর ঘটিয়াছে, ইহা বিজ্ঞান বলিতে পারে। কবে ঘটিল, কি প্রকারে ঘটিল, তাহা বিজ্ঞান বলিতে পারে না। তবে ইহাই বলিতে পারে যে, সকলই নিয়মের বলে ঘটিয়াছে—কাণক ইচ্ছাধীন নহে। যে সকল নিয়মে অদ্যাপি জড় প্রকৃতি শাসিতা হইতেছে, সেই সকল নিয়মের ফলেই এই ঘোর রূপান্তর ঘটিয়াছে। সেই সকল নিয়মে? তবে আর সেরূপ রূপান্তর দেখি না কেন? দেখিতেছি। তিল তিল করিয়া, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জগতের রূপান্তর ঘটিতেছে। কোটি কোটি বৎসর পরে,পৃথিবী কি ঠিক এইরূপ থাকিবে? তাহা নহে।

কিরূপে এই ঘোর রূপান্তর ঘটিল, এ প্রশ্নের একটি উত্তর অতি বিখ্যাত। আমরা লাপ্লাসের মতের কথা বলিতেছি। লাপ্লাসের মত ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও জানেন।

সংক্ষেপে বর্ণিত করিলেই হইবে। লাপ্লাস সৌরজগতের উৎপত্তি বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, মনে কর, আদৌ সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহাদি নাই, কিন্তু সৌরজগতের প্রান্ত অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্র সমভাবে, সৌরজগতের পরমাণু-সকল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। জড় পরমাণুমাত্রেরই পরস্পরাকর্ষণ, তাপক্ষয়, সঙ্কোচন প্রভৃতি যে সকল গুণ আছে, ঐ জগদ্ব্যাপী পরমাণুরও তাহা থাকিবে। তাহার ফলে, ঐ পরমাণুরাশি, পরমাণুরাশির কেন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া ঘূর্ণিত হইতে থাকিবে এবং তাপক্ষতির ফলে ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে। সঙ্কোচনকালে, পরমাণু-জগতের বহিঃপ্রদেশ সকল মধ্যভাগ হইতে বিযুক্ত হইতে থাকিবে। বিযুক্ত ভগ্নাংশ পূর্ব্বসঞ্চিত বেগের গুণে মধ্যেপ্রদেশকে বেড়িয়া ঘুরিতে থাকিবে। যে সকল কারণে বৃষ্টিবিন্দু গোলত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই সকল কারণে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই ঘূর্ণিত বিযুক্ত ভগ্নাংশ গোলাকার প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে এক একটি গ্রহের উৎপত্তি এবং তাহা হইতে উপগ্রহগণেরও ঐরূপে উৎপত্তি। অবশিষ্ট মধ্যভাগ, সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান সূর্য্যে পরিণত হইয়াছে।

যদি স্বীকার করা যায় যে, আদৌ পরমাণু মাত্র আকারশূন্য হইয়া জগৎ ব্যাপিয়া ছিল—জগতে আর কিছুই ছিল না, তাহা হইলে ইহা সিদ্ধ হয় যে, প্রচলিত নৈসর্গিক নিয়মের বলে জগৎ সূর্য্য,* চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতুবিশিষ্ট হইবে—ঠিক এখন যেরূপ, সেইরূপ হইবে। প্রচলিত নিয়ম ভিন্ন অন্য প্রকার ঐশিক আজ্ঞার সাপেক্ষ নহে। এই গুরুতর তত্ত্ব, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বুঝাইবার সম্ভাবনা নহে—এবং ইহা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হইতে পারে না। আমাদের সে উদ্দেশ্যও নহে। যাঁহারা বিজ্ঞানালোচনায় সমক্ষ, তাঁহারা এই নৈহারিক উপপাদ্য সম্বন্ধে হর্বর্ট স্পেন্সরের বিচিত্র প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। দেখিবেন যে, স্পেন্সর কেবল আকারশূন্য পরমাণু-সমষ্টির অস্তিত্ব মাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহা হইতে জাগতিক ব্যাপারের সমুদায়ই সিদ্ধ করিয়াছেন। স্পেন্সরের সকল কথাগুলি প্রামাণিক না হইলে হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির কৌশল আশ্চর্য্য।

এইরূপে যে বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে, এমন কোন নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। অন্য কোন প্রকারে যে সৃষ্টি হয় নাই, তাহারও কোন নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। তবে লাপ্লাসের মতে প্রমাণবিরুদ্ধও কিছু নাই * অসম্ভব কিছু নাই। এ মত সম্ভব, সঙ্গত—অতএব ইহা প্রমাণের অতীত হইলেও গ্রাহ্য।

এই মত প্রকৃত হইলে, স্বীকার করিতে হয় যে, আদৌ পৃথিবী ছিল না। সূর্য্যাঙ্গ হইতে পৃথিবী বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পৃথিবী যখন বিক্ষিপ্ত হয়, তখন ইহা বাষ্পরাশি মাত্র—নহিলে বিক্ষিপ্ত হইবে না। অতএব পৃথিবীর প্রথমাবস্থা, উত্তপ্ত বাষ্পীয় গোলক।

একটি উত্তপ্ত বাষ্পীয় গোলক—আকাশ পথে বহুকাল বিচরণ করিলে কি হইবে? প্রথমে তাহার তাপহানি হইবে। যেখানে তাপের আধার মাত্র নাই—সেখানে তাপলেশ নাই; তাহা অচিন্তনীয় শৈত্যবিশিষ্ট। আকাশে তাপাধার কিছু নাই—অতএব আকাশমার্গ শৈত্যবিশিষ্ট অচিন্তনীয়। এই শৈত্যবিশিষ্ট আকাশে বিচরণ করিতে করিতে

* গতিশূন্য নক্ষত্র মাত্রেই সূর্য্য। জগৎ কোটি কোটি সূর্য্য।

*কোমৎ, মিল, স্পেন্সর প্রভৃতি এই মত অনুমোদন করেন। সর্ জন হর্শেল বলেন, এ মত প্রমাণবিরুদ্ধ।

তপ্ত বাষ্পীয় গোলকের অবশ্য তাপক্ষয় হইবে. তাপক্ষয় হইলে কি হইবে?

জলের উত্তপ্ত বাষ্প সকলেই দেখিয়াছেন। সকলেই দেখিয়াছেন যে, ঐ বাষ্প শীতল হইলে জল হয়। আরও শীতল হইলে, জল বরফ হয়। সকল পদার্থের এই নিয়ম। যাহা উত্তপ্ত অবস্থায় বাষ্পকৃত, তাপক্ষয়ে তাহা গাঢ়তা এবং কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বাষ্পীয় গোলকাকৃতা পৃথিবীর তাপক্ষয় হইলে কালে তাহা এক্ষণকার গাঢ়তা এবং কঠিনাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

পৃথিবী কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াও কিছুকাল অগ্নিতপ্ত ছিল, বিবেচনা হয়। অপেক্ষাকৃত শীতলতা ঘটিলেই কঠিনতা জন্মিবে, কিন্তু কঠিনতা জন্মিলেই তাহার সঙ্গে জীবাবাসযোগ্য শীতলতা ছিল বিবেচনা করা যায় না। সেও কালে ঘটিয়াছিল। তাপক্ষতি হেতু যে শীতলতা, তাহা উপরিভাগেই প্রথমে ঘটে উপরিভাগ শীতল হইলেও, ভিতর তপ্ত থাকে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে অদ্যাপি বিষম তাপ আছে। ভূতত্ত্ববিদেরা ইহা পুনঃ পুনঃ প্রমাণীকৃত করিয়াছেন।

সেই উত্তপ্ত আদিমাবস্থায় পৃথিবীতলে কোন জীব বা উদ্ভিদের বাসের সম্ভাবনা ছিল না। উত্তপ্ত বাষ্পীয় গোলক জীবাবাসোপযোগী শীতলতা এবং কঠিনতা প্রাপ্ত হইতে লক্ষ লক্ষ যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই—কেন না, আমাদের দুধের বাটী জুড়াইতে যে কালবিলম্ব হয়, তাহাতেই আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি জন্মে। অতএব পৃথিবীর উৎপত্তির লক্ষ লক্ষ যুগ পরেও জীব বা উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় নাই।

যাঁহারা ভূতত্ত্বের কিছুমাত্র জানেন, তাঁহারাও অবগত আছেন যে, পৃথিবীর উপরে নানাবিধ মৃত্তিকা এবং প্রস্তর স্তরে স্তরে সন্নিবেশিত আছে। এইরূপ স্তর-সন্নিবেশ কিয়দ্দূর মাত্র পাওয়া যায়, তাহার পরে যে সকল প্রস্তর পাওয়া যায়, তাহা স্তরত্বশূন্য।

নীচে স্তরত্বশূন্য প্রস্তর, তদুপরি স্তরে স্তরে নানাবিধ প্রস্তর, গৈরিক বা মৃত্তিকা। এই সকল স্তরনিবদ্ধ প্রস্তর গৈরিক বা মৃত্তিকাভ্যন্তরে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাহা এককালে সমুদ্রতলে ছিল। এমন কি, অনেকগুলি স্তর কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমুদ্রচর জীবের শরীরের সমষ্টি মাত্র। চাখড়ি নামে যে গৈরিক বা প্রস্তর প্রচলিত, তাহা ইউরোপখণ্ডের অধিকাংশের এবং আসিয়ার কিয়দংশের নিম্নে স্তরনিবদ্ধ আছে। এক্ষণে বর্ত্তমান অনেকগুলি পর্ব্বত কেবল চাখড়ি। এই চাখড়ি কেবল এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমুদ্রতলচর জীবের (Globigerinae) মৃত দেহের সমষ্টি মাত্র।

অতএব এই সকল গৈরিকস্তর এক কালে সমুদ্রতলস্থ ছিল। ভূভাগের কোন স্থান সমুদ্রতলস্থ হইতেছে; আবার কাল সহকারে সমুদ্র সে স্থান হইতে সরিয়া যাইতেছে, সমুদ্রতল শুষ্ক ভূমিখণ্ড হইতেছে। ভূগর্ভস্থ রুদ্ধবায়ু বা অন্য কোথাও ভূমি কাল সহকারে উন্নত, কালসহকারে অবনত হইতেছে। যেখানে ভূমি উন্নত হইল, সেখান হইতে সমুদ্র সরিয়া গেল, যেখানে অবনত হইল, তাহার উপরে সাগরজলরাশি পড়িল। তাহার উপরে সমুদ্রবাহিত মৃত্তিকা, জীবদেহাদি পতিত হইয়া একটি নূতন স্তর সৃষ্ট হইল। মনে কর, আবার কালে সমুদ্র সরিয়া গেল—সমুদ্রের তল শুষ্ক ভূমি হইল—তাহার উপর বৃক্ষাদি জন্মিয়া জীব সকল জন্ম গ্রহণ করিয়া বিচরণ করিল। আবার যদি কখন উহা সমুদ্রগর্ভস্থ হয়, তবে তদুপরি নূতন স্তর সংস্থাপিত হইবে, এবং তথায় যে সকল জীব বিচরণ করিত, তাহাদিগের দেহাবশেষ সেই স্তরে প্রোথিত

হইবে। জীবের অস্থি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না—কিন্তু অতি দীর্ঘকাল প্রোথিত থাকিলে এক-রূপ প্রস্তরত্ব প্রাপ্ত হয়। এই অস্থ্যাদিকে "ফসিল্" বলা যায়। পাতুরিয়া কয়লা, ফসিল্ কাষ্ঠ।

যে কয়টি কথা উপরে বলিলাম, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে—

১। সর্ব্বনিম্নে স্তরত্বশূন্য প্রস্তর। তদুপরি অন্যান্য গৈরিকাদি স্তরে স্তরে সন্নিবিষ্ট।

২। স্তর-পরম্পরা সাময়িক সম্বন্ধবিশিষ্ট। যে স্তরটি নিম্নে, সেটি আগে, যেটি তাহার উপরে, সেটি তাহার পরে হইয়াছে।

৩। যে স্তরে যে জীবের ফসিল্ অস্থি পাওয়া যায়, সেই স্তর যখন শুষ্কভূমি বা জল-তল ছিল, তখন সেই জীব বর্ত্তমান ছিল। যদি কোন স্তরে কোন জীববিশেষের ফসিল্ একেবারে পাওয়া না যায়, তবে সেই স্তর-সৃজনকালে সেই জীব ছিল না।

২। যদি কোন স্তরে ক নামক জীবের ফসিল্ পাওয়া যায়, খ নামক জীবের ফসিল পাওয়া যায় না; তাহার উপরস্থ কোন স্তরে যদি ঐ খ নামক জীবের ফসিল্ পাওয়া যায়, তবে সিদ্ধ হইতেছে, খ নামক জন্তু ক নামক জন্তুর পরে সৃষ্ট।

সর্ব্বনিম্নস্থ স্তরত্বশূন্য প্রস্তরে কোন ফসিল্ ছিল না, অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, পৃথিবীর প্রথম ভূমিতে কোন জীব বিচরণ করে নাই। তখন পৃথিবী জীবশূন্য ছিল।

যখন প্রথম স্তরমধ্যে জীবদেহের ফসিল্ দেখা যায়, তখন মনুষ্যের অবস্থানের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। মনুষ্য দূরে থাকুক, বৃহৎ বা ক্ষুদ্র চতুষ্পদ জন্তুর ফসিল্ পাওয়া যায় না। মৎস্য বা সরীসৃপের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। যে সকল ক্ষুদ্র কীটাদিবৎ জীবের দেহাবশেষ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শম্বূকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অতএব আদিম জীবলোকে শম্বূকেরা প্রভু ছিল।

তৎপরে মৎস্য দেখা দিল। ক্রমে উপরে উঠিতে সরীসৃপ জাতীয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালীয় সরীসৃপ অতি ভয়ঙ্কর; তাদৃশ বিচিত্র বৃহৎ এবং ভয়ঙ্কর সরীসৃপ এক্ষণে পৃথিবীতে নাই। সরীসৃপের রাজ্যের পরে, স্তন্যপায়ী জীবের দেখা পাওয়া যায়। ক্রমে নানাবিধ হস্তী, ঋক্ষ, গণ্ডার, সিংহ, হরিণ-জাতীয় প্রভৃতি দেখা যায়, তথাপি মনুষ্য দেখা যায় না। মনুষ্যের চিহ্ন কেবল সর্ব্বোর্দ্ধ স্তরে, অর্থাৎ আধুনিক মৃত্তিকায়। তন্নিম্নস্থ অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরেও কদাচিৎ মনুষ্যের চিহ্ন পাওয়া যায়। অতএব মনুষ্যের সৃষ্টি সর্ব্ব-শেষে; মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক জীব।*

"আধুনিক" শব্দে এ স্থলে কি বুঝায়, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। যে সকল স্তরের কথা বলিলাম, সেগুলির সম-বায়, পৃথিবীর ত্বকের স্বরূপ। একটি স্তরের উৎপত্তি ও সমাপ্তিতে কত লক্ষ বৎসর, কত কোটি বৎসর লাগিয়াছে, তাহা কে বলিবে? তাহা গণনা করিবার উপায় নাই। তবে কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, সে কাল অপরিমিত—বুদ্ধির ধারণার অতীত। সর্ব্বোর্দ্ধ স্তরেই মনুষ্য-চিহ্ন, এই কথা বলিলে এমত বুঝায় না যে, বহু সহস্র বৎসর মনুষ্য পৃথিবী-বাসী নহে। তবে পৃথিবীর বয়ঃক্রমের সঙ্গে তুলনা করিলে বোধ হয় মনুষ্যের উৎপত্তি এই মুহূর্ত্তে হইয়াছে। এই জন্য মনুষ্যকে আধুনিক জীব বলা যাইতেছে।

মিসরদেশের রাজাবলীর যে সকল তালিকা প্রচলিত আছে, তাহাতে যদি বিশ্বাস করা

---

* এ কথায় এমত বুঝায় না যে, মনুষ্যের পর কোন জীবের উৎপত্তি হয় নাই। বোধ হয়, বিড়াল মনুষ্যের কনিষ্ঠ।

যায়, তবে মিসরদেশে দশ সহস্র বৎসরাবধি রাজশাসন প্রচলিত আছে। হোমর খ্রীষ্টের নয় শত বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীবিদিত মহাকাব্যদ্বয় রচনা করেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। হোমরের গ্রন্থে মিসরের রাজধানী শতদ্বারবিশিষ্টা থিবস্ নগরীর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। মনুষ্যজাতি সভ্যাবস্থায় একবার উন্নতির পথে পদার্পণ করিলে, উন্নতি শীঘ্র শীঘ্র লাভ করিয়া থাকে বটে; কিন্তু অসভ্যদিগের স্বতঃসম্পন্ন যে উন্নতি, তাহা অচিন্তনীয়, কালবিলম্বে ঘটিয়া থাকে। ভারতীয় বন্যজাতিগণ চারি সহস্র বৎসর সভ্যজাতির প্রতিবেশী হইয়াও বিশেষ কিছু উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। অতএব সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, মিসরদেশে সভ্যতা স্বতঃ জন্মিয়া যে কালে শতদ্বারবিশিষ্টা নগরী সংস্থাপনে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ বহু সহস্র বৎসর। মিসরতত্ত্বজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন যে, মেম্ফিজ প্রভৃতি নগরী থিবস্ হইতে প্রাচীনা। এই সকল নগরীতে যে দেবালয়াদি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহাতে যুদ্ধজয়াদির উৎসবের প্রতিকৃতি আছে। সর জর্জ্জ কর্ণওয়াল লুইস বলেন, ঐতিহাসিক সময়ে মিসরদেশীয়দিগকে কখন যুদ্ধপরায়ণ দেখা যায় না। অথচ কোন কালে তাহারা যুদ্ধপরায়ণ না থাকিলে তন্নির্ম্মিত মন্দিরাদিতে যুদ্ধ-জয়োৎসবের প্রতিকৃতি থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব বিবেচনা করিতে হইবে যে, ঐতিহাসিক কালের পূর্ব্বেই মিসরদেশীয়েরা এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে, প্রকাণ্ড মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া জাতীয় কীর্ত্তি-সকল তাহাতে চিত্রিত করিত। অসভ্যজাতি কেবল আপন প্রতিভাকে সহায় করিয়া যে এতদূর উন্নতি লাভ করে, ইহা অনেক সহস্র বৎসরের কাজ। তাহার পর ঐতিহাসিক কাল অনেক সহস্র বৎসর। অতএব বহু সহস্র বৎসর হইতে মিসরদেশে মনুষ্যজাতি সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে। সে দশ সহস্র বৎসর, কি ততোধিক, কি তাহার কিছু ন্যূন, তাহা বলা যায় না।

মিসরদেশ নীলনদী-নির্ম্মিত। বৎসর বৎসর নীলনদীর জলে আনীত কর্দ্দমরাশিতে এই দেশ গঠিত হইয়াছে। থিবস্, মেম্ফিজ প্রভৃতি নগরী নীলনদীর পলির উপর স্থাপিত হইয়াছিল। এই নদী-কর্দ্দম-নির্ম্মিত প্রদেশ ১৮৫১ ও ১৮৫৪ সালে রাজব্যয়ে সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধানতায় নিখাত হইয়াছিল। নানা স্থানে খনন করা যায়। যেখানে খনন করা গিয়াছিল, সেইখানে হইতেই ভগ্ন মৃৎপাত্র, ইষ্টকাদি উঠিয়াছিল। এমন কি, ষাট ফিট নীচে হইতে ইষ্টক উঠিয়াছিল। সকল স্থানে এইরূপ ইষ্টকাদি পাওয়া গিয়াছিল। অতএব ঐ সকল ইষ্টক পূর্ব্বতন কুম্ভকারনির্ম্মিত বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। এই সকল খননকার্য্য হেকেকিয়ান বে নামক একজন সুশিক্ষিত আর্ম্মাণিজাতীয় কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধারণায় হইয়াছিল। লিনাণ্টবে নামক অপর একজন কর্ম্মচারী ৭২ ফীট নিম্নে ইষ্টক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মস্যুর গিরার্ড অনুমান করেন যে, নীলের কর্দ্দম, শত বৎসরে পাঁচ ইঞ্চ মাত্র নিক্ষিপ্ত হয়। যদি শত বৎসরে পাঁচ ইঞ্চিও ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে হেকেকিয়ান ৬০ ফীট নীচে যে ইট পাইয়াছিলেন, তাহার বয়ঃক্রম অন্যূন দ্বাদশ সহস্র বৎসর। মস্যুর রজীর হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, নীলের কাদা শত বৎসরে ২।০ ইঞ্চি মাত্র জমে। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে লিনাণ্টবের ইষ্টকের বয়স ত্রিশ হাজার বৎসর।

অতএব যদি কেহ বলেন যে, ত্রিশ হাজার

বৎসরের অধিক কাল মিসরে মনুষ্যের বাস, তবে তাঁহার কথা নিতান্ত প্রমাণশূন্য বলা যায় না।

মিসরে যেখানে, যতদূর খনন করা গিয়াছে, সেইখানেই পৃথিবীস্থ বর্ত্তমান জন্তুর অস্থ্যাদি ভিন্ন লুপ্ত জাতির অস্থ্যাদি কোথাও পাওয়া যায় নাই। অতএব যে সকল স্তর-মধ্যে লুপ্ত জাতির অস্থ্যাদি পাওয়া যায়, তদপেক্ষা এই নীল কর্দ্দমস্তর অত্যন্ত আধুনিক। আর যদি সেই সকল লুপ্ত জন্তুর দেহাবশেষ-বিশিষ্ট স্তরমধ্যে মনুষ্যের তৎসহ সমসাময়িক-তার চিহ্ন পাওয়া যায়; তবে কত সহস্র বৎসর পৃথিবীতল মনুষ্যের আবাসভূমি, কে তাহার পরিমাণ করিবে?

এরূপ সমসাময়িকতার চিহ্ন ফ্রান্স ও বেল্‌জমে পাওয়া গিয়াছে।

জৈবনিক।

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ এবং আকাশ, [illegible]কাল হইতে ভারতবর্ষে ভৌতিক সিংহাসন [অ]ধিকার করিয়াছেন। তাঁহারাই পঞ্চ-[ভূ]ত—আর কেহ ভূত নহে। এক্ষণে ইউরোপ [হ]ইতে নূতন বিজ্ঞানশাস্ত্র আসিয়া তাঁহা-[দি]কে সিংহাসন-চ্যুত করিয়াছেন। ভূত [ব]লিয়া আর কেহ তাঁহাদিগকে বড় মানে না। [নূ]তন বিজ্ঞান-শাস্ত্র বলেন, আমি বিলাত [হ]ইতে নূতন ভূত আনিয়াছি, তোমরা আবার [কে]? যদি ক্ষিত্যাদি জড়সড় হইয়া বলেন যে, [আ]মরা প্রচীন ভূত, কণাদকপিলাদির দ্বারা [ভৌ]তিক-রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রতি জীব-[শরী]রে বাস করিতেছি, বিলাতী বিজ্ঞান [বলে]ন, তোমরা আদৌ ভূত নও। আমার [El]ementary Substances" দেখ—[তাহা]রাই ভূত; তাহার মধ্যে তোমরা কই! [তুমি], আকাশ, তুমি কেহই নও—সম্বন্ধ-[বাচ]ক শব্দ মাত্র। তুমি, তেজঃ, তুমি কেবল [একটি] ক্রিয়া,—গতিবিশেষ মাত্র। আর, [ক্ষি]তি, অপ, মরুৎ তোমরা এক একজন দুই [বা] তাতাধিক ভূতে নির্ম্মিত। তোমরা [আ]র কিসের ভূত?

যদি ভারতবর্ষ এমন সহজে ভূতছাড়া হইত, তবে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এখনও অনেকে পঞ্চভূতের প্রতি ভক্তিবিশিষ্ট। বাস্ত-বিক ভূত ছাড়াইলে একটু বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। ভূতবাদীরা বলিবেন যে, যদি ক্ষিত্যাদি ভূত নহে, তবে আমাদিগের এ শরীর কোথা হইতে? কিসে নির্ম্মিত হইল? নূতন বিজ্ঞান বলেন যে, "তোমাদের পুরাণ কথায় একেবারে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহি না। জীবশরীরের একটি প্রধান ভাগ যে জল, ইহা অবশ্য স্বীকার করিব। আর মরুতের সঙ্গে শরীরের একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে,—এমন কি, শরীরের বায়ুকোষে বায়ু না গেলে প্রাণের ধ্বংস হয়, ইহাও স্বীকার করিতে তোমাদের বৈশেষিকেরা যে জঠরাগ্নি কল্পনা করিয়াছেন, তাহার আস্তত্ব আমার লিবিগ অতি সুকৌশলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, আর যদি সন্তাপকেই তেজঃ বল, তবে মানি যে, ইহা জীবদেহে অহরহঃ বিরাজ করে, ইহার লাঘব হইলে প্রাণের ধ্বংস হয়। সোডা পোতাস প্রভৃতি পৃথিবী বটে, তাহা অত্যল্প-পরিমাণে শরীরমধ্যে আছে। আকাশ ছাড়া

কিছুই নাই. কেন না, আকাশ সম্বন্ধজ্ঞাপক মাত্র। অতএব শরীরে পঞ্চভূতের অস্তিত্ব এ প্রকারে স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমার প্রধান আপত্তি তিনটি। প্রথম, শরীরের সারাংশ এ সকলে নির্ম্মিত নহে; এ সকল ভিন্ন অন্য অনেক প্রকার উপকরণ আছে। দ্বিতীয়,ইহাদের ভূত বল কেন? তৃতীয়,ইহার সঙ্গে প্রাণাপানাদি বায়ু প্রভৃতি যে কতকগুলি কথা বল, বোধ হয়, হিন্দু রাজাদিগের আমলে আবকারীর আইন চলিত থাকিলে সে কথাগুলির প্রচার হইত না।"

"দেখ, এই তোমার সম্মুখে ইষ্টক-নির্ম্মিত মনুষ্যের বাসগৃহ। ইহা ইষ্টকনির্ম্মিত, সুতরাং ইহাতে পৃথিবী আছে। গৃহস্থ ইহাতে পানাদির জন্য কলসী কলসী জল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। পাকার্থ এবং আলোকের জন্য অগ্নি জ্বালিয়াছে. সুতরাং তেজঃও বর্ত্তমান। আকাশ গৃহমধ্যে সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান; সর্ব্বত্র বায়ু যাতায়াত করিতেছে সুতরাং এ গৃহও পঞ্চভূত-নির্ম্মিত? তুমি যেমন বল, মনুষ্যের এ স্থানে প্রাণবায়ু ও স্থানে অপান বায়ু ইত্যাদি, আমিও তেমনি বলিতেছি. এই দ্বারপথে যে বায়ু বহিতেছে, তাহা প্রাণ-বায়ু, ও বাতায়ন-পথে যাহা বহিতেছে,তাহা অপান বায়ু ইত্যাদি। তোমারও নির্দ্দেশ যেমন অমূলক ও প্রমাণশূন্য, আমার নির্দ্দেশও তেমনি প্রমাণশূন্য। তুমি জীব-শরীর সম্বন্ধে যাহা বলিবে, আমি এই অট্টালিকা সম্বন্ধে তাহাই বলিব। তুমি যদি আমার কথা অপ্রমাণ করিতে যাও, তোমার স্বপক্ষের কথাও অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। তবে কি তুমি আমার এই অট্টালিকা জীব বলিয়া স্বীকার করিবে?"

প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে এবং আধুনিক বিজ্ঞানে এই প্রকার বিবাদ। ভারতবর্ষবাসীরা মধ্যস্থ। মধ্যস্থেরা তিন শ্রেণীভুক্ত। এক শ্রেণীর মধ্যস্থেরা বলেন যে. "প্রাচীন দর্শন আমাদের দেশীয়। যাহা আমাদের দেশীয়, তাহাই ভাল, তাহাই মান্য এবং যথার্থ। আধুনিক বিজ্ঞান বিদেশী, যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে, সন্ধ্যাহ্নিক করে না, উহারাই তাহাকে মানে। আমাদের দর্শন সিদ্ধ ঋষি-প্রণীত,তাঁহাদিগের মনুষ্যাতীত জ্ঞান ছিল, দিব্য চক্ষে সকল দেখিতে পাইতেন. কেন না, তাঁহারা প্রাচীন এবং এদেশীয়। আধুনিক বিজ্ঞান যাঁহাদিগের প্রণীত, তাঁহারা সামান্য মনুষ্য। সুতরাং প্রাচীন মতই মানিব।"

আর এক শ্রেণীর মধ্যস্থ আছেন, তাঁহারা বলেন, "কোন্‌টি মানিতে হইবে, তাহা জানি না। দর্শনে কি আছে তাহা জানি না, বিজ্ঞানে কি আছে, তাহাও জানি না। কালেজে তোতা পাখীর মত কিছু বিজ্ঞান শিখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা কর, কেন সে সব মানি,তবে আমার কোন উত্তর নাই। যদি দুই মানিলে চলে,তবে দুই মানি। তবে যদি নিতান্ত পীড়াপীড়ি কর, তবে বিজ্ঞানই মানি। কেন না,তাহা না মানিলে,লোকে আজিকালি মূর্খ বলে। বিজ্ঞান মানিলে লোকে বলিবে, এ ইংরাজি জানে, সে গৌরব ছাড়িতে পারি না। আর বিজ্ঞান মানিলে বিনা কষ্টে হিন্দুয়ানীর বাঁধাবাঁধি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সে অল্প সুখ নহে। সুতরাং বিজ্ঞানই মানিব।"

তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যস্থেরা বলেন, "প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র দেশী বলিয়া তৎপ্রতি আমাদিগের বিশেষ প্রীতি বা অপ্রীতি নাই। আধুনিক বিজ্ঞান সাহেবী বলিয়া তাহাকে ভক্তি বা অভক্তি করি না। যেটি যথার্থ হইবে, তাহাই মানিব—ইহাতে কেহ খ্রীষ্টান বা কেহ মূর্খ বলে, তাহাতে ক্ষতি বোধ করি না। কোন্‌টি যথার্থ, কোন্‌টি অযথার্থ, তাহা মীমাংসা

করিবে কে ? আমরা আপনার বুদ্ধিমত মীমাংসা করিব ;—পরের বুদ্ধিতে যাইব না। দার্শনিকেরা আমাদিগের দেশী লোক বলিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করিব না—ইংরেজেরা রাজা বলিয়া তাঁহাদিগকে অভ্রান্ত মনে করি না। সর্ব্বজ্ঞ বা সিদ্ধ মানি না ; আধুনিক মনুষ্যাপেক্ষা প্রাচীন ঋষিদিগের কোন প্রকার বিশেষ জ্ঞানের উপায় ছিল, তাহা মানি না—কেন না, যাহা অনৈসর্গিক, তাহা মানিব না। বরং ইহাই বলি যে, প্রাচীনাপেক্ষা আধুনিকদিগের অধিক জ্ঞানবত্তার সম্ভাবনা। কেন না, কোন বংশে যদি পুরুষানুক্রমে সকলেই কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া যায়, তবে প্রপিতামহ অপেক্ষা প্রপৌত্র ধনবান্ হইবে সন্দেহ নাই। তবে আপনার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে এ সকল গুরুতর তত্ত্বের মীমাংসা করিব কি প্রকারে ? প্রমাণানুসারে। যিনি প্রমাণ দেখাইবেন, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিব। যিনি কেবল আনুমানিক কথা বলিবেন, তাহার কোন প্রমাণ দেখাইবেন না, তিনি পিতৃপিতামহ হইলেও তাঁহার কথায় অশ্রদ্ধা করিব। দার্শনিকেরা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলেন, ক হইতে খ হইয়াছে, গর মধ্যে ঘ আছে ইত্যাদি। তাঁহারা তাহার কোন প্রমাণ নির্দ্দেশ করেন না ; কোন প্রমাণের অনুসন্ধান করিয়াছেন, এমত কথা বলেন না, সন্ধান করিলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি কখন প্রমাণ নির্দ্দেশ করেন, সে প্রমাণও আনুমানিক বা কাল্পনিক, তাহার আবার প্রমাণের প্রয়োজন ; তাহাও পাওয়া যায় না। অতএব আজন্ম মূর্খ হইয়া থাকিতে হয়, সেও ভাল, তথাপি দর্শন মানিব না। এ দিকে বিজ্ঞান আমাদিগকে বলিতেছেন, "আমি তোমাকে সহসা বিশ্বাস করিতে বলি না, যে সহসা বিশ্বাস করে, আমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করি না ; সে যেন আমার কাছে আইসে না। আমি যাহা তোমার কাছে প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিব, তুমি তাহাই বিশ্বাস করিও, তাহার তিলার্দ্ধ অধিক বিশ্বাস করিলে তুমি আমার ত্যাজ্য। আমি যে প্রমাণ দিব, তাহা প্রত্যক্ষ। একজন সকল কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, এজন্য কতকগুলি তোমাকে অন্যের প্রত্যক্ষের কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু যেটিতে তোমার সন্দেহ হইবে, সেইটি তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিও। সর্ব্বদা আমার প্রতি সন্দেহ করিও। দর্শনের প্রতি সন্দেহ করিলেই সে ভস্ম হইয়া যায়, কিন্তু সন্দেহেই আমার পুষ্টি। আমি জীবশরীর সম্বন্ধে বলিতেছি, আমার সঙ্গে শবচ্ছেদগৃহ ও রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় আইস। সকলই প্রত্যক্ষ দেখাইব। এইরূপ অভিহিত হইয়া বিজ্ঞানের গৃহে গিয়া সকলই প্রমাণ সহিত দেখিয়া আসিয়াছি। সুতরাং বিজ্ঞানেই আমাদের বিশ্বাস।"

যাঁহারা এই সকল কথা শুনিয়া কুতূহলবিশিষ্ট হইবেন, তাঁহারা বিজ্ঞান-মাতার আহ্বানানুসারে তাঁহার শবচ্ছেদ-গৃহে এবং রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় গিয়া দেখুন, পঞ্চ ভূতের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে। জীব শরীরের ভৌতিকতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যদি দুই একটা কথা বলিয়া রাখি, তবে তাঁহাদিগের পথ সুগম হইবে।

বিষয়বাহুল্যভয়ে কেবল একটি তত্ত্বই আমরা সংক্ষেপে বুঝাইব। আমরা অনুমান করিয়া রাখিলাম যে, পাঠক জীবের শারীরিক নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। গঠনের কথা বলিব না—গঠনের সামগ্রীর কথা বলিব।

একবিন্দু শোণিত লইয়া অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা কর। তাহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাকার বস্তু দেখিবে। অধিকাংশই

রক্তবর্ণ এবং সেই চক্রাণুসমূহের বর্ণ হেতুই শোণিতের বর্ণ রক্ত, তাহাও দেখিবে। তন্মধ্যে মধ্যে মধ্যে, আর কতকগুলি দেখিবে, তাহা রক্তবর্ণ নহে. বর্ণহীন, চক্রাণু হইতে কিঞ্চিৎ বড়, প্রকৃত চক্রাকার নহে—আকারের কোন নিয়ম নাই। শরীরাভ্যন্তরে যে তাপ, পরীক্ষ্যমাণ রক্তবিন্দু যদি সেইরূপ তাপ-সংযুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, এই বর্ণহীন চক্রাণু-সকল সজীব পদার্থের ন্যায় আচরণ করিবে। আপনারা যথেচ্ছ চলিয়া বেড়াইবে, আকার পরিবর্ত্তন করিবে, কখন কোন অঙ্গ বাড়াইয়া দিবে, কখন কোন ভাগ সঙ্কীর্ণ করিয়া লইবে। এইগুলি যে পদার্থের সমষ্টি, তাহাকে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা প্রোটোপ্লাস্ বলেন। আমরা ইহাকে "জৈবনিক" বলিলাম। ইহাই জীব-শরীরনির্ম্মাণের একমাত্র সামগ্রী। যাহাতে ইহা আছে, তাহাই জীব ; যাহাতে ইহা নাই, তাহা জীব নহে। দেখা যাউক, এই সামগ্রীটি কি।

এক্ষণকার বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অনেকেই দেখিয়াছেন, আচার্য্যেরা বৈদ্যুতীয় যন্ত্র-সাহায্যে জল উড়াইয়া দেন। বাস্তবিক জল উড়িয়া যায় না ; জল অন্তর্হিত হয় বটে, কিন্তু তাহার স্থানে দুইটি বায়বীয় পদার্থ পাওয়া যায়—পরীক্ষক সেই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে ধরিয়া রাখেন। সেই দুইটি পুনর্ব্বার একত্রিত করিয়া আগুন দিলে আবার জল হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই দুইটি পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে জলের জন্ম। ইহার একটির নাম অম্লজান বায়ু ; দ্বিতীয়টির নাম জলজান বায়ু।

যে বায়ু পৃথিবী ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইহাতেও অম্লজান আছে। অম্লজান ভিন্ন আর একটি বায়বীয় পদার্থও তাহাতে আছে। সেটি যবক্ষারেও আছে বলিয়া তাহার নাম যবক্ষারজান হইয়াছে। অম্লজান ও যবক্ষারজান সাধারণ বায়ুতে রাসায়নিক সংযোগে যুক্ত নহে। মিশ্রিত মাত্র। যাঁহারা রসায়নবিদ্যা প্রথম শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা শুনিয়া চমৎকৃত হয়েন যে, হীরক ও অঙ্গার একই বস্তু। বাস্তবিক এ কথা সত্য এবং পরীক্ষাধীন। যে দ্রব্য উভয়েরই সার, তাহার নাম হইয়াছে অঙ্গারজান। কাষ্ঠ তৃণ তৈলাদি যাহা দাহ করা যায়, তাহার দাহ্য ভাগ এই অঙ্গারজান। অঙ্গারজানের সহিত অম্লজানের রাসায়নিক যোগক্রিয়াকে দাহ বলে। এই চারিটি পদার্থ সর্ব্বদা পরস্পরে রাসায়নিক যোগে সংযুক্ত হয়। যথা, অম্লজানে জল হয়। অম্লজানে যবক্ষারজানে নাইট্রিক আসিড নামক প্রসিদ্ধ ঔষধ হয়। অম্লজানে অঙ্গারজানে আঙ্গারিক অম্ল (কার্ব্বণিক আসিড) হয়। যে বাষ্পের কারণ সোডা ওয়াটার উছলিয়া উঠে, সে এই পদার্থ। দীপশিখা হইতে এবং মানুষ্যনিশ্বাসে ইহা বাহির হইয়া থাকে। যবক্ষারজান এবং জলজানে আমানিয়া নামক প্রসিদ্ধ তেজস্বী ঔষধ হইয়া থাকে। অঙ্গারজান এবং জলজানে তারপিন তৈল প্রভৃতি অনেকগুলি তৈলবৎ এবং অন্যান্য সামগ্রী হয়। ইত্যাদি।

এই চারিটি সামগ্রী যেমন পরস্পরের সহিত রাসায়নিক যোগে যুক্ত হয়, সেইরূপ অন্যান্য সামগ্রীর সহিত যুক্ত হয় এবং সেই সংযোগেই এই পৃথিবী নির্ম্মিত। যথা সডিয়মের সঙ্গে ও ক্লোরাইনের সঙ্গে অম্লজান ও সংযোগবিশেষে লবণ ; চূণের সঙ্গে অম্লজান ও অঙ্গারজানের সংযোগবিশেষে মর্ম্মরাদি নানাবিধ প্রস্তর হয় : সিলিকন এবং আলুমিনার সঙ্গে অম্লজানের সংযোগে নানাবিধ মৃত্তিকা।

দুইটি সামগ্রীর রাসায়নিক সংযোগে যে এক ফল হয়, এমত নহে। নানা দ্রব্যের সংযোগে নানা দ্রব্য হইয়া থাকে।

জলজান, অম্লজান, অঙ্গারজান, যবক্ষার-

জান, এই চারিটিই একত্রে সংযুক্ত হইয়া থাকে। সেই সংযোগের ফল জৈবনিক। জৈবনিকে এই চারিটি সামগ্রীই থাকে, আর কিছুই থাকে না, এমত নহে; অম্লজানাদির সঙ্গে কখন কখন গন্ধক, কখন পোতাস ইত্যাদি সামগ্রী থাকে। কিন্তু যে পদার্থে এই চারিটিই নাই, তাহা জৈবনিক নহে; যাহাতে এই চারিটিই আছে, তাহাই জৈবনিক। জীবমাত্রেই এই জৈবনিক নাই। এই স্থলে জীব শব্দে কেবল প্রাণী বুঝাইতেছে, এমত নহে। উদ্ভিদ্‌ও জীব, কেন না, তাহাদিগের জন্ম, বৃদ্ধি পুষ্টি ও মৃত্যু আছে। অতএব উদ্ভিদের শরীরও জৈবনিকে নির্ম্মিত। কিন্তু সচেতন ও অচেতন জীবে এ বিষয়ে একটু বিশেষ প্রভেদ আছে।

জৈবনিক জীব-শরীরমধ্যেই পাওয়া যায়, অন্যত্র পাওয়া যায় না। জীব-শরীরে কোথা হইতে জৈবনিক আইসে? জৈবনিক জীবশরীরে প্রস্তুত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্ জীব, ভূমি এবং বায়ু হইতে অম্লজানাদি গ্রহণ করিয়া আপন শরীরমধ্যে তৎসমুদায়ের রাসায়নিক সংযোগ সম্পাদন করিয়া জৈবনিক প্রস্তুত করে; সেই জৈবনিকে আপন শরীর নির্ম্মাণ করে। কিন্তু নির্জ্জীব পদার্থ হইতে জৈবনিক পদার্থ প্রস্তুত করার যে শক্তি, তাহা উদ্ভিদেরই আছে। সচেতন জীবের এই শক্তি নাই; ইহারা স্বয়ং জৈবনিক প্রস্তুত করিতে পারে না; উদ্ভিদকে ভোজন করিয়া প্রস্তুত জৈবনিক সংগ্রহ পূর্ব্বক শরীর পোষণ করে। কোন সচেতন জীব মৃত্তিকা খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু তৃণ ধান্য প্রভৃতি সেই মৃত্তিকার রস পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে, কেন না, উহারা তাহা হইতে জৈবনিক প্রস্তুত করে; বৃষ মৃত্তিকা খাইবে না, কিন্তু সেই তৃণ ধান্যাদি খাইয়া তাহা হইতে জৈবনিক গ্রহণ করিবে, ব্যাঘ্র আবার সেই বৃষকে খাইয়া জৈবনিক সংগ্রহ করিবে। যাঁহারা এদেশের জমীদারগণের দ্বেষক, তাঁহারা বলিতে পারেন যে, উদ্ভিদ জীবেরা এ জগতে চাষা, তাহারা উৎপাদন করে; অপরেরা জমীদার, তাহারা চাষার উপার্জ্জন কাড়িয়া খায়, আপনারা কিছু করে না।

এখন দেখ, এক জৈবনিকে সর্ব্বজীব নির্ম্মিত। যে ধান ছড়াইয়া তুমি পাখীকে খাওয়াইতেছ, সে ধান যে সামগ্রী, পাখীও সেই সামগ্রী, তুমিও সেই সামগ্রী। যে কুসুম ঘ্রাণ মাত্র লইয়া, লোকমোহিনী সুন্দরী ফেলিয়া দিতেছেন, সুন্দরীও যাহা, কুসুমও তাই। কীটও যাহা, সম্রাটও তাই। যে হংসপুচ্ছলেখনীতে আমি লিখিতেছি, সেও যাহা, আমিও তাই। সকলই জৈবনিক। প্রভেদও গুরুতর। জয়পুরী শ্বেত প্রস্তরে তোমার জলপান-পাত্র বা ভোজনপাত্র নির্ম্মিত হইয়াছে; সেই প্রস্তরে তাজমহল এবং জুমা মস্‌জিদও নির্ম্মিত হইয়াছে। উভয়ে প্রভেদ নাই কে বলিবে? গোষ্পদেও জল, সমুদ্রেও জল, গোষ্পদে সমুদ্রে প্রভেদ নাই, কে বলিবে?

কিন্তু স্থূল কথা বলিতে বাকি আছে। জৈবনিক ভিন্ন জীবন নাই, যেখানে জীবন, সেইখানে জৈবনিক তাহার পূর্ব্বগামী। "অন্যথা সিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ব্ববর্ত্তিতা কারণত্বং।" এ কথা যদি সত্য হয়, তবে জৈবনিকই জীবনের কারণ। জৈবনিক ভিন্ন জীবন কুত্রাপি সিদ্ধ নহে, এবং জৈবনিক জীবনের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী বটে। অতএব আমাদের এই চঞ্চল, সুখদুঃখ বহুল, বহু স্নেহাস্পদ জীবন, কেবল জৈবনিকের ক্রিয়া, রাসায়নিক সংযোগসমবেত জড় পদার্থের ফল। নিউটনের বিজ্ঞান, কালিদাসের কবিতা, হম্বোলট বা শঙ্করাচা-

র্য্যের পাণ্ডিত্য—সকলই জড় পদার্থের ক্রিয়া; শাক্যসিংহের ধর্ম্মজ্ঞান, আকবরের শৌর্য্য, কোমতের দর্শনবিদ্যা সকলই জড়ের গতি। তোমার বনিতার প্রেম, বালকের অমৃত-ভাষা,পিতার সদুপদেশ—সকলই জড়পদার্থের আকুঞ্চন সম্প্রসারণ মাত্র—জৈবনিক ভিন্ন ভিতরে আর ঐন্দ্রজালিক কেহ নাই। যে যশের জন্য তুমি প্রাণপাত করিতেছ, সে এই জৈবনিকের ক্রিয়া—যেমন সমুদ্রগর্জ্জন এক প্রকার জড়পদার্থকৃত কোলাহল, যশ তেমনি জড়পদার্থকৃত অন্য প্রকার কোলাহল মাত্র। এই সর্ব্বকর্ত্তা জৈবনিক অম্লজান, অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজানের রাসায়নিক সমষ্টি। অতএব এই চারিটি ভৌতিক পদার্থই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা। ইহাই প্রকৃত ভূত, এবং এই ভূতের কাণ্ড সকল আশ্চর্য্য বটে। পাঠক দেখিলেন যে, আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত পঞ্চভূত হইতে এই আধুনিক ভূতগণের যে প্রভেদ,তাহা কেবল প্রমাণগত। নচেৎ উভয়েরই ফল প্রকৃতিবাদ (Materialism) সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ হইতে আধুনিক প্রকৃতিবাদের প্রভেদ, প্রধানতঃ প্রমাণগত। তবে আধুনিক বলেন, ক্ষিত্যাদি ভূত নহে, আমাদিগের পরিচিত এই ভূতগুলিই ভূত। যেই ভূত হউক, তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই;—কেন না, মনুষ্যজাতি ভূত ছাড়া হইল না। নাই হউক—স্মরণ রাখিলেই হইল, ভূতের উপর সর্ব্বভূতময় একজন আছেন। তাঁহা হইতে ভূতের এ খেলা।

পরিমাণ-রহস্য।

আমাদিগের সকল ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা চক্ষুর উপর বিশ্বাস অধিক। কিছুতে যাহা বিশ্বাস না করি,দেখিলেই তাহাতে বিশ্বাস হয়, অথচ চক্ষের ন্যায় প্রবঞ্চক কেহ নহে। যে সূর্য্যের পরিমাণ লক্ষ লক্ষ যোজনে হয় না, তাহাকে একখানি স্বর্ণথালির মত দেখি। প্রকাণ্ড বিশ্বকে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখি। যে চন্দ্রের দূরতা সূর্য্যের দূরতার চারি শত ভাগের এক ভাগও নহে, তাহা সূর্য্যের সমদূরবর্ত্তী দেখায়। যে পরমাণুতে এই জগৎ নির্ম্মিত, তাহার একটিও দেখিতে পাই না। আনুবীক্ষণিক জীব জৈবনিকাদি কিছুই দেখিতে পাই না। এই অবিশ্বাসযোগ্য চক্ষুকেই আমাদের বিশ্বাস।

দর্শনেন্দ্রিয়ের এইরূপ শক্তিহীনতার গতিকে আমরা জগতের পরিমাণবৈচিত্র্য কিছুই বুঝিতে পারি না। জ্যোতিষ্কাদি অতি বৃহৎ পদার্থকে ক্ষুদ্র দেখি এবং অতি ক্ষুদ্র পদার্থ সকলকে একেবারে দেখিতে পাই না। ভাগ্যক্রমে, মন বাহেন্দ্রিয়াপেক্ষা দূরদর্শী; অদর্শনীয়ও বিজ্ঞান দ্বারা মিত হইয়াছে সে পরিমাণ অতি বিস্ময়কর। দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

সকলে জানেন যে, পৃথিবীর ব্যাস ৭৯১৯ মাইল। যদি পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ এক মাইল প্রস্থ, এমত খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে উনিশ কোটি ছয়ষট্টি লক্ষ ছাব্বিশ হাজার এইরূপ বর্গ মাইল পাওয়া যায়। এক মাইল দীর্ঘে, এক মাইল প্রস্থে এবং এক মাইল ঊর্দ্ধে এরূপ ২৫৯৭৮০০০০০০০০ মাইল পাওয়া যায়। ওজনে পৃথিবী যত টন হইয়াছে,তাহা নিম্নে অঙ্কের দ্বারা লিখিলাম।

এক টন সাতাইশ মনের অধিক। *

এই আকার অতি ভয়ানক, তাহা মনে কল্পনা করা যায় না। সমগ্র হিমালয় পর্ব্বত ইহার বালুকাকণার অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। কিন্তু এই প্রকাণ্ড পৃথিবী সূর্য্যের আকারের সহিত তুলনায় বালুকা মাত্র। চন্দ্র একটি প্রকাণ্ড উপগ্রহ, উহা পৃথিবী হইতে২৪০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। সূর্য্য এ প্রকার প্রকাণ্ড পদার্থ যে, তাহা অন্তঃশূন্য করিয়া পৃথিবীকে, চন্দ্রসমেত তাহার মধ্যস্থলে স্থপিত করিলে, চন্দ্র এখন যেরূপ দূরে থাকিয়া পৃথিবীর পার্শ্বে বর্ত্তন করে,সূর্য্যগর্ভেও সেইরূপ করিতে পারে, এবং চন্দ্রের বর্ত্তনপথ ছাড়াও এক লক্ষ ষাট হাজার মাইল বেশী থাকে।

সূর্য্যের দূরতা কত মাইল,তাহা বালকেও জানে, কিন্তু সেই দূরতা অনুভূত করিবার জন্য নিম্নলিখিত গণনা উদ্ধৃত করিলাম।

"অস্মদাদির দেশে রেইলওয়ে ট্রেণ ঘণ্টায় ২০ মাইল যায়। যদি পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত রেইলওয়ে হইত,তবে কতকালে সূর্য্যলোকে যাইতে পারিতাম ? উত্তর—যদি দিন রাত্রে, ট্রেণ অবিরত ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে, তবে ৫২০ বৎসর ৬মাস ১৬ দিনে সূর্য্যলোকে পৌঁচান যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ট্রেণে চড়িবে, তাহার সপ্তদশ পুরুষ ঐ ট্রেণেই গত হইবে।"†

আর বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি গ্রহ সকলের দূরতার সহিত তুলনায় এ দূরতাও সামান্য। বুবীর গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, রেইল যদি ঘণ্টায় ৩৩ মাইল চলে, তবে সূর্য্যলোক হইতে কেহ রেইলে যাত্রা করিলে, দিন-রাত্র চলিয়া বৃহস্পতি গ্রহে ১৭১২ বৎসরে,শনিগ্রহে ৩১১৩ ৯৬৮৫ বৎসরে পৌঁছিবে।

আবার এ দূরতা নক্ষত্র সূর্য্যগণের দূরতার তুলনায় কেশের পরিমাণ মাত্র। সকল নক্ষত্রের অপেক্ষা আলফা সেণ্টরাই আমাদিগের নিকটবর্ত্তী; তাহার দূরতা ৬১ সিগনাই নামক নক্ষত্রের পাঁচ ভাগের চারি ভাগ। এই দ্বিতীয় নক্ষত্রের দূরতা ৬৩,৬৫০,০০০,০০০,০০০ মাইল। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৯২,০০০ মাইল। সেই আলোক ঐ নক্ষত্র হইতে আসিতে দশ বৎসরের অধিক কাল লাগে। বেগা নামক নক্ষত্রের দূরতা ১৩০,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল; আলোক সেখানে হইতে ২১ বৎসরে পৃথিবীতে পৌঁছে। ২১ বৎসর পূর্ব্বে ঐ নক্ষত্রের যে অবস্থা ছিল,তাহা আমরা দেখিতেছি—উহার অদ্যকার অবস্থা আমাদিগের জানিবার সাধ্য নাই।

আবার নীহারিকাগণের দূরতার সঙ্গে তুলনায়, এ সকল নক্ষত্রের দূরতা সূত্র-পরিমিত বোধ হয়। বীণা (Lyra) নামক নক্ষত্র-সমষ্টির বিটা ও গামা নক্ষত্রে মধ্যবর্ত্তী অঙ্গুরীয়বৎ নীহারিকার দূরতা, সর্ উইলিয়ম্ হর্শেলের গণনানুসারে সিরিয়সের দূরতার ৯৫ গুণ। ঐ বিটা নক্ষত্রের দক্ষিণপূর্ব্বস্থিত গোলাকৃত নীহারিকা, ঐ মহাত্মার গণনানুসারে সৌর-জগৎ হইতে ১ ৩০০,০০০,০০ ০০০,০০০ মাইল। ত্রিকোণ নামক নক্ষ সমষ্টিস্থিত এক নীহারিকা,সিরিয়সের দূরতা ৩৪৪ গুণ দূরে অবস্থিত ; এবং সুবৈাঙ্কির ঢাল নামক-নক্ষত্র সমষ্টিতে ঘোড়ার লাঙ্গের আকার যে এক নীহারিকা আছে,তাহার দূরতা উক্ত ভীষণ মানদণ্ডের নয় শত গুণ অর্থাৎ ৫০,০০০ ০০০,০০০,০০০,০০০ মাইলের কিছু ন্যূন।

পাদরী ডাক্তার স্কোরেসবি বলেন যে,যদি আমাদিগের সূর্য্যকে এত দূরে লইয়া যাওয়া

* আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত দেখ।

† আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত দেখ।

যায় যে, তথা হইতে পঁচিশ হাজার বৎসরে উহার আলোক আমাদিগের চক্ষে আসিবে, উহা তথাপি লর্ড রসের বৃহৎ দূরবীক্ষণে দৃশ্য হইতে পারে। যদি তাহা সত্য হয়, তবে যে সকল নীহারিকা হইতে সহস্র প্রচণ্ড সূর্য্যের রশ্মি একত্রিত হইয়া আসিলেও, নীহারিকাকে ঐ দূরবীক্ষণে ধূমরেখা মাত্রবৎ দেখা যায়, না জানি যে কত কোটি বৎসরে আলোক তথা হইতে আসিয়া আমাদিগের নয়নে লাগে। অথচ আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১,৯২,০০০ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর পরিধির অষ্টগুণ যায়।

পণ্টন সাহেব জানিয়াছেন যে, রৌদ্রের আলোক, মডরেটর দীপের অপেক্ষা ৪৪৪ গুণ তীব্র। যদি কোন সামগ্রীর দুই ইঞ্চি দূরে ১৬০টা মোমবাতী রাখা যায়, তবে তাহাতে যে আলো পড়ে,সে রৌদ্রের মত উজ্জ্বল হয়। গণিত হইয়াছে যে,যদি সূর্য্য রশ্মিবিশিষ্ট পদার্থ না হইত, তবে তাহাকে মোমবাতীর সাত কোটি বিশ লক্ষ স্তরে আবৃত করিলে, অর্থাৎ নয় মাইল উচ্চ করিয়া বাতীতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ মুড়িয়া, সকল বাতী জ্বালিয়া দিলে রৌদ্রের ন্যায় আলো পৃথিবীতে পাওয়া যাইত। কি ভয়ঙ্কর তাপাধার! সিনসিনেটির ডাক্তার ভন স্থির করিয়াছেন যে, এক ফুট দূরে ১৪,০০০ বাতী রাখিলে যে তাপ পাওয়া যায়, রৌদ্রের সেই তাপ। আর সূর্য্য আমাদিগের নিকট হইতে যত দূরে আছে, তত দূর থাকিলে ৩, ৫০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ সংখ্যক বাতী এককালীন না পোড়াইলে রৌদ্রের ন্যায় তাপ হয় না। এ কথার অর্থ এই হইতেছে যে, প্রত্যহ পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ দুই শত বাতীর গোলক পোড়াইলে যে তাপ সম্ভূত হয়, সূর্য্যদেব একদিনে তত তাপ খরচ করেন। তাঁহার তাপ যেরূপ খরচ হয়, সেই-রূপ নিত্য নিত্য উৎপন্ন হইয়া জমা হইয়া থাকে। তাহা না হইলে এই মহাতাপক্ষয়ে সূর্য্যও অল্পকালে অবশ্য তাপশূন্য হইতেন। কথিত হইয়াছে যে, সূর্য্য দাহ্যমান পদার্থ হইলে এই তাপ ব্যয় করিতে দশ বৎসরে আপনি দগ্ধ হইয়া যাইতেন।

মস্যুর পূইলা গণনা করিয়াছেন যে, সতের মাইল উচ্চ কয়লার খনি পোড়াইতে যে তাপ জন্মে, এক বৎসরে সূর্য্য তত তাপ ব্যয় করেন। যদি সূর্য্যের তাপবাহিতা জলের ন্যায় হয়, তবে বৎসরে ২৬ ডিগ্রী সূর্য্যের তাপ কমিবে। কুঞ্চন-ক্রিয়াতে তাপ-সৃষ্টি হয়। সূর্য্যের ব্যাস তাহার দশ-সহস্রাংশের একাংশ কমিলেই, দুই সহস্র বৎসরে ব্যয়িত তাপ সূর্য্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে।

সূর্য্যের তাপশালিতার যে ভয়ানক পরিমাণ লিখিত হইল, স্থির নক্ষত্রমধ্যে অনেক-গুলি তদপেক্ষা তাপশালী বোধ হয়। সে সকলের তাপ পরিমিত হইবার উপায় নাই, কেন না, তাহার রৌদ্র পৃথিবীতে আসে না, কিন্তু তাহার আলোক পরিমিত হইতে পারে। কোন কোন নক্ষত্রের প্রভাবশালিতা পরিমিত হইয়াছে। আলফা সেণ্টরাই নামক নক্ষত্রের প্রভাশালিতা সূর্য্যের ১০৩২ গুণ। বেগা নক্ষত্র ষোড়শ সূর্য্যের প্রভাবিশিষ্ট এবং নক্ষত্ররাজ সিরিয়স দুই শত পঞ্চবিংশতি সূর্য্যের প্রভাবিশিষ্ট। এই নক্ষত্র আমাদিগের সৌর-জগতের মধ্যবর্ত্তী হইলে পৃথিব্যাদি গ্রহ-সকল অল্পকালমধ্যে বাষ্প হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইত।

এই সকল নক্ষত্রের সংখ্যা অতি ভয়ানক। সর উইলিয়ম হর্শেল গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কেবল ছায়াপথে ১৮০০০,০০০ নক্ষত্র আছে। স্ত্রুব বলেন, আকাশে দুই কোটি নক্ষত্র আছে। মস্যুর শকর্ণাক বলেন, নক্ষত্রসংখ্যা সাত কোটি সত্তর লক্ষ। এ

সকল সংখ্যার মধ্যে নীহারিকাভ্যন্তরবর্ত্তী নক্ষত্র-সকল গণিত হয় নাই। যেমন সমুদ্র-তীরে বালুকানীহারিকা, সেইরূপ নক্ষত্র। এখানে অঙ্ক হারি মানে।

যদি অতি প্রকাণ্ড জগৎ সকলের সংখ্যা এইরূপ অনমুমেয়,তবে ক্ষুদ্র পদার্থের কথা কি বলিব? ইহ্রেণবর্গ বলেন যে, এক ঘন ইঞ্চি বিলিন শ্লেট প্রস্তরে চল্লিশহাজার Gallionella নামক আনুবীক্ষণিক শম্বূক আছে—তবে এই প্রস্তরের একটি পর্ব্বতশ্রেণীতে কত আছে, কে মনে ধারণা করিতে পারে? ডাক্তার টমাস টম্‌সন্ পরীক্ষা করিয়াছেন যে, সীসা, এক ঘন ইঞ্চির ৮৮৮,৪৯২,০০০,০০০,০০০ ভাগের এক ভাগ পরিমিত হইয়া বিভক্ত হইতে পারে। উহাই সীসার পরমাণুর পরিমাণ। তিনিই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, গন্ধকের পরমাণু ওজনে এক গ্রেণের ২,০০০,০০০,০০০ ভাগের এক ভাগ।

(সমুদ্রের গভীরতার পরিমাণ)

লোকের বিশ্বাস আছে যে, সমুদ্র কত গভীর, তাহার পরিমাণ নাই। অনেকের বিশ্বাস সমুদ্র "অতল।"

অনেক স্থানে সমুদ্রের গভীরতা পরিমিত হইয়াছে। আলেক্‌জান্দ্রানিবাসী প্রাচীন গণিত-ব্যবসায়িগণ অনুমান করিতেন যে, নিকটস্থ পর্ব্বত-সকল যত উচ্চ, সমুদ্র তত গভীর। ভূমধ্যস্থ (Mediteranean) সমুদ্রের অনেক স্থানে ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তথায় এ পর্য্যন্ত ১৫,০০০ ফিটের অধিক জল পরিমিত হয় নাই—আলপ্স পর্ব্বত-শ্রেণীর উচ্চতাও ঐরূপ।

মিশর ও সাইপ্রস দ্বীপের মধ্যে ছয় সহস্র ফিট, আলেক্‌জান্দ্রা ও রোড্‌শের মধ্যে নয় সহস্র নয় শত,এবং মাল্‌টায় পূর্ব্বে ১৫,০০০ ফিট জল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তদপেক্ষা অন্যান্য সমুদ্রে অধিকতর গভীরতা পাওয়া গিয়াছে। হম্বোল্‌টের কস্‌মস্ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এক স্থানে ২৬,০০০ ফিট রশী নামাইয়া দিয়াও তল পাওয়া যায় নাই—ইহা চারি মাইলের অধিক। ডাক্তার স্কোরেস্‌বি লিখেন যে, সাত মাইল রশী ছাড়িয়া দিয়াও তল পাওয়া যায় নাই। পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চতম পর্ব্বত-শৃঙ্গ পাঁচ মাইল মাত্র উচ্চ।

কিন্তু গড়ে. সমুদ্র কত গভীর, তাহা না মাপিয়াও গণিতবলে জানা যাইতে পারে।. জলোচ্ছ্বাসের কারণ সমুদ্রের জলের উপর সূর্য্য-চন্দ্রের আকর্ষণ। অতএব জলোচ্ছ্বাসের পরিমাণের হেতু, (১) সূর্য্য চন্দ্রের গুরুত্ব, (২) তদীয় দূরতা, (৩) তদীয় সংবর্ত্তনকাল, (৪) সমুদ্রের গভীরতা। প্রথম, দ্বিতীয়, এবং তৃতীয় তত্ত্ব আমরা জ্ঞাত আছি; চতুর্থ আমরা জানি না, কিন্তু চারিটির সমবায়ের ফল, অর্থাৎ জলোচ্ছ্বাসের পরিমাণ, আমরা জ্ঞাত আছি। অতএব অজ্ঞাত চতুর্থ সমবায়ী কারণ অনায়াসেই গণনা করা যাইতে পারে। আচার্য্য হটন এই প্রকারে গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, সমুদ্র গড়ে, ৫.১২ মাইল, অর্থাৎ পাঁচ মাইলের কিছু অধিক মাত্র গভীর। লাপ্লাস ব্রেষ্ট নগরে জলোচ্ছ্বাস পর্য্যবেক্ষণের বলে যে "Ratio of Semi-diurnal Co- efficents" স্থির করিয়াছেন, তাহা হইতেও এইরূপ উপলব্ধি করা যায়।

(শব্দ)

সচরাচর শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১০৩৮ ফিট গিয়া থাকে বটে, কিন্তু বের্থেম ও ব্রেগেট নামক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বৈদ্যুতিক তারে প্রতি সেকেণ্ডে, ১১,৪৫৬ সেকেণ্ড বেগে শব্দ প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতএব তারে কেবল পত্র-প্রেরণ হয়,এমত নহে; বৈজ্ঞানিক শিল্প

আর৭ কিছু উন্নতি প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য তারে কথোপকথন করিতে পারিবে। *

মনুষ্যের কণ্ঠস্বর কত দূর যায়? বলা যায় না। কোন কোন যুবতীর ব্রীড়ারুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিবার সময়ে, বিরক্তিক্রমে ইচ্ছা করে যে, নাকের চসমা খুলিয়া কাণে পরি, কোন কোন প্রাচীনার চীৎকারে বোধ হয়, গ্রামান্তরে পলাইলেও নিষ্কৃতি নাই। বিজ্ঞানবিদেরা এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দেখা যাউক।

প্রাচীনমতে আকাশ শব্দবহ; আধুনিক মতে বায়ু শব্দবহ। বায়ুর তরঙ্গে শব্দের সৃষ্টি ও বহন হয়। অতএব যেখানে বায়ু তরল ও ক্ষীণ, সেখানে শব্দের অস্পষ্টতা সম্ভব। ব্লাঙ্ শৃঙ্গোপরি শব্দ অস্পষ্টশ্রাব্য বলিয়া শব্দের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, তথায় পিস্তল ছুড়িলে পটকার মত শব্দ হয়; এবং স্যাম্পেন খুলিলে কাকের শব্দ প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মার্শাস বলেন যে, তিনি সেই শৃঙ্গোপরেই ১৩৪০ ফিট হইতে মনুষ্য-কণ্ঠ শুনিয়াছিলেন। এ বিষয় "গগনপর্য্যটন" প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ লেখা হইয়াছে।

যদি শব্দবহ বায়ুকে চোঙ্গার ভিতর রুদ্ধ করা যায়, তবে মনুষ্য-কণ্ঠ যে অনেক দূর হইতে শুনা যাইবে, ইহা বিচিত্র নহে। কেন না, শব্দ তরঙ্গ সকল ছড়াইয়া পড়িবে না।

স্থির জল, চোঙ্গার কাজ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চতায় বায়ু প্রতিহত হইতে পায় না—এজন্য শব্দ তরঙ্গসকল, ভগ্ন হইয়া নানা দিগ্‌-দিগন্তরে বিকীর্ণ হয় না। এই জন্য প্রশস্ত নদীর এপার হইতে ডাকিলে ওপারে শুনিতে পায়। বিখ্যাত হিমকেন্দ্রানুসারী পর্য্যটক পারির সমভিব্যাহারী লেপ্টেনাণ্ট ফষ্টর লিখেন যে, তিনি পোর্ট বৌয়েনের ওপার হইতে পরপারে স্থিত মনুষ্যের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে ১।০ মাইল ব্যবধান। ইহা আশ্চর্য্য বটে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার ডাক্তার ইয়ং কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, জিব্রল্টরে দশ মাইল হইতে মনুষ্যকণ্ঠ শুনা গিয়াছে। কথা বিশ্বাসযোগ্য কি?

প্রবন্ধান্তরে কথিত হইয়াছে যে, আলোক ইথর নামপ্রাপ্ত বিশ্বব্যাপী জাগতিক তরল পদার্থের আন্দোলনের ফল মাত্র। সূর্য্যালোক সপ্ত বর্ণের সমবায়; সেই সপ্ত বর্ণ ইন্দ্রধনু অথবা স্ফাটিক প্রেরিত আলোকে লক্ষিত হয়। প্রত্যেক বর্ণের তরঙ্গ-সকল পৃথক্ পৃথক্; তাহাদিগের প্রাকৃতিক সমবায়ের ফলে, শ্বেত রৌদ্র। এই সকল জ্যোতিস্তরঙ্গ-বৈচিত্র্যই জগতের বর্ণ-বৈচিত্র্যের কারণ। কোন কোন পদার্থ কোন কোন বর্ণের তরঙ্গ-সকল রুদ্ধ করিয়া, অবশিষ্টগুলি প্রতিহত করে। আমরা সে সকল দ্রব্যকে প্রতিহত তরঙ্গের বর্ণবিশিষ্ট দেখি।

(জ্যোতিস্তরঙ্গ)

তবে তরঙ্গেরই বা বর্ণ-বৈষম্য কেন? কোন তরঙ্গ রক্ত, কোন তরঙ্গ পীত, কোন তরঙ্গ নীল কেন? ইহা কেবল তরঙ্গের বেগের তারতম্য। প্রতি ইঞ্চি স্থানমধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার তরঙ্গের উৎপত্তি হইলে তরঙ্গ রক্তবর্ণ, অন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার তরঙ্গ পীতবর্ণ ইত্যাদি।

যে জ্যোতিস্তরঙ্গ এক ইঞ্চিমধ্যে ৩৭,৬৪০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়, এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৪,৫৮,০০০,০০০,০০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা রক্তবর্ণ। পীত তরঙ্গ, এক ইঞ্চিতে ৪৪,০০০ বার, এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৫৩,৫০,০০,০০,০০,০০

---

* এই প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পরে টেলিফোনের আবিষ্ক্রিয়া।

০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়, এবং নীল তরঙ্গ প্রতি ইঞ্চিতে ৫১.১১০ বার এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৬২,২০,০০,০০,০০.০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়। পরিমাণের রহস্য ইহা অপেক্ষা আর কি বলিব? এমন অনেক নক্ষত্র আছে যে, তাহার আলোক পৃথিবীতে পঞ্চাশ বৎসরেও পৌছে না। সেই নক্ষত্র হইতে যে আলোক রেখা আমাদের নয়নে আসিয়া লাগে, তাহার তরঙ্গ-সকল কতবার প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে? এবার যখন রাত্রে আকাশ প্রতি চাহিবে, তখন এই কথাটি একবার মনে করিও।

(সমুদ্রের তরঙ্গ)

এই অচিন্ত্য বেগবান সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম জ্যোতিস্তরঙ্গের আলোচনার পর, পার্থিব জলের তরঙ্গমালার আলোচনা অবিধেয় নহে। জ্যোতিস্তরঙ্গের বেগের পরে সমুদ্রের ঢেউকে অচল মনে করিলেও হয়। তথাপি সাগরতরঙ্গের বেগ মন্দ নহে। ফিণ্‌লে সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতি বৃহৎ সাগরোর্ম্মিসকল ঘণ্টায় ২০ মাইল হইতে ২৭॥০ মাইল পর্য্যন্ত বেগে ধাবিত হয়। স্কোরেসবি সাহেব গণনা করিয়াছেন যে, আটলাণ্টিক সাগরের তরঙ্গ ঘণ্টায় প্রায় ৩৩ মাইল চলে। এই বেগ ভারতবর্ষীয় বাষ্পীয় রথের বেগের অপেক্ষা ক্ষিপ্রতর।

যাঁহারা বাঙ্গালার নদীবর্গে নৌকারোহণ করিতে ভীত, সাগরোর্ম্মির পরিমাণ সম্বন্ধে তাঁহাদের কিরূপ অনুমান, তাহা বলিতে পারি না। উপকথায় "তালগাছ প্রমাণ ঢেউ" শুনা যায়—কিন্তু কেহ তাহা বিশ্বাস করে না। সমুদ্রে তদপেক্ষা উচ্চতর ঢেউ উঠিয়া থাকে। ফিণ্‌লে সাহেব লিখেন, ১৮৪৩ অব্দে কর্ণ্বালের নিকট ৩০০ ফিট অর্থাৎ ২০০ হাত উচ্চ ঢেউ উঠিয়াছিল। ১৮১০ সালে নরওয়ে প্রদেশের নিকট ৪০০ ফিট পরিমিত ঢেউ উঠিয়াছিল।

সমুদ্রের ঢেউ অনেক দূরে চলে। উত্তমাশা অন্তরীপে উদ্ভূত মগ্ন তরঙ্গ তিন সহস্র মাইল দূরস্থ উপদ্বীপে প্রহত হইয়া থাকে। আচার্য্য বাচ বলেন যে, জাপান দ্বীপাবলীর অন্তর্গত সৈমোদা নামক স্থানে একদা ভূমিকম্প হয়; তাহাতে ঐ স্থানসমীপস্থ "পোতাশ্রয়ে" এক বৃহৎ ঊর্ম্মি প্রবেশ করিয়া সরিয়া আসিলে পোতাশ্রয় জলশূন্য হইয়া পড়ে। সেই ঢেউ প্রশান্ত মহাসাগরের পরপারে, সানফ্রান্‌সিস্কো নগরের উপকূলে প্রহত হয়; সৈমোদা হইতে ঐ নগর ৪৮০০ মাইল। তরঙ্গরাজ ১২ ঘণ্টা ১৬ মিনিটে পার হইয়াছিলেন অর্থাৎ মিনিটে ৬৷৷০ মাইল চলিয়াছিলেন।

চন্দ্রলোক।

এই বঙ্গদেশের সাহিত্যে চন্দ্রদেব অনেক কার্য্য করিয়াছেন। বর্ণনায়, উপমায়,—বিচ্ছেদে, মিলনে,—অলঙ্কারে, খোসামোদে—তিনি উলটি পালটি খাইয়াছেন। চন্দ্রবদন, চন্দ্ররশ্মি, চন্দ্রকরলেখা, শশী মসি ইত্যাদি সাধারণ ভোগ্য সামগ্রী অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন; কখন স্ত্রীলোকের স্কন্ধোপরি চড়াচড়ি, কখন তাঁহাদিগের নখরে গড়াগড়ি গিয়াছেন; সুধাকর, হিমকর-করনিকর, মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক, কলঙ্ক, প্রভৃতি অনুপ্রাসে,

বাঙ্গালী বালকের মনোমুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীতে এইরূপ কেবল সাহিত্য-কুঞ্জে লীলা-খেলা করিয়া কার সাধ্য নিস্তার পায়? বিজ্ঞান-দৈত্য সকল পথ ঘেরিয়া বসিয়া আছে! আজি চন্দ্রদেবকে বিজ্ঞানে ধরিয়াছে, ছাড়াছাড়ি নাই। আর সাধের সাহিত্য-বৃন্দাবনে লীলা-খেলা চলে না—কুঞ্জদ্বারে সাহেব-অক্রূর রথ আনাইয়া দাঁড়াইয়া আছে; চল চন্দ্র, বিজ্ঞান-মথুরায় চল; একটা কংস বধ করিতে হইবে।

যখন অভিমন্যু-শোকে ভদ্রার্জ্জুন অত্যন্ত কাতর, তখন তাঁহাদিগের প্রবোধার্থ কথিত হইয়াছিল যে, অভিমন্যু চন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। আমরাও যখন নীলগগন-সমুদ্রে এই সুবর্ণের দ্বীপ দেখি, আমরাও মনে করি, বুঝি, এই সুবর্ণময় লোকে সোণার মানুষ সোণার থালে সোণার মাছ ভাজিয়া সোণার ভাত খায়, হীরার সরবত পান করে এবং অপূর্ব্ব পদার্থের শয্যায় শয়ন করিয়া স্বপ্নশূন্য নিদ্রায় কাল কাটায়। বিজ্ঞান বলে, তাহা নহে—এ পোড়া লোকে যেন কেহ যায় না—এ দগ্ধ মরুভূমি মাত্র। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব।

বালকেরা শৈশবে পড়িয়া থাকে, চন্দ্র উপগ্রহ। কিন্তু উপগ্রহ বলিলে সৌর-জগতের সঙ্গে চন্দ্রের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট হইল না। পৃথিবী ও চন্দ্র যুগল গ্রহ। উভয়ে এক পথে, একত্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, উভয়েই উভয়ের মাধ্যাকর্ষণ-কেন্দ্রের বশবর্ত্তী—কিন্তু পৃথিবী গুরুত্বে চন্দ্রের একাশী গুণ, এজন্য পৃথিবীর আকর্ষণীশক্তি চন্দ্রাপেক্ষা এত অধিক যে, সেই যুক্ত আকর্ষণে কেন্দ্র পৃথিবীস্থিত; এজন্য চন্দ্রকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণকারী উপ-গ্রহ বোধ হয়। সাধারণ পাঠকে বুঝিবেন যে, চন্দ্র একটি ক্ষুদ্রতর পৃথিবী; ইহার ব্যাস ১০৫০ ক্রোশ; অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের চতুর্থাংশের অপেক্ষা কিছু বেশী। যে সকল কবিগণ নায়িকাদিগের আর প্রাচীন প্রথা-মত চন্দ্রমুখী বলিয়া সন্তুষ্ট নহেন—নূতন উপ-মার অনুসন্ধান করেন—তাঁহাদিগকে আমরা পরামর্শ দিই যে, এক্ষণ অবধি নায়িকাদিগকে পৃথিবীমুখী বলিতে আরম্ভ করিবেন। তাহা হইলে অলঙ্কারের কিছু গৌরব হইবে। বুঝা-ইবে যে, সুন্দরীর মুখমণ্ডলের ব্যাস কেবল সহস্র ক্রোশ নহে—কিছু কম চারি সহস্র ক্রোশ।

এই ক্ষুদ্র পৃথিবী আমাদিগের পৃথিবী হইতে এক লক্ষ বিংশতি সহস্র ক্রোশ মাত্র—ত্রিশ হাজার যোজন মাত্র। গাগনিক গণনায় এ দূরতা অতি সামান্য—এ পাড়া ও পাড়া। ত্রিশটি পৃথিবী গায় গায় সাজাইলে চন্দ্রে গিয়া লাগে। চন্দ্র পর্য্যন্ত রেইলওয়ে যদি থাকিত, তাহা হইলে ঘণ্টায় বিশ মাইল গেলে, দিনরাত্র চলিলে, পঞ্চাশ দিনে পৌঁছান যায়।

সুতরাং আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ চন্দ্রকে অতি নিকটবর্ত্তী মনে করেন। তাঁহাদিগের কৌশলে এক্ষণে এমন দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হই-য়াছে যে, তদ্দ্বারা চন্দ্রাদিকে ২৪০০ গুণ বৃহ-ত্তর দেখা যায়। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে চন্দ্র যদি আমাদিগের নেত্র হইতে পঞ্চাশৎ ক্রোশ মাত্র দূরবর্ত্তী হইত, তাহা হইলে আমরা চন্দ্রকে যেমন স্পষ্ট দেখিতাম, এক্ষণেও ঐ সকল দূরবীক্ষণ-সাহায্যে সেইরূপ স্পষ্ট দেখিতে পারি।

এরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চন্দ্রকে কিরূপ দেখা যায়? দেখা যায় যে, তিনি হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেবতা নহেন, জ্যোতির্ম্ময় কোন পদার্থ নহেন, কেবল পাষাণময়, আগ্নেয়-গিরি-পরিপূর্ণ জড়-পিণ্ড। কোথাও অত্যুন্নত পর্ব্বতমালা—কোথাও গভীর গহ্বররাজি। চন্দ্র যে উজ্জ্বল, তাহা সূর্য্যা-

লোকের কারণে। আমরা পৃথিবীতেও দেখি যে, যাহা রৌদ্রপ্রদীপ্ত, তাহাই দূর হইতে উজ্জ্বল দেখায়। চন্দ্রও রৌদ্রপ্রদীপ্ত বলিয়া উজ্জ্বল। কিন্তু যে স্থানে রৌদ্র না লাগে, সে স্থান উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় না। সকলেই জানে যে, চন্দ্রের কলায় কলায় হ্রাস-বৃদ্ধি এই কারণেই ঘটিয়া থাকে। সে তত্ত্ব বুঝাইয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা যাইবে, যে স্থান উন্নত, সেই স্থানে রৌদ্র লাগে—সেই স্থান আমরা উজ্জ্বল দেখি—যে স্থানে গহ্বর অথবা পর্ব্বতের ছায়া, সে স্থানে রৌদ্র প্রবেশ করে না—সে স্থলগুলি আমরা কালিমাপূর্ণ দেখি। সেই অনুজ্জ্বল রৌদ্রশূন্য স্থানগুলিই কলঙ্ক—অথবা "মৃগ"—প্রাচীনাদিগের মতে সেইগুলিই "কদম-তলায় বুড়ী চরকা কাটিতেছে।"

চন্দ্রের বহির্ভাগের এরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান হইয়াছে যে, তাহাতে চন্দ্রের উৎকৃষ্ট মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে; তাহার পর্ব্বতাবলী ও প্রদেশ-সকল নাম প্রাপ্ত হইয়াছে—এবং তাহার পর্ব্বতমালার উচ্চতা পরিমিত হইয়াছে। বেয়র ও মাল্লর নামক সুপরিচিত জ্যোতির্ব্বিদ্‌দ্বয় অন্যূন ১০৯৫টি চান্দ্রপর্ব্বতের উচ্চতা পরিমিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে মনুষ্যে যে পর্ব্বতের নাম রাখিয়াছে "নিউটন", তাহার উচ্চতা ২২,৮২৩ ফীট। এতাদৃশ উচ্চ পর্ব্বত-শিখর পৃথিবীতে আন্দিস্‌ ও হিমালয়শ্রেণী ভিন্ন আর কোথাও নাই। চন্দ্র পৃথিবীর পঞ্চাশদ্‌ভাগের একভাগ মাত্র এবং গুরুত্বে একাশী ভাগের এক ভাগ মাত্র; অতএব পৃথিবীর তুলনায় চান্দ্র পর্ব্বত-সকল অত্যন্ত উচ্চ। চন্দ্রের তুলনায় নিউটন যেমন উচ্চ, চিম্বারোজা নামক বৃহৎ পার্থিব-শিখরের অবয়ব আর পঞ্চাশদ্‌গুণে বৃদ্ধি পাইলে পৃথিবীর তুলনায় তত উচ্চ হইত।

চান্দ্র পর্ব্বত কেবল যে আশ্চর্য্য উচ্চ, এমত নহে; চন্দ্রলোকে আগ্নেয় পর্ব্বতের অত্যন্ত আধিক্য। অগণিত আগ্নেয় পর্ব্বতশ্রেণী অগ্ন্যুদ্গারী বিশাল রন্ধ্র-সকল প্রকাশিত করিয়া রহিয়াছে—যেন কোন তপ্ত দ্রবীভূত পদার্থ কটাহে জ্বাল প্রাপ্ত হইয়া কোন কালে টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া জমিয়া গিয়াছে। এই চন্দ্রমণ্ডল সহস্রধা বিভিন্ন, সহস্র সহস্র বিবরবিশিষ্ট,—কেবল পাষাণ, বিদীর্ণ, ভগ্ন, ছিন্নভিন্ন, দগ্ধ, পাষাণময়। হায়! এমন চাঁদের সঙ্গে কে সুন্দরীদিগের মুখের তুলনা করার পদ্ধতি বাহির করিয়াছিল?

এই ত পোড়া চন্দ্রলোক! এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এখানে জীবের বসতি আছে কি? আমরা যতদূর জানি, জল বায়ু ভিন্ন জীবের বসতি নাই; যেখানে জল বা বায়ু নাই, সেখানে আমাদের জ্ঞানগোচরে জীব থাকিতে পারে না। যদি চন্দ্রলোকে জলবায়ু থাকে, তবে সেখানে জীব থাকিতে পারে; যদি জল-বায়ু না থাকে, তবে জীব নাই, এক প্রকার সিদ্ধ করিতে পারি। এক্ষণে দেখা যাউক, তদ্বিষয়ে কি প্রমাণ আছে।

মনে কর, চন্দ্র পৃথিবীর ন্যায় বায়বীয় মণ্ডলে বেষ্টিত। মনে কর, কোন নক্ষত্র, চন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া গতি করিবে। ইহাকে জ্যোতিষে সমাবরণ (Occultation) বলা যাইতে পারে। নক্ষত্র চন্দ্র কর্ত্তৃক সমাবৃত হইবার কালে প্রথমে, বায়ুস্তরের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে, তৎপরে চন্দ্রশরীরের পশ্চাতে লুকাইবে। যখন বায়বীয় স্তরের পশ্চাতে নক্ষত্র যাইবে, তখন নক্ষত্র পূর্ব্বমত উজ্জ্বল বোধ হইবে না; কেন না, বায়ু আলোকের কিয়ৎপরিমাণে প্রতিরোধ করিয়া থাকে। নিকটস্থ বস্তু আমরা যত স্পষ্ট দেখি, দূরস্থ বস্তু আমরা তত স্পষ্ট দেখিতে পাই না—তাহার কারণ

মধ্যবর্ত্তী বায়ুস্তর। অতএব সমাবরণীয় নক্ষত্র ক্রমে হ্রস্বতেজা হইয়া পরে চন্দ্রান্তরালে অদৃশ্য হইবে। কিন্তু এরূপ ঘটিয়া থাকে না। সমাবরণীয় নক্ষত্র একবারেই নিবিয়া যায়—নিবিবার পূর্ব্বে তাহার উজ্জ্বলতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। চন্দ্রে বায়ু থাকিলে কখন এরূপ হইত না।

চন্দ্রে যে জল নাই তাহারও প্রমাণ আছে; কিন্তু সে প্রমাণ অতি দুরূহ—সাধারণ পাঠককে অল্পে বুঝান যাইবে না; এবং এই সকল প্রমাণ বর্ণ-রেখা-পরীক্ষক (Spectroscope) যন্ত্রের বিচিত্র পরীক্ষায় দূরীকৃত হইয়াছে; চন্দ্রলোকে জলও নাই, বায়ুও নাই। যদি জল-বায়ু না থাকে, তবে পৃথিবীবাসী জীবের ন্যায় কোন জীব তথায় নাই।

আর একটি কথা বলিয়াই আমরা উপসংহার করিব। চান্দ্রিক উত্তাপও এক্ষণে পরিমিত হইয়াছে। চন্দ্র এক পক্ষকালে আপন মেরুদণ্ডের উপর সংবর্ত্তন করে, অতএব আমাদের এক পক্ষকালে এক চান্দ্রিক দিবস। এক্ষণে স্মরণ করিয়া দেখ যে, পৌষমাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসে আমরা এত তাপাধিক্য ভোগ করি, তাহার কারণ পৌষমাসে দিন ছোট, জ্যৈষ্ঠমাসের দিন চারি ঘণ্টা বড়। যদি দিনমান তিন চারি ঘণ্টা মাত্র বড় হইলেই এ তাপাধিক্য হয় তবে পাক্ষিক চন্দ্র-দিবসে না জানি চন্দ্র কি ভয়ানক উত্তপ্ত হয়। তাহাতে আবার পৃথিবীতে জল, বায়ু, মেঘ আছে—তজ্জন্য পার্থিব সন্তাপ বিশেষ প্রকারে শমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু জল, বায়ু, মেঘ ইত্যাদি চন্দ্রে কিছুই নাই। তাহার উপর আবার চন্দ্র পাষাণময়। অতি সহজে উত্তপ্ত হয়। অতএব চন্দ্রলোক অত্যন্ত তপ্ত হইবারই সম্ভাবনা। বিখ্যাত দূরবীক্ষণ-নির্ম্মাণকারীর পুত্র লর্ড রস চন্দ্রের তাপ পরিমিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুসন্ধানে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, চন্দ্রের কোন কোন অংশ এত উষ্ণ, তত্তুলনায় যে জল অগ্নিসংস্পর্শে ফুটিতেছে, তাহাও শীতল। সে সন্তাপে কোন পার্থিব জীব রক্ষা পাইতে পারে না মুহূর্ত্ত জন্যও রক্ষা পাইতে পারে না। এই কি শীতরশ্মি, হিমকর, সুধাংশু? হায়! হায়! অন্ধ পুত্রকে পদ্মলোচন আর কেমন করিয়া বলিতে হয়! *

অতএব সুখের চন্দ্রলোক কি প্রকার, তাহা এক্ষণে আমরা একপ্রকার বুঝিতে পারিয়াছি। চন্দ্রলোক পাষাণময়, বিদীর্ণ, ভগ্ন, ছিন্নভিন্ন, বন্ধুর, দগ্ধ, পাষাণময়! জলশূন্য, সাগরশূন্য, নদীশূন্য, তড়াগশূন্য, বায়ুশূন্য, বৃষ্টিশূন্য—জনহীন, জীবহীন, তরুহীন, তৃণহীন, শব্দহীন, † উত্তপ্ত জলন্ত, নরককুণ্ডতুল্য, এই চন্দ্রলোক!

এইজন্য বিজ্ঞানকে কাব্য আঁটিয়া উঠিতে পারে না। কাব্য গড়ে—বিজ্ঞান ভাঙ্গে।

---

* যদি কেহ বলেন যে, চন্দ্র স্বয়ং উত্তপ্ত হউন, আমরা তাঁহার আলোকের শৈত্য-স্পর্শের প্রত্যক্ষ দ্বারা জানিয়া থাকি। বাস্তবিক এ কথা সত্য নহে—আমরা স্পর্শ দ্বারা চন্দ্রলোকের শৈত্য বা উষ্ণতা কিছুই অনুভূত করি না। অন্ধকার-রাত্রের অপেক্ষা জ্যোৎস্নারাত্রি শীতল, এ কথা যদি কেহ মনে করেন, তবে সে তাঁহার মনের বিকার মাত্র। বরং চন্দ্রালোকে কিঞ্চিৎ সন্তাপ আছে, সেটুকু এত অল্প যে, তাহা আমাদিগের স্পর্শের অনুভবনীয় নহে। কিন্তু জান্তেদেশী, মেলনি, পিয়াজি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষার দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিয়াছেন।

† কেন না, বায়ু নাই।

সর্ম্পূ।

সাম্য
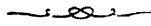
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

বিজ্ঞাপন।

এই প্রবন্ধের প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ বঙ্গদর্শনের সাম্যশীর্ষক প্রবন্ধ। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঐ পত্রে প্রকাশিত "বঙ্গদেশের কৃষক" নামক প্রবন্ধ হইতে নীত। কৃষকের কথা যে আধুনিক সামাজিক বৈষম্যের উদাহরণস্বরূপ লিখিত হইয়াছে, এমত নহে ; প্রাচীন বর্ণ-বৈষম্যের ফলস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। পাঠক যেন এই কথাটি স্মরণ রাখেন।

সাম্যনীতি নূতন তত্ত্ব নহে, কিন্তু ইউরোপীয়েরা যে ভাবে ইহার বিচার করেন, আমি তাহা করি নাই। আমি সাম্য-নীতি যেমন মোটামুটি বুঝিয়াছি—সেইরূপ লিখিয়াছি। অতএব ইউরোপীয় নীতিশাস্ত্রের সহিত প্রভেদ দেখিলে, কেহ রাগ করিবেন না। আরও, স্বদেশীয় সাধারণজনগণকে এই তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছি। সুশিক্ষিত যদি ইহাতে কিছু পঠিতব্য না পান, আমি দুঃখিত হইব না। অশিক্ষিত পাঠকদিগের হৃদয়ে এই নীতি অঙ্কুরিত হইলে আমি চরিতার্থ হইব।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সাম্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এই সংসারে একটি শব্দ সর্ব্বদা শুনিতে পাই—"অমুক বড় লোক—অমুক ছোট লোক।" এটি কেবল শব্দ নহে। লোকের পরস্পর বৈষম্য-জ্ঞান মনুষ্যমণ্ডলীর কার্য্যের একটি প্রধান প্রবৃত্তির মূল। অমুক বড় লোক, পৃথিবীর যত ক্ষীর সর নবনীত সকলই তাঁহাকে উপহার দাও। ভাষার সাগর হইতে শব্দরত্নগুলি বাছিয়া বাছিয়া তুলিয়া হার গাঁথিয়া তাঁহাকে পরাও, কেন না, তিনি বড় লোক। যেখানে ক্ষুদ্র অদৃশ্যপ্রায় কণ্টকটি পথে পড়িয়া আছে, উহা যত্নসহকারে উঠাইয়া সরাইয়া রাখ—ঐ বড় লোক আসিতেছেন, কি জানি, যদি তাঁহার পায়ে ফুটে। এই জীবন-পথের ছায়া-স্নিগ্ধ পার্শ্ব ছাড়িয়া রৌদ্রে দাঁড়াও, বড় লোক যাইতেছেন। সংসারের আনন্দকুসুম সকল, সকলে মিলিয়া চয়ন করিয়া শয্যারচনা করিয়া রাখ, বড় লোক উহাতে শয়ন করুন। আর তুমি—তুমি বড় লোক নহ—তুমি সরিয়া দাঁড়াও, এ পৃথিবীর ভাল সামগ্রী কিছুই তোমার জন্য নয়। কেবল এই তীব্রঘাতী দোলায়মান বেত্র তোমার জন্য—বড় লোকের চিত্তরঞ্জনার্থ তোমার পৃষ্ঠের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে ইহার আলাপ হইবে।

বড় লোকে ছোট লোকে এ প্রভেদ কিসে? রাম বড় লোক, যদু ছোট লোক কিসে? তাহা নিন্দকলোকে এক প্রকার বুঝাইয়া দেয়। যদু চুরি করিতে জানে না, বঞ্চনা করিতে জানে না, পরের সর্ব্বস্ব শঠতা করিয়া গ্রহণ করিতে জানে না, সুতরাং যদু ছোট লোক; রাম চুরি করিয়া, বঞ্চনা করিয়া, শঠতা করিয়া, ধনসঞ্চয় করিয়াছেন, সুতরাং রাম বড়লোক। অথবা রাম নিজে নিরীহ ভাল মানুষ, কিন্তু তাহার প্রপিতামহ চৌর্য্য-বঞ্চনাদিতে সুদক্ষ ছিলেন; মুনিবের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া বিষয় করিয়া গিয়াছেন, রাম জুয়াচোরের প্রপৌত্র, সুতরাং সে বড় লোক। যদুর পিতামহ আপনি আনিয়া আপনার খাইয়াছে—সুতরাং সে ছোট লোক। অথবা রাম কোন বঞ্চকের কন্যা বিবাহ করিয়াছে, সেই সম্বন্ধে বড় লোক। রামের মাহাত্ম্যের উপর পুষ্পবৃষ্টি কর।

অথবা রাম সেলাম করিয়া, গালি খাইয়া, কদাচিৎ পদাঘাত সহ্য করিয়া, অথবা ততোধিক কোন মহৎ কার্য্য করিয়া, কোন রাজপুরুষের নিকট প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছে। রাম চাপরাশ গলায় বাঁধিয়াছে—চাপরাশের বলে বড় লোক হইয়াছে। আমরা কেবল বাঙ্গালীর কথা বলিতেছি না—পৃথিবীর সকল দেশেই চাপরাশ-বাহকের একই চরিত্র—প্রভুর নিকট কীটাণু-কীট, কিন্তু অন্যের কাছে?—ধর্ম্মাবতার!! তুমি যে হও, দুই হাতে সেলাম কর, ইনি ধর্ম্মাবতার। ইঁহার ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান নাই, অধর্ম্মেই আসক্তি,—তাহাতে ক্ষতি কি? রাজকটাক্ষে ইনি ধর্ম্মাবতার। ইনি গণ্ডমূর্খ, তুমি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ—সে কথা এখন মনে করিও না, ইনি বড় লোক, ইঁহাকে প্রণাম কর।

আর এক প্রকারের বড় লোক আছে। গোপাল ঠাকুর, "কন্যাভারগ্রস্ত—কন্যাভারগ্রস্ত" বলিয়া দুই চারি পয়সা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে—এও বড় লোক। কেন না, গোপাল ব্রাহ্মণ-জাতি! তুমি শূদ্র—যত বড় লোক হও না কেন, তোমাকে উহার পায়ের ধূলা লইতে হইবে। দুই প্রহর বেলা ঠাকুর রাগ করিয়া না যান—ভাল করিয়া আহার করাও, যাহা চাহেন, দিয়া বিদায় কর। গোপাল দরিদ্র, মূর্খ, নরাধম, পাপিষ্ঠ, কিন্তু সেও বড় লোক।

অতএব সংসার বৈষম্য-পরিপূর্ণ।—সকল বিষয়েই বৈষম্য জন্মে। রাম এ দেশে না জন্মিয়া, ও দেশে জন্মিল, সে একটি বৈষম্যের কারণ হইল; রাম পাঁচীর গর্ভে না জন্মিয়া আদির গর্ভে জন্মিল, সে একটি বৈষম্যের কারণ হইল। তোমার অপেক্ষা আমি কথায় পটু, বা আমার শক্তি অধিক বা আমি বঞ্চনায় দক্ষ,—এ সকলই সামাজিক বৈষম্যের কারণ, সংসার বৈষম্যপূর্ণ।

সংসারে বৈষম্য থাকাই উচিত। প্রকৃতিই অনেক বৈষম্যের নিয়ম করিয়া আমাদিগকে এই সংসার-রঙ্গে পাঠাইয়াছেন। তোমার অপেক্ষা আমার হাড়গুলি মোটা মোটা, বড় কঠিন—তোমার অপেক্ষা আমার বাহুতে অধিক বল আছে—আমি তোমাকে এক ঘুষিতে ভূতলশায়ী করিয়া তোমার অপেক্ষা বড় লোক হইতেছি। কুমুদিনীর অপেক্ষা সৌদামিনী সুন্দরী; সুতরাং সৌদামিনী জমিদারের স্ত্রী, কুমুদিনী পাট কাটে। রামের মস্তিষ্কের অপেক্ষা যদুর মস্তিষ্ক দশ আউন্‌স্ ওজনে ভারি, সুতরাং যদু সংসারে মান্য, রাম ঘৃণিত।

অতএব বৈষম্য সাংসারিক নিয়ম। জগতের সকল পদার্থেরই বৈষম্য। মনুষ্যে মনুষ্যে প্রকৃত বৈষম্য আছে। যেমন প্রকৃত বৈষম্য আছে—প্রকৃত বৈষম্য অর্থাৎ যে বৈষম্য প্রাকৃতিক নিয়মানুরুদ্ধ,—তেমনি অপ্রাকৃত বৈষম্য আছে। ব্রাহ্মণ শূদ্রে অপ্রাকৃত বৈষম্য। ব্রাহ্মণবধে গুরু পাপ, শূদ্রবধে লঘু পাপ; ইহা প্রাকৃতিক নিয়মানুকৃত নহে। ব্রাহ্মণ অবধ্য—শূদ্র বধ্য কেন? শূদ্রই দাতা, ব্রাহ্মণই কেবল গৃহীতা কেন? তৎপরিবর্ত্তে যাহার দিবার শক্তি আছে, সেই দাতা, যাহার প্রয়োজন, সেই গৃহীতা, এ বিধি হয় নাই কেন?

দেশী বিলাতীর মধ্যে সেইরূপ আর একটি অপ্রাকৃত বৈষম্য। কিন্তু সে কথার অধিক আন্দোলন করিতে পারি না।

সর্ব্বাপেক্ষা অর্থগত বৈষম্য গুরুতর। তাহার ফলে কোথাও কোথাও দুই একজন লোক টাকার খরচ খুঁজিয়া পান না—কিন্তু লক্ষ লোক অন্নাভাবে উৎকট রোগগ্রস্ত হইতেছে!

সমাজের উন্নতিরোধ বা অবনতির যে সকল কারণ আছে, অপ্রাকৃতিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার প্রধান। ভারতবর্ষের যে এতদিন হইতে এত দুর্দ্দশা, সামাজিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার বিশিষ্ট কারণ।

ভারতবর্ষেই যে বৈষম্যের আধিক্য ঘটিয়াছে, এমত নহে। এই সংসার বৈষম্যময়, সকল দেশই বৈষম্যজালে আচ্ছন্ন। উন্নতিশীল সমাজে, সামাজিকেরা পরস্পরে সংঘৃষ্ট হইয়া সেই বৈষম্যকে অপনীত করিয়াছেন। সেই সকল রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। রোম ইহার প্রধান উদাহরণ। রোমরাজ্যের প্রথমকালিক বৈষম্য—প্রেত্রিষীয় ও প্লিবীয়দিগের সম্প্রাদায়-ভেদ—তাহা এক প্রকার সামাজিক সামঞ্জস্যে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদ্রাজ্যের যে পশ্চাৎকালিক বৈষম্য—নাগরিকত্ব এবং অনাগরিকত্ব; তাহাও শাসনকর্ত্তৃপক্ষের অলৌকিক

রাজনীতিদক্ষতার গুণে অপনীত হইয়াছিল। সুতরাং রোম পৃথিবীশ্বরী হইয়াছিল।

অন্যত্র এরূপ ঘটে নাই। আমেরিকায় চিরদাসত্বের উচ্ছেদ জন্য সেদিন ঘোরতর আভ্যন্তরিক সমর হইয়া গেল—অস্ত্রাঘাতে ক্ষতচিকিৎসার ন্যায় সামাজিক অনিষ্টের দ্বারা সমাজিক ইষ্টসাধন করিতে হইল। এই চিকিৎসার বড় ডাক্তার দাঁতো এবং রোবস্পীর বৈষম্যের পরিবর্ত্তে সাম্যসংস্থাপনই প্রথম ও দ্বিতীয় ফরাসিস বিপ্লবের উদ্দেশ্য।

কিন্তু সর্ব্বত্র এই কঠোর চিকিৎসার প্রয়োজন হয় নাই। অধিকাংশ দেশেই উপদেষ্টার উপদেশেই সাম্য আদৃত এবং সংস্থাপিত হইয়াছে। অস্ত্রবল অপেক্ষা বাক্যবল গুরুতর—সমরাপেক্ষা শিক্ষা অধিকতর ফলোপধায়িনী। খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্ম বাক্যে প্রচারিত হয়—ইসলামের ধর্ম্ম শস্ত্রসাহায্যে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীতে মুসলমান অল্পসংখ্যক—বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টিয়ানই অধিক।

পৃথিবীতে তিনবার আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। বহুকালান্তর, তিন দেশে তিন জন মহাশুদ্ধাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলে মঙ্গলময় এক মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছেন। সেই মহামন্ত্রের স্থূল মর্ম্ম, "মনুষ্য সকলেই সমান।" এই স্বর্গীয় মহাপবিত্র বাক্য ভূমণ্ডলে প্রচার করিয়া তাঁহারা জগতে সভ্যতা এবং উন্নতির বীজ বপন করিয়াছিলেন। যখনই মনুষ্যজাতি দুর্দ্দশাপন্ন, অবনতির পথারূঢ় হইয়াছে, তখনই এক মহাত্মা মহাশব্দে কহিয়াছেন, "তোমরা সকলেই সমান—পরস্পর সমান ব্যবহার কর।" তখনই দুর্দ্দশা ঘুচিয়া সুদশা হইয়াছে, অবনতি ঘুচিয়া উন্নতি হইয়াছে।

প্রথম, শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব। যখন বৈদিকধর্ম্মসঞ্জাত বৈষম্যে ভারতবর্ষ পীড়িত, তখন ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের উদ্ধার করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে যত প্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালিক বর্ণ-বৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই। অন্য বর্ণ অবস্থানুসারে বধ্য—কিন্তু ব্রাহ্মণ শত অপরাধেও অবধ্য। ব্রাহ্মণে তোমার সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট করুক; তুমি ব্রাহ্মণের কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তোমরা ব্রাহ্মণের চরণে লুটাইয়া তাঁহার চরণরেণু শিরোদেশে গ্রহণ কর—কিন্তু শূদ্র অস্পৃশ্য। শূদ্রস্পৃষ্ট জল পর্য্যন্ত অব্যবহার্য্য। এ পৃথিবীর কোন সুখে শূদ্র অধিকারী নহে, কেবল নীচবৃত্তি তাহার অবলম্বনীয়। জীবনের জীবন যে বিদ্যা, তাহাতে তাহার অধিকার নাই। সে শাস্ত্রে বদ্ধ, অথচ শাস্ত্র যে কি, তাহা তাহার স্বচক্ষে দেখিবার অধিকার নাই. তাহার নিজ পরকালও ব্রাহ্মণের হাতে। ব্রাহ্মণ যাহা বলিবেন, তাহা করিলেই পরকালের গতি, নহিলে গতি নাই। ব্রাহ্মণ যাহা করাইবেন, তাহা করিলেই পরকালের গতি, নহিলে গতি নাই। ব্রাহ্মণকে দান করিলেই পরকালের গতি, কিন্তু শূদ্রের সেই দান গ্রহণ করিলে ও ব্রাহ্মণ পতিত। ব্রাহ্মণের সেবা করিলেই শূদ্রের পরকালে গতি। অথচ শূদ্রও মনুষ্য, ব্রাহ্মণও মনুষ্য। প্রাচীন ইউরোপের বন্দী এবং প্রভুমধ্যে যে বৈষম্য, তাহাও এমন ভয়ানক নহে। অদ্যাপি ভারতবর্ষবাসীরা কোন গুরুতর বৈষম্যের কথায় উদাহরণস্বরূপ বলে, "বামনশূদ্র তফাৎ।"

এই গুরুতর বর্ণ-বৈষম্যের ফলে ভারতবর্ষ অবনতির পথে দাঁড়াইল। সকল উন্নতির মূল জ্ঞানোন্নতি। পশ্বাদিবৎ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ভিন্ন পৃথিবীর এমন কোন একটি সুখ তুমি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারিবে না, যাহার মূল জ্ঞানোন্নতি নহে। বর্ণ-বৈষম্যে জ্ঞানোন্নতির পথরোধ

হইল। শূদ্র জ্ঞানালোচনায় অধিকারী নহে; একমাত্র ব্রাহ্মণ তাহার অধিকারী। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক ব্রাহ্মণেতরবর্ণ। অতএব অধিকাংশ লোক মূর্খ হইল। মনে কর, যদি ইংলণ্ডে এরূপ নিয়ম থাকিত যে, রসেল, কাবেন্দিষ, স্ট্যান্লি প্রভৃতি কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বংশের লোক ভিন্ন আর কেহ বিদ্যার আলোচনা করিতে পারিবে না, তাহা হইলে ইংলণ্ডের এ সভ্যতা কোথায় থাকিত? কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানবিৎ দূরে থাকুক, ওয়াট্ ষ্টিবিন্‌সন, আর্করাইট্, কোথায় থাকিত? ভারতবর্ষে প্রায় তাহাই ঘটিয়াছিল। কিন্তু কেবল তাহাই নহে। অনন্যসহায় ব্রাহ্মণেরা যে বিদ্যার আলোচনা একাধিকার করিলেন, তাহাও বর্ণ-বৈষম্য-দোষে কুফলপ্রদা হইয়া উঠিল। সকল বর্ণের প্রভু হইয়া, তাঁহারা বিদ্যাকে প্রভুত্বরক্ষণীরূপে নিযুক্ত করিলেন। বিদ্যার যেরূপ আলোচনায় সেই প্রভুত্ব বজায় থাকে, যাহাতে তাহার আরও বৃদ্ধি হয়, যাহাতে অ' বর্ণ আরও প্রণত হইয়া ব্রাহ্মণ-পদরজ ইহজন্মের সারভূত করে, সেইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। আরও যাগ-যজ্ঞের সৃষ্টি কর, আরও মন্ত্র,দান, দক্ষিণা, প্রায়শ্চিত্ত বাড়াও, আরও দেবতার মহিমাপূর্ণ মিথ্যা ইতিহাস কল্পনা করিয়া এই অপ্স ।-নূপুরনিক্বণনিন্দিত মধুর আর্য্যভাষায় গ্রন্থিত কর, ভারতবাসীদিগের মূর্খতাবন্ধন আরও আঁটিয়া বাঁধ। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সে সবে কাজ কি? সেদিকে মন দিও না। অমুক ব্রাহ্মণখানির কলেবর বাড়াও—নূতন উপনিষদখানি প্রচার কর ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, উপনিষদের উপর উপনিষদ,আরণ্যকের উপর আরণ্যক, সূত্রের উপর সূত্র,তার উপর ভাষ্য; তার টীকা; তার টীকা; তার ভাষ্য অনন্তশ্রেণী—বৈদিক ধর্ম্মের গ্রন্থে ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন কর। বিদ্যা?—তাহার নাম ভারতবর্ষে লুপ্ত হউক্!

লোক বিষন্ন, ব্যস্ত, শঙ্কিত হইল। ব্রাহ্মণেরা দেখেন, সকল কাজেই পাপ—সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত কঠিন। তবে কি বিপ্রেতর বর্ণের পাপ হইতে মুক্তি নাই—পারত্রিক সুখ কি এতই দুর্লভ? লোক কোথায় যাইবে? কি করিবে? এ ধর্ম্মশাস্ত্র-পীড়া হইতে কে উদ্ধার করিবে? সর্ব্বসুখ-নিরোধকারী ব্রাহ্মণের হাত হইতে কে রক্ষা করিবে? ভারতবাসীকে কে জীবন দান করিবে?

তখন বিশুদ্ধাত্মা শাক্যসিংহ অনন্তকালস্থায়ী মহিমা বিস্তার পূর্ব্বক, ভারতাকাশে উদিত হইয়া, দিগন্তপ্রধাবিত রবে বলিলেন, "আমি এ উদ্ধার করিব। আমি তোমাদিগের উদ্ধারের বীজমন্ত্র বলিয়া দিতেছি, তোমরা সেই মন্ত্র সাধন কর। তোমরা সবই সমান। ব্রাহ্মণ শূদ্র সমান। মনুষ্যে মনুষ্যে সকলেই সমান। সকলেই পাপী, সকলেরই উদ্ধার সদাচরণে। বর্ণ-বৈষম্য মিথ্যা। কে রাজা, কে প্রজা, সব মিথ্যা। ধর্ম্মই সত্য। মিথ্যাত্যাগ করিয়া সকলেই সত্যধর্ম্ম পালন কর।"

বৈষম্য-পীড়িত ভারত এ মহামন্ত্র শুনিয়া হিমগিরি হইতে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত বিচলিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত হইল—বর্ণ-বৈষম্য কতকদূর বিলুপ্ত হইল। প্রায় সহস্র বৎসর ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত রহিল। পুরাবৃত্তজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে, সেই সহস্র বৎসরই ভারতবর্ষের প্রকৃত সৌষ্ঠবের সময়। যে সকল সম্রাট্ হিমালয় হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত যথার্থই একচ্ছত্রে শাসিত করিয়াছেন—অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, শিলাদিত্য প্রভৃতি—এই কালমধ্যেই তাঁহাদিগের অভ্যুদয়। এই সময়েই তক্ষশীলা হইতে তাম্রলিপ্তি পর্য্যন্ত, বহুজনসমাকীর্ণ মহাসমৃদ্ধিশালিনী সহস্র সহস্র নগ-

রীতে ভারতবর্ষ পরিপূরিত হইয়াছিল। এই সময়েই ভারতবর্ষের গৌরব পশ্চিমে রোমকে, পূর্ব্বে চীনে গীত হইয়াছিল—তদ্দেশীয় রাজারা ভারতবর্ষীয় সম্রাট্‌দিগের সহিত রাজনৈতিক সখ্যে বদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মপ্রচারকেরা ধর্ম্মপ্রচারে যাত্রা করিয়া অর্দ্ধেক আসিয়া ভারতীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শিল্পবিদ্যার যে এই সময়ে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। দর্শনশাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন বৌদ্ধোদয়ের আনুসঙ্গিক বলিয়া বোধ হয়। বিজ্ঞান-সাহিত্যের বিশেষ অনুশীলনের কালনিরূপণ করা কঠিন, কিন্তু শাক্যসিংহের সম্পাদিত ধর্ম্মবিপ্লবের সহিত যে সে সকলের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় সাম্যাবতার যীশুখ্রীষ্ট। যে সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়, তখন ইউরোপ ও পশ্চিম আসিয়া রোমকরাজ্যভুক্ত। রোমের সৌষ্ঠবদিবসের অপরাহ্ণ উপস্থিত। তখন রোম আর যুদ্ধবিশারদ বীরপ্রসবিনী নহে, অমিত-ধনশালী ভোগাসক্ত ইন্দ্রিয়পরবশ "বাবু"-দিগের আবাস। যাঁহাদিগের আমোদ কেবল রণক্ষেত্রেই ছিল, তাঁহারা এক্ষণে কেবল আহারে, দাসীসংসর্গে, এবং রঙ্গভূমের কৃত্রিম যুদ্ধে আমোদ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। যে দেশবাৎসল্যগুণে রোম নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়াছিল। যে সমসামাজিকতার জন্য আমরা রোমের প্রশংসা করিয়াছি, যে সমসামাজিকতার গুণে রোম পৃথিবীশ্বরী হইয়াছিল, তাহা লুপ্ত হইতে লাগিল। আমরা পূর্ব্বে রোমনগরীর কথা বলিয়াছি—এক্ষণে রোমক-সাম্রাজ্যের কথা বলিতেছি। রোমকসামাজ্যে চিরদাসত্বজনিত বৈষম্য সাংঘাতিক রোগস্বরূপ প্রবেশ করিয়াছিল। এক এক ব্যক্তির সহস্র সহস্র চিরদাস থাকিত। প্রভুর অকরণীয় সমুদায় কার্য্য সেই সকল দাসের দ্বারা হইত। ভূমিকর্ষণ, গার্হস্থ্য ভৃত্যের কার্য্য, শিল্পকার্য্যাদি চিরদাসগণের দ্বারা নির্ব্বাহ হইত। তাহারা গোরু-বাছুরের ন্যায় ক্রীত-বিক্রীত হইত। গোরু-বাছুরের উপর প্রভুর যেরূপ অধিকার, দাসের উপরও সেইরূপ অধিকার ছিল। প্রভু মারিলে মারিতে পারিতেন, কাটিলে কাটিতে পারিতেন, বধ করিলেও দণ্ডনীয় হইতেন না। প্রভুর আজ্ঞায় দাস রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়া সিংহ-ব্যাঘ্রাদি পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইত—প্রভু তামাসা দেখিতেন। রোমক-সাম্রাজ্যের লোক দুই ভাগে বিভক্ত—প্রভু এবং দাস। এক ভাগ অনন্তভোগাসক্ত—আর এক ভাগ অনন্ত দুর্দ্দশাপন্ন।

কেবল এই বৈষম্য নহে। সম্রাট্ স্বেচ্ছাচারী। তাঁহার ক্ষমতা ও প্রতাপের সীমা ছিল না। নীরো নগরে অগ্নি লাগাইয়া বীণাবাদনপূর্ব্বক রঙ্গ দেখিয়াছিলেন। কালিগুলা আপন অশ্বকে কনসলের পদে বরণ করিলেন। ইলিয়গেবলসের স্বেচ্ছাচারিতা বর্ণনা করিতে লজ্জা করে। যে হউক না কেন, যত বড় লোক হউন না কেন, সম্রাটের ইচ্ছামাত্রে তিনি বধ্য,—বিনা কারণে, বিনা প্রয়োজনে, বিনা বিচারে, তিনি বধ্য। আবার সেই সম্রাটের উপর সম্রাট্ প্রেটরীয় সৈনিক। তাহারা আজ যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে সম্রাট্ করে—কাল সে সম্রাট্‌কে বধ করিয়া অন্যকে রাজা করে। রোমক-সাম্রাজ্য তাহারা আলু-পটলের মত ক্রয়-বিক্রয় করে। রোমকে তাহারা যাহা মনে করে, তাহাই করে। সুবায় সুবায় সুবাদারেরা স্বেচ্ছাচারী। যাহার শক্তি আছে, সেই স্বেচ্ছাচারী। যেখানে স্বেচ্ছাচার প্রবল সেখানে বৈষম্যও প্রবল।

এই সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্ম রোমক-সাম্রাজ্যমধ্যে

প্রচারিত হইতে লাগিল। খৃষ্টের উচ্চারিত মহতী বাণী লোকের মর্ম্মভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি বলিয়াছিলেন, মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃসম্বন্ধ। সকল মনুষ্যই ঈশ্বরসমক্ষে তুল্য। বরং যে পীড়িত, দুঃখী, কাতর, সেই ঈশ্বরের অধিক প্রিয়। এই মহাবাক্যে বড়-মানুষের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল—প্রভুর গর্ব্ব খর্ব্ব হইল—অঙ্গহীন ভিক্ষুকও সম্রাটের অপেক্ষা বড় হইল। তিনি বলিয়াছিলেন, ইহলোকে আমার রাজত্ব নহে—ঐহিক সুখ সুখে নহে—ঐহিক প্রাধান্য প্রাধান্য নহে। পৃথিবীতে দুই বার দুইটি বাক্য উক্ত হইয়াছে,—তাহাই নীতিশাস্ত্রের সার, তদতিরিক্ত নীতি আর কিছুই নাই। একবার আর্য্যবংশীয় ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে বলিয়াছিলেন, "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ", দ্বিতীয়বার জেরুসলেমের পর্ব্বতশিখরে দাঁড়াইয়া য়ীহুদাবংশীয় যীশু বলিলেন, "অন্যের নিকট তুমি যে ব্যবহারের কামনা কর, অন্যের প্রতি তুমি সেই ব্যবহার করিও।" এই দুইটি বাক্যের ন্যায় মহৎ বাক্য ভূমণ্ডলে আর কখন উক্ত হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই বাক্য সাম্য-তত্ত্বের মূল।

এই সকল তত্ত্ব ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তি বলিয়া পরিগৃহীত হইতে লাগিলে, দাসের বন্ধন শৃঙ্খল মোচন হইতে লাগিল। ভোগাভিলাষী ভোগা-ভিলাষ ত্যাগ করিতে লাগিল। তৎপ্রসাদে রোমকে বর্ব্বরে মিলিত হইয়া, মহাতেজস্বী, উন্নতিশীল, যুদ্ধদুর্ম্মদ জাতি সকল সঞ্জাত হইল। তাহারাই আধুনিক ইউরোপীয়-দিগের পূর্ব্বপুরুষ। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ন্যায় লৌকিক উন্নতি পৃথিবীতে কখন হয় নাই, বা হইবে, এমত ভরসা পূর্ব্বগামী মনুষ্যেরা কখন করেন নাই। ইহা যে কেবল খৃষ্ট-ধর্ম্মের ফল, এমত নহে, ইহার অনেক কারণ আছে—কিন্তু প্রধান কারণ খ্রীষ্টীয় নীতি এবং গ্রাক্ সাহিত্য এবং দর্শন; এবং খৃষ্ট-ধর্ম্মে যে কেবল সুফলই ফলিয়াছে, এমত নহে। ইষ্ট এবং অনিষ্ট উভয়বিধ ফলই ফলিয়াছিল। খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম সাম্যাত্মক হইলেও পরিণামে তৎফলে একটি গুরুতর বৈষম্য জন্মিয়াছিল। ধর্ম্মযাজকদিগের অত্যন্ত প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইয়াছিল। স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি কয়েকটি ইউরোপীয় রাজ্যে এই বৈষম্য বড় গুরুতর হইয়াছিল। বিশেষ ফ্রান্সে তৎসহিত উচ্চ শ্রেণী এবং অধঃশ্রেণীর মধ্যে ঈদৃশ গুরুতর বৈষম্য জন্মিয়াছিল যে, সেই বৈষম্যের ফলে ফরাসী মহাবিপ্লব ঘটিয়াছিল। সেই মথিত সাগরের একজন মন্থনকর্ত্তা ছিলেন—তিনিই তৃতীয়বারের একজন সাম্যতত্ত্ব-প্রচারকর্ত্তা। তৃতীয় সাম্যাবতার রূসো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স রাজ্যের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনীয় নহে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে তাহার বর্ণনায় স্থান নাই, প্রয়োজনও নাই। জগদ্বিখ্যাত, বাক্যবিশারদ, পুরাবৃত্তজ্ঞ, সূক্ষ্মদর্শী বহুসংখক লেখক তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ বর্ণনা করিয়াছেন; সেই সকল বর্ণনা সকলেরই অনায়াসপাঠ্য। দুই একটা বলিলেই আমাদিগের উদ্দেশ্যসাধন হইবে।

কার্লাইল ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন যে, "যে আইন অনুসারে একজন ভূম্যধিকারী মৃগয়া হইতে আসিয়া দুইজন দাস বধ করিয়া তাহা-দিগের রক্তে পদপ্রক্ষালন করিতে পারিতেন, সে আইন ইদানীং আর প্রচলিত ছিল না।" ইদানীং প্রচলিত ছিল না! তবে পূর্ব্বে ছিল! পঞ্চাশবৎসর-মধ্যে শারলোয়ার ন্যায় কোন ব্যক্তি স্থপতিদিগকে গুলী করিয়া, তাহারা কি প্রকারে ছাদের উপর হইতে গড়াইয়া পড়ে,

দেখিয়া আনন্দলাভ করে নাই।” সেরাজ উদ্দৌলা দেশের অধিপতি ছিলেন; শায়োলোয়া উচ্চশ্রেণীর প্রজামাত্র।

এই ব্যঙ্গোক্তিতেই তাৎকালিক ফরাসীদিগের মধ্যে কি অচিন্তনীয় বৈষম্য জন্মিয়া ছিল,তাহা বুঝা যাইবে। পঞ্চদশ লুই প্রমোদামুরক্ত, বৃথাভোগাসক্ত, ব্যয়শৌণ্ড, স্বার্থপর রাজা ছিলেন। তাঁহার উপপত্নীগণের পরিতুষ্টির জন্য অনন্ত ধনরাশির আবশ্যক। মাদাম পোম্পাডুর ও মাদাম্ ডুবারি যে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা পরিণীতা রাজমহিষীর নিষ্কলঙ্ক কপালেও ঘটে না। মাদাম ডুবারির একটি বানরবৎ কাফ্রি খানসামা ছিল; সে এক স্থানের শাসনকর্তৃত্বপদে নিযুক্ত হইয়াছিল—মাদামের আজ্ঞা! লুইর বিলাসভবনের বর্ণনা শুনিলে ইন্দ্রপ্রস্থের দৈবশক্তিনির্ম্মিতা পাণ্ডবীয়া পুরীর সঙ্গে তুলনা করা যায়—সেই সকল প্রমোদমন্দিরে যে উৎসব হইত, কিসের সঙ্গে তাহার তুলনা করিব? জলবৎ অর্থব্যয়—এ দিকে রাজকোষ শূন্য। রাজকোষ শূন্য, এবং প্রজাবর্গমধ্যে অন্নাভাবে হাহাকার রব আকাশমধ্যে উঠিতেছিল। রাজকোষ শূন্য—প্রজামধ্যে অন্নভাবে হাহাকার রব—তবে এ সভাপর্ব্বের রাজসূয়, এ নন্দনকাননের ঐন্দ্রবিলাস—এ সকল অর্থসাধ্য ব্যাপার সম্পন্ন হয় কোথা হইতে? সেই অন্না ভাবপীড়িত প্রজার জীবনোপায় অপহরণ করিয়া। পিষ্টকে পেষণ করিয়া—শুষ্ককে শোষণ করিয়া, দগ্ধকে দাহন করিয়া ডুবারি কুলকলঙ্কিনীর অলকদাম রত্নরাজিতে শোভিত হয়। আর বড়মানুষেরা? তাহারা এক কপর্দ্দক রাজকোষে অর্পণ করে না, কেবল রাজপ্রসাদ ভোগ করে। রাজপ্রসাদ অজস্র, অনন্ত অপরিমিত—যে যত পায়, গ্রহণ করে, কেন না, তাহা পিষ্টপেষণলব্ধ। কিন্তু রাজপ্রসাদভোগীরা কপর্দ্দক মাত্র রাজকোষে দেয় না। বড়মানুষে কর দেয় না ধর্ম্মযাজকেরা কর দেয় না, রাজপুরুষেরা কর দেয় না—কেবল দীন-দুঃখী কৃষকেরা কর দেয়। তাহার উপর করসংগ্রহকাদিগের অত্যাচার। মিশালা বলেন, “কর আদায় এক প্রকার প্রণালীবদ্ধ যুদ্ধের ন্যায় ছিল। তাহার দ্বারা দুই লক্ষ নিষ্কর্ম্মা ভূমিকে প্রপীড়িত করিত। এই পঙ্গপালের রাশি, সর্ব্বগ্রাস,সর্ব্বনাশ করিত। এই প্রকারে পরিশোষিত প্রজাদিগের নিকট আরও আদায় করিতে হইলে, সুতরাং নিষ্ঠুর রাজব্যবস্থা, ভয়ঙ্কর দণ্ডবিধি, নাবিক দাসত্ব,ফাঁসিকাঠ, পীড়নযন্ত্র প্রভৃতির আবশ্যক হইল।” রাজকর ইজারা বন্দোবস্ত ছিল; ইজারাদারের এমন অধিকার ছিল যে, শস্ত্রাঘাতাদির দ্বারা রাজস্ব আদায় করে। তাহারা তজ্জন্য প্রজাবধ পর্য্যন্ত করিত। একদিকে রম্যোদ্যান, বনবিহার, নৃত্যগীত, পরস্ত্রীর সহিত প্রণয়, হাস্যপরিহাস, অনন্ত প্রমোদ, চিন্তাশূন্যতা,—আর একদিকে দারিদ্র্য, অনাহার,পীড়া, নিরপরাধে নাবিক দাসত্ব, ফাঁসিকাঠ, প্রাণবধ! পঞ্চদশ লুইর রাজ্যকালে ফ্রান্সদেশে এইরূপ গুরুতর বৈষম্য। এই বৈষম্য দর্য্য, অপরিশুদ্ধ রাজশাসনপ্রণালীজনিত। রুসোর গুরুতর প্রহারে সেই রাজ্য ও রাজশাসনপ্রণালী ভগ্নমূল হইল। তাঁহার মানস-শিষ্যেরা তাহা চূর্ণীকৃত করিল।

শাক্যসিংহ এবং যীশুখৃষ্ট পবিত্র সত্যকথা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। এজন্য মনুষ্যলোকে তাঁহারা যে দেবতা বলিয়া পূজিত, ইহা যথাযোগ্য। রুসো তাঁহাদের সমকক্ষ ব্যক্তি নহেন। অবিমিশ্র বিমল সত্যই যে তাঁহা কর্ত্তৃক ভূমণ্ডলে প্রচারিত হইয়াছিল, এমত নহে। তিনি মহিমাময় লোকহিতকর নৈতিক সত্যের সহিত অনিষ্টকারক মিথ্যা মিশাইয়া, সেই মিশ্র পদার্থকে আপনার অদ্ভুত বাগিন্দ্রজালের গুণে লোকবিমোহিনীশক্তি দিয়া, ফরাসী-

দিগের হৃদয়াধিকারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। একে কথাগুলি কালোপযোগিনী, তাহাতে রুসো বাক্‌শক্তিতে যথার্থ ঐন্দ্রজালিক, তাঁহার প্রেরিত সৎকথানুসারিণী ভ্রান্তিও ফরাসীদিগের জীবনযাত্রার একমাত্র বীজমন্ত্র বলিয়া গৃহীত হইল। সকল ফরাসী তাঁহার মানসশিষ্য হইল। তাহারা সেই শিক্ষার গুণে ফরাসীবিপ্লব উপস্থিত করিল।

রুসোরও মূল কথা,সাম্যপ্রাকৃতিক নিয়ম। স্বাভাবিক অবস্থায় সকল মনুষ্য সমান। সভ্যতার ফলে বৈষম্য জন্মে, কিন্তু বৈষম্য জন্মে বলিয়া, রুসো সভ্যতাকে মনুষ্যজাতির গুরুতর অমঙ্গল বিবেচনা করেন। তিনি ইহাও স্বীকার করেন যে, মনুষ্যে মনুষ্যে নৈসর্গিক বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেও সভ্যতার দোষে—সভ্যতাজনিত ভোগাসক্তি পাপানুরক্তি এবং সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম বিচারের ফল। অসভ্যাবস্থায় সকল মনুষ্যের সমভাবে শারীরিক পরিশ্রমের আবশ্যক হয়; এজন্য সকলেরই সমভাবে শরীরপুষ্টি হয়; নীরোগ শরীরের ফল নীরোগ মন। যখন মনুষ্যগণ বন্যাবস্থায়, কাননে কাননে মৃগয়া করিয়া বেড়াইত, বৃক্ষতলে বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইত,অল্পমাত্র ভাষাশক্তিসম্পন্ন, এজন্য বাগ্বৈদগ্ধ্য জানিত না; যে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই, যে লোভের তৃপ্তি নাই, যে বাসনার পূরণ নাই, তাহার কিছুই জানিত না; ইহাকে ভালবাসিব, উহাকে বাসিব না; এ আপন, ও পর,এ স্ত্রী, ও পরস্ত্রী এ সকল বুঝিত না—সেই অবস্থাকে স্বর্গীয় সুখ মনে করিয়া, মনুষ্যজাতিকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, "এই অপূর্ব্ব চিত্র দেখ! ইহার সহিত এখনকার দুঃখপূর্ণ, পাপপূর্ণ সভ্যাবস্থায় তুলনা কর!"

যেই মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে, সেই মনুষ্য মাত্রের সমান—নৈসর্গিক প্রকৃতিতে সমান এবং সম্পত্তির অধিকারিত্বেও সমান। এই পৃথিবীর ভূমিতে রাজার যে প্রাকৃতিক অধিকার, ভিক্ষুকেরও সেই অধিকার। ভূমি সকলেরই—কাহারও নিজস্ব নহে। যখন বলবানে দুর্ব্বলকে অধিকারচ্যুত করিতে লাগিল,তখনই সমাজ-সংস্থাপনের আরম্ভ হইল। সেই অপহরণের স্থায়িত্ববিধানের নাম আইন।

যে ব্যক্তি সর্ব্বাদৌ কোন ভূমিখণ্ড চিহ্নিত করিয়া বলিয়াছিল, "ইহা আমার", সেই সমাজকর্ত্তা। যদি কেহ,তাহাকে উঠাইয়া দিয়া বলিত, "এ ব্যক্তি বঞ্চক, তোমরা উহার কথা শুনিও না, বসুন্ধরা কাহারও নহেন; তৎপ্রসূত শস্য সকলেরই", সে মানবজাতির অশেষ উপকার করিত।

রুসোর এই সকল কথা অতি ভয়ানক। বল্‌টের শুনিয়া বলিয়াছিলেন, এ সকল বদ্‌মায়েসের দর্শনশাস্ত্র। এই সকল কথার অনুবর্ত্তী হইয়া রুসোর মানসশিষ্য প্রুধোঁ বলিয়াছেন যে, অপহরণেরই নাম সম্পত্তি।

জগদ্বিখ্যাত Le Contrat Social নামক গ্রন্থে রুসো এই সকল মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সভ্যাবস্থায় তাদৃশ দোষকীর্ত্তনে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে, অসভ্যাবস্থায় যেখানে সহজজ্ঞানে ধর্ম্ম নির্ণীত হয়, সভ্যাবস্থায় তৎপরিবর্ত্তে ন্যায়ানুভাবকতা সন্নিবেশিত হয়। সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি প্রথমাধিকারীকে অধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু অবস্থাবিশেষে মাত্র— প্রথম, যদি ভূমি পূর্ব্বে অধিকৃত না হইয়া থাকে; দ্বিতীয়, অধিকারী যদি আত্মভরণপোষণের উপযোগী মাত্র ভূমি অধিকার করে, তাহার অধিক না লয়; তৃতীয়, যদি নাম মাত্র দখল না লইয়া কর্ষণাদির দ্বারা দখল লওয়া হয়,তবে অধিকৃত ভূমি অধিকারীর সম্পত্তি।

Le Contrat Social গ্রন্থের স্থূলোদ্দেশ্য

এই যে, সমাজ সমাজভুক্তদিগের সম্মতিসৃষ্ট। যেমন পাঁচজন ব্যবসাদার মিলিয়া, পরস্পরে কতকগুলি নিয়মের দ্বারা বদ্ধ হইয়া, একটি জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী সৃষ্ট করেন, রূসোর মতে সমাজ, রাজ্য, শাসন, এ সকল সেইরূপে লোকের মঙ্গলার্থ লোকের দ্বারা সৃষ্ট। এ কথার ফল অতি গুরুতর। তোমায় আমায় চুক্তি হইয়াছে যে, তুমি আমার জমী চষিয়া দিবে, আমি তোমাকে খাইতে পরিতে দিব, এবং গৃহে স্থান দিব। তুমি যে দিন আমার ভূমিকর্ষণ বন্ধ করিলে,সেই দিন আমি তোমার গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলাম এবং গ্রাসাচ্ছাদন বন্ধ করিলাম। এই কার্য্য ন্যায়সঙ্গত হইল। তেমনি যদি রাজা-প্রজার সম্বন্ধ কেবল চুক্তি মাত্র হয় তবে, প্রজা অত্যাচারী-রাজাকে বলিতে পারে, তুমি চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছ। প্রজার মঙ্গল করিবে, এই অঙ্গীকারে তুমি রাজা; তোমার কার্য্য আমাদের মঙ্গল করা, আমাদের কার্য্য তোমাকে করদান ও তোমার আজ্ঞাপালন। তুমি এখন আর আমাদের মঙ্গল কর না, অতএব আমরাও তোমাকে কর দিব না, বা আজ্ঞাপালন করিব না। তুমি রত্নসিংহাসন হইতে অবতরণ কর।

অতএব যে দিন Le Contrat Social প্রচারিত হইল, সেই দিন ফরাসী রাজার হস্তের রাজদণ্ড ভগ্ন হইল। Le Contrat Social গ্রন্থের চরমফল ষোড়শ লুইর সিংহাসনচ্যুতি, এবং প্রাণদণ্ড। ফরাসী বিপ্লবে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহার মূল এই গ্রন্থে। সেই যজ্ঞে বেদমন্ত্র, এই গ্রন্থের বাণী।

সেই ফরাসীবিপ্লবে রাজা গেল, রাজকুল গেল, রাজপদ গেল, রাজনাম লুপ্ত হইল; সম্ভ্রান্ত লোকের সম্প্রদায় লুপ্ত হইল, পুরাতন খ্রীষ্টিয়-ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্মযাজক-সম্প্রদায় গেল; মাস, বার প্রভৃতির নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইল—অনন্ত-প্রবাহিত শোণিতস্রোতে সকল ধুইয়া গেল। কালে আবার সকলই হইল, কিন্তু যাহা ছিল, তাহা আর হইল না। ফ্রান্স নূতন কলেবর প্রাপ্ত হইল। ইউরোপে নূতন সভ্যতার সৃষ্টি হইল—মনুষ্যজাতির স্থায়ী মঙ্গল সিদ্ধ হইল। রূসোর ভ্রান্ত বাক্যে অনন্তকালস্থায়িনী কীর্ত্তি সংস্থাপিতা হইল। কেন না, সেই ভ্রান্ত বাক্য সাম্যাত্মক—সেই ভ্রান্তির কায়া অর্দ্ধেক সত্যে নির্ম্মিত।

ফরাসীবিপ্লব শমিত হইল, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কিন্তু তুমি সাধারণের, এই কথা বলিয়া রূসো যে মহা বৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন,তাহার নিত্য নূতন ফল ফলিতে লাগিল। অদ্যাপি তাহার ফলে ইউরোপ পরিপূর্ণ। "কম্যুনিজম্" সেই বৃক্ষের ফল। ইণ্টরন্যাশনল, সেই বৃক্ষের ফল। এ সকলের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

এ দেশে এবং অন্য দেশে সচরাচর সম্পত্তি ব্যক্তিবিশেষের। আমার বাড়ী, তোমার ভূমি, তাহার বৃক্ষ। কিন্তু ইহা ভিন্ন আর কোন প্রকার সম্পত্তি হইতে পারে না, এমত নহে। ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি না হইয়া, সর্ব্বলোকসাধারণের সম্পত্তি হইতে পারে। এই সর্ব্বলোকপালিকা বসুন্ধরা কাহারও একার জন্য সৃষ্ট হয় নাই বা দশ পনের জন ভূম্যধিকারীর জন্য সৃষ্ট হয় নাই। অতএব ভূমির উপর সকলেরই সমান অধিকার থাকা কর্ত্তব্য। সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী বাক্‌শক্তির বলে এই কথা রূসো পৃথিবীর মধ্যে আবৃত্তা করাইয়াছিলেন, ক্রমে বিজ্ঞ বিবেচক পণ্ডিতেরা সেই ভিত্তির উপর সম্পত্তি মাত্রেরই সাধারণতা স্থাপন করিবার মত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন।

প্রথম মত এই যে, ভূমি এবং মূলধন, যাহার দ্বারা অন্য ধনের উৎপত্তি হইবে,

তাহা সামাজিক সর্ব্বলোকের সাধারণ সম্পত্তি হউক। যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহা সর্ব্বলোকে সমভাগে বণ্টন করিয়া লউক। ইহাতে বড়লোক ছোটলোক কোন প্রভেদ রহিল না; সকলেই সমান ভাবে পরিশ্রম করিবে। সকলেই সমান ভাগে ধনের অধিকারী। ইহাই প্রকৃত কম্যুনিজম্‌। ইহার প্রচারকর্ত্তা ওয়েন, লুই, ব্লাং এবং কাবে। কিন্তু সাধারণ কম্যুনিষ্ট, বহুশ্রমী, এবং অল্পশ্রমী, কর্ম্মিষ্ঠ এবং অকর্ম্মিষ্ঠ, সকলকেই যেরূপ ধনের সমানভাগী করিতে চাহেন, লুই ব্লাং সে মতাবলম্বী নহেন। তিনি বলেন, শ্রমানুসারে ধনের ভাগ হওয়া কর্ত্তব্য। যে মত সেণ্টসাইমনিজম বলিয়া বিখ্যাত, তাহারও অভিপ্রায় এই যে, সকলেই যে সমভাগে ধনভাগী হইবে, বা সকলেই এক প্রকার পরিশ্রম করিবে বা সকলেই সমান পরিশ্রম করিবে, এমত নহে। যে যেমন পরিশ্রমের উপযুক্ত ও যে, যে কার্য্যের উপযুক্ত, সে তেমনি পরিশ্রম করিবে, ও সেইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। কার্য্যের গুরুত্ব, এবং কর্ম্মকারকের গুণানুসারে বেতন প্রদত্ত হইবে। যে যাহার যোগ্য, তাহাতে তাহাকে নিযুক্ত করিবার জন্য যে প্রকারে পুরস্কৃত হইবে, তাহা নিরূপণ এবং সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বাবধারণ জন্য কতকগুলি কর্ত্তৃপক্ষ থাকিবেন। ভূমি ও ধনোৎপাদক সামগ্রী সকল সাধারণের। ইত্যাদি।

ফুরীরিজম্‌ আর এক প্রকার সাধারণ সম্পত্তির পক্ষতা। কিন্তু এ সম্প্রদায়ের এমন মত নহে যে, ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি থাকিতে পারিবে না। সম্পত্তির বৈশেষিকতা এবং উত্তরাধিকারিতাও ইহাঁদের অনুমত। ইহাঁরা বলেন যে, দুই সহস্র বা তদ্রূপ সংখ্যক লোক একতন্ত্র হইয়া ধনোৎপাদন করিবে। এইরূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ সম্প্রদায়ের দ্বারা ধনোৎপত্তি হইতে থাকিবে। তাহারা আপনাদিগের কর্ত্তৃপক্ষ আপনারা মনোনীত করিবে। মূলধনের পার্থক্য থাকিবে। উৎপন্নধনের মধ্য হইতে প্রথমে কিয়দংশ সমভাবে সকলকে বিতরিত হইবে। যে শ্রমে অপারগ, সেও তাহা পাইবে। যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, শ্রমকারী, মূলধনকারী, এবং কর্ম্মনিপুণদিগের কোন নিয়মিত পরিমাণে তাহা বিভক্ত হইবে। যে যেমন গুণবান্‌, সে তদুপযুক্ত পাইবে। ইত্যাদি।

ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব-সম্বন্ধে মৃত মহাত্মা জন ষ্টুয়ার্ট মিল যাহা বলিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক, কেন না, তাহাও সাম্যতত্ত্বের অন্তর্গত। যিনি উপার্জ্জনকর্ত্তা, উপার্জ্জিত সম্পত্তিতে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার, ইহা মিল স্বীকার করেন। যে যাহা আপন পরিশ্রমে বা গুণে উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহা অপর্য্যাপ্ত হইলেও তাহার যাবজ্জীবন ভোগ্য এবং তাহার জীবনান্তেও যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিয়া যাইবার তাহার অধিকার আছে। কিন্তু যদি আপন জীবনান্তে সে কাহাকেও না দিয়া যায়, তবে তাহার ত্যক্তসম্পত্তি একা ভোগ করিবার অধিকার কাহারও নাই। রাম যে সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহাতে দশ, সহস্র লোক প্রতিপালিত হইতে পারে; কিন্তু রাম উপার্জ্জন করিয়াছে বলিয়া সে নয় সহস্র নয় শত নিরানব্বই জনকে বঞ্চিত করিয়া, একা ভোগের অধিকারী বটে। জীবনান্তে স্বেচ্ছাক্রমে আপনার পুত্রকে বা অপরকে তাহাতে স্বত্ববান্‌ করিবারও তাহার অধিকার আছে; কিন্তু সে যদি কাহাকেও না দিয়া গেল, তবে কেবল ব্যবস্থার বলে, তাহার পুত্রও কেন একা অধিকারী হয়? অধিকার উপার্জ্জনকর্ত্তার, তাহার পুত্রের নহে। যেখানে অধিকারী বলিয়া যায় নাই যে, আমার পুত্র সকল

ভোগ করিবে, সেখানে পুত্র অধিকারী নহে, সামাজিক লোক সকলেই সমান ভাবে অধিকারী।

তবে পিতা পুত্রকে এই দুঃখময় সংসারে আনিয়াছেন, এজন্য যাহাতে সে কষ্ট না পায়, সুশিক্ষিত হইয়া অভাবাপন্ন না হইয়া যাহাতে সে সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, পিতার এরূপ উপায় করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। পিতৃসম্পত্তির যে অংশ রাখিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, পুত্রের তাহা বিনা দানেও প্রাপ্য। কিন্তু তদধিক এক কড়াও তাহার প্রাপ্য নহে। মিল বলেন, জারজপুত্রের অপেক্ষা অন্য পুত্রের কিছুমাত্র অধিকার নাই—উভয়েই কেবল আত্মরক্ষার উপায়ের অধিকারী। কিন্তু এরূপ যাহা কিছু অধিকার, তাহা সন্তানের। পুত্রের অবর্ত্তমানে জ্ঞাতি প্রভৃতি মৃতের সর্ব্বসম্পত্তিতে একাধিকারী হওয়ার কিছুমাত্র ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই। যাহার সন্তান আছে, তাহার ত্যক্তসম্পত্তি হইতে সন্তানের আবশ্যকীয় ধন রাখিয়া, অবশিষ্ট জনসাধারণের অধিকার হওয়া কর্ত্তব্য। যাহার সন্তান নাই, তাহার সমুদায় সম্পত্তিতেই জনসাধারণের অধিকার হওয়া কর্ত্তব্য। বাস্তবিক উত্তরাধিকারিত্বসম্বন্ধে ন্যায়ানুযায়ী ব্যবস্থা পৃথিবীর কোন রাজ্যে এ পর্য্যন্ত হয় নাই। বিলাতী ব্যবস্থার অপেক্ষা আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র কিছু ভাল; হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা সরা আরও ভাল। কিন্তু সকলই অন্যায়পূর্ণ। এক্ষণে এ সকল কথা অধিকাংশের অগ্রাহ্য, এবং মূর্খের নিকট হাস্যের কারণ। কিন্তু একদিন এইরূপ বিধি পৃথিবীর সর্ব্বত্র চলিবে।

সাম্যতত্ত্বের শেষাংশও এই চিরস্মরণীয় মহাত্মার প্রচারিত। স্ত্রী পুরুষে সমান। এক্ষণে সুশিক্ষায়, বিজ্ঞানে, রাজকার্য্যে, বিবিধ ব্যবসায় একা পুরুষেই অধিকারী—স্ত্রীলোক অনধিকারিণী থাকিবে কেন? মিল বলেন, নারীজাতিও এ সকলের অধিকারী। তাহারা যে পারিবে না, উপযুক্ত নহে, এ সকল চিরপ্রচলিত লৌকিক ভ্রান্তি মাত্র। মিলের এ মত ইউরোপে গ্রাহ্য হইয়া, ফলে পরিণত হইতেছে। আমাদিগের দেশে এ সকল কথা প্রচারিত হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

সাম্যতত্ত্বসম্বন্ধে সার কথা পুনর্ব্বার উক্ত করিতে হইল। মনুষ্যে মনুষ্যে সমান। কিন্তু এ কথার এমত উদ্দেশ্য নহে যে, সকল অবস্থার সকল মনুষ্যই, সকল অবস্থায় সকল মনুষ্যের সঙ্গে সমান। নৈসর্গিক তারতম্য আছে; কেহ দুর্ব্বল, কেহ বলিষ্ঠ; কেহ বুদ্ধিমান্, কেহ বুদ্ধিহীন। নৈসর্গিক তারতম্যে সামাজিক তারতম্য অবশ্য ঘটিবে; যে বুদ্ধিমান্ এবং বলিষ্ঠ, সে আজ্ঞাদাতা, যে বুদ্ধিহীন এবং দুর্ব্বল, সে আজ্ঞাকারী অবশ্য হইবে। রুসোও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সাম্যতত্ত্বের তাৎপর্য্য এই যে, সামাজিক বৈষম্য নৈসর্গিক বৈষম্যের ফল, তাহার অতিরিক্ত বৈষম্য ন্যায়বিরুদ্ধ, এবং মনুষ্যজাতির অনিষ্টকর। যে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহা অনেকগুলি এইরূপ অপ্রাকৃত বৈষম্যের কারণ। সেই ব্যবস্থাগুলির সংশোধন না হইলে, মনুষ্যজাতির প্রকৃত উন্নতি নাই। মিল একস্থানে বলিয়াছেন, এক্ষণকার যত সুব্যবস্থা, তাহা পূর্ব্বতন কুব্যবহারসংশোধক মাত্র। ইহা সত্য কথা। কিন্তু সম্পূর্ণ সংশোধন কালসাপেক্ষ। তাই বলিয়া কেহ না মনে করেন যে, আমি জন্মগুণে বড়লোক হইয়াছি, অন্যে জন্মগুণে ছোটলোক হইয়াছে। তুমি যে উচ্চ কুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার কোন গুণে নহে; অন্য যে নীচকুলে জন্মিয়াছে, সে তাহার দোষে নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার,

নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না; মনে থাকে যেন যে, সেও তোমার ভাই—তোমার সমকক্ষ। যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া, দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে, বঙ্গদেশের কৃষক পরাণমণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ, এবং তাঁহার ভ্রাতা। জন্ম, দোষগুণের অধীন নহে। তাহার অন্য কোন দোষ নাই। যে সম্পত্তি তিনি একা ভোগ করিতেছেন, পরাণ মণ্ডলও তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমরা যদি পরাণ মণ্ডলের কথা পাড়িলাম, তবে তাহার দুঃখের পরিচয় কিঞ্চিৎ সবিস্তারে না দিয়া থাকিতে পারি না। জমীদারের ঐশ্বর্য্য সকলেই জানেন, কিন্তু যাঁহারা সংবাদ-পত্র লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া, বঙ্গসমাজের উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া বেড়ান, তাঁহারা সকলে কৃষকের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন। সাম্যতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া সে বৈষম্য না দেখাইলে কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। যে বসুন্ধরা কাহারও নহে, তাহা ভূম্যধিকারিবর্গ বণ্টন করিয়া লওয়াতে কি ফল ফলিতেছে, তাহা কিছু বলিতে হইল।

যতক্ষণ জমীদার বাবু সাড়ে সাত মহল পুরীর মধ্যে রঙ্গিল সাসীপ্রেরিত স্নিগ্ধালোকে স্ত্রী-কন্যার গৌরকান্তির উপর হীরকদামের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, ততক্ষণ পরাণ মণ্ডল, পুত্রসহিত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট বলদে ভোঁতা হালে তাঁহার ভোগের জন্য চাষকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে। উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণ জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে; কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত নুণ লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় ভূমে, গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে -উহাদের মশা লাগে না। তাহার পরদিন প্রাতে আবার সেই একহাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে—যাইবার সময়, হয় জমীদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয় ত; চষিবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবে, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস—সপরিবারে উপবাস!

পৌষমাসে ধান কাটিয়াই কৃষকে পৌষের কিস্তি খাজানা দিল। কেহ কিস্তি পরিশোধ করিল—কাহার বাকি রহিল। ধান পালা দিয়া, আছড়াইয়া, গোলায় তুলিয়া, সময়মতে হাটে লইয়া গিয়া, বিক্রয় করিয়া, কৃষক সংবৎসরের খাজানা পরিশোধ করিতে চৈত্রমাসে জমীদারের কাছারীতে আসিল। পরাণ মণ্ডলের পৌষের কিস্তি পাঁচ টাকা, চারি টাকা দিয়াছে, এক টাকা বাকি আছে। আর চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা। মোটে চারি টাকা সে দিতে আসিয়াছে। গোমস্তা হিসাব করিয়া বলিলেন, "তোমার পৌষের কিস্তির তিন টাকা বাকি আছে।" পরাণ মণ্ডল অনেক চীৎকার করিল—দোহাই পাড়িল—হায় ত দাখিলা দেখাইতে পারিল, নয় ত না। হয় ত গোমস্তা দাখিলা দেয় নাই, নয় ত চারি টাকা লইয়া দাখিলায় দুই টাকা

তাহার পর আষাঢ় মাসে নববর্ষের শুভ পুণ্যাহ উপস্থিত। পরাণ পুণ্যাহের কিস্তিতে দুই টাকা খাজানা দিয়া থাকে। তাহা ত সে দিল, কিন্তু সে কেবল খাজানা। শুভ পুণ্যাহের দিনে জমীদারকে কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। হয় ত জমীদারেরা অনেক শরিক, প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ নজর দিতে হয়। তাহাও দিল। তাহার পর নায়েব মহাশয় আছেন—তাঁহাকেও কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। পরে গোমস্তা মহাশয়েরা। তাঁহাদের ন্যায্য পাওনা—তাঁহারাও পাইলেন। যে প্রজার অর্থ নজর দিতে দিতে ফুরাইয়া গেল—তাহার কাছে বাকি রাহল। সময়ান্তরে আদায় হইবে।

পরাণ মণ্ডল সব দিয়া থুইয়া ঘরে গিয়া দেখিল, আর আহারের উপায় নাই। এদিকে চাষের সময় উপস্থিত। তাহার খরচ আছে। কিন্তু ইহাতে পরাণ ভীত নহে। এ ত প্রতি বৎসরেই ঘটিয়া থাকে। ভরসা, মহাজন। পরাণ মহাজনের কাছে গেল। দেড়ী সুদে ধান লইয়া আসিল। আবার আগামী বৎসর তাহা সুদ সমেত শুধিয়া নিঃস্ব হইবে। চাষা চিরকাল ধার করিয়া খায়, চিরকাল দেড়ী সুদ দেয়। ইহাতে রাজার নিঃস্ব হইবার সম্ভাবনা, চাষা কোন্ ছার! হয় ত জমীদার নিজেই মহাজন। গ্রামের মধ্যে তাঁহার ধানের গোলা ও গোলাবাড়ী আছে। পরাণ সেইখান হইতে ধান লইয়া আসিল। এরূপ জমীদারের ব্যবসায় মন্দ নহে। স্বয়ং প্রজার অর্থাপহরণ করিয়া, তাহাকে নিঃস্ব করিয়া পরিশেষে কর্জ্জ দিয়া তাহার কাছে দেড়ী সুদ ভোগ করেন। এমত অবস্থায় যত শীঘ্র প্রজার অর্থ অপহৃত করিতে পারেন, ততই তাঁহার লাভ।

সকল বৎসর সমান নহে। কোন বৎসর উত্তম ফসল জন্মে, কোন বৎসর জন্মে না। লিখিয়া দিয়াছে। যাহা হউক, তিন টাকা বাকি না স্বীকার করিলে সে আখিরি কবচ পায় না। হয় ত তাহা না দিলে গোমস্তা সেই তিন টাকাকে তের টাকা করিয়া নালিশ করিবে। সুতরাং পরাণ মণ্ডল তিন টাকা বাকি স্বীকার করিল। মনে কর, তিন টাকাই তাহার যথার্থ দেনা। তখন গোমস্তা সুদ কষিল। জমীদারী নিরিখ টাকায় চারি আনা। তিন টাকা বাকির সুদ বার আনা। পরাণ তিন টাকা বার আনা দিল। পরে চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা দিল। তাহার পর গোমস্তার হিসাবানা। তাহা টাকায় দুই পয়সা। পরাণ মণ্ডল ৩২৲ টাকার জমা রাখে। তাহাকে হিসাবানা ১৲ টাকা দিতে হইল। তাহার পর পার্ব্বণী। নায়েব, গোমস্তা, তহশীলদার, মুহুরি, পাইক, সকলেই পার্ব্বণীর হকদার। মোটের উপর পড়তা গ্রাম হইতে এত টাকা আদায় হইল। সকলে ভাগ করিয়া লইলেন। পরাণ মণ্ডলকে তজ্জন্য আর দুই টাকা দিতে হইল।

এ সকল দৌরাত্ম্য জমীদারের অভিপ্রায়ানুসারে হয় না, তাহা স্বীকার করি। তিনি ইহার মধ্যে ন্যায্য খাজানা এবং সুদ ভিন্ন আর কিছুই পাইলেন না, অবশিষ্ট সকল নায়েব-গোমস্তার উদরে গেল। সে কাহার দোষ? জমীদার যে বেতনে দ্বারবান্ রাখেন, নায়েবেরও সেই বেতন; গোমস্তার বেতন খানসামার বেতন অপেক্ষা কিছু কম। সুতরাং এ সব না করিলে তাহাদের দিনপাত হয় কি প্রকারে? এ সকল জমীদারের আজ্ঞানুসারে হয় না বটে, কিন্তু তাঁহার কার্পণ্যের ফল। প্রজার নিকট হইতে তাঁহার লোকে আপন উদরপূর্ত্তির জন্য অপহরণ করিতেছে, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি কি? তাঁহার কথা কহিবার কি প্রয়োজন আছে?

অতিবৃষ্টি আছে, অনাবৃষ্টি আছে, অকালবৃষ্টি আছে, বন্যা আছে, পঙ্গপালের দৌরাত্ম্য আছে, অন্য কীটের দৌরাত্ম্যও আছে। যদি ফসলের সুলক্ষণ দেখে, তবেই মহাজন কর্জ্জ দেয়; নচেৎ দেয় না। কেন না, মহাজন বিলক্ষণ জানে যে, ফসল না হইলেই কৃষক ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। তখন কৃষক নিরুপায়। অন্নাভাবে সপরিবারে প্রাণে মারা যায়। কখন ভরসার মধ্যে বন্য অখাদ্য ফলমূল, কখন ভরসা "রিলিভ", কখন ভিক্ষা, কখন ভরসা কেবল জগদীশ্বর। অল্পসংখ্যক মহাত্মা ভিন্ন কোন জমীদারই এমন দুঃসময়ে প্রজার ভরসাস্থল নহে। মনে কর, সেবার সুবৎসর। পরাণ মণ্ডল কর্জ্জ পাইয়া দিনপাত করিতে লাগিল।

পরে ভাদ্রের কিস্তি আসিল। পরাণের কিছুই নাই, দিতে পারিল না। পাইক, পিয়াদা, নগদী, হালশাহানা, কোটাল, বা তদ্রূপ কোন নামধারী মহাত্মা তাগাদায় আসিলেন। হয় ত কিছু করিতে না পারিয়া, ভাল মানুষের মত ফিরিয়া গেলেন। নয় ত পরাণ কর্জ্জ করিয়া টাকা দিল। নয় ত পরাণের দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল—সে পিয়াদার সঙ্গে বচসা করিল। পিয়াদা ফিরিয়া গিয়া গোমস্তাকে বলিল,"পরাণ মণ্ডল আপনাকে শালা বলিয়াছে।" তখন পরাণকে ধরিতে তিন জন পিয়াদা ছুটিল। তাহারা পরাণকে মাটী ছাড়া করিয়া লইয়া আসিল। কাছারীতে আসিয়া পরাণ কিছু সুসভ্য গালিগালাজ শুনিল—শরীরেও কিছু উত্তম মধ্যম ধারণ করিল। গোমস্তা তাহার পাঁচগুণ জরিমানা করিলেন। তাহার উপর পিয়াদার রোজ। পিয়াদাদিগের প্রতি হুকুম হইল, উহাকে বসাইয়া রাখিয়া আদায় কর। যদি পরাণের কেহ হিতৈষী থাকে, তবে টাকা দিয়া খালাস করিয়া আনিল; নচেৎ পরাণ একদিন, দুইদিন, তিনদিন, পাঁচদিন, সাতদিন কাছারীতে রহিল। হয় ত পরাণের মা কিংবা ভাই, থানায় গিয়া এজেহার করিল। সব ইন্‌স্পেক্‌টার মহাশয় কয়েদ খালাসের জন্য কন্‌ষ্টেবল পাঠাইলেন। কন্‌ষ্টেবল সাহেব—দিনদুনিয়ার মালিক—কাছারীতে আসিয়া জাঁকিয়া বসিলেন। পরাণ তাঁহার কাছেই বসিয়া—একটু কাঁদা-কাটা আরম্ভ করিল। কন্‌ষ্টেবল সাহেব একটু ধূমধাম করিতে লাগিলেন—কিন্তু কয়েদ খালাসের কোন কথা নাই। তিনিও জমীদারের বেতনভুক্—বৎসরে দুই তিনবার পার্ব্বণী পান, বড় উড়িবার বল নাই। সেদিনও সর্ব্বসুখময় পরমপবিত্রমূর্ত্তি রৌপ্যচক্রের দর্শন পাইলেন। এই আশ্চর্য্য চক্র দৃষ্টিমাত্রেই মনুষ্যের হৃদয়ে আনন্দরসের সঞ্চার হয়—ভক্তি-প্রীতির উদয় হয়। তিনি গোমস্তার প্রতি প্রীত হইয়া থানায় গিয়া প্রকাশ করিলেন, কেহ কয়েদ ছিল না। পরাণ মণ্ডল ফেরেব্বাজ লোক—সে পুকুরধারে তালতলায় লুকাইয়াছিল—আমি ডাক দিবামাত্র সেখান হইতে আসিয়া আমাকে দেখা দিল। মোকর্দ্দমা ফাঁসিয়া গেল।

প্রজা ধরিয়া লইয়া গিয়া, কাছারীতে আটক রাখা, মারপিট করা, জরিমানা করা, কেবল খাজানা বাকির জন্য হয়, এমত নহে। যে সে কারণে হয়। আজি, গোপাল মণ্ডল গোমস্তা মহাশয়কে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া নালিশ করিয়াছে যে, "পরাণ আমাকে লইয়া খায় না।" তখনই পরাণ ধৃত হইয়া আসিল। আজি নেপাল মণ্ডল ঐরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া নালিশ করিল যে,"পরাণ আমার ভগিনীর সঙ্গে প্রসক্তি করিয়াছে",—অমনি পরাণ গ্রেপ্তার হইয়া আবদ্ধ হইল। আজি সংবাদ আসিল, পরাণের বিধবা ভ্রাতৃবধূ গর্ভবতী হইয়াছে",—অমনি পরাণকে ধরিতে লোক ছুটিল। আজ

পরাণ জমীদারের হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নারাজ,অমনি তাহাকে ধরিতে লোক ছুটিল।

গোমস্তা মহাশয় পরাণের কাছে টাকা আদায় করিয়াই হউক,বা জামিন লইয়াই হউক, বা কিস্তিবন্দী করিয়াই হউক, বা সময়ান্তরে বিহিত করিবার আশয়েই হউক, বা পুনর্ব্বার পুলিস আসার আশঙ্কায়ই হউক, বা বহুকাল আবদ্ধ রাখায় কোন ফল নাই বলিয়াই হউক, পরাণ মণ্ডলকে ছাড়িয়া দিলেন। পরাণ ঘরে গিয়া চাষ আবাদে প্রবৃত্ত হইল। উত্তম ফসল জন্মিল। অগ্রহায়ণ মাসে জমীদারের দৌহিত্রীর বিবাহ বা ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্নপ্রাশন। বরাদ্দ দুই হাজার টাকা। মহলে মাঙ্গন চড়িল। সকল প্রজা টাকার উপর ।০ আনা দিবে। তাহাতে পাঁচ হাজার টাকা উঠিবে। দুই হাজার অন্নপ্রাশনের খরচ লাগিবে—তিন হাজার টাকা জমীদারের সিন্দুকে উঠিবে।

যে প্রজা পারিল, সে দিল—পরাণ মণ্ডলের আর কিছুই নাই—সে দিতে পারিল না। জমীদারী হইতে পূরা পাঁচ হাজার টাকা আদায় হইল না। শুনিয়া জমীদার স্থির করিলেন, একবার স্বয়ং মহলে পদার্পণ করিবেন। তাঁহার আগমন হইল—গ্রাম পবিত্র হইল।

তখন বড় বড় কালো কালো পাঁটা আনিয়া মণ্ডলেরা কাছারীর দ্বারে বাঁধিয়া যাইতে লাগিল। বড় বড় জীবন্ত রুই, কাতলা, মৃগাল, উঠানে পড়িয়া ল্যাজ আছড়াইতে লাগিল। বড় বড় কালো কালো বার্ত্তাকু, গোল আলু, কপি, কলাইসুঁটিতে ঘর পূরিয়া যাইতে লাগিল। দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীতের ত কথাই নাই। প্রজাদিগের ভক্তি অচলা, কিন্তু বাবুর উদর তেমন নহে। বাবুর কথা দূরে থাকুক, পাইক পিয়াদার পর্য্যন্ত উদরাময়ের লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল।

কিন্তু সে সকল ত বাজে কথা। আসল কথা, জমীদারকে "আগমনী," "নজর" বা "সেলামী" দিতে হইবে। আবার টাকার অঙ্কে দুই আনা বসিল। কিন্তু সকলে এত পারে না। যে পারিল, সে দিল। যে না পারিল, সে কাছারীতে কয়েদ হইল, অথবা তাহার দেনা বাকির সামিল হইল।

পরাণ মণ্ডল দিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ক্ষেত্রে উত্তম ফসল হইয়াছে। তাহাতে গোমস্তার চোখ পড়িল। তিনি আট আনার ষ্ট্যাম্প খরচ করিয়া,উপযুক্ত আদালতে ক্রোক সহায়তার প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলেন। দরখাস্তের তাৎপর্য্য এই, পরাণ মণ্ডলের নিকট খাজানা বাকি, আমরা তাহার ধান্য ক্রোক করিব। কিন্তু পরাণ বড় দাঙ্গাবাজ লোক, ক্রোক করিলে দাঙ্গা-হেঙ্গামা খুন-জখম করিবে বলিয়া লোক জমায়ত করিয়াছে। অতএব আদালত হইতে পিয়াদা মোকরর হউক। গোমস্তা নিরীহ ভালমানুষ; কেবল পরাণ মণ্ডলের যত অত্যাচার। সুতরাং আদালত হইতে পিয়াদা নিযুক্ত হইল। পিয়াদা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই মায়াময় রৌপ্যচক্রের মায়ায় অভিভূত হইল। দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরাণের ধানগুলি কাটাইয়া জমীদারের কাছারীতে পাঠাইয়া দিল। ইহার নাম ক্রোক-সহায়তা।

পরাণ দেখিল, সর্ব্বস্ব গেল। মহাজনের ঋণও পরিশোধ করিতে পারিব না,জমীদারের খাজানাও দিতে পারিব না, পেটেও খাইতে পাইব না। এত দিন পরাণ সহিয়াছিল, কুমীরের সঙ্গে বাদ করিয়া জলে বাস করা চলে না। পরাণ মণ্ডল শুনিল যে, ইহার জন্য নালিশ চলে। পরাণ নালিশ করিয়া দেখিবে। কিন্তু সে ত সোজা কথা নহে। আদালত এবং বারাঙ্গনার মন্দির তুল্য; অর্থ নহিলে প্রবেশের উপায় নাই। ষ্ট্যাম্পের মূল্য চাই, উকীলের ফিস চাই,আসামী,সাক্ষীর তলবানা চাই,

সাক্ষীর খোরাকী চাই, সাক্ষীদের পারিতোষিক আছে; হয় ত আমীন খরচা লাগিবে এবং আদালতে পিয়াদা ও আমলাবর্গ কিছু কিছুর প্রত্যাশা রাখেন। পরাণ নিঃস্ব।—তথাপি হাল বলদ ঘটি বাটি বেচিয়া আদালতে নালিশ করিল। ইহার অপেক্ষা তাহার গলায় দড়ি দিয়া মরা ভাল ছিল।

অমনি জমীদারের পক্ষ হইতে পালটা নালিশ হইল যে, পরাণ মণ্ডল ক্রোক অদুল করিয়া সকল ধান কাটিয়া লইয়া বিক্রয় করিয়াছে। সাক্ষীরা সকল জমীদারের প্রজা—সুতরাং জমীদারের বশীভূত; স্নেহে নহে—ভয়ে বশীভূত। সুতরাং তাঁহার পক্ষেই সাক্ষ্য দিল। পিয়াদা মহাশয় রৌপ্যমন্ত্রের সেই পথবর্ত্তী। সকলেই বলিল, পরাণ ক্রোক অদুল করিয়া ধান কাটিয়া বেচিয়াছে। জমীদারের নালিশ ডিক্রী হইল, পরাণের নালিশ ডিস্‌মিস হইল। ইহাতে পরাণের লাভ প্রথমতঃ, জমীদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইল, দ্বিতীয়তঃ দুই, মোকর্দ্দমাতেই জমীদারের খরচা দিতে হইল, তৃতীয়তঃ, দুই মোকর্দ্দমাতেই নিজের খরচা ঘর হইতে গেল।

পরাণের আর এক পয়সা নাই, কোথা হইতে এত টাকা দিবে? যদি জমী বেচিয়া দিতে পারিল, তবে দিল; নচেৎ জেলে গেল, অথবা দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

আমরা এমত বলি না যে, এই অত্যাচারগুলিন সকলই একজন প্রজার প্রতি এক বৎসর হইয়া থাকে বা সকল জমীদারই এরূপ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে দেশ রক্ষা হইত না। পরাণ মণ্ডল কল্পিত ব্যক্তি—একটি কল্পিত প্রজাকে উপলক্ষ্য করিয়া, প্রজার উপর সচরাচর অত্যাচারপরায়ণ জমীদারেরা যত প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহা বিবৃত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আজি একজনের উপর একরূপ, কাল অন্য প্রজার উপর অন্যরূপ পীড়ন হইয়া থাকে।

জমীদারদিগের সকল প্রকার দৌরাত্ম্যের কথা যে বলিয়া উঠিতে পারিয়াছি, এমত নহে। জমীদারবিশেষে, প্রদেশবিশেষে, সময়বিশেষে যে কত রকমে টাকা আদায় করা হয়, তাহার তালিকা করিয়া সমাপ্ত করা যায় না। সর্ব্বত্র এক নিয়ম নহে; এক স্থানে সকলের এক নিয়ম নহে; অনেকের কোন নিয়মই নাই, যখন যাহা পারেন, আদায় করেন।

এক্ষণে জমীদারদিগের পক্ষে কয়েকটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে।

প্রথমতঃ, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন। দিন দিন অত্যাচারপরায়ণ জমীদারের সংখ্যা কমিতেছে। কলিকাতাস্থ সুশিক্ষিত ভূস্বামীদিগের কোন অত্যাচার নাই—যাহা আছে, তাহা তাঁহাদিগের অজ্ঞাতে এবং অভিমতবিরুদ্ধে নায়েব গোমস্তাগণের দ্বারায় হয়। মফস্বলেও অনেক সুশিক্ষিত জমীদার আছেন, তাঁহাদিগেরও প্রায় ঐরূপ। বড় বড় জমীদারদিগের অত্যাচার তত অধিক নহে—অনেক বড় বড় ঘরে অত্যাচার একেবারে নাই। সামান্য সামান্য ঘরেই অত্যাচার অধিক। যাঁহার জমীদারী হইতে লক্ষ টাকা আইসে—অধর্ম্মাচরণ করিয়া প্রজাদিগের নিকট আর পঁচিশ হাজার টাকা লইবার জন্য তাঁহার মনে প্রবৃত্তি দুর্ব্বলা হইবারই সম্ভাবনা, কিন্তু যাঁহার জমীদারী হইতে বার মাসে বার শত টাকা আসে না, অথচ জমীদারী চালচলনে চলিতে হইবে, তাঁহার মারপিট করিয়া আর কিছু সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা সুতরাং বলবতী হইবে। আবার যাঁহারা নিজে জমীদার, আপন প্রজার নিকট খাজানা আদায় করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, ইজারাদারের দৌরাত্ম্য

অধিক। আমরা সংক্ষেপানুরোধে উপরে কেবল জমীদার শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। জমীদারী অর্থে করগ্রাহী বুঝিতে হইবে। ইহাঁরা জমীদারকে জমীদারের লাভ দিয়া তাহার উপর লাভ করিবার জন্য ইজারা পত্তনি গ্রহণ করেন, সুতরাং প্রজার নিকট হইতেই তাঁহাদিগকে লাভ পোষাইয়া লইতে হইবে। মধ্যবর্ত্তী তালুকের সৃজন প্রজার পক্ষে বিষম অনিষ্টকর।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা যে সকল অত্যাচার বিবৃত করিয়াছি, তাহার অনেকই জমীদারের অজ্ঞাতে, কখন বা অভিমতবিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি দ্বারা হইয়া থাকে। প্রজার উপর যে কোনরূপ পীড়ন হয়, অনেকেই তাহা জানেন না।

তৃতীয়তঃ, অনেক জমীদারীর প্রজাও ভাল নহে। পীড়ন না করিলে খাজানা দেয় না। সকলের উপর নালিশ করিয়া খাজানা আদায় করিতে গেলে জমীদারের সর্ব্বনাশ হয়। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, প্রজার উপর আগে অত্যাচার না হইলে, তাহারা বিরুদ্ধভাব ধারণ করে না।

যাঁহারা জমীদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাঁহাদিগের বিরোধী। জমীদারদিগের দ্বারা অনেক সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। গ্রামে গ্রামে যে এক্ষণে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে, আপামর সাধারণ সকলেই যে আপন গ্রামে বসিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিতেছে, ইহা জমীদারদিগের গুণে। জমীদারেরা অনেক স্থানে চিকিৎসালয়, রথ্যা, অতিথিশালা ইত্যাদি সৃজন করিয়া সাধারণের উপকার করিতেছেন। আমাদিগের দেশে লোকের জন্য যে ভিন্নজাতীয় রাজপুরুষদিগের সমক্ষে দুটো কথা বলে, সে কেবল জমীদারদের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন—জমীদারদের সমাজ। অতএব জমীদারদিগের কেবল নিন্দা করা, অতি অন্যায়পরতার কাজ। এই সম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন লোকের দ্বারা যে প্রজাপীড়ন হয়, ইহাই তাঁহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক। এই কলঙ্ক অপনীত করা জমীদারদিগেরই হাত। যদি কোন পরিবারে পাঁচ ভাই থাকে, তাহার মধ্যে দুই ভাই দুশ্চরিত্র হয়, তবে আর তিন জনে দুশ্চরিত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের চরিত্রসংশোধন জন্য যত্ন করেন। জমীদার-সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারাও সেইরূপ করুন। সেই কথা বলিবার জন্যই আমাদের এ প্রবন্ধ লেখা। আমরা রাজপুরুষদিগকে জানাইতেছি না—জনসমাজকে জানাইতেছি না, জমীদারদিগের কাছেই আমাদের নালিশ। ইহা তাঁহাদিগের অসাধ্য নহে। সকল দণ্ড অপেক্ষা আপন সম্প্রদায়ের বিরাগ, আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে অপমান সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর, এবং কার্য্যকারী। যত লোক চুরি করিতে ইচ্ছুক হইয়া চৌর্য্যে বিরত, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ প্রতিবাসীদিগেরমধ্যে চোর বলিয়া ঘৃণিত হইবার ভয়ে চুরি করে না; এই দণ্ড যত কার্য্যকারী, আইনের দণ্ড তত নহে। জমীদারের পক্ষে এই দণ্ড জমীদারেরই হাত। অপর জমীদারের নিকট ঘৃণিত, অপমানিত ও সমাজচ্যুত হইবার ভয় থাকিলে অনেক দুর্ব্বৃত্ত জমীদার দুর্ব্বৃত্তি ত্যাগ করিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এ দেশীয় কৃষকদিগের এ দুর্দ্দশা কিসে হইল? এ ঘোরতর সামাজিক বৈষম্য কোথা হইতে জন্মিল? সাম্য নীতি বুঝাইবার জন্য আমরা তাহা সবিস্তারে বলিতেছি।

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে,

বঙ্গদেশের কৃষকের দুর্দ্দশা আজকালি হয় নাই। ভারতবর্ষীয় ইতর লোকের অনুন্নতি ধারাবাহিক; যতদিন হইতে ভারতবর্ষে সভ্যতার সৃষ্টি, প্রায় ততদিন হইতে ভারতবর্ষীয় কৃষকদের দুর্দ্দশার সূত্রপাত। পাশ্চাত্ত্যেরা কথায় বলেন, একদিনে রোমনগরী নির্ম্মিতা হয় নাই। এ দেশের কৃষকদিগের দুর্দ্দশাও দুই এক শত বৎসরে ঘটে নাই। কি কারণে ভারতবর্ষের প্রজা চিরকাল উন্নতিহীন, অদ্য আমরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

জ্ঞানবৃদ্ধিই যে সভ্যতার মূল এবং পরিমাণ, ইহা বক্ল সাহেবের স্থূল কথা। বক্ল বলেন যে, জ্ঞানিক উন্নতি ভিন্ন নৈতিক উন্নতি নাই। সে কথায় আমরা অনুমোদন করি না, কিন্তু জ্ঞানিক উন্নতি যে সভ্যতার কারণ, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানের উন্নতি না হইলে সভ্যতার উন্নতি হইবে না। জ্ঞান আপনি জন্মে না; অতিশয় শ্রমলভ্য। কেহ যদি বিদ্যালোচনায় রত না হয়, তবে সমাজমধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ হইবে না। কিন্তু বিদ্যালোচনার পক্ষে অবকাশ আবশ্যক। বিদ্যালোচনার পূর্ব্বে উদরপোষণ চাই; অনাহারে কেহ জ্ঞানালোচনা করিবে না। যদি সকলকেই আহারান্বেষণে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, তবে কাহারও জ্ঞানালোচনার অবকাশ হয় না। অতএব সভ্যতার সৃষ্টির পক্ষে প্রথমে আবশ্যক যে, সমাজমধ্যে একটি সম্প্রদায় শারীরিক শ্রম ব্যতীত আত্মভরণপোষণে সক্ষম হইবে। অন্যে পরিশ্রম করিবে, তাঁহারা বসিয়া বিদ্যালোচনা করিবেন। যদি শ্রমজীবীরা সকলেই কেবল আত্মভরণপোষণের যোগ্য খাদ্য উৎপন্ন করে, তাহা হইলে এরূপ ঘটিবে না। কেন না, যাহা জন্মিবে, তাহা শ্রমোপজীবিদের সেবায় যাইবে, আর কাহারও জন্য থাকিবে না। কিন্তু যদি তাহারা আত্মভরণপোষণের প্রয়োজনীয় পরিমাণের অপেক্ষা অধিক উৎপাদন করে, তবে তাহাদিগের ভরণপোষণ বাদে কিছু সঞ্চিত হইবে। তদ্দ্বারা শ্রমবিরত ব্যক্তিরা প্রতিপালিত হইয়া বিদ্যানুশীলন করিতে পারেন। তখন জ্ঞানের উদয় সম্ভব। উৎপাদকের খাইয়া পরিয়া যাহা রহিল, তাহাকে সঞ্চয় বলা যাইতে পারে। অতএব সভ্যতার উদয়ের পূর্ব্বে প্রথমে আবশ্যক—সামাজিক ধনসঞ্চয়।

কোন দেশে সামাজিক ধনসঞ্চয় হয়, কোন দেশে হয় না। যেখানে হয়, সে দেশ সভ্য হয়। যে দেশে হয় না, সে দেশ অসভ্য থাকে। কি কি কারণে দেশবিশেষে আদিম ধনসঞ্চয় হইয়া থাকে? দুইটি কারণ সংক্ষেপে নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। প্রথম কারণ, ভূমির উর্ব্বরতা। যে দেশের ভূমি উর্ব্বরা, সে দেশে সহজে অধিক শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং শ্রমোপজীবীদিগের ভরণপোষণের পর আরও কিছু অবশিষ্ট থাকিয়া সঞ্চিত হইবে। দ্বিতীয় কারণ, দেশের উষ্ণতা বা শীতলতা। শীতোষ্ণতার ফল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, যে দেশ উষ্ণ, সে দেশের লোকের অল্পাহার আবশ্যক, শীতল দেশে অধিক আহার আবশ্যক। এই কথা কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়মের উপর নির্ভর করে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিখিবার স্থান নাই; আমরা এতদংশ বক্লের গ্রন্থের অনুবর্ত্তী হইয়া লিখিতেছি; কৌতূহলবিশিষ্ট পাঠক সেই গ্রন্থ দেখিবেন। যে দেশের লোকের সাধারণতঃ অল্প খাদ্যের প্রয়োজন, সে দেশে শীঘ্র যে সামাজিক ধনসঞ্চয় হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উষ্ণতার দ্বিতীয় ফল বক্ল এই বলেন যে, তাপাধিক্য হেতু লোকের শারীরিক তাপজনক খাদ্যের তত আবশ্যক হয় না। যে দেশ শীতল, সে দেশে শারীরিক তাপজনক খাদ্যের অধিক আবশ্যক শারীরিক তাপ। শ্বাসগত বায়ুর অম্লজনের সঙ্গে শরীরস্থ দ্রব্যের কার্ব্বনের

রাসায়নিক সংযোগের ফল। অতএব যে খাদ্যে কার্ব্বন অধিক আছে, তাহাই তাপজনক ভোজ্য। মাংসাদিতেই অধিক কার্ব্বন। অতএব শীতপ্রধান দেশের লোকের মাংসাদির বিশেষ প্রয়োজন। উষ্ণদেশে মাংসাদি অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক—বনজের অধিক আবশ্যক। বনজ সহজে প্রাপ্য—কিন্তু পশুহনন কষ্টসাধ্য, এবং ভোজ্য পশু দুর্লভ। অতএব উষ্ণদেশের খাদ্য অপেক্ষাকৃত সুলভ; খাদ্য সুলভ বলিয়া শীঘ্র ধনসঞ্চয় হয়।

ভারতবর্ষ উষ্ণদেশ, এবং তথায় ভূমিও উর্ব্বরা। সুতরাং ভারতবর্ষে অতি শীঘ্র ধনসঞ্চয় হওয়াই সম্ভব। এই জন্য ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালেই সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল। ধনাধিক্য হেতু, একটি সম্প্রদায় কায়িক পরিশ্রম হইতে অবসর হইয়া, জ্ঞানালোচনায় তৎপর হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অর্জ্জিত ও প্রচারিত জ্ঞানের কারণেই ভারতবর্ষের সভ্যতা। পাঠক বুঝিয়াছেন যে, আমরা ব্রাহ্মণদিগের কথা বলিতেছি।

কিন্তু এইরূপ প্রথমকালিক সভ্যতাই ভারতীয় প্রজার দুরদৃষ্টের মূল। যে যে নিয়মের বশে অকালে সভ্যতা জন্মিয়াছিল, সেই সেই নিয়মের বশেই তাহার অধিক উন্নতি কোন কালেই হইতে পারিল না;—সেই সেই নিয়মের বশেই সাধারণ প্রজার দুর্দ্দশা ঘটিল। প্রভাতেই মেঘাচ্ছন্ন। বালতরু ফলবান্ হওয়া ভাল নহে।

যখন জনসমাজে ধনসঞ্চয় হইল, তখন কাজে কাজেই সমাজ দ্বিভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগ শ্রম করে; এক ভাগ শ্রম করে না। এই দ্বিতীয় ভাগের শ্রম করিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া তাহারা করে না; প্রথম ভাগের উৎপাদিত অতিরিক্ত খাদ্যে তাহাদের ভরণপোষণ হয়। যাহারা শ্রম করে না, তাহারাই কেবল সাবকাশ; সুতরাং চিন্তা, শিক্ষা ইত্যাদিতে তাহাদিগেরই একাধিকার। যে চিন্তা করে, শিক্ষা পায়, অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়, সে অন্যাপেক্ষা যোগ্য, এবং ক্ষমতাশালী হয়। সুতরাং সমাজমধ্যে ইহাদিগেরই প্রধানত্ব হয়। যাহারা শ্রমোপজীবী, তাহারা ইহাদিগের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রম করে। অতএব প্রথমেই বৈষম্য উপস্থিত হইল। কিন্তু এ বৈষম্য প্রাকৃতিক, ইহার উচ্ছেদ সম্ভবে না, এবং উচ্ছেদ মঙ্গলকরও নহে।

বুদ্ধ্যুপজীবীর জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রমোপজীবীরা উপকৃত হয়, পুরস্কারস্বরূপ উহারা শ্রমোপজীবীর অর্জ্জিত ধনের অংশ গ্রহণ করে; শ্রমোপজীবীর ভরণপোষণের জন্য যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত যাহা জন্মে, তাহা উহাদেরই হাতে জমে। অতএব সমাজের যে অতিরিক্ত ধন, তাহা ইহাদেরই হাতে সঞ্চিত হইতে থাকে। তবে, দেশের উৎপন্ন দুই ভাগে বিভক্ত হয়, এক ভাগ শ্রমোপজীবীর, এক ভাগ বুদ্ধ্যুপজীবীর। প্রথম ভাগ, "মজুরির বেতন," দ্বিতীয় ভাগ ব্যবসায়ের "মুনাফা।"* আমরা, "বেতন" ও "মুনাফা," এই দুইটি নাম ব্যবহার করিতে থাকিব। "মুনাফা" বুদ্ধ্যুপজীবীদের ঘরেই থাকিবে। শ্রমোপজীবীরা "বেতন" ভিন্ন মুনাফার কোন অংশ পায় না। শ্রমোপজীবীরা সংখ্যায় যতই হউক না কেন, উৎপন্ন ধনের যে অংশটি বেতন, সেইটিই তাহাদের মধ্যে বিভক্ত হইবে, "মুনাফার" মধ্য হইতে এক পয়সাও তাহারা পাইবে না।

---

* "ভূমির কর" এবং "সুদ" ইহার অন্তর্গত, এ স্থলে বিবেচনা করিতে হইবে। সংক্ষেপাভিপ্রায়ে আমরা কর বা সুদের উল্লেখ করিলাম না।

মনে কর, দেশের উৎপন্ন কোটি মুদ্রা; তন্মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ "বেতন," পঞ্চাশ লক্ষ "মুনাফা।" মনে কর, দেশে পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবী। তাহা হইলে এই পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা "বেতন" পঁচিশ লক্ষ লোকের মধ্যে ভাগ হইবে, প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগে দুই মুদ্রা পড়িবে। মনে কর, হঠাৎ ঐ পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবীর উপর আর পঁচিশ লক্ষ লোক কোথা হইতে আসিয়া পড়িল। তখন পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমোপজীবী হইল। সেই পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রাই ঐ পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে বিভক্ত হইবে। যাহা "মুনাফা," তাহার এক পয়সাও উহাদের প্রাপ্য নহে, সুতরাং ঐ পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রার বেশী এক পয়সাও তাহাদের মধ্যে বিভাজ্য নহে। সুতরাং এক্ষণে প্রত্যেক শ্রমোবজীবীর ভাগ দুই মুদ্রার পরিবর্ত্তে এক মুদ্রা হইবে। কিন্তু দুই মুদ্রাই ভরণপোষণের জন্য আবশ্যক বলিয়াই, তাহা পাইত। অতএব এক্ষণে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্টে বিশেষ দুর্দ্দশা হইবে।

যদি ঐ লোকাগমের সঙ্গে সঙ্গে আর কোটি মুদ্রা দেশের ধনবৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে এ কষ্ট হইত না। পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা বেতন-ভাগের স্থানে লক্ষ মুদ্রা বেতন-ভাগ হইত। তখন লোক বেশী আসাতেও সকলের দুই টাকা করিয়া কুলাইত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি শ্রমোপজীবীদের মহৎ অনিষ্টের কারণ। যে পরিমাণে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি হয়, যদি সেই পরিমাণে দেশেরও ধন বৃদ্ধি পায়, তবে শ্রমোপজীবীদের কোন অনিষ্ট নাই। যদি লোক-সংখ্যাবৃদ্ধির অপেক্ষাও ধনবৃদ্ধি গুরুতর, তবে শ্রমোপজীবীদের শ্রীবৃদ্ধি—যথা, ইংলণ্ড ও আমেরিকায়। আর যদি এই দুইয়ের একও না ঘটিয়া, ধনবৃদ্ধির অপেক্ষা লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি অধিক হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের দুর্দ্দশা। ভারতবর্ষে প্রথমোক্তমেই তাহাই ঘটিল।

লোকসংখ্যাবৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম। এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে অনেক সন্তান জন্মে। তাহার এক একটি সন্তানের আবার অনেক সন্তান জন্মে। অতএব মনুষ্যের দুর্দ্দশা এক প্রকার স্বভাবের নিয়মাদিষ্ট। সকল সমাজেই এই অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। কিন্তু ইহার সদুপায় আছে। প্রকৃত সদুপায়, সঙ্গে সঙ্গে ধন-বৃদ্ধি। পরন্তু যে পরিমাণে প্রজাবৃদ্ধি, সে পরিমাণে ধনবৃদ্ধি প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। ঘটিবার অনেক বিঘ্ন আছে। অতএব উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়। উপায়ান্তর দুইটি মাত্র। এক উপায়, দেশীয় লোকের কিয়দংশের দেশান্তরে গমন। কোন দেশে লোকের অন্নে কুলায় না, অন্যদেশে অন্ন খাইবার লোক নাই। প্রথমোক্ত কতক দেশের লোক শেষোক্ত দেশে যাউক, তাহা হইলে প্রথমোক্ত দেশের লোক-সংখ্যা কমিবে, এবং শেষোক্ত দেশেরও কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। এইরূপে ইংলণ্ডের মহৎ উপকার হইয়াছে। ইংলণ্ডের লোক আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভাগে বাস করিয়াছে। তাহাতে ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, উপনিবেশ-সকলেরও মঙ্গল হইয়াছে।

দ্বিতীয় উপায়, বিবাহপ্রবৃত্তির দমন। এইটি প্রধান উপায়। যদি সকলেই বিবাহ করে, তবে প্রজাবৃদ্ধির সীমা থাকে না। কিন্তু যদি কতক লোক অবিবাহিত থাকে, তবে প্রজাবৃদ্ধির লাঘব হয়। যে দেশে জীবনের স্বচ্ছন্দতা লোকের অভ্যস্ত, যেখানে জীবিকা-নির্ব্বাহের সামগ্রী প্রচুরপরিমাণে আবশ্যক, এবং কষ্টে আহরণীয়, সেখানকার লোকে বিবাহপ্রবৃত্তি দমন করে। পরিবার প্রতি-পালনের উপায় না দেখিলে বিবাহ করে না।

ভারতবর্ষে এই দুইটির একটি উপায়ও

অবলম্বিত হইতে পারে নাই। উষ্ণতা শরীরের শৈথিল্যজনক, পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তিদায়ক। দেশান্তরে গমন উৎসাহ, উদ্‌যোগ এবং পরিশ্রমের কাজ। বিশেষতঃ প্রকৃতিও তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষকে অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত, এবং বাত্যাসঙ্কুল সমুদ্রমধ্যস্থ করিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যবদ্বীপ, এবং বালি উপদ্বীপ ভিন্ন আর কোন হিন্দু উপনিবেশের কথা শুনা যায় না। ভারতবর্ষের ন্যায় বৃহৎ এবং প্রাচীন দেশের এইরূপ সামান্য ঔপনিবেশিকা ক্রিয়া গণনীয় নহে।

বিবাহ-প্রবৃত্তির দমনবিষয়ে ভারতবর্ষের আরও মন্দাবস্থা। মাটী আঁচড়াইলেই শস্য জন্মে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করিলেই শরীরের উপকার হউক না হউক,ক্ষুধানিবৃত্তি এবং জীবনধারণ হয়। বায়ুর উষ্ণতা প্রযুক্ত পরিচ্ছদের বাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। সুতরাং অপকৃষ্ট জীবিকা অতি সুলভ। এমত অবস্থায় পরিবার-প্রতিপালনে অক্ষমতাভয়ে কেহ ভীত নহে। সুতরাং বিবাহপ্রবৃত্তি-দমনে প্রজা পরাঙ্মুখ হইল। প্রজাবৃদ্ধির নিবারণের কোন উপায়ই অবলম্বিত না হওয়াতে তাহার বেগ অপ্রতিহত হইল। কাজে কাজেই সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয়ের পরেই, ভারতীয় শ্রমোপজীবীর দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। যে ভূমির উর্ব্বরতা ও বায়ুর উষ্ণতা হেতুক সভ্যতার উদয়, তাহাতেই জনসাধারণের দুরবস্থার কারণ সৃষ্ট হইল। উভয়ই অলঙ্ঘ্য নৈসর্গিক নিয়মের ফল।

শ্রমোপজীবীর এই কারণে দুর্দ্দশার আরম্ভ। কিন্তু একবার অবনতি আরম্ভ হইলেই, সেই অবনতিরই ফলে আরও অবনতি ঘটে। শ্রমোপজীবীদিগের যে পরিমাণে দুরবস্থা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে তাহাদিগের সহিত সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের তারতম্য অধিকতর হইতে লাগিল। প্রথম, ধনের তারতম্য—তৎফলে অধিকারের তারতম্য। শ্রমোপজীবীরা হীন বলিয়া তাহাদের উপর বুদ্ধ্যুপজীবীদিগের প্রভুত্ব বাড়িতে লাগিল। অধিক প্রভুত্বের ফল অধিক অত্যাচার। এই প্রভুত্বই শূদ্রপীড়ক স্মৃতিশাস্ত্রের মূল। এই বৈষম্যই অস্বাভাবিক, ইহাই অমঙ্গলের কারণ।

আমরা যে সকল কথা বলিলাম, তাহার তিনটি গুরুতর তাৎপর্য্য দেখা যায়।

১। শ্রমোপজীবীদিগের অবনতির যে সকল কারণ দেখাইলাম,তাহার ফল ত্রিবিধ।

প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের অল্পতা,ইহার নামান্তর দারিদ্র্য। ইহা বৈষম্যবর্দ্ধক।

দ্বিতীয় ফল, বেতনের অল্পতা হইলেই পরিশ্রমের আধিক্যের আবশ্যক হয়; কেন না, যাহা কমিল, তাহা খাটিয়া পোষাইয়া লইতে হইবে। তাহাতে অবকাশের ধ্বংস। অবকাশের অভাবে বিদ্যালোচনার অভাব। অতএব দ্বিতীয় ফল মূর্খতা। ইহাও বৈষম্যবর্দ্ধক।

তৃতীয় ফল, বুদ্ধ্যুপজীবীদিগের প্রভুত্ব এবং অত্যাচারবৃদ্ধি। ইহার নামান্তর দাসত্ব। ইহা বৈষম্যের পরাকাষ্ঠা।

দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব।

২। ঐ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়মগুণে স্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয়।

দেখান গিয়াছে যে, ধনসঞ্চয়ই সভ্যতার আদিম কারণ। যদি বলি যে,ধনলিপ্সা সভ্যতাবৃদ্ধির নিত্য কারণ, তাহা হইলে অত্যুক্তি হইবে না। সামাজিক উন্নতির মূলীভূত,মনুষ্যহৃদয়ে দুইটি বৃত্তি; প্রথম,জ্ঞানলিপ্সা, দ্বিতীয়, ধনলিপ্সা। প্রথমোক্তটি মহৎ এবং আদরণীয়; দ্বিতীয়টি স্বার্থসাধক এবং নীচ বলিয়া খ্যাত।

কিন্তু "History of Rationalism in Europe" নামক গ্রন্থে লেকি সাহেব বলেন যে, দুইটি বৃত্তির মধ্যে ধনলিপ্সাই মনুষ্য-জাতির অধিকতর মঙ্গলকর হইয়াছে। বস্তুতঃ জ্ঞান লিপ্সা কদাচিৎক,ধনলিপ্সা সর্ব্বসাধারণ; এজন্য অপেক্ষাকৃত ফলোপধায়ক। দেশের উৎপন্ন ধনে জনসাধারণের গ্রাসাচ্ছাদনের কুলান হই-তেছে বলিয়া সামাজিক ধনলিপ্সা কমে না, সর্ব্বদা নূতন নূতন সুখের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। পূর্ব্বে যাহা নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইত, পরে তাহা আবশ্যকীয় বোধ হয়। তাহা পাইলে আবার অন্য সামগ্রী আবশ্যক বোধ হয়। আকাঙ্ক্ষায় চেষ্টা,চেষ্টায় সফলতা জন্মে। সুতরাং সুখ এবং মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে থাকে। অতএব সুখস্বচ্ছন্দতার আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি সভ্যতাবৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বাহ্য সুখের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইয়া আসিলে জ্ঞানের আকঙ্ক্ষা,সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা, তৎ-সঙ্গে কাব্যসাহিত্যাদির প্রিয়তা এবং নানাবিধ বিদ্যার উৎপত্তি হয়। যখন লোকের সুখ-লালসার অভাব থাকে, তখন পরিশ্রমের প্রবৃত্তি দুর্ব্বলা হয়। উৎকর্ষলাভের ইচ্ছাও থাকে না, তৎপ্রতি যত্নও হয় না। তন্নিবন্ধন যে দেশে খাদ্য সুলভ, সে দেশে প্রজাবৃদ্ধির নিবারণকারিণী প্রবৃত্তি সকলের অভাব হয়। অতএব যে সন্তোষ কবিদিগের অশেষ প্রশংসার স্থান, তাহা সমাজোন্নতির নিতান্ত অনিষ্টকারক; কবিগীতা এই প্রবৃত্তি সামা-জিক জীবনের হলাহল।

লোকের অনিষ্টপূর্ণ সন্তুষ্টভাব, ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক নিয়মগুণে সহজেই ঘটিল। এ দেশে তাপের কারণ অধিককাল ধরিয়া এককালীন পরিশ্রম অসহ্য। তৎকারণ পরিশ্রমে অনিচ্ছা অভ্যাসগত হয়। সেই অভ্যাসের আরও কারণ আছে। উষ্ণদেশে শরীরমধ্যে অধিক তাপের সমুদ্ভবের আবশ্যক হয় না বলিয়া তথাকার লোকে যে মৃগয়াদিতে তাদৃশ রত হয় না, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। বন্যপশু হনন করিয়া খাইতে হইলে পরিশ্রম, সাহস, বল এবং কার্য্যতৎপরতা অভ্যস্ত হয়। ইউরোপীয় সভ্যতার একটি মূল, পূর্ব্বকালীন তাদৃক্ অভ্যাস। অতএব অনাবশ্যকতা, তাহাতে শ্রমে অনিচ্ছা, ইহার পরিণাম আলস্য এবং অনুৎসাহ। অভ্যাসগত আলস্য এবং অনুৎসাহেরই নামান্তর সন্তোষ। অতএব ভারতীয় প্রজার একবার দুর্দ্দশা হইলে, সেই দশাতেই তাহারা সন্তুষ্ট রহিল। উত্তমাভাবে আর উন্নতি হইল না। সুপ্তসিংহের মুখে আহার্য্য পশু স্বতঃ প্রবেশ করে না।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তালোচনায় সন্তোষ-সম্বন্ধে অনেকগুলিন বিচিত্র তত্ত্ব পাওয়া যায়। ঐহিক সুখে নিস্পৃহতা হিন্দুধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্ম উভয় কর্তৃক অনুজ্ঞাত। কি ব্রাহ্মণ, কি বৌদ্ধ, কি স্মার্ত্ত, কি দার্শনিক, সকলেই প্রাণপণে ভারতবাসীদিগকে শিখাইয়াছেন যে, ঐহিক সুখ অনাদরণীয়। ইউরোপেও ধর্ম্মযাজকগণ কর্তৃক ঐহিক সুখে অনাদরতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছিল। ইউরোপে যে রোমীয় সভ্যতা-লোপের পর সহস্রবৎসর মনুষ্যের ঐহিক অবস্থা অনুন্নত ছিল, এইরূপ শিক্ষাই তাহার কারণ। কিন্তু যখন ইতালীতে প্রাচীন গ্রীক-সাহিত্য গ্রীক-দর্শনের পুনরুদয় হইল, তখন তৎপ্রদত্ত শিক্ষানিবন্ধন ঐহিকে বিরক্তি ইউরোপে ক্রমে মন্দীভূত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারও বৃদ্ধি হইল। ইউরোপে এ প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষে ইহা মনুষ্যের দ্বিতীয় স্বভাবস্বরূপে পরিণত হই-য়াছে। যে ভূমি যে বৃক্ষের উপযুক্ত, সেই-খানেই তাহা বদ্ধমূল হয়। এ দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র কর্তৃক যে নিবৃত্তিজনক শিক্ষা প্রচারিত হইল,

দেশের অবস্থাই তাহার মূল; আবার সেই জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রদত্ত শিক্ষায় প্রাকৃতিক অবস্থা-নিবৃত্তি আরও দৃঢ়ীকৃতা হইল।

এতন্নিবন্ধন ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন ফল ফলিল। সুপ্তোত্থিত ইউরোপীয় প্রজাগণ, ঐহিক সুখে রত হইয়া, সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে চেষ্টিত হইল। ইহার ফল সুখ, সমৃদ্ধি, সভ্যতাবৃদ্ধি। ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ নিদ্রিত রহিল; সামাজিক বৈষম্য ধারাবাহিক হইয়া চলিল। ইহার ফল অবনতি।

৩। শ্রমোপজীবীদিগের দুরবস্থা যে চিরস্থায়ী হয়, কেবল তাহাই নহে। তন্নিবন্ধন সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গৌরবের ধ্বংস হয়, যেমন এক ভাণ্ড দুগ্ধে একবিন্দু অম্ল পড়িলে, সকল দুগ্ধ দধি হয়, তেমনি সমাজের এক অধঃশ্রেণীর দুর্দ্দশায় সকল শ্রেণীরই দুর্দ্দশা জন্মে।

(ক) উপজীবিকানুসারে, প্রাচীন আর্য্যেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। বৈষম্যের উপর বৈষম্য। শূদ্র অধস্তন শ্রেণী; তাহাদিগেরই দুর্দ্দশার কথা এতক্ষণ বলিতেছিলাম। বৈশ্য বাণিজ্য-ব্যবসায়ী। বাণিজ্য, শ্রমোপজীবীর শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্য্যের উপর নির্ভর করে। যে দেশে দেশের আবশ্যকীয় সামগ্রীর অতিরিক্ত উৎপন্ন না হয়, সে দেশে বাণিজ্যের উন্নতি হয় না। বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে, বাণিজ্য-ব্যবসায়ীদিগের সৌষ্ঠবের হানি। লোকের অভাববৃদ্ধি, বাণিজ্যের মূল। যদি আমাদিগের অন্য-দেশোৎপন্ন সামগ্রী-গ্রহণেচ্ছা না থাকে, তবে কেহ অন্য-দেশোৎপন্ন সামগ্রী আমাদের কাছে আনিয়া বিক্রয় করিবে না; অতএব যে দেশের লোক অভাবশূন্য, নিজ শ্রমোৎপন্ন সামগ্রীতে সন্তুষ্ট, সে দেশে বণিক্‌দিগের শ্রীহানি অবশ্য হইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তবে কি ভারতবর্ষে বাণিজ্য ছিল না? ছিল বৈ কি। ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের তুল্য বিস্তৃত উর্ব্বরা ভূমিবিশিষ্ট বহুধনের আকর-স্বরূপ দেশে যেরূপ বাণিজ্যবাহুল্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল,—অতি প্রাচীনকালেই যে সম্ভাবনা ছিল, তাহার কিছুই হয় নাই। বাণিজ্যহানির অন্যান্য কারণও ছিল, যথা—ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিবন্ধকতা, সমাজের অভ্যস্ত অনুৎসাহ ইত্যাদি। এ প্রবন্ধে সে সকলের উল্লেখের আবশ্যক নাই।

(খ) ক্ষত্রিয়েরা রাজা বা রাজপুরুষ। যদি পৃথিবীর পুরাবৃত্তে কোন কথা নিশ্চিত প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তবে সে কথাটি এই যে, সাধারণ প্রজা সতেজ এবং রাজনিয়ন্তা না হইলে, রাজপুরুষদিগের স্বভাবের উন্নতি হয় না, অবনতি হয়। যদি কেহ কিছু না বলে, রাজপুরুষেরা সহজেই স্বেচ্ছাচারী হয়েন। স্বেচ্ছাচারী হইলেই আত্মসুখে রত, কার্য্যে শিথিল, এবং দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইতে হয়। অতএব যে দেশের প্রজা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী, অলস, সেইখানেই রাজপুরুষদিগের ঐরূপ স্বভাবগত অবনতি হইবে। যেখানে প্রজা দুঃখী, অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, আহারোপার্জ্জনে ব্যস্ত, এবং সন্তুষ্টস্বভাব, সেইখানেই তাহারা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী, অবিরোধী। ভারতবর্ষে বৈষম্যপীড়িত হীনবর্ণেরা তাই। সেই জন্য ভারতবর্ষের রাজগণ মহাভারত-কীর্ত্তিত বলশালী, ধর্ম্মিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়জয়ী, রাজ-চরিত্র হইতে মধ্যকালের কাব্যনাটকাদি-চিত্রিত বলহীন, ইন্দ্রিয়পরবশ, স্ত্রৈণ, অকর্ম্মঠ দশাপ্রাপ্ত হইয়া শেষে মুসলমান-হস্তে লুপ্ত হইলেন। যে দেশে সাধারণ প্রজার অবস্থা ভাল, সে দেশে রাজপুরুষদিগের এরূপ দুর্গতি ঘটে না। তাহারা রাজার দুর্ম্মতি দেখিলে তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইতে পারে এবং হইয়া থাকে।

পরস্পরের উপরোধেই উভয় পক্ষের উন্নতি। রাজপুরুষগণ অনর্থক অসন্তোষের ভয়ে সতর্ক থাকেন। কিন্তু ইহাতে কেবল যে এই উপকার, ইহা নহে। রাজকার্য্যের অপক্ষপাতী সমালোচনায় মানসিক গুণ সকলের সৃষ্টি এবং পুষ্টি হয়। তদভাবে তৎসমুদায়ের লোপ। শূদ্রের দাসত্বে ক্ষত্রিয়ের ধন এবং ধর্ম্মের লোপ হইয়াছিল। রোমে প্লিবিয়ানদিগের বিবাদে, ইংলণ্ডের কমনদিগের বিবাদে প্রভুদিগের স্বাভাবিক উৎকর্ষ জন্মিয়াছিল।

(গ) ব্রাহ্মণ। যেমন, অধঃশ্রেণীর প্রজার অবনতিতে ক্ষত্রিয়দিগের প্রভুত্ব বাড়িয়া, পরিশেষে লুপ্ত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণদিগেরও তদ্রূপ। অপর তিনবর্ণের অনুন্নতিতে বর্ণগত ঘোরতর বৈষম্যে ব্রাহ্মণের প্রথমে প্রভুত্ববৃদ্ধি হয়। অপরবর্ণের মানসিক শক্তির হানি হওয়াতে তাহাদিগের চিত্ত উপধর্ম্মের বিশেষ বশীভূত হইতে লাগিল। দৌর্ব্বল্য থাকিলেই ভয়াধিক্য হয়। উপধর্ম্ম ভীতিজাত; এই সংসার বলশালী অথচ অনিষ্টকারক দেবতাপূর্ণ, এই বিশ্বাসই উপধর্ম্ম। অতএব অপরবর্ণক্রম, মানসিক শক্তিবিহীন হওয়াতে অধিকতর উপধর্ম্মপীড়িত হইল; ব্রাহ্মণেরা উপধর্ম্মের যাজক, সুতরাং তাঁহাদের প্রভুত্ববৃদ্ধি হইল; বৈষম্য-বৃদ্ধি হইল। ব্রাহ্মণেরা কেবল শাস্ত্রজাল ব্যবস্থাজাল বিস্তারিত করিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রকে জড়িত করিতে লাগিলেন। মক্ষিকাগণ জড়াইয়া পড়িল, নড়িবার শক্তি নাই। কিন্তু তথাপি ঊর্ণনাভের জাল ফুরায় না। বিধানের অন্ত নাই। এদিকে রাজশাসনপ্রণালী, দণ্ডবিধি, দায়, সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি হইতে আচমন, শয়ন, বসন, গমন, কথোপকথন, হাস্য, রোদন, এই সকল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের রচিত বিধির দ্বারা নিয়মিত হইতে লাগিল। "আমরা যেরূপে বলি, সেইরূপে শুইবে, সেইরূপে খাইবে, সেইরূপে বসিবে, সেইরূপে হাঁটিবে, সেইরূপে কথা কহিবে, সেইরূপে হাসিবে, সেইরূপে কাঁদিবে, তোমার জন্ম-মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের ব্যবস্থার বিপরীত হইতে পারিবে না, যদি হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আমাদিগকে দক্ষিণা দিও।" জালের এইরূপ সূত্র। কিন্তু পরকে ভ্রান্ত করিতে গেলে আপনিও ভ্রান্ত হইতে হয়, কেন না, ভ্রান্তির আলোচনায় ভ্রান্তি অভ্যস্ত হয়। যাহা পরকে বিশ্বাস করাইতে চাহি, তাহাতে নিজের বিশ্বাস দেখাইতে হয়; বিশ্বাস দেখাইতে দেখাইতে যথার্থ বিশ্বাস ঘটিয়া উঠে। যে জালে ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষকে জড়াইলেন, তাহাতে আপনারাও জড়িত হইলেন। পৌরাবৃত্তিকে প্রমাণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মানুষের স্বেচ্ছানুবর্ত্তিতার প্রয়োজনাতিরিক্ত বোধ করিলে, সমাজের অবনতি হয়। হিন্দুসমাজের অবনতির জন্য যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তন্মধ্যে এইটি বোধ হয় প্রধান; অদ্যাপি জাজ্বল্যমান। ইহাতে রুদ্ধ এবং রোধকারী সমান ফলভোগী। নিয়মজালে জড়িত হওয়াতে ব্রাহ্মণদিগের বুদ্ধি-স্ফূর্ত্তি লুপ্ত হইল। যে ব্রাহ্মণ রামায়ণ, মহাভারত, পাণিনি ব্যাকরণ, সাংখ্যদর্শন প্রভৃতির অবতারণা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতির প্রণয়নে গৌরব বোধ করিতে লাগিলেন। শেষে সে ক্ষমতাও গেল, ব্রাহ্মণদিগের মানসক্ষেত্র মরুভূমি হইল।

অতএব বৈষম্যবিষ ভারতীয় প্রজার দুর্দ্দশার একটি মূল কারণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট—ইহাই সাম্যনীতি। কৃষকে ও ভূম্যধিকারীতে যে বৈষম্য,সাম্যনীতিভ্রংশের প্রথম উদাহরণস্বরূপ তাহার উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় উদাহরণস্বরূপ স্ত্রীপুরুষে যে বৈষম্য, তাহার উল্লেখ করিব।

মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট। স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি; অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের ন্যায় অধিকারশালিনী। যে যে কার্য্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্য্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত। কেন থাকিবে না? কেহ কেহ উত্তর করিতে পারেন যে, স্ত্রী-পুরুষে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে; পুরুষ বলবান্, স্ত্রী অবলা; পুরুষ সাহসী, স্ত্রী ভীরু; পুরুষ ক্লেশসহিষ্ণু, স্ত্রী কোমলা; ইত্যাদি ইত্যাদি; অতএব যেখানে স্বভাবগত বৈষম্য আছে, সেখানে অধিকারগত বৈষম্য থাকাও বিধেয়। কেন না,যে যাহাতে অশক্ত, সে তাহাতে অধিকারী হইতে পারে না।

ইহার দুইটি উত্তর সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিলেই আপাততঃ যথেষ্ট হইবে। প্রথমতঃ, স্বভাবগত বৈষম্য থাকিলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাকা ন্যায়সঙ্গত, ইহা আমরা স্বীকার করি না। এ কথাটি সাম্যতত্ত্বের মূলোচ্ছেদক। দেখ, স্ত্রীপুরুষে যেরূপ স্বভাবগত বৈষম্য, ইংরেজ-বাঙ্গালীতেও সেইরূপ। ইংরেজ বলবান্, বাঙ্গালী দুর্ব্বল; ইংরেজ সাহসী,বাঙ্গালী ভীরু; ইংরেজ ক্লেশসহিষ্ণু, বাঙ্গালী কোমল; ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি এই সকল প্রকৃতিগত বৈষম্য হেতু অধিকারবৈষম্য ন্যায্য হইত, তবে আমরা ইংরেজ-বাঙ্গালি-মধ্যে সামান্য অধিকার-বৈষম্য দেখিয়া এত চীৎকার করি কেন? যদি স্ত্রী দাসী, পুরুষ প্রভু, ইহাই বিচারসঙ্গত হয়, তবে বাঙ্গালী দাস, ইংরেজ প্রভু, এটিও বিচারসঙ্গত হইবে।

দ্বিতীয় উত্তর এই, যে সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষে অধিকারবৈষম্য দেখা যায়, সে সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষে যথার্থ প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখা যায় না। যতটুকু দেখা যায়, ততটুকু কেবল সামাজিক নিয়মের দোষে। সেই সকল সামাজিক নিয়মের সংশোধনই সাম্যনীতির উদ্দেশ্য। বিখ্যাতনামা জন ষ্টুয়ার্ট মিলকৃত এতদ্বিষয়ক বিচারে এই বিষয়টি সুন্দররূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। সে সকল কথা এখানে পুনরুক্ত করা নিষ্প্রয়োজন। *

স্ত্রীগণ সকল দেশেই পুরুষের দাসী। যে দেশে স্ত্রীগণকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া না রাখে, সে দেশেও স্ত্রীগণকে পুরুষের উপর নির্ভর করিতে হয়, এবং সর্ব্বপ্রকারে আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া মন যোগাইয়া থাকিতে হয়।

এই প্রথা সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে চিরপ্রচলিত থাকিলেও, এক্ষণে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে এক সম্প্রদায় সমাজতত্ত্ববিদ্ ইহার বিরোধী। তাঁহারা সাম্যবাদী। তাঁহাদের মত এই যে, স্ত্রী ও পুরুষে সর্ব্বপ্রকারে সাম্য থাকাই উচিত। পুরুষগণের যাহাতে যাহাতে অধিকার, স্ত্রীগণের তাহাতে তাহাতেই অধিকার থাকাই উচিত। পুরুষে চাকরি করিবে, ব্যবসায় করিবে, স্ত্রীগণে কেন করিবে না? পুরুষে রাজসভায় সভ্য হইবে, স্ত্রীলোক কেন হইবে না? নারী পুরুষের পত্নী, মাত্র দাসী কেন হইবে?

অধীনতার দেশ, সর্ব্বপ্রকার অধীনতা ইহাতে বীজমাত্রে অঙ্কুরিত হইয়া উর্ব্বরা ভূমি পাইয়া বিশেষ বৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। এখানে প্রজা যেমন রাজার নিতান্ত অধীন,

* Subjection of women.

অন্যত্র তেমন নহে ; এখানে অশিক্ষিত যেমন আজ্ঞাবহ, অন্যত্র তেমন নহে ; এখানে যেমন শূদ্রাদি ব্রাহ্মণের পদানত, অন্যত্র কেহই ধর্ম্মযাজকের তাদৃশ বশবর্ত্তী নহে। এখানে যেমন দরিদ্র ধনীর পদানত, অন্যত্র তত নহে। এখানে স্ত্রী যেমন পুরুষের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, অন্যত্র তত নহে।

এখানে রমণী পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী ; যে বুলি পড়াইবে, সেই বুলি পড়িবে। আহার দিলে খাইবে, নচেৎ একাদশী করিবে। পতি অর্থাৎ পুরুষ দেবতাস্বরূপ ; দেবতাস্বরূপ কেন, সকল দেবতার প্রধান দেবতা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। দাসীত্ব এতদুর যে, পত্নীদিগের আদর্শস্বরূপা দ্রৌপদী সত্যভামার নিকট আপনার প্রশংসাস্বরূপ বলিয়াছিলেন যে, তিনি স্বামীর সন্তোষার্থ সপত্নীগণেরও পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন।

এই আর্য্য পাতিব্রত্যধর্ম্ম অতি সুন্দর ; ইহার জন্য আর্য্যগৃহ স্বর্গতুল্য সুখময়। কিন্তু পাতিব্রত্যের কেহ বিরোধী নহে ; স্ত্রী যে পুরুষের দাসীমাত্র, সংসারের অধিকাংশ ব্যাপারে স্ত্রীলোক অধিকারশূন্যা, সাম্যবাদীরা ইহারই প্রতিবাদী।

স্ত্রীপুরুষে যে সকল বৈষম্য প্রায় সর্ব্বসমাজে প্রচলিত আছে,তন্মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারসম্বন্ধীয় বিধিগুলি অতি ভয়ানক ও শোচনীয়। পুত্র পৈতৃক সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ অধিকারী, কন্যা কেহই নহে। পুত্র কন্যা, উভয়েরই এক ঔরসে এক গর্ভে জন্ম ; উভয়েরই প্রতি পিতা-মাতার এক প্রকার যত্ন এক প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ; কিন্তু পুত্র পিতৃমৃত্যুর পর পিতার কোটি মুদ্রা সুরাপানাদিতে ভস্মসাৎ করুক, কন্যা বিশেষ প্রয়োজনের জন্যও তন্মধ্যে এক কপর্দ্দক পাইতে পারে না। এই নীতির যে কারণ হিন্দুশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে যে, যেই শ্রাদ্ধাধিকারী, সেই উত্তরাধিকারী ; সেটি এরূপ অসঙ্গত এবং অযথার্থ যে, তাহার অযৌক্তিকতা নির্ব্বাচন করাই নিষ্প্রয়োজন। দেখা যাউক, এরূপ নিয়মের স্বভাবসঙ্গত অন্য কোন মূল আছে কি না। ইহা কথিত হইতে পারে যে, স্ত্রী স্বামীর ধনে স্বামীর ন্যায়ই অধিকারিণী ; এবং তিনি স্বামিগৃহে গৃহিণী.স্বামীর ধনৈশ্বর্য্যে কর্ত্রী,অতএব তাঁহার আর পৈতৃক ধনে অধিকারিণী হইবার প্রয়োজন নাই। যদি ইহাই এই ব্যবস্থানীতির মূলস্বরূপ হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে,বিধবা কন্যা বিষয়াধিকারিণী হয় না কেন ? যে কন্যা দরিদ্রে সমর্পিত হইয়াছে, সে উত্তরাধিকারিণী হয় না কেন ? কিন্তু আমরা এ সকল ক্ষুদ্রতর আপত্তি উপস্থিত করিতে ইচ্ছুক নহি। স্ত্রীকে স্বামী বা পুত্র এবংবিধ কোন পুরুষের আশ্রিতা হইয়াই ধনভাগিনী হইতে হইবে,ইহাতেই আমাদের আপত্তি। অন্যের ধনে নহিলে স্ত্রীজাতি ধনাধিকারিণী হইতে পারিবে না—পরের দাসী হইয়া ধনী হইবে—নচেৎ ধনী হইবে না. ইহাতেই আপত্তি। পতির পদসেবা কর, পতি দুষ্ট হৌক, কুভাষী কদাচার হৌক, সকল সহ্য কর—অবাধ্য,দুর্ম্মুখ,কৃতঘ্ন,পাপাত্মা পুত্রের বাধ্য হইয়া থাক - নচেৎ ধনের সঙ্গে স্ত্রীজাতির কোন সম্বন্ধ নাই। পতি পুত্র তাড়াইয়া দিল ত সব ঘুচিল। স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবার উপায় নাই—সহিষ্ণুতা ভিন্ন অন্য গতিই নাই। এদিকে পুরুষ সর্ব্বাধিকারী,স্ত্রীর ধনও তাঁর ধন। ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীকে সর্ব্বস্বচ্যুত করিতে পারেন। তাঁহার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে কোন বাধা নাই। এ বৈষম্য গুরুতর, ন্যায়বিরুদ্ধ এবং নীতিবিরুদ্ধ।

অনেকে বলিবেন, এ অতি উত্তম ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থাপ্রভাবে স্ত্রী স্বামীর বশবর্ত্তিনী থাকে।

বটে, পুরুষকৃত ব্যবস্থাবলির উদ্দেশ্যই তাই; যত প্রকার বন্ধন আছে, সকল প্রকার বন্ধনে স্ত্রীগণের হস্তপদ বাঁধিয়া পুরুষপদমূলে স্থাপিত কর—পুরুষগণ স্বেচ্ছাক্রমে পদাঘাত করুক, অধম নারীগণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে না পারে। জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রীগণ পুরুষের বশবর্ত্তিনী হয়, ইহা বড় বাঞ্ছনীয়; পুরুষগণ স্ত্রীজাতির বশবর্ত্তী হয়, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে কেন? যত বন্ধন আছে, সকল বন্ধনে স্ত্রীগণকে বাঁধিয়াছ, পুরুষজাতির জন্য একটি বন্ধনও নাই কেন? স্ত্রীগণ কি পুরুষাপেক্ষা অধিকতর স্বভাবতঃ দুশ্চরিত্র? না রজ্জুটি পুরুষের হাতে বলিয়া স্ত্রীজাতির এত দৃঢ় বন্ধন? ইহা যদি অধর্ম্ম না হয়, তবে অধর্ম্ম কাহাকে বলে, বলিতে পারি না।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে কদাচিৎ স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী হয়, যথা—পতি অপুত্রক মরিলে। এইটুকু হিন্দুশাস্ত্রের গৌরব। এইরূপ বিধি দুই একটা থাকাতেই আমরা প্রাচীন আর্য্যব্যবস্থা-শাস্ত্রকে কোন কোন অংশে আধুনিক সভ্য ইউরোপীয় ব্যবস্থাশাস্ত্রাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলিয়া গৌরব করি। কিন্তু এইটুকু কেবল মন্দের ভালমাত্র। স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী বটে, কিন্তু দানবিক্রয়াদির অধিকারিণী নহে। এ অধিকার কতটুকু? আপনার ভরণপোষণ মাত্র পাইবেন, আর তাঁহার জীবনকালমধ্যে আর কাহাকেও কিছু দিবেন না, এই পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার। পাপাত্মা পুত্র সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করুক, তাহাতে শাস্ত্রের আপত্তি নাই, কিন্তু মহারাণী স্বর্ণময়ীর ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠা স্ত্রী কাহারও প্রাণরক্ষার্থেও এক বিঘা হস্তান্তর করিতে সমর্থ নহেন। এ বৈষম্য কেন? তাহার উত্তরের অভাব নাই। স্ত্রীগণ অল্পবুদ্ধি, অস্থিরমতি, বিষয়রক্ষণে অশক্ত, হঠাৎ সর্ব্বস্ব হস্তান্তর করিবে, উত্তরাধিকারীর ক্ষতি হইবে, এ জন্য তাহারা বিষয় হস্তান্তর করিতে অশক্ত হওয়াই উচিত। আমরা এ কথা স্বীকার করি না। স্ত্রীগণ বুদ্ধি, স্থৈর্য্য, চতুরতায় পুরুষাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। বিষয়রক্ষার জন্য যে বৈষয়িক শিক্ষা, তাহাতে তাহারা নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু সে পুরুষেরই দোষ। তোমরা তাহাদিগকে পুরমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া বিষয়কর্ম্ম হইতে নির্লিপ্ত রাখ, সুতরাং তাহাদিগের বৈষয়িক শিক্ষা হয় না। আগে বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে দাও, পরে বৈষয়িক শিক্ষার প্রত্যাশা করিও। আগে মুড়ি রাখিয়া পরে পাঁটা কটা যায় না। পুরুষের অপরাধে স্ত্রী অশিক্ষিতা—কিন্তু সেই অপরাধের দণ্ড স্ত্রীগণের উপরেই বর্ত্তাইতেছে। বিচার মন্দ নয়

এই তিনটি বিঘ্ন নিবারণের একই উপায়—শিক্ষা। লোকে সুশিক্ষিত হইলে, বিশেষতঃ স্ত্রীগণ সুশিক্ষিত হইলে তাহারা অনায়াসেই গৃহমধ্যে গুপ্ত থাকার পদ্ধতি অতিক্রম করিতে পারিবে। শিক্ষা থাকিলেই অর্থোপার্জ্জনে নারীগণের ক্ষমতা জন্মিবে এবং এ দেশী স্ত্রীপুরুষ সকল প্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে, বিদেশী ব্যবসায়ী, বিদেশী শিল্পী বা বিদেশী বণিক্ তাহাদিগের অন্ন কাড়িয়া লইতে পারিবে না। শিক্ষাই সকলপ্রকার সামাজিক অমঙ্গলনিবারণের উপায়।

আমরা যে সকল কথা এই প্রবন্ধে বলিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমাদিগের দেশীয়া স্ত্রীগণের দশা বড়ই শোচনীয়া। ইহার প্রতীকার জন্য কে কি করিয়াছেন? পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্মসম্প্রদায় অনেক যত্ন করিয়াছেন—তাঁহাদিগের যশঃ অক্ষয় হউক; কিন্তু এই কয়জন ভিন্ন সমাজ হইতে কিছুই হয় নাই। দেশে অনেক এসোশিয়েসন, লিগ, সোসাইটি, সভা, ক্লব,

ইত্যাদি আছে—কাহারও উদ্দেশ্য রাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য সমাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য ধর্ম্মনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য দুর্নীতি, কিন্তু স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য কেহ নাই। পশুগণকে কেহ প্রহার না করে, এজন্যও একটি সভা আছে. কিন্তু বাঙ্গালার অর্দ্ধেক অধিবাসী, স্ত্রীজাতি—তাহাদিগের উপকারার্থ কেহ নাই। আমরা কয়দিনের ভিতর অনেক পাঠশালা, চিকিৎসাশালা এবং পশুশালার জন্য বিস্তর অর্থব্যয় দেখিলাম, কিন্তু এই বঙ্গসংসাররূপ পশুশালার সংস্করণার্থ কিছু করা যায় না কি?

যায় না, কেন না, তাহাতে রঙ-তামাসা কিছু নাই। কিছু করা যায় না, কেন না, তাহাতে রায় বাহাদুরি, রাজা বাহাদুরি, ষ্টার অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি কিছু নাই। আছে কেবল মূর্খের করতালি। কে অগ্রসর হইবে?

উপসংহার।

এ দেশের বর্ত্তমান সমাজের তৃতীয় দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইলে জাতিগত বৈষম্যের উল্লেখ করিতে হয়। আমরা বর্ণ-বৈষম্যের কথা বলিতেছি না। প্রাচীন ভারতের বর্ণ-বৈষম্যের ফলের পরিচয় দিয়াছি। তাহার ফলে যে সামাজিক বৈষম্য জন্মিয়াছে, তাহা কৃষকের উদাহরণে বুঝাইয়াছি। এক্ষণে বর্ণগত বৈষম্যের সঙ্গে অধিকারগত বৈষম্য নাই; যাহা আছে, তাহা সামান্য। জাতিগত যে বৈষম্য বলিতেছি, তাহা জেতা ও বিজেতার মধ্যে। যে জাতি রাজা ও যে জাতি প্রজা, তাহাদিগের মধ্যে এ দেশে অধিকারগত বৈষম্য আছে। সেই বৈষম্যে এতদ্দেশীয়গণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা বিচারিত হইয়া থাকে. সুতরাং এ গ্রন্থে তাহার সবিস্তারে বিচার করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না।

উপসংহারে আমরা কেবল ইহাই বুঝিতে চাই যে, আমরা সাম্যনীতির এরূপ ব্যাখ্যা করি না যে, সকল মনুষ্য সমানাবস্থাসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্থির করিতে হইবে। তাহা কখন হইতে পারে না। যেখানে বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভৃতির স্বাভাবিক তারতম্য আছে, সেখানে অবশ্য অবস্থার তারতম্য ঘটিবে—কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। তবে অধিকারের সাম্য আবশ্যক—কাহারও শক্তি থাকিলে অধিকার নাই বলিয়া বিমুখ না হয়। সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাহি।

সমাপ্ত।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্ব।

ঈশ্বর গুপ্ত কবি। কিন্তু কি রকম কবি? ভারতবর্ষে পূর্ব্বে জ্ঞানীমাত্রকেই কবি বলিত। শাস্ত্রবেত্তারাও সকলেই "কবি।" ধর্ম্মশাস্ত্রকারও কবি; জ্যোতিষ-শাস্ত্রকারও কবি।

তার পর কবি শব্দের অর্থের অনেক রকম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। "কাব্যেষু মাঘঃ কবিঃ কালিদাসঃ"। এখানে অর্থটা ইংরেজি Poet শব্দের মত। তার পর এই শতাব্দীর প্রথমাংশে "কবির লড়াই" হইত। দুই দল গায়ক জুটিয়া ছন্দোবন্ধে পরস্পরের কথার উত্তর-প্রত্যুত্তর দিতেন। সেই রচনার নাম "কবি"।

আবার আজকাল কবি অর্থে Poet; তাহাকে পাওয়া যায়, কিন্তু "কবিত্ব" সম্বন্ধে আজকাল বড় গোল। ইংরাজিতে যাহাকে Poetry বলে, এখন তাহাই কবিত্ব। এখন এই অর্থ প্রচলিত, সুতরাং এই অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত কবি কি না, আমরা বিচার করিতে বাধ্য।

পাঠক বোধ হয়, আমার কাছে এমন প্রত্যাশা করেন না যে, এই কবিত্ব কি সামগ্রী, তাহা আমি বুঝাইতে বসিব। অনেক ইংরেজ ও বাঙ্গালী লেখক সে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের উপর আমার বরাত দেওয়া রহিল। আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, সে অর্থে ঈশ্বর গুপ্তকে উচ্চাসনে বসাইতে সমালোচক সম্মত হইবেন না। মনুষ্য-হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, [illegible] গঠন [illegible] [illegible] পারেন না। তাঁহার সৃষ্টি বড় নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ইঁহারা সকলেই এ কবিত্বে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনেরাও তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের ন্যায় হীরামালিনী গড়িবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। কাশীরামের মত সুভদ্রাহরণ কি শ্রীবৎসচিন্তা, কৃত্তিবাসের মত তরণীসেন-বধ, মুকুন্দরামের মত ফুল্লরা গড়িতে পারিতেন না; বৈষ্ণব কবিদের মত বীণায় ঝঙ্কার দিতে জানিতেন না। তাঁহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম এ সব সামগ্রী বড় বেশী নাই। কিন্তু তাঁহার যাহা আছে, তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা।

সংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে। যাহা ভাল, তাও কিছু এত ভাল নহে যে, তা'র অপেক্ষা ভাল আমরা কামনা করি না। সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আমরা কামনা করি। সেই উৎকর্ষের আদর্শস্থল, আমাদের হৃদয়ে অস্ফুট রকম থাকে, সেই আদর্শ ও সেই কামনা, কবির সামগ্রী। যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহাকে গঠন দিয়া শরীরী করিয়া, আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর তাঁহাকেই আমরা কবি বলি। মধুসূদনাদি তাহা পারিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা পারেন নাই বা করেন নাই, এই জন্য এই অর্থে আমরা মধুসূদনাদিকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া, ঈশ্বরচন্দ্রকে নিম্ন [illegible] ফেলিলাম। কিন্তু এই [illegible] [illegible] রহিল? কাব্যের সামগ্রী [illegible] কি আর কিছু রহিল না?

রহিল বৈ কি। যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু

যাহা প্রকৃত,যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত,তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য্য নাই? আছে বৈ কি। ঈশ্বর গুপ্ত সেই রসে রসিক,সেই সৌন্দর্য্যের কবি। যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কবি। এই সমাজ, এই সহর,এই দেশ বড় কাব্যময়, অন্যে তাহাতে বড় রস পান না। তোমরা পৌষপার্ব্বণে পিটাপুলি খাইয়া অজীর্ণে দুঃখ পাও,তিনি তাহার কাব্যরসটুকু সংগ্রহ করেন; অন্যে নববর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ গিলিয়া, গাঁদাফুল সাজাইয়া কষ্ট পায়, ঈশ্বর গুপ্ত মক্ষিকাবৎ তাহার সারাদান করিয়া নিজে উপভোগ করেন, অন্যকেও উপহার দেন। দুর্ভিক্ষের দিন, তোমরা মাতা বা শিশুর চক্ষে অশ্রুবিন্দুশ্রেণী সাজাইয়া মুক্তাহারের সঙ্গে তাহার উপমা দাও,তিনি চালের দরটি কসিয়া দেখিয়া তাহার ভিতর একটু রস পান।

মনের চেলে মন ভেঙ্গেচে
ভাঙ্গা মন আর গড়ে নাকো।

তোমরা সুন্দরীগণকে পুষ্পোদ্যানে বা বাতায়নে বসাইয়া প্রতিমা সাজাইয়া পূজা কর, তিনি তাহাদের রান্নাঘরে,উনুন-গোড়ায় বসাইয়া,শাশুড়ী-ননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া, সত্যের সংসারের এক রকম খাঁটী কাব্যরস বাহির করেন;—

বধূর মধুর খনি, মুখ-শতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছলছল॥

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায়,রান্নাঘরের ধুঁয়ায়, নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁটার অস্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রস ছাড়া কাব্যরস পান, তপ্‌সেমাছে মৎস্যভাব ছাড়া তপস্বী-ভাব দেখেন। পাঁটায় বোকাগন্ধ ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান। তিনি বলেন,তোমাদের এ দেশে,এ সমাজ বড় রঙ্গভরা। তোমরা মাথা কুটাকুটি করিয়া দুর্গোৎসব কর,আমি কেবল তোমাদের রঙ্গ দেখি। তোমরা এ ওকে ফাঁকি দিতেছ,এ ওর কাছে মেকি চালাইতেছ, এখানে কাষ্ঠ হাসি হাস, ওখানে মিছা কান্না কাঁদ, আমি তা বসিয়া বসিয়া দেখিয়া হাসি। তোমরা বল,বাঙ্গালীর মেয়ে বড় সুন্দরী,বড় মনোমোহিনী, প্রেমের আধার, প্রাণের সুসার, ধর্ম্মের ভাণ্ডার,—তা হইলে হইতে পারে,কিন্তু আমি দেখি উহারা বড় রঙ্গের জিনিস। মানুষ যেমন রূপী বাঁদর পোষে, আমি বলি,পুরুষে তেমনি মেয়েমানুষ পোষে,উভয়কে মুখ ভেঙ্গানোতেই সুখ। স্ত্রীলোকের রূপ আছে—তাহা তোমার আমার মত ঈশ্বর গুপ্তও জানিতেন,কিন্তু তিনি বলেন, উহা দেখিয়া মুগ্ধ হইবার কথা নহে—উহা দেখিয়া হাসিবার কথা। তিনি স্ত্রীলোকের রূপের কথা পাড়িলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়েন, মাঘ মাসের প্রাতঃস্নানের সময় যেখানে অন্য কবি রূপ দেখিবার জন্য, যুবতীগণের পিছে পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে তাহাদের নাকাল দেখিবার জন্য যান। তোমরা হয় ত, সেই নীহারশীতলস্বচ্ছসলিলধৌত কবিতকান্তি লইয়া আদর্শ গড়িবে. তিনি বলিলেন, "দেখ দেখি,কেমন তামাসা! যে জাতি স্নানের সময় পরিধেয়-বসন লইয়া বিব্রত, তোমরা তাদের পাইয়া এত বাড়াবাড়ি কর।" তোমরা মহিলাগণের গৃহকর্ম্মে আস্থা ও যত্ন দেখিয়া বলিবে, "ধন্য স্বামীপুত্রসেবাব্রত। ধন্য স্ত্রীলোকের স্নেহ ও ধৈর্য্য।" ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাহাদের হাঁড়িশালে গিয়া দেখিবেন, রন্ধনের চাল চর্ব্বণেই গেল, পিটুলির জন্য কোন্দল বাধিয়া গেল, স্বামী ভোজন করাইবার সময়ে শাশুড়ী-ননদের মুণ্ড-ভোজন হইল এবং কুটুম্ব-ভোজনের সময়

লজ্জার মুণ্ড ভোজন হইল। স্থূল কথা, ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist, ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

ব্যঙ্গ অনেক সময়ে বিদ্বেষপ্রসূত। ইউরোপে অনেক ব্যঙ্গকুশল লেখক জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের রচনা অনেক সময়ে হিংসা,অসূয়া, অকৌশল,নিরানন্দ এবং পরশ্রীকাতরতাপরিপূর্ণ; পড়িয়া বোধ হয় ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মার পেটে জন্মিয়াছে—দুয়ের কাজ মানুষকে দুঃখ দেওয়া। ইউরোপীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে প্রবেশ করিতেছে—এই নরঘাতিনী রসিকতাও এ দেশে প্রবেশ করিয়াছে। হুতোম পেঁচার নক্সা বিদ্বেষপরিপূর্ণ। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন না কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ। কেবল ঘোর ইয়ারকি। গৌরীশঙ্করকে গালি দিবার সময়েও রাগ করিয়া গালি দেন না। সেটা কেবল জিগীষা—ব্রাহ্মণকে কুভাষায় পরাজয় করিতে হইবে, এই জিদ। কবির লড়াই, ঐ রকম শত্রুতাশূন্য গালাগালি। ঈশ্বর গুপ্ত "কবির লড়াইয়ে"শিক্ষিত—সে ধরণটা তাঁহার ছিল।

অন্যত্র তাও না—কেবল আনন্দ। যে যেখানে সম্মুখে পড়ে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহারই গালে এক চড়, নহে একটা কাণমলা দিয়া ছাড়িয়া দেন—কারণ আর কিছুই নয়, দুই জনে একটু হাসিবার জন্য। কেহই চড়-চাপড় হইতে নিস্তার পাইতেন না। গবর্ণর জেনেরাল, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর, কৌন্সিলের মেম্বর হইতে, মুটে মাঝি উড়িয়া বেহারা কেহ ছাড়া নাই। এক একটি চড়-চাপড় এক একটি বজ্র—যে মারে, তাহার রাগ নাই। কিন্তু যে খায়,তা'র হাড়ে হাড়ে লাগে। তাতে আবার পাত্রাপাত্র বিচার নাই। যে সাহসে তিনি বলিয়াছেন,—

"বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে,"

আমাদের সে সাহস নাই। তবে বাঙ্গালীর মেয়ের উপর নীচের লিখিত দুই চরণে আমাদের ঢেরা সই রহিল—

"সিন্দূরের বিন্দুসহ কপালেতে উল্কি।
নসী জশী ক্ষেমী বামী,রামী শ্যামী গুল্কী॥"

মহারাণীকে স্তুতি করিতে করিতে দেশী Agitatar দের কাণ ধরিয়া টানাটানি—

"তুমি মা কল্পতরু,আমরা সব পোষা গোরু,
শিখিনি শিং বাঁকানো
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস।
যেন রাঙ্গা অমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙ্গে না,
আমরা ভুসি পেলেই খুসী হব,
ঘুসি খেলে বাঁচ্‌ব না।"

সাহেব বাবুরা কবির কাছে অনেক কাণমলা খাইয়াছেন—একটা নমুনা—

"যখন আসবে শমন করবে দমন
কি বোলে তায় বুঝাইবে।
বুঝি হুট বোলে, বুট পায়ে দিয়ে
চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে?"

এক কথায় সাহেবদের নৃত্য-গীত—

"গুড়্ গুড়্ গুম গুম লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল॥"

সখের বাবু, বিনা সম্বলে—

"তেড়া হয়ে তুড়ি মারে, টপ্পাগীত গেয়ে।
গোচে গাচে বাবু হন, পচা শাল চেয়ে॥
কোনরূপে পিত্তি রক্ষা, এঁটোকাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙ্গে, বেনো জলে নেয়ে॥"

কিন্তু অনেক স্থানেই ঈশ্বর গুপ্তের ঐ ধরণ

নাই। অনেক স্থানেই কেবল রঙ্গরস, কেবল আনন্দ। তপ্‌সেমাছ লইয়া আনন্দে—

"কষিত কনক-কান্তি কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপদাড়ি তপস্বীর প্রায়॥
মানুষের দৃশ্য নও বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা ননীর শরীরে॥"

অথবা আনারসে—

"লুণ মেখে লেবুরস, রসে যুক্ত করি।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা, চিন তায় ভরি॥"

অথবা পাঁটা—

"সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে॥
হাড়কাটে ফেলে দিই, ধরে দুটি ঠ্যাঙ্গ।
সে সময় বাদ্য করে, ছ্যাড়্যাঙ্গ ছ্যাড়্যাঙ্গ।
এমন পাঁটার নাম, যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয় ঝাড়ে বংশে বোকা॥"

তবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, ঈশ্বর গুপ্ত মেকির উপর গালিগালাজ করিতেন। মেকির উপর যথার্থ রাগ ছিল। মেকি বাবুরা তাঁহার কাছে গালি খাইতেন, মেকি সাহেবেরা গালি খাইতেন, মেকি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা "নস্য লোসা দধি চোষার" দল গালি খাইতেন। হিন্দুর ছেলে মেকি খ্রীষ্টিয়ান হইতে চলিল দেখিয়া তাঁহার রাগ সহ্য হইত না। মিশনরিদিগের ধর্ম্মের মেকির উপর বড় রাগ। মেকি পলিটীক্সের উপর রাগ। যথাস্থানে পাঠক এ সকলের উদাহরণ পাইবেন, এজন্য এখানে উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম না।

অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা এই ক্রোধসম্ভূত। অশ্লীলতা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার একটি প্রধান দোষ। উহা বাদ দিতে গিয়া, ঈশ্বর গুপ্তকে Bowdlerize করিতে গিয়া, আমরা তাঁহার কবিতাকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছি। যিনি কাব্যরসে রসিক, এখনকার বাঙ্গালা লেখক বা পাঠকের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কোনরূপেই অশ্লীলতার বিন্দুমাত্র রাখিতে পারি না। ইহাও জানি যে, ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা প্রকৃত অশ্লীলতা নহে। যাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্য্যভাবের অভিব্যক্তি জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা। তাহা পবিত্র সভ্যভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে। ঋষিরাও এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতেন। সে কালের বাঙ্গালীদিগের ইহা এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। আমি এমন অনেক দেখিয়াছি, অশীতিপর বৃদ্ধ, ধর্ম্মাত্মা, আজন্ম সংযতেন্দ্রিয়, সভ্য, সুশীল, সজ্জন, এমন সকল লোকও কুকাজ দেখিয়াই রাগিলেই "বদ্‌জোবান" আরম্ভ করিতেন। তখনকার রাগ প্রকাশের ভাষাই অশ্লীল ছিল। ফলে, সে সময় ধর্ম্মাত্মা এবং অধর্ম্মাত্মা উভয়কেই অশ্লীলতায় সুপটু দেখিতাম—প্রভেদ এই দেখিতাম, যিনি রাগের বশীভূত হইয়া অশ্লীল, তিনি ধর্ম্মাত্মা। যিনি ইন্দ্রিয়ান্তরের বশে অশ্লীল, তিনি পাপাত্মা। সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ সামাজিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে।

ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মাত্মা, কিন্তু সেকেলে বাঙ্গালী। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অশ্লীল। সংসারের উপর, সমাজের উপর ঈশ্বর গুপ্তের রাগের কারণ অনেক ছিল। সংসার, বাল্যকালে বালকের অমূল্য রত্ন যে মাতা, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। খাঁটী সোনা কাড়িয়া লইয়া তাহার পরিবর্ত্তে এক পিত্তলের সামগ্রী দিয়া গেল—মার বদলে বিমাতা। তার পর, যৌবনের যে অমূল্যরত্ন—সুখ যৌবনের কেন,

অমূল্যরত্ন যে ভার্য্যা, তাহার বেলাও সংসার বড় দাগা দিল। যাহা গ্রহণীয় নহে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা লইলেন না, কিন্তু দাগাবাজির জন্য সংসারের উপর ঈশ্বরের রাগটা রহিয়া গেল। তার পর অল্পবয়সে পিতৃহীন, সহায়হীন হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র অন্নকষ্টে পড়িলেন। কত বানরে, বানরের অট্টালিকায় শিকলে বাঁধা থাকিয়া ক্ষীর সর পায়সান্ন ভোজন করে আর তিনি দেবতুল্য প্রতিভা লইয়া ভূমণ্ডলে আসিয়া, শাকান্নের অভাবে ক্ষুধার্ত্ত। কত কুক্কুর বা মর্কট বক্লসে ক্রুড় হাঁকাইয়া, তাঁহার গায়ে কাদা ছড়াইয়া যায়, আর তিনি পদতলে বাগ্দেবী ধারণ করিয়াও খালি পায়ে বর্ষার কাদা ভাঙ্গিয়া উঠিতে পারেন না। দুর্ব্বল মনুষ্য হইলে এ অত্যাচারে হারি মানিয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া, পলায়ন করিয়া, দুঃখের অন্ধকার গহ্বরে লুকাইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিভাশালীরা প্রায়ই বলবান্।

ঈশ্বরগুপ্ত সংসারকে, সমাজকে, স্বীয় বাহুবলে পরাস্ত করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধন, যশ, সম্মান আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু অত্যাচারজনিত যে ক্রোধ, তাহা মিটিল না। জ্যেঠা মহাশয়ের জুতা তিনি সমাজের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন সমাজকে পদতলে পাইয়া বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিতে লাগিলেন। সেকেলে বাঙ্গালার ক্রোধ কদর্য্যের উপর কদর্য্য ভাষাতেই অভিব্যক্ত হইত। বোধ হয়, ইহাদিগের মনে হইত, বিশুদ্ধ পবিত্র কথা, দেবদ্বিজ[illegible]স্তুতি যে বিশুদ্ধ ও পবিত্র, তাহারই প্রতি ব্যবহার্য্য—যে দুরাত্মা, তাহার জন্য এই কদর্য্য ভাষা। এইরূপে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় অশ্লীলতা আসিয়া পড়িয়াছে।

ইয়ারকির জন্য এক আধটু অশ্লীলতাও আছে। কিন্তু দেশ কাল বিবেচনা করিলে, তাহার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের অপরাধ ক্ষমা করা যায়। সেকালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস বলিয়া গণ্য হইত না। যে কথা অশ্লীল নহে, তাহা সতেজ বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল। চোর কবি, চোরপঞ্চাশৎ দুই পক্ষে অর্থ খাটাইয়া লিখিলেন বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে—দুই পক্ষে সমান অশ্লীল। তখন পূজা পার্ব্বণ অশ্লীল, উৎসবগুলি অশ্লীল—দুর্গোৎসবের নবমীর রাত্রি বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ অশ্লীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালী হাফআকড়াই অশ্লীলতার জন্যই রচিত। ঈশ্বর গুপ্ত সেই বাতাসে জীবন প্রাপ্ত ও বর্দ্ধিত। অতএব ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা অনায়াসে একটুখানি মার্জ্জনা করিতে পারি।

আর একটা কথা আছে। অশ্লীলতা সকল সভ্যসমাজেই ঘৃণিত। তবে, যেমন লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি দেশভেদেও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এমন অনেক কথা আছে, যাহা ইংরেজেরা অশ্লীল বিবেচনা করেন, আমরা করি না। আবার এমন অনেক কথা আছে, যাহা আমরা অশ্লীল বিবেচনা করি, ইংরেজেরা করেন না। ইংরেজের কাছে, প্যানটালুন বা উরুদেশের নাম অশ্লীল—ইংরেজের মেয়ের কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই। আমরা ধুতি, পায়জামা বা উরু শব্দগুলিকে অশ্লীল মনে করি না। মা, ভগিনী বা কন্যা কাহারও সম্মুখে[illegible] সকল কথা ব্যবহার করিতে [illegible]

মাতৃপিতৃ-সম্বন্ধেই উহা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এখন আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা দেশী জিনিস সকলই হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, বিলাতী জিনিস সবই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দেশী সুরুচি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী সুরুচি গ্রহণ করিতেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন যে,তাঁহাদের পরস্ত্রীর মুখচুম্বনে আপত্তি নাই,কিন্তু পরস্ত্রীর অনাবৃত চরণ,আলতাপরা মলপরা পা। দর্শনে বিশেষ আপত্তি। ইহাতে আমরা কেবলই যে জিতিয়াছি, এমত নহে। একটা উদাহরণের দ্বারা বুঝাই। মেঘদূতের একটি কবিতায় কালিদাস কোন পর্ব্বতশৃঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিলাতী রুচিবিরুদ্ধ ; স্তন বিলাতী রুচি অনুসারে অশ্লীল কথা। কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে অশ্লীল। নব্য বাবু হয় ত ইহা শুনিয়া কাণে আঙ্গুল দিয়া পরস্ত্রী-মুখচুম্বন ও করস্পর্শের মহিমা কীর্ত্তনে মনোযোগ দিবেন। কিন্তু আমি ভিন্ন রকম বুঝি। আমি এ উপমার অর্থ এই বুঝি যে. পৃথিবী আমাদিগের জননী। তাই তাঁকে ভক্তিভাবে,স্নেহ করিয়া"মাতা বসুমতী" বলি ; আমরা তাঁহার সন্তান ; সন্তানের চক্ষে, মাতৃস্তনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র জগতে আর কিছুই নাই—থাকিতে পারে না। অতএব এমন পবিত্র উপমা আর হইতে পারে না। ইহাকে যে অশ্লীলতা দেখে, আমার বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপচিন্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না। কবি এখানে অশ্লীল নহে,—এখানে পাঠকের হৃদয় নরক। এখানে ইংরেজি রুচি বিশুদ্ধ নহে—দেশী রুচিই বিশুদ্ধ।

আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি, এইরূপ বিলাতী রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাল্মীকি কি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মস্যুর জোলার নবেলের আদর,সে ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ, আর যাঁহারা রামায়ণ,কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, সীতা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি অশ্লীল। এই শিক্ষা আমরা ইউরোপীয়ের কাছে পাই। কি শিক্ষা! তাই আমি অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প শেখ। আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ।

অন্যের ন্যায় ঈশ্বর গুপ্তও হাল আইনে অনেক স্থানে ধরা পড়েন। সে সকল স্থানে আমরা তাঁহাকে বেকসুর খালাস দিতে রাজি; কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে,আর অনেক স্থানেই তত সহজে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় না। অনেক স্থানে তাঁহার রুচি বাস্তবিক কদর্য্য, যথার্থ অশ্লীল এবং বিরক্তিকর। তাহার মার্জ্জনা নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের যে অশ্লীলতার কথা আমরা লিখিলাম, পাঠক তাহা এ সংগ্রহে কোথাও পাইবেন না। আমরা তাহা সব কাটিয়া দিয়া, কবিতাগুলিকে নেড়া-মুড়া করিয়া বাহির করিয়াছি। অনেকগুলিকে কেবল অশ্লীলতা-দোষ জন্যই একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। তবে তাঁহার কবিতার এই দোষের এত বিস্তারিত সমালোচনা করিলাম, তাহার কারণ এই যে, এই দোষ তাঁহার প্রসিদ্ধ। ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব কিপ্রকার,তাহা বুঝিতে গেলে, তাহার দোষ গুণ দুই বুঝাইতে হয়। শুধু তাই নহে। তাঁহার কবিত্বের অপেক্ষা আর একটা বড় জিনিস পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কি ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরু

তর লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্র—তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া,ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্ত্তি—তাহা ত আমাদের হাতেই আছে—পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন,তিনি কি গুণে,কি প্রকারে এই কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনাদত্ত প্রধান শিক্ষা ও জীবনী ও সমালোচলাচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীতে আমরা অবগত হইয়াছি যে, একজন অশিক্ষিত যুবা কলিকাতায় আসিয়া, সাহিত্যে ও সমাজে আধিপত্য সংস্থাপন করিল। কি শক্তিতে? তাহাও দেখিতে পাই—নিজ প্রতিভাগুণে। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই যে, প্রতিভানুযায়ী ফল ফলে নাই। প্রভাকর মেঘাচ্ছন্ন। সে মেঘ কোথা হইতে আসিল? বিশুদ্ধ রুচির অভাবে। এখন ইহা এক প্রকার স্বাভাবিক নিয়ম যে, প্রতিভা ও সুরুচি পরস্পর সখী—প্রতিভার অনুগামিনী সুরুচি। ঈশ্বর গুপ্তের বেলা তাহা ঘটে নাই কেন? এখানে দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া দেখিতে হইবে। তাই আমি দেশের রুচি বুঝাইলাম, কালের রুচি বুঝাইলাম এবং পাত্রের রুচিও বুঝাইলাম। বুঝাইলাম যে, পাত্রের রুচির অভাবের কারণ (১) পুস্তকদত্ত সুশিক্ষার অল্পতা, (২) মাতার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৩) সহধর্ম্মিণী অর্থাৎ যাঁহার সঙ্গে একত্রে ধর্ম্ম শিক্ষা করি, তাঁহার পবিত্র সংসর্গের অভাব,(৪) সমাজের অত্যাচার এবং তজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতক্রোধ। যে মেঘে প্রভাকরের তেজোহ্রাস করিয়াছিল,এই সকল উপাদানে তাহার জন্ম। স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র যখন অশ্লীল, তখন কুরুচির বশীভূত হইয়াই অশ্লীল, ভারতচন্দ্রাদির ন্যায় কোথাও কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অশ্লীল নহেন। তাই দর্পণতলস্থ প্রতিবিম্বের সাহায্যে প্রতিবিম্বধারী সত্তাকে বুঝাইবার জন্য আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অশ্লীলতা-দোষ এত সবিস্তারে সমালোচনা করিলাম। ব্যাপারটা রুচিকর নহে। মনে করিলে, নমো নমঃ বলিয়া দুই কথায় সারিয়া যাইতে পারিতাম। অভিপ্রায় বুঝিয়া বিস্তারিত সমালোচনা পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

মানুষটা কে,আর একটু ভাল করিয়া বুঝা যাউক—কবিতা না হয় এখন থাক। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা বলিয়াছি, ঈশ্বর গুপ্ত বিলাসী ছিলেন না। অথচ দেখিতে পাই, মুখের আটক-পাটক কিছুই নাই। অশ্লীলতায় ঘোর আমোদ, ইয়ারকি ভরা—পাঁঠার স্তোত্র লেখেন, তপ্‌সে মাছের মজা বুঝেন. লেবু দিয়া আনারসের পরমভক্ত, সুরাপান * সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠ—আবার বিলাসী কারে বলে? কথাটা বুঝিয়া দেখা যাউক।

এই সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে পাঠক ঈশ্বর গুপ্ত প্রণীত কতকগুলি নৈতিক ও পারমার্থিক বিষয়ক কবিতা পাইবেন। অনেকের পক্ষে ঐগুলি নীরস বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু যদি পাঠক ঈশ্বর গুপ্তকে বুঝিতে চাহেন, তবে সেগুলি ফরমায়েসি কবিতা নহে। কবির আন্তরিক কথা তাহাতে আছে। অনেকগুলির মধ্যে ঐ কয়েকটি বাছিয়া দিয়াছি—আর

---

* সুরাপানের মার্জ্জনা নাই। মার্জ্জনার আমিও কোন কারণ দেখাইতে ইচ্ছুক নহি। কেবল সে সম্বন্ধে পাঠককে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবির এই উক্তিটি স্মরণ করিতে বলি—"একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।"

বেশী দিলে রসিক বাঙ্গালী পাঠকের বিরক্তিকর হইয়া উঠিবে। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পরমার্থ-বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গদ্যে পদ্যে যত লিখিয়াছেন, এত আর কোন বিষয়েই বোধ হয় লিখেন নাই। এ গ্রন্থ পদ্যসংগ্রহ বলিয়া আমরা তাঁহার গদ্য কিছুই উদ্ধৃত করি নাই. কিন্তু সে গদ্য পড়িয়া বোধ হয় যে, পদ্য অপেক্ষাও বুঝি গদ্যে তাঁহার মনের ভাব আরও সুস্পষ্ট। এই সকল গদ্য ও পদ্যে প্রণিধান করিয়া দেখিলে, আমরা বুঝিতে পারিব যে, ঈশ্বর গুপ্তের ধর্ম্ম, একটা কৃত্রিম ভান্ ছিল না। ঈশ্বরে তাঁর আন্তরিক ভক্তি ছিল। তিনি মদ্যপ হউন. বিলাসী হউন. কোন হবিস্যাশী নামাবলীধারীতে সেরূপ আন্তরিক ঈশ্বরে ভক্তি দেখিতে পাই না। সাধারণ ঈশ্বরবাদী বা ঈশ্বরভক্তের মত তিনি ঈশ্বরবাদী ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতেন। যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেন, যেন মুখামুখী হইয়া কথা কহিতেন। আপনাকে যথার্থ ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরকে আপনার সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ পিতা বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। মুখামুখী হইয়া বাপের সঙ্গে বচসা করিতেন। কখন বাপের আদর খাইবার জন্য কোলে বসিতে যাইতেন. আপনি বাপকে কত আদর করিতেন—উত্তর না পাইলে কাঁদাকাটা বাধাইতেন। বলিতে কি, তাঁহার ঈশ্বরে গাঢ় পুত্রবৎ অকৃত্রিম প্রেম দেখিয়া চক্ষের জল রাখা যায় না। অনেক সময়েই দেখিতে পাই যে, মূর্ত্তিমান্ ঈশ্বর সম্মুখে পাইতেছেন না, কথার উত্তর পাইতেছেন না দেখিয়া তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে, বাপকে

কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সন্তান।
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান॥
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান্।
একবার তাহে তুমি. নাহি দাও কাণ॥
সর্ব্বদিকে সর্ব্বলোকে, কত কথা কয়।
শ্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয়॥
হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হয়ে তুমি হ'লে কালা॥
মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া।
অধীর হলেম ভেবে, বধির জানিয়া॥

এ ভক্তের স্তুতি নহে—এ বাপের উপর বেটার অভিমান। ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র! তুমি পিতৃপদ লাভ করিয়াছ সন্দেহ নাই। আমরা কেহই তোমার সমালোচক হইবার যোগ্য নহি।

ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বরভক্তির যথার্থ স্বরূপ যিনি অনুভূত করিতে চান, ভরসা করি, তিনি এই সংগ্রহের উপর নির্ভর করিবেন না। এই সংগ্রহ সাধারণের আয়ত্ত ও পাঠ্য করিবার জন্য ইহা নানাদিকে সঙ্কীর্ণ করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি। ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় কতকগুলি গদ্য পদ্য প্রবন্ধ মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়. যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের অকৃত্রিম ঈশ্বরভক্তি বুঝিতে পারিবেন। সেগুলি যাহাতে পুনর্মুদ্রিত হয়, সে যত্ন পাইব।

বৈষ্ণবগণ বলেন, হনুমানাদি দাস্যভাবে, শ্রীদামাদি সখ্যভাবে, নন্দ-যশোদা পুত্রভাবে এবং গোপীগণ কান্তভাবে সাধনা করিয়া ঈশ্বর পাইয়াছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক ব্যাপার সকল আমাদিগের হইতে এতদূর সংস্থিত যে, তদালোচনায় আমাদের বাহ্য

দুই জন সাধক আমাদের বড় নিকট। দুইজনই বৈদ্য, দুইজনই কবি। এক রামপ্রসাদ সেন, আর এক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইঁহারা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না, কেহই ঈশ্বরকে প্রভু, সখা, পুত্র বা কান্তভাবে দেখেন নাই। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিয়া ভক্তি সাধিত করিয়াছিলেন —ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃভাবে। রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প।

তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমার॥
পিতৃ নামে নাম পেয়ে, উপাধি পেয়েছি।
জন্মভূমি জননীর, কোলেতে বসেছি॥
তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়।
তবে কেন গুপ্তভাবে, ভাব গুপ্ত রয়?

পুনশ্চ—আরও নিকটে—

তোমার বদনে যদি, না স্বরে বচন।
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন॥
আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায়।
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায়॥

যার এই ঈশ্বর-ভক্তি—যে ঈশ্বরকে এইরূপ সর্ব্বদা নিকটে, অতি নিকটে দেখে—ঈশ্বর-সংসর্গতৃষ্ণায় যাহার হৃদয় এইরূপে দগ্ধ—সে কি বিলাসী হইতে পারে? হয় হউক। আমরা এরূপ বিলাসী ছাড়িয়া সন্ন্যাসী দেখিতে চাই না।

তবে ঈশ্বর সন্ন্যাসী, হবিষ্যাশী বা অভোক্তা ছিলেন না। পাঁটা, তপ্‌সে মাছ বা আনারসের গুণ গারিতে ও রসাস্বাদনে, উভয়েই সক্ষম ছিলেন। যদি ইহা বিলাসিতা হয়, তিনি বিলাসী ছিলেন। তাঁহার বিলাসিতা তিনি নিজে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—

লক্ষ্মীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে।
কিছু মাত্র সুখ নাই, হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥
যতক্ষণ থাকে ধন, তোমার আগারে।
নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসারে॥
ইথে যদি কমলার, মন নাহি সরে।
প্যাঁচা লয়ে যান মাতা, কৃপণের ঘরে॥

শাকান্নমাত্র যে ভোজন না করে, তাহাকেই বিলাসীমধ্যে গণনা করিতে হইবে, ইহাও আমি স্বীকার করি না। গীতায় ভগবদুক্তি এই—

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
স্নিগ্ধা রস্যা স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

স্থূলকথা এই, যাহা আগে বলিয়াছি—ঈশ্বরগুপ্ত মেকির বড় শত্রু। মেকি মানুষের শত্রু, এবং মেকি ধর্ম্মের শত্রু। লোভী, পরদ্বেষী অথচ হবিষ্যাশী ভণ্ডের ধর্ম্ম তিনি গ্রহণ করেন নাই। ভণ্ডের ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া তিনি জানিতেন না। তিনি জানিতেন, ধর্ম্ম ঈশ্বরানুরাগে, আহারত্যাগে নহে। যে ধর্ম্মে ঈশ্বরানুরাগ ছাড়িয়া পানাহারত্যাগকে ধর্ম্মের স্থানে খাড়া করিতে চাহিত—তিনি তাহার শত্রু। সেই ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ পাঁটার স্তোত্র, আনারসের গুণগানে এবং তপ্‌সের মহিমা-বর্ণনায় কবির এত সুখ হইত। মানুষটা বুঝিলাম নিজে ধার্ম্মিক, ধর্ম্মে খাঁটি, মেকির উপর খড়্গহস্ত। ধার্ম্মিকের কবিতায় অশ্লীলতা কেন দেখি, বোধ হয়, তাহা বুঝিয়াছি। বিলাসিতা কেন দেখি, বোধ হয়, তাহা এখন বুঝিলাম।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কথা বলিতে বলিতে তাঁহার ব্যঙ্গের কথায়, ব্যঙ্গের কথা হইতে তাঁহার অশ্লীলতার কথায়, অশ্লীলতার কথা হইতে তাঁহার বিলাসিতার কথায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম। এখন ফিরিয়া যাইতে হইতেছে।

অশ্লীলতা যেমন তাঁহার কবিতার এক

প্রধান দোষ, শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা তেমনি আর এক প্রধান দোষ। শব্দচ্ছটায়, অনুপ্রাস যমকের ঘটায় তাঁহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায়। অনুপ্রাস যমকের অনুরোধ অর্থের ভিতর কি ছাই-ভস্ম থাকিয়া যায়, কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র অনুধাবন করিতেছেন না দেখিয়া, অনেক সময় রাগ হয়, দুঃখ হয়, হাসি পায়, দয়া হয়, পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে কারণে তাঁহার অশ্লীলতা, সেই কারণে এই যমকানুপ্রাসে অনুরাগ দেশ,কাল,পাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় হইতে যমকানুপ্রাসের বড় বাড়াবাড়ি। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্বেই—কবিওয়ালার কবিতায়, পাঁচালীওয়ালার পাঁচালীতে, ইহার বেশী বাড়াবাড়ি। দাশরথি রায় অনুপ্রাস যমকে বড় পটু—তাই তাঁর পাঁচালী লোকের এত প্রিয় ছিল। দাশরথি রায়ের কবিত্ব না ছিল, এমত নহে। কিন্তু অনুপ্রাস যমকের দৌরাত্ম্যে তাহা প্রায় একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; পাঁচালীওয়ালা ছাড়িয়া তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পান নাই। এই অলঙ্কার-প্রয়োগের পটুতায় ঈশ্বর গুপ্তের স্থান তার পরেই—এত অনুপ্রাস যমক আর কোন বাঙ্গালীতে ব্যবহার করে নাই। এখানেও মার্জ্জিত রুচির অভাব জন্য বড় দুঃখ হয়।

অনুপ্রাস যমক যে সর্ব্বত্রই দুষ্য, এমত কথা আমি বলি না। ইংরাজীতে ইহা বড় কদর্য্য শুনায় বটে, কিন্তু সংস্কৃতে ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময়েই বড় মধুর। কিছুরই বাহুল্য ভাল নহে—অনুপ্রাস যমকের বাহুল্য বড় কষ্টকর। রাখিয়া ঢাকিয়া, পরিমিত ভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে বড় মিঠে। বাজালাতেও তাই। মধুসূদন দত্ত মধ্যে মধ্যে পদ্যে অনুপ্রাসের ব্যবহার করেন,—বড় বুঝিয়া সুঝিয়া, রাখিয়া ঢাকিয়া, ব্যবহার করেন—মধুর হয়। শ্রীমান্ অক্ষয়চন্দ্র সরকার গদ্যে কখন কখন দুই এক বুঁদ অনুপ্রাস ছাড়িয়া দেন, রস উছলিয়া উঠে। ঈশ্বর গুপ্তের এক একটি অনুপ্রাস বড় মিঠে—

বিবিজান চ'লে যান লবেজান ক'রে।

ইহার তুলনা নাই। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময় অসময় নাই, বিষয় অবিষয় নাই, সীমা সরহদ্দ নাই—একবার অনুপ্রাস যমকের ফোয়ারা খুলিলে আর বন্ধ হয় না। আর কোন দিকে দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দের দিকে। এইরূপ শব্দ ব্যবহারে তিনি অদ্বিতীয়। তিনি শব্দের প্রতিযোগীশূন্য অধিপতি। এই দোষ-গুণের উদাহরণস্বরূপ দুইটি গীত বোধেন্দু-বিকাশ হইতে উদ্ধৃত করিলাম,—

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

কে রে, বামা, বারিদবরণী,
তরুণী, ভালে, ধ'রেছে তরণি,
কাহার' ঘরণী, আসিয়ে ধরণী,
করিছ দনুজ-জয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ,
অনুপম রূপ, নাহি স্বরূপ,
মদননিধনকরণকারণ, চরণ শরণ লয়॥
বামা, হাসিছে ভাষিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কাররবে,বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ,হয়।
বামা, টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে,
ছলিছে ভুবনময়॥
কে রে, ললিতরসনা, বিকটদশনা;
করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা,
হয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা,
আসবে মগনা হয়॥

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

কে রে বামা, ষোড়শী রূপসী,
সুরেশী, এ যে, নহে মানুষী,
ভালে শিশু শশী, করে শোভে অসি,
রূপমসী চারু ভাস.

দেখ, বাজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প,
মারিছে লম্ফ, হ'তেছে কম্প,
গেল রে পৃথ্বী, করে কি কীর্ত্তি,
চরণে কৃত্তিবাস॥

কে রে, করাল-কামিনী, মরালগামিনী,
কাহার স্বামিনী, ভুবনভামিনী,
রূপেতে প্রভাত, করেছে যামিনী,
দামিনীজড়িত-হাস।

কে রে, যোগিনী সঙ্গে, রুধির-রঙ্গে,
রণতরঙ্গে, নাচে ত্রিভঙ্গে,
কুটিলাপাঙ্গে, তিমির অঙ্গে,
করিছে তিমির নাশ।

আহা, যে দেখি পর্ব্ব, যে ছিল গর্ব্ব,
হইল খর্ব্ব, গেল রে সর্ব্ব,
চরণসরোজে, পড়িয়ে শর্ব্ব, করিছে সর্ব্বনাশ।

দেখি, নিকট মরণ, কর রে স্মরণ,
মরণহরণ, অভয় চরণ;
নিবিড় নবীন-নীরদবরণ,মানসে কর প্রকাশ॥

ঈশ্বর গুপ্ত অপূর্ব্ব শব্দকৌশলী বলিয়া, তাঁহার যেমন এই গুরুতর দোষ জন্মিয়াছে, তিনি অপূর্ব্ব শব্দকৌশলী বলিয়া তেমনি তাঁহার এক মহৎ গুণ জন্মিয়াছে—যখন অনুপ্রাস যমকে মন না থাকে,তখন তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছিলেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায় এমন বাঙ্গালীর এমন প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন বিকার নাই—ইংরেজীনবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না; টলে না, বাঁকে না—সরল,সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই—আর লিখিবার সম্ভাবনাও নাই। কেবল ভাষা নহে—ভাবও তাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা; দেশী ভাব প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতায় কেলাকা ফুল নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা-প্রচারের জন্য আমরা যে উদ্‌যোগী—তাহার বিশেষ কারণ, তাঁহার ভাষার এই গুণ। খাঁটি বাঙ্গালা আমাদিগের বড় মিঠে লাগে—ভরসা করি, পাঠকেরও লাগিবে। এমন বলিতে চাই না যে, ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নতি হইতেছে না বা হইবে না। হইতেছে ও হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে জাতি হারাইয়া ভিন্ন ভাষার অনুকরণ মাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতা প্রাপ্ত না হয়,তাহাও দেখিতে হয়। বাঙ্গালা ভাষা বড় দোটানার মধ্যে পড়িয়াছে। ত্রিপথগামিনী এই স্রোতস্বতীর ত্রিবেণীর মধ্যে আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র লেখকেরা অনেক ঘুরপাক খাইতেছি। একদিকে সংস্কৃতের স্রোতে মরাগাঙ্গে উজান বহিতেছে—কত "ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রাড়্‌বিপাক্ মলিম্লূচ" গুণ ধরিয়া সেকেলে বোঝাই নৌকা সকল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না—আর একদিকে ইংরেজির ভরাগাঙ্গে বেনোজল ছাপাইয়া দেশ ছারখার করিয়া তুলিয়াছে—মাধ্যাকর্ষণ, যবক্ষার জান,ইবোলিউশন,ডিবলিউশন প্রভৃতি জাহাজ,পিনেস, বজরা, ক্ষুদে লঞ্চের জ্বালায় দেশ উৎপীড়িত, মাঝে স্বচ্ছ সলিলা পুণ্যতোয়া কৃশাঙ্গী এই বাঙ্গালা ভাষার স্রোতঃ বড় ক্ষীণ বহিতেছে। ত্রিবেণীর আবর্ত্তে পড়িয়া লেখক তুল্যরূপেই ব্যতিব্যস্ত। এ সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রচারে কিছু উপকার হইতে পারে।

ঈশ্বর গুপ্তের আর এক গুণ, তাঁহার কৃত সামাজিক ব্যাপার সকলের বর্ণনা অতি মনোহর। তিনি যে সকল রীতি-নীতি বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে বা হইতেছে। সে সকল পাঠকের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে, ভরসা করি।

ঈশ্বর গুপ্তের স্বভাব-বর্ণনা নবজীবনে বিশেষ প্রকারে প্রশংসিত হইয়াছে। আমরা ততটা প্রশংসা করি না। ফলে,তাঁহার যে বর্ণনার শক্তি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। তাহার উদাহরণ এই সংগ্রহে পাঠক মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইবেন। "বর্ষাকালের নদী","প্রভাতের পদ্ম" প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে তাহার পরিচয় পাইবেন।

স্থূল কথা, তাঁর কবিতার অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কবিতায় নাই। যাঁহারা বিশেষ প্রতিভাশালী, তাঁহারা প্রায় আপন আপন সময়ের অগ্রবর্ত্তী। ঈশ্বর গুপ্তও আপন সময়ের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। আমরা দুই একটা উদাহরণ দি।

প্রথম, দেশবাৎসল্য। বাৎসল্য পরমধর্ম্ম; কিন্তু এ ধর্ম্ম অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা দেশে ছিল না। কখনও ছিল কি না বলিতে পারি না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ,আপন আপন জাতি, বা আপন আপন ধর্ম্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশবাৎসল্যের ন্যায় নহে—অনেক নিকৃষ্ট। মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও তাঁহাদের অপেক্ষাও তীব্র ও বিশুদ্ধ। নিম্ন কয় ছত্র পদ্য ভরসা করি,সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন,—

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

তখনকার লোকের কথা দূরে থাক্, এখনকার কয়জন লোকে ইহা বুঝে? এখনকার কয়জন লোক এখানে ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ? ঈশ্বর গুপ্তের কথায় যা, কাজেও তাই ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরদিগের প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেন না, দেশের কুকুর লইয়াও আদর করিতেন। মাতৃভাষা সম্বন্ধে যে কবিতাটি আছে, পাঠককে তাহা পড়িতে বলি। "মাতৃসম মাতৃ ভাষা।" সৌভাগ্যক্রমে এখন অনেকে ঝিতেছেন,কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে কে সাহস করিয়া এ কথা বলে?" "বাঙ্গালা বুঝিতে পারি", এ কথা স্বীকার করিতে অনেকের লজ্জা হইত। আজিও না কি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্য নরাধম আছে,যাহারা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করে,যে তাহার অনুশীলন করে, তাহাকেও ঘৃণা করে এবং আপনাকে মাতৃভাষা অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ইংরেজিনবীশ বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনার গৌরববৃদ্ধির চেষ্টা পায়। যখন এ মহাত্মারা সমাজে আদৃত, তখন এ সমাজ ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ হইবার অনেক বিলম্ব আছে।

দ্বিতীয়, ধর্ম্ম। ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মেও সমকালিক লোকদিগের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন তিনি হিন্দু ছিলেন,কিন্তু তখনকার লোকদিগের ন্যায় উপধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলিতেন না। এখন যাহা বিশুদ্ধ হিন্দু-ধর্ম্ম বলিয়া শিক্ষিত-সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই গ্রহণ করিতেছেন, ঈশ্বর গুপ্ত সেই বিশুদ্ধ পরমমঙ্গলময় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম কি, তাহা

অবগত হইবার জন্য, তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ হইয়াও অধ্যাপকের সাহায্যে বেদান্তাদি দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্য্য হেতু সে সকলে যে তাঁহার বেশ অধিকার জন্মিয়াছিল, তাঁহার প্রণীত গদ্য-পদ্যে তাহা বিশেষ জানা যায়। এক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত ব্রাহ্ম ছিলেন, আদিব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে সমবেত হইয়া বক্তৃতা, উপাসনাদি করিতেন। এ জন্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন এবং আদৃত হইতেন।

তৃতীয়। ঈশ্বর গুপ্তের রাজনীতি বড় উদার ছিল। তাহাতেও যে তিনি সময়ের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন, সে কথা বুঝাইতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়, সুতরাং নিরস্ত হইলাম।

এক্ষণে এই সংগ্রহ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমি ক্ষান্ত হইব। ঈশ্বর গুপ্ত যত পদ্য লিখিয়াছেন, এত আর কোন বাঙ্গালী লেখে নাই। গোপাল-বাবুর অনুমান, তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছত্র পদ্য লিখিয়াছেন। এখন যাহা পাঠককে উপহার দেওয়া যাইতেছে, তাহা উহার ক্ষুদ্রাংশ। যদি তাঁহার প্রতি বাঙ্গালী পাঠক-সমাজের অনুরাগ দেখা যায়, তবে ক্রমশঃ আরও প্রকাশ করা যাইবে। এ সংগ্রহ প্রথম খণ্ড মাত্র। বাছিয়া বাছিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলি যে ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি, এমত নহে। যদি সকল ভাল কবিতাগুলিই প্রথম খণ্ডে দিব, তবে অন্যান্য খণ্ডে কি থাকিবে?

নির্ব্বাচনকালে আমার এই লক্ষ্য ছিল যে, ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রকৃতি কি, যাহাতে পাঠক বুঝিতে পারেন, তাহাই করিব। এজন্য কেবল আমার পছন্দমত কবিতাগুলি না তুলিয়া সকল রকমের কবিতা কিছু কিছু তুলিয়াছি অর্থাৎ কবির যত রকম রচনাপ্রথা ছিল; সকল রকমের কিছু কিছু উদাহরণ দিয়াছি। কেবল যাহা অপাঠ্য, তাহারই উদাহরণ দিই নাই। আর "হিতপ্রভাকর" "বোধেন্দুবিকাশ" "প্রবোধপ্রভাকর" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কিছু সংগ্রহ করি নাই। কেন না, সেই গ্রন্থগুলি অবিকল পুনর্মুদ্রিত হইবার সম্ভাবনা আছে। তদ্ভিন্ন তাঁহার গদ্য রচনা হইতে কিছুই উদ্ধৃত করি নাই। ভরসা করি, তাহার স্বতন্ত্র একখণ্ড প্রকাশিত হইতে পারিবে।

পরিশেষে বক্তব্য যে, অনবকাশ—বিদেশে বাস প্রভৃতি কারণে আমি মুদ্রাঙ্কনকার্য্যের কোন তত্ত্বাবধান করিতে পারি নাই। তাহাতে যদি দোষ হইয়া থাকে, তবে পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ।

(১২৮২ সাল)

চারি বৎসর গত হইল, বঙ্গদর্শন-প্রকাশ আরম্ভ হয়। যখন ইহাতে আমি প্রবৃত্ত হই, তখন আমার কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পত্রসূচনায় কতকগুলি ব্যক্ত করিয়াছিলাম, কতকগুলি অব্যক্ত ছিল, এক্ষণে তাহার অধিকাংশই সিদ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে আর বঙ্গদর্শন রাখিবার প্রয়োজন নাই।

যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশারম্ভ হয়, তখন সাধারণের পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সাময়িক পত্রের অভাব নাই। যে অভাব পূর্ণ করিবার ভার বঙ্গদর্শন গ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে বান্ধব, আর্য্যদর্শন প্রভৃতির দ্বারা তাহা পূরিত হইবে। অতএব বঙ্গদর্শন রাখিবার আর প্রয়োজন নাই। আমার অপেক্ষা দক্ষতর ব্যক্তি এই ভার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত এবং বঙ্গদর্শনের জন্য আমি যে শ্রম স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা সার্থক বিবেচনা করি। তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ পূর্ব্বক আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

এ সংবাদে কেহ সন্তুষ্ট, কেহ ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। এ কথায় আত্মশ্লাঘার বিষয় কিছুই নাই; কেন না, এমন ব্যক্তি বা এমন বস্তু জগতে নাই, যাহার প্রতি কেহ না কেহ অনুরক্ত নহেন। যদি কেহ বঙ্গদর্শনের এমত বন্ধু থাকেন যে, বঙ্গদর্শনের লোপ তাঁহার কষ্টদায়ক হইবে, তাঁহার প্রতি আমার এই নিবেদন যে, যখন আমি বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ করি, তখন এমত সংকল্প করি নাই যে, যতদিন বাঁচিব, এই বঙ্গদর্শনে আবদ্ধ থাকিব। ব্রতবিশেষ গ্রহণ করিয়া কেহই চিরদিন তাহাতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। মনুষ্যজীবন ক্ষণস্থায়ী, এই অল্পকালমধ্যে সকলকেই অনেকগুলি অভীষ্টসিদ্ধ করিতে হয়, এই জন্য কোন একটিতে কেহ চিরকাল আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ইহসংসারে অনেক গুরুতর ব্যাপার আছে বটে যে, তাহাতে এই জীবন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিবদ্ধ রাখাই উচিত। কিন্তু এই ক্ষুদ্র বঙ্গদর্শন তাদৃশ গুরুতর ব্যাপার নহে, এবং আমিও তাদৃশ গুরুতর ব্যাপারে নিযুক্ত হইবার যোগ্যপাত্র নহি। যাঁহারা বঙ্গদর্শনের লেখা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইবেন, তাঁহাদের প্রতি আমার এই নিবেদন, আর যাঁহারা ইহাতে আহ্লাদিত হইবেন, তাঁহাদিগকে একটি মন্দ সংবাদ শুনাইতে আমি বাধ্য হইলাম। বঙ্গদর্শন আপাততঃ রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনও যে এই পত্র পুনর্জীবিত হইবে না, এমত অস্বীকার করিতেছি না। প্রয়োজন দেখিলে স্বতঃ অন্যতঃ ইহা পুনর্জীবিত করিবার ইচ্ছা রহিল। বঙ্গদর্শন-সম্পাদন-কালে আমি অনেকের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়াছি, সেই কৃতজ্ঞতা-স্বীকার, এই সময়ে আমার প্রধান কার্য্য।

প্রথমতঃ, সাধারণপাঠকশ্রেণীর নিকট আমি বিশেষ বাধ্য। তাঁহারা যে পরিমাণে বঙ্গদর্শনের প্রতি আদর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমার আশার অতীত। আমি একদিনের তরেও ব্যক্তিবিশেষের আদর ও উৎসাহের কামনা করি নাই, কিন্তু সাধারণ পাঠকের এই উৎসাহ ও যত্ন না দেখিলে আমি এতদিন বঙ্গদর্শন রাখিতাম কি না সন্দেহ। এই বৎসর বঙ্গদর্শনের প্রতি তাদৃশ যত্ন করি নাই, এবং ১২৮২ সালে বঙ্গদর্শন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুল্য

হয় নাই, তথাপি পাঠকশ্রেণীর আদরের লাঘব বা অনাস্থা দেখি নাই। ইহার জন্য আমি বঙ্গীয় পাঠকগণের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। তৎপরে যে সকল কৃতবিদ্য সুলেখকদিগের সহায়তাতেই বঙ্গদর্শন এত আদরণীয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কাছে আমার এই অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করিতে হইতেছে। বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বাবু রামদাস সেন, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির লিপিশক্তি, বিদ্যাবত্তা, উৎসাহ এবং শ্রমশীলতাই বঙ্গদর্শনের উন্নতীর মূল কারণ। ঈদৃশ ব্যক্তিগণের সহায়তা লাভ করিয়াছিলাম, ইহা আমার অল্প শ্লাঘার বিষয় নয়।

আর একজন আমার সহায় ছিলেন—সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখ-দুঃখের ভাগী—তাঁহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনকে তাঁহার নামোল্লেখও করি নাই। কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ, কে তাহার ভাগী হইবে? কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে? অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক—আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু—আমার সঙ্গী, সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া, তখনও কিছু বলি নাই, এখনও আর কিছু বলিলাম না।

তৃতীয়, যে সকল সহযোগিবর্গ বঙ্গদর্শনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমার শত শত ধন্যবাদ। ইহাতেও আমার একটি স্পর্দ্ধার কথা আছে। উচ্চশ্রেণীর দেশী সংবাদপত্র মাত্রেই বঙ্গদর্শনের অনুকূল ছিলেন। অধিকতর স্পর্দ্ধার কথা এই যে, নিম্নশ্রেণীর সংবাদপত্র মাত্রেই ইহার প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন। ইংরেজেরা বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের বড় খবর রাখেন না। কিন্তু এক্ষণে গতাসু ইণ্ডিয়ান অবজর্ব্বর বঙ্গদর্শনের বিশেষ সহায়তা করিতেন। আমি ইণ্ডিয়ান অবজর্ব্বর এবং ইণ্ডিয়ান মিররের নিকট যেরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এরূপ আর কোন ইংরেজি পত্রের নিকট প্রাপ্ত হই নাই। অবজর্ব্বর এক্ষণে গত হইয়াছেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ মিরর অদ্যাপি উন্নতভাবে দেশের মঙ্গল-সাধন করিতেছেন এবং ঈশ্বরেচ্ছায় বহুকাল তদ্রূপ মঙ্গলসাধন করিবেন; তাঁহাকে আমার শত সহস্র ধন্যবাদ। বঙ্গদর্শনের সহিত অনেক বিষয়ে তাঁহার মতভেদ থাকাতেও তিনি যে এরূপ সহৃদয়তা প্রকাশ পূর্ব্বক বল প্রদান করিতেন, ইহা তাঁহার উদারতার সামান্য পরিচয় নহে।

সহৃদয়তা এবং বল, আমি কেবল অবজর্ব্বর ও মিররের কাছে প্রাপ্ত হইয়াছি, এমত নহে। দেশী সংবাদপত্রের অগ্রগণ্য হিন্দু প্রেট্রিয়ট এবং স্থিরবুদ্ধি ও দেশবৎসল সহচরের দ্বারা আমি তদ্রূপ উপকৃত, এবং তাঁহাদের কাছে আমি সেইরূপ কৃতজ্ঞ। নিরপেক্ষ সদ্বিদ্বান্ এবং যথার্থবাদী ভারতসংস্কারক বিজ্ঞ এডুকেশন গেজেট ও ওজস্বিনী, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালিনী সাধারণী এবং সত্যপ্রিয় সাপ্তাহিক সমাচার প্রভৃতি পত্রকে বহুবিধ আনুকূল্যের জন্য আমি শত শত ধন্যবাদ করি।

চারি বৎসর হইল, বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনায় বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদবুদ বলিয়াছিলাম, আজি সেই জলবুদবুদ জলে মিশাইল।

বঙ্গদর্শনের পুনরুত্থান।

(১২৮৪ সাল)

যখন বঙ্গদর্শনের চতুর্থ ভাগ সমাপ্ত করিয়া আমি পাঠকদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করি, তখন স্বীকার করিয়াছিলাম, প্রয়োজন দেখিলে স্বতঃ হউক, অন্যতঃ হউক, বঙ্গদর্শন পুনর্জীবিত করিব।

বঙ্গদর্শনের লোপ জন্য আমি অনেকের কাছে তিরস্কৃত হইয়াছি, সেই তিরস্কারের প্রাচুর্য্যে আমার এমত প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, বঙ্গদর্শনে দেশের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে বলিয়া ইহা পুনর্জীবিত হইল।

যাহা একজনের উপর নির্ভর করে, তাহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। বঙ্গদর্শন যত দিন আমার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, স্বাস্থ্য বা জীবনের উপর নির্ভর করিবে, তত দিন বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ব অসম্ভব। এজন্য আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম। বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ববিধান করাই আমার উদ্দেশ্য।

যাঁহার হস্তে বঙ্গদর্শন সমর্পণ করিলাম, তাঁহার দ্বারা ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে, ইহা আমার সম্পূর্ণ ভরসা আছে, তাঁহার সঙ্কল্প সকল আমি অবগত আছি। তিনি নিজের উপর নির্ভর যত করুন না করুন, দেশীয় সুলেখক মাত্রেরই উপর অধিক-তর নির্ভর করিবেন। তাঁহার ইচ্ছা, বঙ্গদর্শনকে সুশিক্ষিতমণ্ডলীর সাধারণ উক্তি-পত্ররূপে পরিণত করেন, তাহা হইলেই বঙ্গদর্শন স্থায়ী এবং মঙ্গলপ্রদ হইবে।

ইউরোপীয় সাময়িক পত্র এবং এতদ্দেশীয় সাময়িক পত্রের বিশেষ প্রভেদ এই যে, এখানে যিনিই সম্পাদক, তিনিই প্রধান লেখক—ইউরোপীয় সম্পাদক মাত্র—কদাচিৎ লেখক। পত্র এবং প্রবন্ধের উদ্বাহের তিনি ঘটক মাত্র, স্বয়ং বরকর্ত্তা হইয়া সচরাচর উপস্থিত হন না, এবার বঙ্গদর্শন সেই প্রণালী অবলম্বন করিল।

যাহা সকলের মনোনীত, তাহার সহিত সম্বন্ধ গৌরবের বিষয়। আমি সে গৌরবের আকাঙ্ক্ষা করি। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম বটে, কিন্তু ইহার সহিত আমার সম্বন্ধবিচ্ছেদ হইল না; যত দিন বঙ্গদর্শন থাকিবে, আমি ইহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিব এবং যদি পাঠকেরা বিরক্ত না হয়েন, তবে ইহার স্তম্ভে তাঁহাদিগের সম্মুখে মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া বঙ্গদর্শনের গৌরবে গৌরব লাভ করিবার স্পর্দ্ধা করিব।

এক্ষণে বঙ্গদর্শনকে অভিনব সম্পাদকের হস্তে সমর্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, ইহার সুশীতল ছায়ায় এই তপ্ত ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত হউক। আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, ক্ষুদ্রশক্তি, সেই মহতী ছায়াতলে অলক্ষিত থাকিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করি, ইহাই আমার বাসনা।

মৃণালিনীর পূর্ব্বসংস্করণের অংশ*

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রঙ্গভূমি।

মহম্মদ ঘোরির প্রতিনিধি তুর্কস্থানীয় কুতব-উদ্দীন যুধিষ্ঠির ও পৃথ্বীরাজের সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন। দিল্লী, কান্যকুব্জ, মগধাদি প্রাচীন সাম্রাজ্য-সকল যবনকরকবলিত হইয়াছে। অশোক বা হর্ষবর্দ্ধন, বিক্রমাদিত্য বা শি[illegible]দিত্য ইহাঁদের পরিত্যক্ত ছত্রতলে [illegible] আশ্রিত হইয়াছে। যবনের শ্বেতচ্ছত্রে সকলের গৌরব ছায়ান্ধকারব্যাপ্ত করিয়াছে।

বঙ্গীয় ৬০৬ অব্দে যবন কর্ত্তৃক মগধ-জয় হইল। প্রভূত রত্নরাশি সঞ্চিত করিয়া বিজয়ী সেনাপতি বখ্‌তিয়া খিলিজি রাজপ্রতিনিধির চরণে উপঢৌকন প্রদান করিলেন।

কুতব-উদ্দীন প্রসন্ন হইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজিকে পূর্ব্বভারতের আধিপত্যে নিযুক্ত করিলেন। গৌরবে বখ্‌তিয়ার খিলিজি রাজপ্রতিনিধির সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন।

কেবল ইহাই নহে, বিজয়ী সেনাপতির সম্মানার্থে কুতব-উদ্দীন মহাসমারোহপূর্ব্বক উৎসবাদির জন্য দিনাবধারিত করিলেন।

উৎসববাসর আগত হইল। প্রভাতাবধি "রায় পিথোরার" প্রস্তরময় দুর্গের প্রাঙ্গণভূমি জনাকীর্ণ হইতে লাগিল। সশস্ত্রে শত শত সিন্ধুনদপারবাসী খর্ব্বল যোদ্ধ বর্গ রঙ্গাঙ্গনের চারিপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল; তাহাদিগের করস্থিত উন্নতফলক বর্শার অগ্রভাগে প্রাতঃসূর্য্যকিরণ জ্বলিতে লাগিল। মালাসংবদ্ধ কুসুমদামের ন্যায় তাহাদিগের বিচিত্র উষ্ণীষশ্রেণী শোভা পাইতে লাগিল। তৎপশ্চাতে দাস, শিল্পী প্রভৃতি অপর মুসলমানেরা বিবিধ বেশভূষা করিয়া দণ্ডায়মান হইল। যে দুই একজন হিন্দু কৌতূহলের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়া, সাহসে ভর করিয়া রঙ্গদর্শনে আসিয়াছিল, তাহারা তৎপশ্চাতে স্থান পাইল, অথবা স্থান পাইল না, কেন না, যবনদিগের বেত্রাঘাত-পীড়িত এবং ভীত হইয়া অনেককে পলায়ন করিতে হইল।

রাজপ্রতিনিধি সদলে সমাগত হইয়া রঙ্গাঙ্গনের শিরোভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন রহস্য আরম্ভ হইল। প্রথমে মল্লদিগের যুদ্ধ, পরে খড়্গী, শূলী, ধানুকী, সশস্ত্র অশ্বারোহীর যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরে মত্ত সেনামাতঙ্গসকল মাহুতসহিত আনীত হইয়া নানাবিধ ক্রীড়াকৌশল দেখাইতে লাগিল। দর্শকেরা মধ্যে মধ্যে একতানমনে ক্রীড়াসন্দর্শন করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে আপন আপন মন্তব্যসকল পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। এক স্থানে কয়েকটি বর্ষীয়ান্ মুসলমান একত্র হইয়া বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন।

একজন কহিল, "সত্য সত্যই কি পারিবে ?"

অপর উত্তর করিল, "না পারিবে কেন ? ঈশ্বর যাহাকে সদয়, সে কি না পারে ? রোস্তম পাহাড় বিদীর্ণ করিয়াছিল, তবে

---

* গ্রন্থকার মৃণালিনীর পরিবর্ত্তিত সংস্করণে উক্ত অংশ বাদ দিয়াছিলেন, কিন্তু পাঠকগণ এই অংশ পাঠে আগ্রহান্বিত বলিয়া ইহা আমরা প্রকাশিত করিলাম।

বখ্‌তিয়ার যুদ্ধে একটা হাতী মারিতে পারিবে না?"

তৃতীয় ব্যক্তি কহিল, "তথাপি উহার ঐ ত বানরের ন্যায় শরীর, এ শরীর লইয়া মত্তহস্তীর সঙ্গে যুদ্ধে সাহস করা পাগলের কাজ।"

প্রথম প্রস্তাবকর্ত্তা কহিল, "বোধ হয়, খিলিজিপুত্র এক্ষণে তাহা বুঝিয়াছে; সেই জন্য এখনও অগ্রসর হইতেছে না।"

আর এক ব্যক্তি কহিল, "আরে, বুঝিতেছ না, বখ্‌তিয়ারের মৃত্যুর জন্য পাঁচজনে ষড়্‌যন্ত্র করিয়া এই এক উপায় করিয়াছে। বেহার জয় করিয়া বখ্‌তিয়ারের বড় দম্ভ হইয়াছে। আর রাজপ্রসাদ সকলই তিনি একক ভোগ করিতেছেন। এইজন্য পাঁচজনে বলিল যে, বখ্‌তিয়ার অমানুষ বলবান্, চাহি কি মত্ত হাতী একা মারিতে পারে। কুতব উদ্দীন তাহা দেখিতে চাহিলেন। বখ্‌তিয়ার দম্ভে লঘু হইতে পারিলেন না, সুতরাং অগত্যা স্বীকার করিয়াছেন।"

এই বলিতে বলিতে রঙ্গাঙ্গনমধ্যে তুমুল কোলাহলধ্বনি সংঘোষিত হইল। দ্রষ্টৃবর্গ সভয়চক্ষে দেখিলেন, পর্ব্বতাকার, শ্রাবণের দিগন্তব্যাপী জলদাকার, এক মত্ত মাতঙ্গ মাহুত কর্ত্তৃক আনীত হইয়া, রঙ্গাঙ্গনমধ্যে দুলিতে দুলিতে প্রবেশ করিল। তাহার মুহুর্মুহুঃ শুণ্ডাস্ফালন, মুহুর্মুহুঃ বিপুল কর্ণতাড়ন, এবং বিশাল বঙ্কিম দন্তদ্বয়ের অমল-শ্বেত স্থির শোভা দেখিয়া দর্শকেরা সভয়ে পশ্চাদ্গত হইয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চাদপসারী দর্শকদিগের বস্ত্রমর্ম্মরে, ভয়সূচক বাক্যে, এবং পদধ্বনিতে কিয়ৎক্ষণ রঙ্গাঙ্গনমধ্যে অস্ফুট কলরব হইতে লাগিল। অল্পক্ষণমধ্যে সে কলরব নিবৃত্ত হইল। কৌতূহলের আতিশয্যে সেই জনাকীর্ণ স্থল একেবারে শব্দহীন হইল। সকলে রুদ্ধনিশ্বাসে বখ্‌তিয়ার খিলিজির রঙ্গপ্রবেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন বখ্‌তিয়ার খিলিজিও রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া গজরাজের সম্মুখীন হইয়া দেখা দিলেন। যাহারা পূর্ব্বে তাঁহাকে চিনিত না, তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল, অপিচ বিরক্ত হইল। তাঁহার শরীরে বীরলক্ষণ কিছুই ছিল না। তাঁহার দেহের আয়তন অতি ক্ষুদ্র, গঠন অতি কদর্য্য। শরীরের সকল স্থানই দোষবিশিষ্ট। তাঁহার বাহুযুগল বিশেষ কুরূপশালিত্বের কারণ হইয়াছিল। "আজানুলম্বিত বাহু" সুলক্ষণ হইলে হইতে পারে, কিন্তু দেখিতে কদর্য্য সন্দেহ নাই। বখ্‌তিয়ারের বাহুযুগল জানুর অধোভাগ পর্য্যন্ত লম্বিত, সুতরাং আরণ্যনরের সহিত তাঁহার [illegible] সাদৃশ্য লক্ষিত হইত। তাঁহাকে দেখিয়া একজন মুসলমান আর একজনকে কহিল, "ইনিই বেহার জয় করিয়াছেন? এই শরীরে এত বল?"

একজন অস্ত্রধারী হিন্দু যুবা নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল। সে কহিল, "পবননন্দন হনূ কলিকালে মর্কটরূপ ধারণ করিয়াছেন।"

যবন কহিল, "তুই কি বলিস্ রে কাফের?"

হিন্দু পুনরপি কহিল, "পবননন্দন কলিতে মর্কটরূপ ধারণ করিয়াছেন।"

যবন কহিল, "আমি তোর কথা বুঝিতে পারিতেছি না, তুই তীর-ধনু লইয়া আসিয়াছিস্ কেন?"

হিন্দু কহিল, "আমি বাল্যকালে তীর-ধনু লইয়া খেলা করিতাম। সেই অবধি অভ্যাসদোষে তীর-ধনু আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।"

যবন কহিল, "হিন্দুদিগের সে অভ্যাসদোষ ক্রমে ঘুচিতেছে। এ খেলায় আর

এখন কাফেরের সুখ নাই। সুভান এল্লা! এ কি?"

এই বলিয়া যবন রঙ্গভূমি প্রতি অনিমেষ-লোচনে চাহিয়া রহিল। বখ্‌তিয়ার নিজ দীর্ঘভুজে এক শাণিত কুঠার ধারণ করিয়া বারণরাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন; কিন্তু বারণ তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া ইতস্ততঃ সমযোগ্য প্রতিযোগীর অন্বেষণ করিতে লাগিল। ক্ষুদ্রকায় একজন মনুষ্য যে তাহার রণাকাঙ্ক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা তাহার হস্তিবুদ্ধিতে উপলব্ধি হইল না। বখ্‌তিয়ার মাহুতকে আজ্ঞা করিলেন যে, হস্তীকে তাড়াইয়া আমার উপর দাও। মাহুত গজশরীরে চরণাঙ্গুলি-সঞ্চালন দ্বারা সঙ্কেত করিয়া বখ্‌তিয়ারকে আক্রমণ করিল। বখ্‌তিয়ার নিমেষমধ্যে করিশুণ্ডপ্রক্ষেপ হইতে ব্যবহিত হইয়া শুণ্ডোপরে তীব্র কুঠারাঘাত করিল। যূথপতি ব্যথায় ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং ক্রোধে পতনশীল পর্ব্বতবৎ বেগে প্রহারকারীর প্রতি ধাবমান হইল; কুঠারাঘাতে সে বেগরোধের কোন সম্ভাবনা রহিল না। দ্রষ্টৃবর্গ সকলে দেখিল যে, পলকমধ্যে বখ্‌তিয়ার কর্দ্দমপিণ্ডবৎ দলিত হইবেন। সকলে বাহুত্তোলন করিয়া "পলাও পলাও" শব্দ করিতে লাগিল। কিন্তু বখ্‌তিয়ার মগধ জয় করিয়া আসিয়া রঙ্গভূমে পলায়নতৎপর হইবেন কি প্রকারে? তিনি তদপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া হস্তিপদতলে প্রাণত্যাগ মনে মনে স্বীকার করিলেন।

করিরাজ আত্মবেগভরে তাঁহার পৃষ্ঠের উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল; একেবারে বখ্‌তিয়ারকে দলিত করিবার মানসে নিজ বিশাল চরণ উত্তোলন করিল; কিন্তু তাহা বখ্‌তিয়ারের স্কন্ধে স্থাপিত হইতে না হইতেই [illegible] অট্টালিকার ন্যায়, সশব্দে মহা উৎ-কীর্ণ করিয়া অকস্মাৎ যূথপতি ভূতলে পড়িয়া গেল। অমনি তাহার মৃত্যু হইল।

যাহারা সবিশেষ দেখিতে না পাইল, তাহারা বিবেচনা করিল যে, বখ্‌তিয়ার খিলিজি কোন কৌশলে হস্তীর বধসাধন করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ মুসলমানমণ্ডলীমধ্যে ঘোরতর জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। কিন্তু অস্ত্রে দেখিতে পাইল যে,হস্তীর গ্রীবার উপর একটি তীর বিদ্ধ রহিয়াছে। কুতব উদ্দীন বিস্মিত হইয়া সবিশেষ জানিবার জন্য মৃত গজের নিকট আসিলেন এবং স্বীয় অস্ত্রবিদ্যার প্রভাবে বুঝিতে পারিলেন যে, এই শরবেধই হস্তীর মৃত্যুর একমাত্র কারণ; বুঝিলেন যে, শর অসাধারণ বাহুবলে নিক্ষিপ্ত হইয়া স্থূল হস্তিচর্ম্ম,তৎপরে হস্তিগ্রীবার বিপুল মাংসরাশি ভেদ করিয়া মস্তিষ্ক বিদ্ধ করিয়াছে। শরনিক্ষেপকারীর আরও এক অপূর্ব্ব নৈপুণ্যলক্ষণ দেখিলেন। গ্রীবার যে স্থানে মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডমধ্যস্থ মজ্জার সংযোগ হইয়াছে,* সেই স্থানেই তীর প্রবিদ্ধ হইয়াছে। তথায় সূচিমাত্র প্রবিষ্ট হইলে জীবের প্রাণ বিনষ্ট হয়—পলকমাত্রও বিলম্ব হয় না। এই স্থানে শরবিদ্ধ না হইলে কখনই বখ্‌তিয়ারের রক্ষা সিদ্ধ হইত না। কুতব-উদ্দীন আরও দেখিলেন, তীরের গঠন সাধারণ হইতে ভিন্ন। তাহার ফলক অতি দীর্ঘ, সূক্ষ্ম এবং একটি বিশেষ চিহ্নে অঙ্কিত। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যে ব্যক্তি এই শরত্যাগ করিয়াছিল, সে অসাধারণ বাহুবলশালী; তাহার শিক্ষা বিচিত্র, এবং হস্ত অতি লঘুগতি।

কুতব-উদ্দীন গজঘাতী প্রহরণ হস্তে গ্রহণ

---

* "Medulla oblongata" পাঠকমহাশয়, "ব্রাইড অব লেমরমুরে" এইরূপ একটি বৃত্তান্ত মনে পড়িতে পারে।

করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন যে, "এ তীর কে ত্যাগ করিয়াছিল ?"

কেহ উত্তর দিল না। কুতব-উদ্দীন পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ তীর কে ত্যাগ করিয়াছিল ?"

যে যবন অনেক হিন্দু শস্ত্রধারীকে তাড়না করিয়াছিল, সে এইবার কহিল, "জাঁহাপনা! একজন কাফের এই স্থানেই দাঁড়াইয়া তীর মারিয়াছিল দেখিয়াছি; কিন্তু তাহাকে আর দেখিতেছি না।"

কুতব-উদ্দীন ভ্রূকুটি করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিমনা হইয়া রহিলেন; পরে কহিলেন, "বখ্‌তিয়ার খিলিজি মত্তহস্তী যুদ্ধে বধ করিয়াছেন, তোমরা তাঁহার প্রশংসা কর। কোন কাফের তাঁহার গৌরবের লাঘব জন্মাইবার অভিলাষে, অথবা তাঁহার প্রাণ-সংহার জন্য এই তীরক্ষেপ করিয়া থাকিবে। আমি তাহার সন্ধান করিয়া সমুচিত দণ্ডবিধান করিব। তোমরা সকলে গৃহে গিয়া আজিকার দিন আনন্দে যাপন করিও।"

ইহা শুনিয়া দর্শকগণ ধন্যবাদ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে উদ্যুক্ত হইল। ইত্যবসরে কুতব-উদ্দীন একজন পারিষদকে হস্তস্থিত তীর প্রদান করিয়া তাহার কর্ণে কর্ণে উপদেশ দিলেন; "যাহার নিকট এইরূপ তীর দেখিবে, তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। অনেকে সন্ধান কর।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

— * —

গজহন্তা।

কুতব-উদ্দীন, দেওয়ানে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বখ্‌তিয়ার খিলিজি এবং অন্যান্য বন্ধুবর্গ লইয়া কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন, এমত সময়ে কয়েকজন সৈনিক পূর্ব্বপরিচিত হিন্দু যুবাকে শৃঙ্খল যুক্ত করিয়া আনয়ন করিল।

রক্ষিগণ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া যুবাকে রাজপ্রতিনিধি-সমক্ষে উপস্থিত করিলে, কুতব-উদ্দীন বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যুবকের অবয়বও নিরীক্ষণযোগ্য। তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের ন্যূন। শরীর ঈষন্মাত্র দীর্ঘ, এবং অনতিস্থূল ও বলব্যঞ্জক। মস্তক যেরূপ পরিমিত হইলে শরীরের উপযোগী হইত, তদপেক্ষা বৃহৎ এবং তাহার গঠন অতি রমণীয়। ললাট প্রশস্ত বটে, কিন্তু অল্পবয়ঃ প্রযুক্ত অনতিবৃহৎ, তাহার মধ্যদেশে "রাজদণ্ড" নামে পরিচিত শিরা প্রকটিত। ভ্রূযুগল সূক্ষ্ম, তরললোম, তত্তলস্থ অস্থি কিছু উন্নত। চক্ষুঃ বিশেষ আয়ত নহে, কিন্তু অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য-গুণে আয়ত বলিয়া বোধ হইত। নাসা মুখের উপযোগী; অত্যন্ত দীর্ঘ নহে, কিন্তু অগ্রভাগ সূক্ষ্ম। ওষ্ঠাধর ক্ষুদ্র; সর্ব্বদা পরস্পরে সংশ্লিষ্ট; পার্শ্বভাগে অস্পৃষ্ট মণ্ডলার্দ্ধ রেখায় বেষ্টিত; ওষ্ঠে ও চিবুকে কোমল নবীন রোমাবলী শোভা পাইতেছিল। অঙ্গের গঠন বলসূচক হইলেও কর্কশতাশূন্য। বর্ণ প্রায় সম্পূর্ণ গৌর। অঙ্গে কবচ, মস্তকে উষ্ণীষ, পৃষ্ঠে তূণীর লম্বিত; করে ধনুঃ, কটিবন্ধে অসি।

কুতব-উদ্দীন যুবাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেছেন, দেখিয়া যুবা ভ্রূকুটি করিলেন এবং কুতবকে কহিলেন, "আপনার কি আজ্ঞা ?"

শুনিয়া কুতব হাসিলেন; বলিলেন, "তুমি কি শরত্যাগে আমার হস্তী বধ করিয়াছ ?"

যুবা। করিয়াছি।

কু। কেন তুমি আমার হাতী মারিলে?

যুবা। না মারিলে হাতী আপনার সেনাপতিকে মারিত।

ইহা শুনিয়া বখ্তিয়ার খিলিজি বলিলেন, "হাতী আমার কি করিত?"

যুবা। চরণে দলিত করিত।

বখ্তি। আমার কুঠার কি জন্য ছিল?

যুবা। হস্তীকে পিপীলিকাদংশনের ক্লেশানুভব করাইবার জন্য।

কুতব-উদ্দীনের ওষ্ঠাধরপ্রান্তে অল্পমাত্র হাস্য প্রকটিত হইল। সেনাপতি অপ্রতিভ হয়েন দেখিয়া কুতব-উদ্দীন তখন কহিলেন, "তুমি হিন্দু, মুসলমানের বল জান না। সেনাপতি অনায়াসে কুঠারাঘাতে হস্তী বধ করিত। তথাপি তুমি যে সেনাপতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় উদ্যোগ করিয়াছিলে—ইহাতে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইলাম। তোমাকে পুরস্কৃত করিব।" এই বলিয়া কুতব-উদ্দীন কোষাধ্যক্ষের প্রতি যুবাকে শতমুদ্রা দিতে অনুমতি করিলেন।

যুবা শুনিয়া কহিলেন, "যবনরাজ-প্রতিনিধি! শুনিয়া লজ্জিত হইলাম। যবন-সেনাপতির জীবনের মূল্য শত মুদ্রা?"

কুতব-উদ্দীন কহিলেন, "তুমি রক্ষা না করিলে যে সেনাপতির জীবন বিনষ্ট হইত, এমত নহে। তথাপি সেনাপতির মর্য্যাদানুসারে দান উচিত বটে। তোমাকে সহস্র মুদ্রা দিতে অনুমতি করিলাম।"

যুবা। যবনের বদান্যতায় অতি সন্তুষ্ট হইলাম। আমিও আপনাকে প্রতিপুরস্কৃত করিব। যমুনাতীরে আমার বাসগৃহ, সেই পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে একজন লোক দিলে, আমি আপনার পুরস্কার পাঠাইব। যদি রত্ন অপেক্ষা মুদ্রায় আপনার আদর অধিক হয়, তবে আমার প্রদত্ত রত্ন বিক্রয় করিবেন। দিল্লীর শ্রেষ্ঠীরা তদ্বিনিময়ে আপনাকে লক্ষ মুদ্রা দিবে।

কুতব-উদ্দীন কহিলেন, "হইতে পারে, তুমি ধনী। একজন্য সহস্র মুদ্রা তোমার গ্রহণযোগ্য নহে; কিন্তু তোমার বাক্য সম্মানসূচক নহে—তুমি সদভিপ্রেত কার্য্যে উদ্যত হইয়াছিলে বলিয়া অনেক ক্ষমা করিয়াছি—অধিক ক্ষমা করিব না। আমি যে তোমার রাজার প্রতিনিধি, তাহা তুমি কি বিস্মৃত হইলে?"

যুবা। আমার রাজার প্রতিনিধি ম্লেচ্ছ নহে।

কুতব-উদ্দীন সকোপ-কটাক্ষে কহিলেন, "তবে কে তোমার রাজা? কোন্ দেশে তোমার বাস?"

যুবা। মগধে আমার বাস।

কুত। মগধ এ বখ্তিয়ার কর্ত্তৃক যবনরাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

যুবা। মগধ দস্যুকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়াছে।

কুত। দস্যু কে?

যুবা। বখ্তিয়ার খিলিজি।

কুতব-উদ্দীনের চক্ষে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। কহিলেন, "তোমার মৃত্যু উপস্থিত।"

যুবা হাসিয়া কহিলেন, "দস্যুহস্তে?"

কুত। আমার আজ্ঞায় তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। আমি যবন-সম্রাটের প্রতিনিধি।

যুবা। আপনি যবন-দস্যুর ক্রীতদাস। *

কুতব-উদ্দীন ক্রোধে কম্পিত হইলেন। কিন্তু নিঃশঙ্কায় যুবকের সাহস দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কুতব-উদ্দীন রক্ষিবর্গকে আজ্ঞা করিলেন, "ইহাকে বন্ধন করিয়া বধ কর।"

বখ্তিয়ার খিলিজি ইঙ্গিতে তাঁহাকে

---

* কুতব-উদ্দীন আদৌ ক্রীতদাস ছিলেন।

নিষেধ করিলেন, পরে কুতবকে বিনয় করিয়া কহিলেন, "প্রভো! এই হিন্দু বাতুল, নচেৎ অনর্থক কেন মৃত্যুকামনা করিবে? ইহাকে বধ করায় অপৌরুষ।"

যুবা বখ্‌তিয়ারের মনের ভাব বুঝিয়া হাসিলেন; বলিলেন, "খিলিজি সাহেব! বুঝিলাম, অপনি অকৃতজ্ঞ নহেন। আমি হস্তিচরণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়াছি বলিয়া আপনি আমার প্রাণরক্ষার জন্য যত্ন করিতেছেন; কিন্তু নিবৃত্ত হউন। আমি আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় হস্তি-বধ করি নাই। আপনাকে একদিন স্বহস্তে বধ করিব বলিয়া আপনাকে হস্তীর চরণ হইতে রক্ষা করিয়াছি।"

রাজপ্রতিনিধি এবং সেনাপতি উভয়ে উভয়ের মুখাবলোকন করিলেন। খিলিজি কহিলেন, "তুমি নিশ্চয় বাতুল। আপনি প্রাণ হারাইতে বসিয়াছ, অন্যে রক্ষা করিতে গেলে তাহারও প্রতিবন্ধক হইতেছ। ভাল, আমাকে স্বহস্তে বধ করিবার এত সাধ কেন?"

যুবা। কেন? তুমি আমার পিতৃরাজ্যাপহরণ করিয়াছ। আমি মগধরাজপুত্র। যুদ্ধকালে হেমচন্দ্র মগধে থাকিলে তাহা যবন-দস্যু জয় করিতে পারিত না। অপহারী দস্যুর প্রতি রাজদণ্ড বিধান করিব।

বখ্‌তিয়ার কহিলেন, "এখন বাঁচলে ত?"

কুতব-উদ্দীন কহিলেন, "তোমার যে পরিচয় দিতেছ এবং তোমার যেরূপ স্পর্দ্ধা, তাহাতে তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। তুমি এক্ষণে কারাগারে বাস করিবে। পশ্চাৎ তোমার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইবে। রক্ষিগণ, এখন ইহাকে কারাগারে লইয়া যাও।"

রক্ষিগণ হেমচন্দ্রকে বেষ্টিত করিয়া লইয়া চলিল। কুতব-উদ্দীন তখন বখ্‌তিয়ারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সাহাব! এই হিন্দুকে কি ভাবিতেছেন?"

বখ্‌তিয়ার কহিলেন, "অগ্নিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ। যদি কখন হিন্দুসেনা পুনর্ব্বার সমবেত হয়, তবে এ ব্যক্তি সকলকে অগ্নিময় করিবে।"

কুত। সুতরাং অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পূর্ব্বেই নির্ব্বাণ করা কর্ত্তব্য।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, ইত্যবসরে দুর্গমধ্যে তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল। ক্ষণপরে পুররক্ষিগণ আসিয়া সংবাদ দিল, "বন্দী পলাইয়াছে।"

কুতব-উদ্দীন ভ্রূভঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রকারে পলাইল?"

রক্ষিগণ কহিল, "দুর্গমধ্যে একজন যবন একটা অশ্ব লইয়া ফিরাইতেছিল। আমরা বিবেচনা করিলাম যে, কোন সৈনিকের অশ্ব। আমরা ঘোটকের নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। তাহার নিকটে আসিবা-মাত্র বন্দী চকিতের ন্যায় লম্ফ দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠিল এবং অশ্বে কশাঘাত করিয়া বায়ু-বেগে দুর্গদ্বার দিয়া নিক্রান্ত হইল।

কুত। তোমরা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলে না কেন?

রক্ষী। আমরা অশ্ব আনিতে আনিতে সে দৃষ্টিপথের অতীত হইল।

কুত। তীর মারিলে না কেন?

রক্ষী। মারিয়াছিলাম। তাহার কবচে ঠেকিয়া তীর সকল মাটীতে পড়িল।

কুত। যে যবন অশ্ব লইয়া ফিরাইতেছিল, সে কোথায়?

রক্ষী। প্রথমে আমরা বন্দীর প্রতিই মনোনিবেশ করিয়াছিলাম। পশ্চাৎ অশ্বপালের সন্ধান করায় তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।